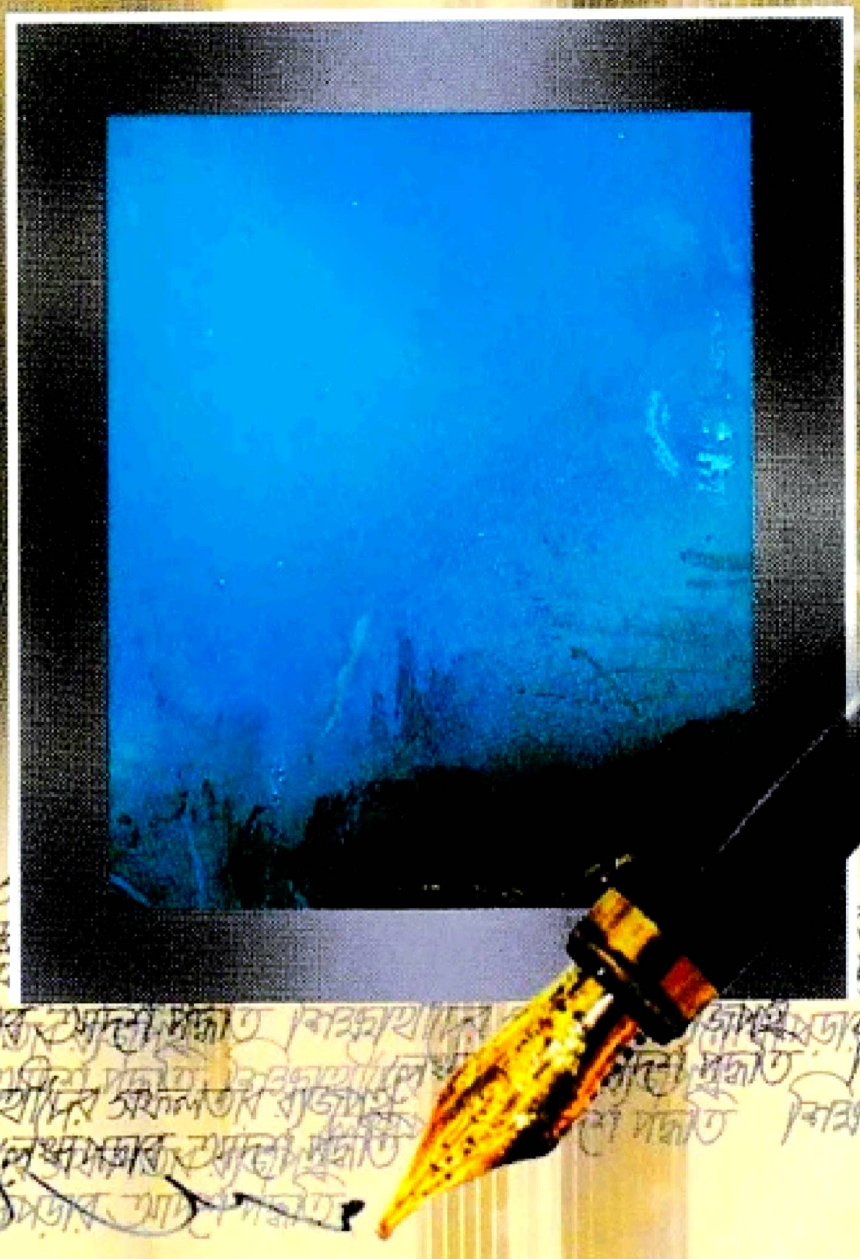
শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দু'টি বই

শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ
লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি



মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

تَعَلَّمْنَا الإِيمَانَ ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ (جُنْدُب رضـ)

শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক

মা'হাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মাকতাবাতুত তাকওয়া

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৯৬২-৪১৫০৭০

শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ

প্রথম প্রকাশ
রজব : ১৪৩০ হিজরি
জুন : ২০০৯ ঈসায়ি

ত্রয়োদশ প্রকাশ
যিলহজ্জ : ১৪৪০ হিজরি
আগস্ট : ২০১৯ ঈসায়ি

লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি

প্রথম প্রকাশ
জুমাদাল উলা : ১৪৩২ হিজরি
মার্চ : ২০১১ ঈসায়ি

একাদশ প্রকাশ
যিলহজ্জ : ১৪৪০ হিজরি
আগস্ট : ২০১৯ ঈসায়ি

প্রকাশক
শাহাদাৎ বিন শামসুজ্জামান (কুতুব ভূঁইয়া)
মোবাইল : ০১৯৬২৪১৫০৭০

স্বত্ব : লেখকের

শব্দবিন্যাস
আল-ফুআদ প্রকাশনী
মাদানীনগর, ঢাকা-১৩৪১

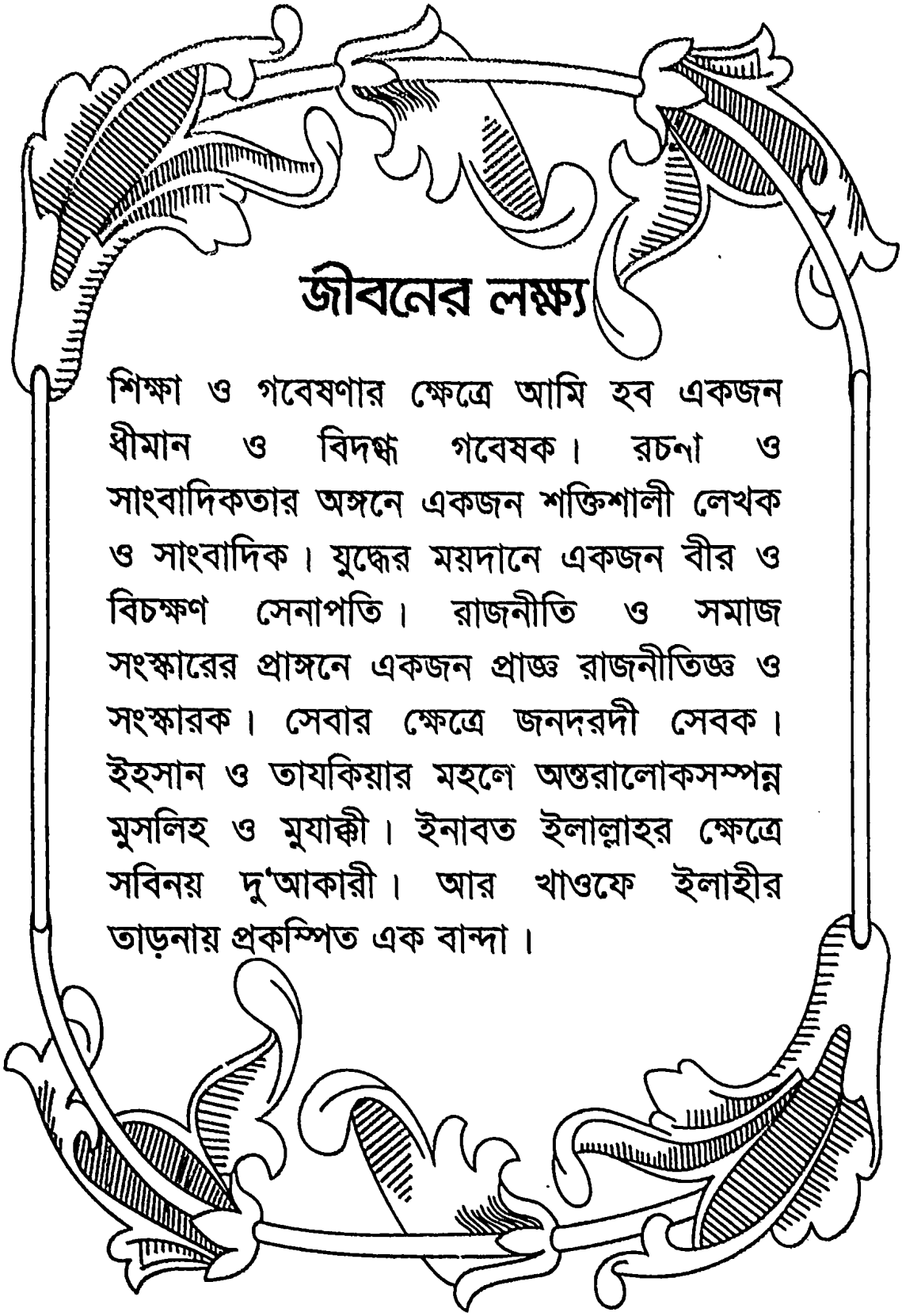
মূল্য : ৬০০.০০ টাকা মাত্র

নাম	: .....
মাদরাসা	: .....
জামাত	: .....
ক্রমিক নং	: .....
হিজরি সন	: .....

উৎসর্গ

সাইফুল্লাহ ফুআদ, শারাফাতুল্লাহ ফুআদ, হাবীবা ফুআদ ও লাবীবা ফুআদসহ দেশের সকল উচ্চাভিলাষী শিক্ষার্থীদেরকে উৎসর্গ করলাম এই বই, যারা লাভ করবে নিজেদের আত্মপরিচয়। হবে ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্যের অধিকারী। হবে জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা, কঠোর পরিশ্রম ও সময়ের সদ্ব্যবহারের প্রবাদব্যক্তিত্ব। গ্রহণ করবে শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন'ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য এবং অধ্যয়ন করবে তাঁদের জীবনচরিত, বাণীসমগ্র ও পত্রসমগ্র। সর্বোপরি সজ্জিত হবে তাকওয়া-তা'আল্লুক মা'আল্লাহ, তাওবা-ইস্তেগফার, দু'আ-মুনাজাত ও আদবের গুণে। উপরন্তু আদর্শ পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে প্রতিষ্ঠিত করবে নিজেদেরকে শেষ নবীর সুযোগ্য উত্তরসূরীরূপে। আকাবিরের পথ ধরে জীবন বিক্রি করবে আল ফিরদাউসের বিনিময়ে। দু'আ করি, আল্লাহ তোমাদের সকলকে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে শান্তিময় জীবন দান করুন এবং তোমাদেরকে মুসলিম উম্মাহর গর্বের ব্যক্তিবর্গে পরিণত করুন। আমীন!

-লেখক



জীবনের লক্ষ্য

শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমি হব একজন ধীমান ও বিদগ্ধ গবেষক। রচনা ও সাংবাদিকতার অঙ্গনে একজন শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক। যুদ্ধের ময়দানে একজন বীর ও বিচক্ষণ সেনাপতি। রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের প্রাঙ্গনে একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও সংস্কারক। সেবার ক্ষেত্রে জনদরদী সেবক। ইহসান ও তাযকিয়ার মহলে অন্তরালোকসম্পন্ন মুসলিহ ও মুযাক্কী। ইনাবত ইলাল্লাহর ক্ষেত্রে সবিনয় দু'আকারী। আর খাওফে ইলাহীর তাড়নায় প্রকম্পিত এক বান্দা।

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَعُلَمَاءِ أُمَّتِهٖ أَجْمَعِيْنَ، وَبَعْدُ،

'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইটির জন্য বর্তমান প্রকাশটি হলো সপ্তম প্রকাশ। পক্ষান্তরে 'লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি' বইটির জন্য বর্তমান প্রকাশটি হলো পঞ্চম প্রকাশ। প্রথম বইটির পঞ্চম প্রকাশ ও দ্বিতীয় বইটির তৃতীয় প্রকাশ নিঃশেষ হওয়ার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে 'মাকতাবাতুত্ তাকওয়া'-এর স্বত্বাধিকারী আমার বিশেষ সুহৃদ মাওলানা শাহাদাত হোসাইন বইদু'টির পরবর্তী মুদ্রণ প্রকাশ করবেন। তিনি চাইলেন, তাঁর প্রকাশিত মুদ্রণটির অঙ্গসজ্জা পূর্বের তুলনায় সুন্দর হোক। এই নেক নিয়তে তিনি বইদু'টি নতুনভাবে কম্পোজ করলেন। প্রুফ দেখার পর্ব সমাপ্ত করার পর একবার দেখে দেয়ার জন্য পেনড্রাইভে কাজটি আমার ল্যাপটবে দিলেন। তখনই। হ্যাঁ, তখনই। তখন কী হলো? তখন ঘটল বহুজনের 'অপ্রত্যাশিত' ঘটনা। বইদু'টির মুদ্রণের সিদ্ধান্ত আপাতত স্থগিত হয়ে গেল। কতদিনের জন্য? এর উত্তরে তখন এক-দেড় মাস বললেও এক-দেড় মাস পর আমার বলতে হলো, 'আমি বলতে পারছি না, কতদিন বিলম্বিত হবে।' আমি শুধু এটুকুই বলতে পারলাম, 'বর্তমান অবস্থায় প্রকাশ করা যাবে না। অনেক কাজ করতে হবে। তারপর।'

মাওলানা শাহদাত হোসাইন আমি যেন বিরক্ত না হই এই অনুরোধ করে প্রায় প্রতি সপ্তাহে আমাকে তাগাদা দিতে থাকলেন। তিনি কেন এত তাগাদা দিচ্ছেন তা বোঝতে আমার কষ্ট হয়নি। কারণ বিপণীকেন্দ্রগুলোতে বইদু'টির কোনো কপি না থাকায় আমার মোবাইলেও এত প্রচুর পরিমাণে কল আসতে থেকেছে যে, বিরক্ত না হওয়ার পূর্ব থেকে মানসিক প্রস্তুতি থাকার কারণেই হয়ত বিরক্ত না হওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি যথেষ্ট ধৈর্য ধারণ করলেন। কিন্তু ধৈর্যেরও তো একটা সীমা আছে। এভাবে প্রায় পাঁচ মাস অতিবাহিত হয়ে গেল।

ওদিকে আমার কাজও সমাপ্ত হচ্ছে না। তখন একদিন তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন, আপাতত পূর্বের সংস্করণটিরই পুঃন মুদ্রণ প্রকাশ করার অনুমতি দিন।

বিষয়টি আমাকেও ভাবিয়ে তোলল। কয়েকজনের সঙ্গে পরামর্শ করলাম। তখনও যেহেতু ধারণা দিতে পারছিলাম না নতুন সংস্করণের কাজ কবে নাগাদ সমাপ্ত হতে পারে, তাই পরামর্শে সকলে এ মতই ব্যক্ত করল যে, আপাতত পূর্বের সংস্করণের পুঃন মুদ্রণ প্রকাশ হোক। তবে মাত্র এক হাজার কপি। মাওলানা শাহাদাত হোসাইন আনন্দিত হলেন। আমিও কিছুটা স্বস্তি বোধ করলাম। কয়েকদিনের মধ্যে মুদ্রিত হলো প্রথম বইটির ষষ্ঠ প্রকাশ ও দ্বিতীয় বইটির চতুর্থ প্রকাশ। শোনলাম, এ মুদ্রণও প্রায় নিঃশেষ হওয়ার পথে। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন!

তারপর নতুন সংস্করণের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে আল্লাহর তাওফীকে সে অনুযায়ী কাজ মোটামুটি সমাপ্ত হয়েছে। আরও কিছু বিষয় আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল।[১] কিন্তু হযরত শাহ ওলীউল্লাহ দেহলভী রহ. [১৩১৪ - ১৩৯৬ হি.]-এর اَلْاِسْتِقْصَاءُ شُؤْمٌ। উক্তিটি স্মরণ

---

১. নিম্নের কিতাবগুলো মুতালা'আ করলে জরুরি অনেক বিষয় আমাদের জানা হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

ক. پاجا سراغ زندگی কৃত, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.। [অনুবাদ, জীবন পথের পাথেয়]

খ. آداب المتعلمين কৃত মাওলানা কারী সাইয়েদ সিদ্দীক আহমদ বান্দবী রহ.।

গ. طلبہ کیلئے تربیتی واقعات কৃত মাওলানা মুহাম্মদ রুহুল্লাহ নকশবন্দী।

ঘ. مَعَالِمُ إِرْشَادِيَّةٌ لِصِنَاعَةِ طَالِبِ العِلمِ কৃত শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা দা. বা.।

এ পুস্তকের ['শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ'] ১৬১ নং পৃষ্ঠায় আরও চারটি কিতাব পড়ার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। সেগুলোও যেন বিভিন্ন সুযোগে আমাদের সকলের পড়া হয়ে যায়।

২. অর্থাৎ কোনো কাজ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমাপ্ত করার জন্য অপেক্ষা করা কুলক্ষণ। 'খুতবাতুল আহকাম' পৃ. ১৯৮ দ্রষ্টব্য। [বাংলা সংস্করণ, এমদাদিয়া পুস্তকালয় (প্রাঃ) লিঃ ঢাকা]

করে আপাতত বিরত থাকলাম। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হলে পরবর্তী সংস্করণে চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের বর্তমানের সংস্করণটির ভিন্নতা পূর্বের তুলনায় এতটাই যে, বইটি স্বতন্ত্র নামে প্রকাশিত হওয়ার দাবিদার। কয়েকজন সুহৃদ আমাকে এমন পরামর্শও দিয়েছেন। কিন্তু দু'টি কারণে 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' নামেই বইটি প্রকাশ করছি। এক. এ শিরোনামের অধীনে বর্তমানে এ আলোচনাগুলোই পেশ করতে চাচ্ছি। দুই. এমন না হলে পূর্বের বইটিও মুদ্রিত হতে থাকবে আর আমি তা চাচ্ছি না।

বর্তমান সংস্করণে আমার একান্ত প্রিয় ছাত্র মাওলানা সিরাজুস্ সালেকীন-এর অংশগ্রহণ এতটাই যে, শাব্দিক অর্থেই সে ছায়ার মতো আমাকে সঙ্গ দিয়েছে। মাশাআল্লাহ, তথ্যসূত্রের ব্যাপারে তার যথেষ্ট ধারণা আছে এবং এ সংস্করণের যথেষ্ট পরিমাণ তথ্যের সন্ধান সে আমাকে দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশেষ 'সমঝ'ও দান করেছেন। আরও দান করেছেন ধীরস্থিরতা ও অবিচলতার গুণ। দান করেছেন ব্যথাভরা এক হৃদয়ও। আমি তার প্রশংসা করছি। তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি না এবং করতেও চাচ্ছি না। কারণ কেউ কারো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলে তাতে এই ইঙ্গিত থাকে যে, যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয় কাজটি তার নিজের নয়। এই দৃষ্টিকোণে তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হবে আমার দৃষ্টিতে তার অবমূল্যায়ন। আল্লাহ তা'আলা আত্মমুগ্ধতাকে তার থেকে দূরে রাখুন[৩] এবং তাকে উত্তম 'সালাফে'র উত্তম 'খালাফ'[৪] বানান। বর্তমান সংস্করণের অধিকাংশ বক্তব্য আমরা দু'জন পর্যালোচনা করে লিখেছি। কখনো এমনও হয়েছে যে, আগে লিখেছি, তারপর পর্যালোচনা করেছি।

---

৩. এখানে এভাবেও লেখা যেত– "আল্লাহ তা'আলা তাকে আত্মমুগ্ধতা থেকে দূরে রাখুন"। কিন্তু ইচ্ছে করেই "আল্লাহ তা'আলা আত্মমুগ্ধতাকে তার থেকে দূরে রাখুন" লিখেছি। সূরা ইউসুফের ২৪ নং আয়াতের كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ থেকে ভাবটি গ্রহণ করেছি।

৪. 'সালাফ' অর্থ পূর্বসূরী আর 'খালাফ' অর্থ উত্তরসূরী।

দারুল উলূম মাদানীনগর মাদরাসায় [ঢাকা] প্রতি সোমবার বাদ জোহর উস্তাদগণ ছাত্রদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বয়ান করেন। সেই ধারাবাহিকতায় বিগত ৯ই রবীউস্ সানী ১৪৩০ হিজরী [মোতাবেক ৬ই এপ্রিল ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ] সোমবার আমার বয়ান ছিল। আমার সাধ্যানুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করার পরই বয়ানটি করেছিলাম। সেই বয়ানটিই ছিল আলোচ্য দুই বইয়ের প্রথম বইটির অঙ্কুর। আর দ্বিতীয় বইয়ের শুরুতে এক স্থানে টীকায় আছে, দ্বিতীয় বইটির মূলও ছিল ১২ টি মজলিসের বয়ান।

বস্তুত সফলতার প্রাকৃতিক ভিত্তিগুলো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের নাগালে রেখেছেন। যারা ভিত্তিগুলো অনুসরণ করে, মেধা-স্বাস্থ্য-পরিবেশ-সচ্ছলতা প্রভৃতি দিক তাদের প্রতিকূল হলেও, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাফল্য দান করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ [অর্থ. যারা আমার পথে কষ্ট করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহ দেখাব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।[৫]] উল্লেখ্য, এখানে সাফল্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উত্তরোত্তর অগ্রগতি লাভ।

সাফল্য অর্জনের প্রধানতম ভিত্তি হলো–

১. আত্মপরিচয় লাভ

২. ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি;

৩. সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য;

৪. পরিশ্রম-সাধনা, সময়ের সদ্ব্যবহার, লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে প্রবল তাড়না সৃষ্টি;

৫. শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন'ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাঁদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা;

৬. তাকওয়া-তা'আল্লুক মা'আল্লাহ, তাওবা-ইস্তেগফার ও দু'আ-মুনাজাত

আর এসবই প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন বিষয়।

---

[৫]. সূরা আনকাবূত, আয়াত নং ৬৯

প্রথম বইয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাধ্যমত এ কথাগুলোরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং দিকনির্দেশাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে। কথাগুলোকে শিক্ষার্থীদের 'আমানত' মনে হয়েছে। এ বইয়ের মাধ্যমে তাদের কাছে তাদের উক্ত আমানত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا [অর্থ. নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে আমানতসমূহ তার হকদারদের নিকট প্রত্যর্পণ করার নির্দেশ দেন।[৬]

বড় দ্বিধার সাথে বইটি প্রকাশ করছি। আমি যেন لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ [কেন এমন কথা বলছ যা নিজে করছ না?[৭]] প্রশ্নের সম্মুখীন না হই। আমি যেন আল্লাহর ক্রোধের শিকার না হই। كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ [যা তোমরা কর না তা বলা, আল্লাহর নিকট অনেক অপছন্দনীয়।[৮]

দারুল উলূম মাদানীনগর মাদরাসার সোমবারের দিক নির্দেশনামূলক মজলিসগুলোর বর্তমান আয়োজক পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা মাহমুদুল হাসান দা. বা. [নাজেম ছাহেব হুজুর]সহ যারা আমাকে ৯ই রবীউস্ সানী ১৪৩০ হিজরী সোমবার বয়ান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং স্নেহাস্পদ ছাত্র মাওলানা মুফতী মুহিব্বুলাহ, মাওলানা মুফতী আব্দুলাহ সালমান, মাওলানা মুফতী নুরুজ্জামান, মাওলানা মুফতী মাহমুদুল হাসানসহ যারা তখন ক্যাসেট থেকে উদ্ধার করে বয়ানটি প্রকাশের যোগ্য করার বিভিন্ন পর্যায়ে অবদান রেখেছিল, এবং দ্বিতীয় বইয়ের আলোচনাগুলো বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার বিভিন্ন পর্বে যারা আমার সাথে বিশেষভাবে অংশ নিয়েছিল, মেহেরবান আল্লাহ আমাদের সকলকে ইখলাছ ও ইখতিছাছ [একনিষ্ঠতা ও বিশেষজ্ঞতা] দান করুন! আমাদের সকলের যবান ও কলমকে মুসলিম উম্মাহর সংস্কার ও পুনর্জাগরণে ব্যবহার করুন! আমীন!! দ্বিতীয় বইয়ের প্রথম সংস্করণে যারা আমাকে

---

৬. সূরা নিসা, আয়াত নং ৫৮
৭. সূরা সাফ, আয়াত নং ২
৮. সূরা সাফ, আয়াত নং ৩

সঙ্গ দিয়েছিল তারা হলো আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা বিলাল হোসাইন, মাওলানা ইলয়াছ খান, মাওলানা আরিফ বিল্লাহ, মাসউদুর রহমান, সাইফুল ইসলাম ও নাজমুল হুদা প্রমুখ।

পরিশেষে তালিবে ইলম ভাইবোনদেরকে বলব, সুনানে ইবনে মাজায়[৯] আছে, হযরত জুনদুব বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেছেন, 'আমরা কয়েকজন টগবগে যুবক নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি। ফলে কুরআন শেখা দ্বারা আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পেয়েছে।' তো আমি বলতে চাচ্ছি, প্রথম সুযোগেই তোমরা আলোচ্য বইদু'টো পড়ে নিবে। পরবর্তীতেও মাঝে মধ্যে পড়বে। তাহলে তোমাদের ইলম শেখা অনেক সহজ ও উপভোগ্য হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ কবুল করুন। আমীন!

বইদু'টির বর্তমান সংস্করণের জন্য আমি আবারও 'মাকতাবাতুত্ তাকওয়া'-এর স্বত্বাধিকারী সুহৃদ মাওলানা শাহাদাত হোসাইন-এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করছি। দৃশ্যত তাঁর নতুন কম্পোজ করার পদক্ষেপটিই হয়েছে বইদু'টির বর্তমান সংস্করণের উপলক্ষ। অতএব আল্লাহ তা'আলা তাঁকেও জাযায়ে খায়ের দান করুন। আমীন!

وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَعُلَمَاءِ اُمَّتِهِ اَجْمَعِيْنَ.

বিনীত

সফিউল্লাহ ফুআদ

[পূর্ব] ভূঁইয়াপাড়া, গল্লাই
চান্দিনা, কুমিল্লা

২০ - ৭ - ১৪৩৫ হি.
২০ - ৫ - ২০১৪ ঈ.
সকাল ১০ টা ১০ মিনিট

---

[৯]. হাদীস নং ৬১. في الزوائد إسناد هذا الحديث صحيح، رجاله ثقات.

সূচীপত্র

শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ

প্রথম অধ্যায়

আত্মপরিচয় লাভ ২৬

আলেমসমাজের অবস্থান ২৮
তোমরা কে? তোমাদের গন্তব্য কোথায়? ২৯
নবুয়তের দায়িত্ব.....৩০
শরীয়তে মুহাম্মদীতে সন্তান উৎসর্গ করার বিধান.....৩৩
এটি সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান ৩৪
আমাদের মূল্য শুধু আল্লাহই পরিশোধ করতে পারেন.....৩৬
আমার নিজের অভিজ্ঞতা ৩৮
কেউ আল্লাহর হয়ে দেখুক! ৪১

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি

জীবনে সফল হওয়ার অন্যতম শর্ত ৪৬
পৃথিবীর বহু কিছু মানুষের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে ৪৬
বিশ্বাসের শক্তি ৪৮
আমরা জন্ম থেকেই বিজয়ী ৫০
হীনম্মন্যতা আত্মবিকাশের পথে অন্যতম বাধা.....৫১
সাবধান! কখনো নেতিবাচক কথা বলবে না ৫১
নিম্নের জিনিসগুলো প্রধান সমস্যা নয় ৫১
মেধার স্বল্পতা ৫২

শারীরিক অসুস্থতা ৫৫
আর্থিক অসচ্ছলতা ৫৬
আর্থিক অধিক সচ্ছলতা ৫৯
পারিবারিক প্রতিকূলতা ৬১
পরিবেশের প্রতিকূলতা ৬৫
বংশীয় আভিজাত্যহীনতা ৭৮
ইয়াতীম হওয়া ৮২
বয়স বেশী হওয়া ও জীবনের দীর্ঘ সময় বিপথে কেটে যাওয়া ৮৩
শারীরিক ত্রুটি, যেমন বধিরতা বোবাত্ব ও অন্ধত্ব ৮৬
নারী হওয়া ৯২
দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব ৯৫
দৃষ্টিভঙ্গির প্রকারভেদ ৯৬
প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির অবস্থা ৯৬
ক্রিয়াশীল ব্যক্তি কেন সফল হয়? ৯৬
ক্রিয়াশীল শিক্ষার্থীদের কয়েকটি গুণ ৯৯

তৃতীয় অধ্যায়

সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য

সফল হওয়ার প্রধান ভিত্তি ১০২
লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা ১০২
লক্ষ্য হতে হবে উচ্চাভিলাষী ১০৩
উচ্চাভিলাষের সংজ্ঞা ১০৪
উচ্চাভিলাষের কিছু ঘটনা ১০৪
ইলমের পথে পূর্বসূরীদের উচ্চাভিলাষ ১০৪
অধ্যয়ন ও গবেষণায় তাঁদের উচ্চাভিলাষ ১০৬
রচনার অঙ্গনে তাঁদের উচ্চাভিলাষ ১২১
তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের উচ্চাভিলাষ ১২৫
ইবাদতে তাঁদের উচ্চাভিলাষ ১২৯
সত্যের জন্য তাঁদের উচ্চাভিলাষ ১৩২

আল্লাহর পথে জিহাদে তাঁদের উচ্চাভিলাষ ১৩৬
সেবার ক্ষেত্রে তাঁদের উচ্চাভিলাষ ১৪২
বিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের উচ্চাভিলাষ ১৪৫
উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের একটি নমুনা ১৫১
সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নির্ধারণের উপকারিতা ১৫২

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশ্রম-সাধনা, সময়ের সদ্ব্যবহার, লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে প্রবল তাড়না সৃষ্টি

পরিশ্রম-সাধনাই হলো লক্ষ্যার্জনের উপায় ১৫৬
লক্ষ্যার্জনে পরিশ্রম ও সাধনা করার কিছু ঘটনা ১৬১
একটি কিতাব বহু বার পড়ার কিছু উদাহরণ ১৭০
পূর্বসূরীদের প্রচুর লেখার কিছু উদাহরণ ১৭৩
সময়ের সদ্ব্যবহার ১৭৫
সর্বদা প্রাণবন্ত ও হাস্যোজ্জ্বল থাকবে ১৮০
পরবর্তীকালের সুফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আনন্দ-ফুর্তি ১৮০
যে বলে– 'আমি তো হাসতে পারি না' ১৮১
সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা একটি দায়েমী সুন্নত ১৮২
সময় সংরক্ষণে সহায়ক কিছু দিকনির্দেশনা ১৮৩
উপযুক্ত সময়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ১৮৪
ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার উপায় ১৮৫
প্রবল তাড়না সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা ১৮৬
প্রবল তাড়না ও জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার একটি উদাহরণ ১৮৬
প্রতিদিন কয়েকবার নিজের লক্ষ্যগুলো আওড়াবে ১৮৭
মনে মনে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার কল্পনা করবে ১৮৮
লেখাপড়ার উদ্দীপক ও চালিকাশক্তি ১৯০
আগ্রহ ও উদ্যমের অবদান ১৯০
ইলমের মহব্বত বৃদ্ধির ১২ টি উপায় ১৯০

পঞ্চম অধ্যায়

শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন'ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাঁদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা

সাহচর্য গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা..... ১৯৯
হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তাইয়েব রহ.-এর আলোচনা ২০১
শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা দা. বা.-এর আলোচনা..... ২২৪
মুহাক্কিক আলেমের নিদর্শন ২৩৭
মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালিক দা. বা.-এর আলোচনা..... ২৪৬
উস্তাদ-শাগরিদ সম্পর্ক ২৪৭
এ যুগের কিছু নমুনা ২৪৭
এই সুন্নত আবারও যিন্দা করতে হবে..... ২৪৯
অহেতুক কিছু অজুহাত ২৫০
জীবনচরিত অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তা ২৫২
আকাবিরের মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতি জানার প্রয়োজনীয়তা ২৫৫
কিছু জীবনচরিত-এর তালিকা ২৫৭
জীবনচরিত অধ্যয়নের মূলনীতি ২৫৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাকওয়া-তা'আল্লুক মা'আল্লাহ, তাওবা-ইস্তেগফার, দু'আ-মুনাজাত

তাকওয়া ও তা'আল্লুক মা'আল্লাহ..... ২৬৩
কেমন হওয়া উচিত তালিবানে ইলমের নামায ও তেলাওয়াত? ২৬৫
ছাত্র জীবনে বাইআত হওয়া না হওয়া ২৬৭
তাওবা ও ইস্তেগফার..... ২৭০
সংশোধনের সময় এখনই ২৭৩
দু'আ ও মুনাজাত..... ২৭৪

লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি

বেফাক-এর মাননীয় মহাসচিব দা. বা.-এর বাণী ২৮৫
বই পরিচিতি ২৮৭
সফলতার ভিত্তিসমূহ ও তার প্রাকৃতিক নিয়মাবলি..... ২৯১
আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু..... ২৯২
শিক্ষার্থীদের কিছু সমস্যা ২৯৪

লেখাপড়ার পরিকল্পনা

রুটিন কী? ২৯৫
রুটিনের প্রয়োজন বোঝার জন্য একটি কার্যকর উপদেশ..... ২৯৫
রুটিন মানেই পুরো সময়কে গাম্ভীর্যপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রাখা নয় ২৯৬
সপ্তাহের ভিত্তিতে রুটিন তৈরি ও তার পদ্ধতি..... ২৯৬
রুটিনে সিলেবাসবহির্ভূত কিতাব ও বইয়ের জন্যও সময় রাখবে ২৯৭
রুটিন তৈরিতে বাস্তববাদী থাকবে..... ২৯৭
অধিক কঠিন কিতাব ও পছন্দনীয় কিতাব পড়ার সময় নির্বাচনে তারতম্য২৯৮
কঠিন পড়া সহজ করার পদ্ধতি..... ২৯৮
ভাগ ভাগ করে পড়ার সুফল ২৯৯
দরসের পড়া আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীর প্রধান কাজ ২৯৯
ছুটির দিনগুলোর রুটিন..... ২৯৯
অসমাপ্ত পড়া সমাপ্ত করার সময় ৩০০
সারা দিনে দরসের পড়া ও অন্যান্য পড়ার সময় ৩০০
সফল লেখক হওয়ার অনুশীলনের রুটিন..... ৩০১
তালিবে ইলমের দৈনন্দিন করণীয়..... ৩০২
রুটিনের প্রতি আকাবিরদের গুরুত্বারোপ..... ৩০৩

কষ্ট-ক্লেশ ও স্বাস্থ্য

রুটিন তৈরির সময় স্বাস্থ্যের দিকও গুরুত্বের সাথে বিবেচনাযোগ্য..... ৩০৭
দ্বীনি ইল্‌ম হাসিল করার একটি অপরিহার্য শর্ত..... ৩০৭
স্বাভাবিক ক্লান্তি ও অস্বাভাবিক ক্লান্তির মধ্যকার পার্থক্য-রেখা..... ৩০৮
রিজার্ভ শক্তি কী?..... ৩০৯
রিজার্ভ শক্তি কখন ব্যবহার করবে?..... ৩০৯
রিজার্ভ শক্তি ব্যয়ের খেশারত দেয়ার উদাহরণ..... ৩০৯
সামর্থ ভেদে শ্রম ও বিশ্রাম..... ৩১০
সুস্বাস্থ্য কী?..... ৩১২

দরসের লেখাপড়ার স্তরসমূহ

দরস পূর্ববর্তী স্তর

দরসের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা..... ৩১৪
দরসের প্রস্তুতি গ্রহণের অর্থ..... ৩১৪
নিজের চেষ্টায় সামনের দরস বোঝার মেহনত..... ৩১৫
হযরত গঙ্গুহী ও হযরত নানুতবী রহ.-এর মুতালা'আর অবস্থা..... ৩১৬
শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর মুতালা'আর অবস্থা..... ৩১৬
নিজের চেষ্টায় সামনের দরস বোঝার মেহনত-এর অবশিষ্ট আলোচনা..... ৩১৮
অনেকের জন্য দরস হয় মুতালা'আ, আর তাকরার হয় দরস..... ৩১৮
মুতালা'আর সময় নোট খাতা রাখবে..... ৩২০
দরসের প্রস্তুতি গ্রহণের উপকারিতা..... ৩২০
একটি শিক্ষণীয় ঘটনা..... ৩২১

দরস চলাকালীন স্তর

মনোযোগসহকারে দরস শ্রবণের অর্থ..... ৩২২
মনোযোগসহকারে শ্রবণকারীর বৈশিষ্ট্য..... ৩২২
দরস চলাকালে নোটখাতা সঙ্গে রাখা..... ৩২৩

দরসে মনোযোগ নিবদ্ধ না থাকার কারণ ৩২৪
দরসে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার জন্য একটি পরামর্শ ৩২৪
গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু কথা ৩২৫
কোনো দরস যেন না ছুটে ৩২৫
শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর কঠোরতা ৩২৬
নিয়মিত হাজিরির ব্যাপারে আকাবিরের পয়গাম ৩২৭
এই যুগের আকাবিরদের অবস্থা ৩২৯
'ছুটি নেওয়া' মানে উপস্থিত না থাকা ৩৩০
অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি ও একটি আশ্চর্য ঘটনা ৩৩২
দরসের নির্ধারিত দশটি নিয়ম ৩৩৩
বোঝার জন্য দরসে প্রশ্ন করা ৩৩৮
প্রশ্ন করার কয়েকটি আদব ৩৩৯
বহস ও মুনাকাশা-র সাথে পড়া ৩৪৪
শিক্ষকের মতো পড়তে চাইলে নিজেই গিয়ে প্রশ্ন ও উত্তর দেখে নাও .. ৩৪৪
সারারাত কিতাব দেখে দেখে প্রশ্ন করতে লজ্জা হয় না? ৩৪৫

দরস-পরবর্তী স্তর

পড়া আয়ত্ত করার চারটি পরামর্শ ৩৪৬
'আপনি - তুমি - তুই' ৩৪৭
হযরত থানবীর ঠিকা ও দায়িত্বগ্রহণ ৩৪৯

উন্মুক্ত লেখাপড়ার পর্বসমূহ ৩৫০

পৃষ্ঠা উল্টানো

'পৃষ্ঠা উল্টানো'র উপমা ৩৫৩
'পৃষ্ঠা উল্টানো'র উদাহরণ ৩৫৩
একটা দুঃখজনক বাস্তবতা ৩৫৪
সময়ের একটি প্রয়োজন ৩৫৫

'পৃষ্ঠা উল্টানো'র অবশিষ্ট আলোচনা ৩৫৫
কীভাবে 'পৃষ্ঠা উল্টানো'র উদ্দেশ্য অর্জিত হবে ৩৫৫
শিরোনামের প্রতি মনোযোগী হও ৩৫৬

প্রশ্ন করা

প্রশ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বেশি স্মরণ থাকে ৩৫৭
প্রশ্নার্জিত তথ্য বেশি স্মরণ থাকার কারণ ৩৫৭
যার কাছে প্রশ্ন থাকে তার লক্ষ্য থাকে ৩৫৭
হাদীসের আলোকে প্রশ্নের গুরুত্ব ৩৫৭
'যার কাছে প্রশ্ন থাকে তার লক্ষ্য থাকে'-এর ব্যাখ্যা ৩৫৮
'প্রশ্ন করা'র পর্ব কখন আরম্ভ হয়? ৩৫৮
প্রশ্ন তৈরি করার দক্ষতা অর্জনের উপায় ৩৫৯
প্রশ্ন তৈরির প্রতি সিলেবাসের বই সংকলনকারীগণের গুরুত্বারোপ ৩৫৯
প্রশ্নমালা কখন পড়বে? ৩৬০
قَصَصُ النَّبِيِّيْنَ পড়ার পদ্ধতি ৩৬০

পাঠ করা

'পাঠ করা' প্রথম কাজ নয় ৩৬১
'পাঠ করা'র লক্ষ্য ও উক্ত লক্ষ্য অর্জনের উপায় ৩৬১
পাঠযোগ্য লেখার ৩টি উপাদান ৩৬১
টীকায় সংক্ষিপ্ত শব্দে মূল বক্তব্য লিখে রাখা ৩৬২
মূল পাঠে রেখা টানা ৩৬২
কখন রেখা টানবে? ৩৬২
যখন ভাগ-বিভক্তি ও শাখা-প্রশাখা বেশী থাকে ৩৬৩
সবকিছু পড়বে ৩৬৩
বুঝে বুঝে পড়বে এবং বোঝার পরীক্ষা করবে ৩৬৪
যখন দুর্বোধ্য কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হবে ৩৬৫

সারাংশ লেখা ৩৬৭
অধ্যয়নে চাই পূর্ণ সচেতনতা ৩৬৭

মনে রাখার চেষ্টা করা

মনে রাখার অর্থ ৩৭৪
নিজকে নিজের পড়া শোনানোর ব্যাখ্যা ৩৭৪
মনে রাখার মূলে রয়েছে মনোযোগ দান ৩৭৫
কান টানলে মাথা আসে ৩৭৫
মনোযোগ দেয়ার বিভিন্ন দিক ৩৭৭
পড়া মুখস্থ হওয়ার সহায়ক কিছু পরামর্শ ৩৭৭
স্মরণ রাখার কিছু সহজ উপায় ৩৭৯

পুনরাবৃত্তি

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা ৩৮২
পুনরাবৃত্তির সময় ৩৮২
পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি ৩৮২

পরীক্ষার্থীদের জন্য আটটি উপদেশ ৩৮৪

পরীক্ষা একটি মজার খেলা

পরীক্ষা শিক্ষার্থীর যোগ্যতা প্রমাণ করার অন্যতম সুযোগ ৩৯১
কারা পরীক্ষার জন্য অধীর অপেক্ষমান থাকে? ৩৯১
পরীক্ষাভীতি শরীরের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে ৩৯১
পরীক্ষার অনুশীলন ৩৯৩
পরীক্ষাভীতির কয়েকটা কারণ ও সেগুলোর সমাধান ৩৯৪
স্মরণশক্তি বিক্ষিপ্ত হওয়ার অন্যতম একটা কারণ ৩৯৪
ভয় দূর করার আরো দু'টি কৌশল ৩৯৫

কীভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে?

খেয়ারের দিনগুলোর কাজ..... ৩৯৬
পুনরাবৃত্তির জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ..... ৩৯৭
পরীক্ষা দেয়া ক্লান্ত ও শক্তিহীন শিক্ষার্থীর কাজ নয়..... ৩৯৭
দাঁত পরিষ্কার করা..... ৩৯৮
প্রশ্নের ব্যাপারে ধারণার আশ্রয় নিবে না..... ৩৯৮
সান্ত্বনার দুষ্টচক্র..... ৩৯৮

পরীক্ষার হলের আচরণ-বিধি

ইচ্ছে করে উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করবে না..... ৩৯৯
পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তের কিছু বর্জনীয় বিষয়..... ৩৯৯
কাগজ হাতে পাওয়ার পর প্রথম করণীয় কাজগুলো..... ৩৯৯
কয়েকটি জরুরী পরামর্শ..... ৪০০
পরীক্ষার হল সংশ্লিষ্ট কিছু সাধারণ জ্ঞাতব্য..... ৪০১

প্রশ্নের পরিভাষা

১. اُكْتُبِ التَّحْلِيْلَ اللَّفْظِيَّ / তাহকীক করো..... ৪০৫
২. وَازِنْ / তুলনা করো..... ৪০৬
৩. عَرِّفْ / পরিচয় দাও..... ৪০৬
৪. اُنْقُدْ / সমালোচনা করো..... ৪০৬
৫. صِفْ / বিবরণ দাও..... ৪০৬
৬. أَوْضِحْ، وَضِّحْ / স্পষ্ট করো..... ৪০৭
৭. لَخِّصْ / সার-সংক্ষেপ লিখ..... ৪০৭
৮. نَاقِشْ / আলোচনা করো..... ৪০৭
৯. عَدِّدِ الْحَالَاتِ/অবস্থাগুলো গুণে গুণে লিখ..... ৪০৭
১০. تَتَبَّعْ / অনুসন্ধান করো..... ৪০৭

পরীক্ষার খাতায় কীভাবে লিখবে? ৪০৮

কীভাবে উত্তরপত্র মানসম্মত করবে?

পরীক্ষার্থীর যে অবদান পরীক্ষক কখনো ভোলেন না..... ৪০৯
স্পষ্ট হস্তাক্ষরের সুফল..... ৪০৯
উত্তরের ভাষা যেন পরিমিত ও পরিষ্কার হয়..... ৪০৯
উদ্দেশ্য বুঝতে বিঘ্নতাসৃষ্টিকারী সংক্ষিপ্তকরণের কুফল..... ৪১০
বিরক্তিকর দীর্ঘায়নের ক্ষতি ৪১০
ভাষা যেন হয় নির্ভুল..... ৪১০
উত্তর সঠিক হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হলে কী করবে? ৪১০
লেখা শেষ করার পর উত্তরপত্র পুনরায় দেখার উপকারিতা..... ৪১১
খাতা জমা দেয়ার পর লিখিত উত্তর নিয়ে চিন্তা করার কুফল..... ৪১১

মৌখিক পরীক্ষা

মৌখিক পরীক্ষা চলাকালীন কিছু সাধারণ জ্ঞাতব্য..... ৪১২

পরীক্ষা সম্পর্কে শেষ কথা

জামাতে প্রথম হলে জীবনে প্রথম হওয়ার পথ সহজ হয় ৪১৪
পরীক্ষা জীবন নয়, জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র..... ৪১৪
পরীক্ষা লক্ষ্য, না উপলক্ষ্য?..... ৪১৫
ভুলে যেও না আখেরাতের পরীক্ষার কথা ৪১৫
সিলেবাসবহির্ভূত পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তা..... ৪১৫
সব পত্রিকাই কি শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর? ৪১৬
দরসের পড়া আয়ত্ত করাই শিক্ষার্থীদের প্রধান কর্তব্য ৪১৬

পড়াতে মন না বসার কিছু কারণ ও সেগুলোর সমাধান

১. আগ্রহের অভাব..... ..... ৪১৭
২. মনোযোগের অভাব ৪১৭
৩. গল্প-গুজবের প্রতি আগ্রহ..... ৪১৭
৪. মনের বিক্ষিপ্ততা ৪১৭

৫. পড়া মনে না থাকা ৪১৯
৬. পূর্বের পরীক্ষায় ফেল করা ৪২০
৭. পূর্বের পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর না পাওয়া ৪২০
৮. পড়াশুনায় অভ্যস্ত না হওয়া ৪২০
৯. ভালো পরিবেশের অভাব ৪২১
১০. মনের অবৈধ আকর্ষণ ৪২২
১১. মানসিক আঘাত ৪২৩
১২. শারীরিক অসুস্থতা ৪২৪
১৩. মাদরাসার লেখাপড়ার প্রতি আস্থাহীনতা ৪২৫
১৪. বাইরের সাথে সম্পর্ক ৪২৫
আকাবিরদের দৃষ্টিতে ছাত্র সংগঠন ৪৩০
ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় ৪৩৫

দু'টি আশার বাণী

শেষ কথা

আলোচনার পটভূমি ৪৩৬
আমি ও তোমরা কেউ যেন জবাবদিহিতার মুখোমুখি না হই ৪৩৬

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা

সুস্বাস্থ্যের অর্থ ৪৪১
সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি ৪৪১

ভিত্তিসমূহের ব্যাখ্যা

১. শোকর, দু'আ ও দান ৪৪২
২. সঠিক জীবনদৃষ্টি ৪৪২
৩. পরিমিত স্বাস্থ্যসম্মত আহার ৪৪৪
৪. যথানিয়মে পর্যাপ্ত পানি পান ৪৪৫
৫. শিথিলায়ন ৪৪৫

৬. দম চর্চা ৪৪৭
৭. ব্যায়াম/হাঁটা ৪৪৭

অভাব কর্মক্ষেত্রের নয়, যোগ্যতার

আনন্দ-বেদনার মুহূর্ত ৪৪৮
তালিবানে ইলমের আনন্দ-বেদনার মুহূর্ত ৪৪৮
আমার আনন্দ-বেদনার মুহূর্ত ৪৪৯
যা নিয়ে আমার পেরেশানী ৪৪৯
আল্লাহর শোকর আদায় করা চাই ৪৫০
প্রত্যেকের এই কষ্টটা হওয়া দরকার ৪৫০
দ্বীনের কাজ كَمْ দ্বারা হয় না, كَيْفَ দ্বারা হয় ৪৫১
কর্মক্ষেত্রের অভাব পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিতদের ৪৫১
একটি ঘটনা ৪৫১
কর্মক্ষেত্রের অভাব ওদের, আমাদের নয় ৪৫২
মাদরাসাগুলোতে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ অনেক ৪৫২
যোগ্য মানুষের বড় অভাব ৪৫২
যোগ্যতা অর্জনের তারতীব ৪৫৪
বন্ধুর সঙ্গে অপরিচিতসুলভ আচরণের একটি উদাহরণ ৪৫৪
যা হলে কর্মক্ষেত্রের অভাব হবে না ৪৫৫
বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার আবশ্যকতা ৪৫৫

বাইতুল্লাহর ছায়া থেকে ৪৫৯
পিতৃত্বের ছায়া ৪৬২
নফসের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার সফল পদ্ধতি ৪৬৫
কিছু দোষ ছাড়ি, আদর্শ জীবন গড়ি ৪৭৬

কুদৃষ্টি বিষয়ক হযরত থানবী রহ.-এর একটি বিশেষ বক্তব্য ... ৪৮৭

একটি সাক্ষাৎকার ৪৯০

কামেল শায়খের পরিচয় ৪৯৭

আমরা এক কাফেলা ৫০০

মুহাসাবা করি, জীবন গড়ি

সম্পাদকের কথা ৫০৫
কিছু কথা, কিছু আশা ৫১১
মুহাসাবার ব্যাপারে লক্ষণীয় কিছু বিষয় ৫১৬

মুহাসাবার বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা

ইবাদত - ১ ..... ৫১৯
ইবাদত - ২ ..... ৫২৪
মুআশারা ও আখলাক - ১ ..... ৫৩১
মুআশারা ও আখলাক - ২ ..... ৫৩৭
পড়ালেখা - ১ ..... ৫৪২
পড়ালেখা - ২ ..... ৫৪৬
ফিকির ও স্বাস্থ্য ৫৫০

মুহাসাবার ছক

ইবাদত - ১ ..... ৫৫৬
ইবাদত - ২ ..... ৫৫৮
মুআশারা ও আখলাক - ১ ..... ৫৬০
মুআশারা ও আখলাক - ২ ..... ৫৬২
পড়ালেখা - ১ ..... ৫৬৪
পড়ালেখা - ২ ..... ৫৬৬
ফিকির ও স্বাস্থ্য ৫৬৮
সারা বছরের তেলাওয়াতের মুহাসাবা ৫৮১
বিরতির সময়ের মুহাসাবা [বিবিধ] ৫৮৩
বিরতির সময়ের মুহাসাবা [লেখাপড়া] ৫৮৪
নিযামুল আওকাত ৫৭২
আগামীকাল থেকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেব ৫৭৪

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

الْحَمْدُ لله وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الأَنْبِيَاءِ والمرسلين، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وَبَعْدُ،

আমার আজকের আলোচনার শিরোনাম হলো 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ'। চমৎকার শিরোনাম, তাই না? জীবনে কিভাবে সফল হওয়া যায়, এখন আমরা সে সম্পর্কে কিছু কথা শুনবো। আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়ে কিছু উপকারী কথা বলার ও শোনার তাওফীক দান করুন এবং সকলকে উপকৃত করুন। আমীন!

কথাগুলো কয়েকটি শিরোনামে বিভক্ত করে বলব ইনশাআল্লাহ। শিরোনামগুলো হলো–

১. আত্মপরিচয় লাভ
২. ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি;
৩. সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য;
৪. পরিশ্রম-সাধনা, সময়ের সদ্ব্যবহার, লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে প্রবল তাড়না সৃষ্টি;
৫. শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন'ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাঁদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা;
৬. তাকওয়া-তা'আল্লুক মা'আল্লাহ, তাওবা-ইস্তেগফার ও দু'আ-মুনাজাত

প্রথম অধ্যায়

আত্মপরিচয় লাভ

একজন শিক্ষার্থীর সর্বপ্রথম কর্তব্য হলো নিজেকে চেনা, নিজের মাকাম ও মর্যাদা জানা, সে কে? সে কি? তার গন্তব্য কোথায়? এ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর অবগত হওয়া, এককথায় আত্মপরিচয় লাভ করা। শিক্ষার্থী যখন নিজেকে চিনবে, নিজের মাকাম ও মর্যাদা জানবে, আত্মপরিচয় লাভ করবে এবং উক্ত পরিচয় তার কাছে গর্বের বস্তু মনে হবে, তখন তার মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত হবে এবং উক্ত পরিচয়ে পরিচিত হওয়ার প্রয়োজনে যেকোনো ত্যাগ ও বিসর্জনের জন্য তার মন প্রস্তুত থাকবে।

শিক্ষার্থী যখন নিজের এই পরিচয় জানবে যে, সে আল্লাহর পথে উৎসর্গিত একজন তরুণ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীনের একজন খাদেম; যখন এ বাস্তবতাটি তার বুঝে এসে যাবে যে, আল্লাহর পথে উৎসর্গিত হওয়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীনের খাদেম হওয়ার চেয়ে উঁচু কোনো অবস্থান ও মর্যাদা পৃথিবীতে নেই, এবং আল্লাহ তাকে যে পদমর্যাদা দান করেছেন ও যে গন্তব্যে পৌঁছার ইচ্ছা সে করেছে, তার চেয়ে উঁচু কোনো পদমর্যাদা ও তার চেয়ে উত্তম কোনো গন্তব্য কল্পনাও করা যায় না, তখন তার মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন আসবে– সে এমন আত্মিক শান্তি ও হৃদয়ের প্রশান্তি অনুভব করবে, যা বিশেষভাবে আল্লাহওয়ালাদের অর্জন হয়। এ পথের যেকোনো ত্যাগ ও বিসর্জন এবং কষ্ট ও ক্লেশকে তখন জিহাদ ও মুজাহাদাই মনে করবে; এই সওদাকে তখন বড় লাভজনক ও সফলতার সওদা মনে করে নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাববে।

উপরন্তু সে কখনো হীনমন্যতার শিকার হবে না, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের মাদরাসাগুলোর অনেক শিক্ষার্থী যার শিকার। তারা মনে করে, মাদরাসায় লেখাপড়া করে পৃথিবীতে আমরা বিরাট ক্ষতি ও লোকসানে পড়ে গেছি; পৃথিবীর আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাশিতা থেকে আমরা চিরতরে বঞ্চিত হয়ে গেছি; আমাদের কোনো ভবিষ্যত নেই।

তাই মাদরাসার প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সর্বপ্রথম নিজের পরিচয় লাভ করা জরুরী; সে কে? সে কি? তার গন্তব্য কোথায়? এ সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর তার জানা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহর জন্য নিকট অতীতের যে দু'জন মনীষীর প্রতি বিশেষ ভালোবাসা আমার অন্তরের অন্তস্থলে রয়েছে, তাঁদের একজন হলেন জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, মুনাযেরে ইসলাম ও দাঈ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী রহ. [১৩২৩ - ১৪১৭ হি.]।[১০] ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতের গুজরাট প্রদেশের এক মসজিদে, সেখানকার মাদরাসার শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি অত্যন্ত ইখলাস ও দরদপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক ভাষণ পেশ করেছিলেন। উক্ত ভাষণে তিনি মাদরাসার শিক্ষার্থীদেরকে সর্বপ্রথম নিজেদের মাকাম ও মর্যাদা বোঝার বিস্তারিতভাবে আহ্বান জানিয়েছেন।

আমি 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের বর্তমান সংস্করণের আলোচ্য 'আত্মপরিচয় লাভ' শিরোনামের অধীনে হযরতের উক্ত আলোচনা উর্দূ থেকে অনুবাদ করে তুলে ধরা উপযোগী মনে করছি। উপরে ভূমিকাস্বরূপ যে কথাগুলো লিখলাম, উক্ত কথাগুলোও হযরতের আলোচ্য বক্তব্যের ছায়া অবলম্বনে লিখেছি। আল্লাহ তা'আলা আলোচনাটি দ্বারা সকলকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

---

১০. তিনি রাবেতা আলমে ইসলামী মক্কা মুকাররমার সদস্য এবং দারুল উলূম দেওবন্দ ও নদওয়াতুল উলামা লখনৌর মজলিসে শুরার সদস্য ছিলেন। যুগোপযোগী ও সহজ-সরল ভাষায় ইসলামকে উপস্থাপন করে *اسلام کیا ہے*، *دین وشریعت*، *قرآن آپ سے کیا کہتا ہے* প্রভৃতি কয়েকটি নজীরবিহীন গ্রন্থ রচনা করেছেন। আট খণ্ডে সুসমাপ্ত *معارف الحدیث* কিতাবটি তাঁরই রচিত। উপরন্তু তিনি ছিলেন বহুল প্রচলিত প্রসিদ্ধ উর্দু মাসিক *الفرقان* পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। আমার বিশেষ ভালোবাসার অপর মনীষী হলেন সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.। শুধু তাঁদেরকে দেখার উদ্দেশ্যে আল্লাহর তাওফীকে আমি ১৯৯৪ ঈসায়ীতে লখনৌ গিয়েছিলাম এবং আল্লাহ আমাকে তাঁদেরকে দেখার তাওফীক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ। হযরত নো'মানী রহ.কে অবশ্য পরে [১৯৯৬ বা ১৯৯৭ ঈসায়ীতে] দেওবন্দে আরেকবার দেখার তাওফীক হয়েছে। অতএব ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

হামদ-সালাত ও প্রারম্ভিক কথার পর তিনি বলেন-

আলেমসমাজের অবস্থান

আমার ভাইয়েরা! আলেমসমাজ হলেন উম্মতের মস্তিষ্ক। আর মস্তিষ্ক সম্পর্কে হাদীস শরীফে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.

[অর্থ. জেনে রাখো, দেহে একটি মাংসখণ্ড আছে, যখন তা সৎ হবে গোটা দেহ সৎ হবে। আর যখন তা অসৎ হবে গোটা দেহ অসৎ হবে। জেনে রাখো, তাহলো অন্তর।]

তো আমরা যারা আলেম পরিচয়ে পরিচিত, আমরা হলাম উম্মতের অন্তর। অতএব আমাদের মধ্যে ফাসাদ ও বিপর্যয় থাকলে, উম্মতের মধ্যে এর চেয়ে হাজার গুণ বেশি ফাসাদ ও বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়বে। আর আমরা যদি সুস্থ থাকি, তাহলে উম্মতও সুস্থ থাকবে ইনশাআল্লাহ।

আমার ভাইয়েরা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সকলের বয়সে বরকত দান করুন। ইনশাআল্লাহ তোমরা হবে আগামী দিনের আলেম। আমি শুরুতেই বলেছি, আমি তোমাদের মতোই একজন তালিবে ইলম। পার্থক্য এই যে, আমি বৃদ্ধ। আমার বয়স সত্তরের কাছাকাছি।[১১] আমি অনেক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছি যেগুলোর মুখোমুখি তোমরাও হবে। সুতরাং আমার কথাগুলো তোমাদের জন্য উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

আমি এখন দেশের মাদরাসাগুলোর পরিদর্শনে বের হয়েছি। আমাকে এর জন্য কেউ দাওয়াত দেয়নি। বরং আমি বের হয়েছি নিজের আগ্রহে ও আত্মার আহ্বানে। আমি এখন তোমাদেরকে যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছি, সেগুলো বলার জন্যই সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়েছি। অতএব আমার এই অধিকার আছে যে, তোমরা আমার কথাগুলো মনোযোগের সাথে শোনবে।

---

১১. হযরত নো'মানী রহ. হিজরী তারিখ হিসেবে ৯৪ বছর বয়সে ১৪১৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন।

তোমরা কে? তোমাদের গন্তব্য কোথায়?

আমার সর্বপ্রথম কথা হলো, তোমরা নিজেদেরকে চিনো। এ বিষয়ে চিন্তা করো– তোমরা কে? তোমাদের পদমর্যাদা ও অবস্থান কী? তোমাদের গন্তব্য কোথায়?

আমার ধারণা, তোমাদের মধ্যে এমন কমই আছে, যারা এ বিষয়গুলো সম্পর্কে যেমন ভাবা দরকার তেমন ভেবেছে। এর ফল এই হয়েছে যে, নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাদের অবগতি নেই, এবং নেই নিজেদের মর্যাদা ও দায়িত্বের অনুভূতি। আমার স্মরণ আছে, একসময় আমার নিজের অবস্থাও এমনই ছিল। তাই আমার ধারণা হলো, সাধারণভাবে তালিবে ইলমদের এ অবস্থাই হয়। আর বলাবাহুল্য যে, এটা বড় ক্ষতির কথা।

আলহামদুলিল্লাহ, তোমরা বিভিন্ন জামাতের তালিবে ইলম হলেও সকলেই সমঝদার ও বিবেকবান। বিষয়টি এভাবে বোঝো, আল্লাহ তা'আলা বিশ্বজগতে আসমান-জমিনসহ যত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোর মধ্যে চিন্তা করলে সহজে এ বিষয়টি বুঝে আসে যে, আল্লাহ তা'আলার মূল উদ্দেশ্য মানুষ সৃষ্টি করা। মানুষ ছাড়া অন্য যা কিছু আছে, সেগুলো সৃষ্টি করেছেন মানুষের সেবা করার জন্য।

বিষয়টি তোমরা এভাবে আরো সহজে বুঝতে পার, আমরা যে মসজিদে এখন উপবিষ্ট আছি এখানে অনেক জিনিস আছে– মিম্বর, যার উপর বসে আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি; জায়নামায, যার উপর তোমরা বসে আছো এবং যার উপর দাঁড়িয়ে নামায পড়া হয়; ঘড়ি, যার মাধ্যমে আমরা সময় জানি। এছাড়াও আছে অজু-এস্তেঞ্জার সকল ব্যবস্থা। তোমরা ভেবে দেখো, এই জিনিসগুলো কী জন্য এবং কার জন্য? উত্তর এটিই হবে যে, এই সবগুলো জিনিস মুসুল্লীদের জন্য; মুসল্লীরা এগুলোর কোনটির জন্য নয়।

এভাবে আকাশ ও পৃথিবীর সকল জিনিসের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবগুলো জিনিস মানুষের জন্য, মানুষ সেগুলোর কোনো একটির জন্য নয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকেও ইরশাদ করেছেন– خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

[পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।[১২]]

তো এই বিশ্বজগতে চিন্তা করলে এ বিষয়টি পুরোপুরি বুঝে এসে যায় যে, সমগ্র পৃথিবী ও সকল মাখলুকের মধ্যে মানুষ হলো মূল। মানুষ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের সেবা করার জন্য।

এখন প্রশ্ন হলো, মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে কোন্ উদ্দেশ্যে? এমন তো হতে পারে না যে, আল্লাহ তা'আলা উদ্দেশ্যহীন হয়ে মানুষকে অনর্থক সৃষ্টি করেছেন। মানুষ কী করে শুধু সেই তামাশা দেখার জন্য সৃষ্টি করেছেন। تَعَالَى اللهُ عَنْ ذٰلِكَ عُلُوًّا كَبِيْرًا [আল্লাহ এমন ধারণা থেকে বহু উর্ধ্বে]।

একটু চিন্তা করলেই বোঝা সম্ভব, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করে তাকে বিবেক, অনুভূতি, ইচ্ছাশক্তি ও কর্মক্ষমতা প্রভৃতি নেয়ামতসমূহ শুধু এ জন্য দান করেছেন যে, মানুষ যেন আল্লাহকে জানতে পারে এবং আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করে জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। তাহলে মানুষ আল্লাহর উচ্চতর পুরস্কারসমূহ লাভের উপযুক্ত হবে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা এবং দান ও করুণার পরিপূর্ণ প্রকাশক্ষেত্র হবে। পক্ষান্তরে যে কেউ আল্লাহর নাফরমানি ও অবাধ্যতার জীবন বেছে নিবে, তার ক্ষেত্রে আল্লাহর ক্রোধ ও প্রতাপ এবং দমন ও শাস্তিদানের ক্ষমতার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। তাই মানুষের জন্য এ বিষয়টির জ্ঞান লাভ করা অতীব প্রয়োজন যে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ কী এবং দিকনির্দেশনা কী।

এ উদ্দেশ্যেই আল্লাহ তা'আলা নবুওয়ত ও রিসালাতের ধারা চালু করেছেন। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল।

নবুয়তের দায়িত্ব

নবুয়তের দায়িত্ব দু'টো ছিল– এক. ওহীর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা। দুই. ওহীর দিকনির্দেশনা মানুষের নিকট পৌঁছানো এবং তাদেরকে সেই আলোকে পরিচালিত করার চেষ্টা করা।

---

১২. সূরা বাকারা, ২৯

আজ থেকে চৌদ্দশ বছর পূর্বে যখন সাইয়েদুনা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হন, তখন মানবপৃথিবীর অবস্থা ও কাঠামোতে এমন কিছু পরিবর্তন এসে গিয়েছিল, অথবা বলো- মানুষের [বিবেকের] এতটুকু উন্নতি হয়ে গিয়েছিল যে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রজ্ঞার দাবি হয়েছে, তাঁর নবুওয়তকে শেষ নবুওয়ত সাব্যস্ত করা হোক এবং তাঁর মাধ্যমে মানবজাতির জন্য এমন ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদান করা হোক, যা চিরকালের জন্য যথেষ্ট হবে। এবং উক্ত দিকনির্দেশনা এমনভাবে সংরক্ষিত হওয়ারও ব্যবস্থা করা হোক যে, তারপর আর কোনো নতুন ওহী ও দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হবে না।

আমার, তোমাদের ও সকল মুসলমানের আকীদা ও বিশ্বাস হলো, আমাদের রাসূল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এমন দিকনির্দেশনা এসে গেছে। আর তা কেয়ামত পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত থাকবে। এভাবে নবুয়তের প্রথম দায়িত্বটি সুসমাপ্ত হয়ে গেছে। নতুন কোনো নবী প্রেরণ করে নতুন কোনো দিকনির্দেশনা প্রদান করার কোনো প্রয়োজন বাকি থাকেনি।

অবশ্য নবুয়তের দ্বিতীয় দায়িত্বটি এখনো অব্যাহত আছে। তাহলো আল্লাহ তা'আলার দিকনির্দেশনাকে মানুষের নিকট পৌঁছানো এবং তাদেরকে এর উপর পরিচালিত করার চেষ্টা-মেহনত করা। এ দায়িত্বটি কেয়ামত পর্যন্ত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের উপর অর্পণ করা হয়েছে।

উম্মতে মুহাম্মদীর দু'টি অবস্থান। প্রথম অবস্থানটি অন্যান্য নবীদের উম্মতগণের মতোই। তাহলো হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দিকনির্দেশনা ও শরীয়তের অনুসরণ করা। দ্বিতীয় অবস্থানটি উম্মতে মুহাম্মদীর একক বৈশিষ্ট্য। তাহলো নবুওয়তের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত হওয়ার পর এই উম্মত নবীওয়ালা মেহনতের দায়িত্বশীল। এই উম্মত পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট ওহীর দিকনির্দেশনা পৌঁছাবে এবং সকলকে এর উপর পরিচালিত করার জন্য নবীওয়ালা মেহনত-মুজাহাদা করবে। এভাবে এই উম্মত নববী দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নবীগণের প্রতিনিধিও বটে।[১৩]

---

[১৩]. মারকাযুদ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা-এর 'আমীনুত তালীম' মাওলানা

তবে নববী দায়িত্ব ও প্রতিনিধিত্বের দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথমটি সাধারণ স্তর, যার জন্য বিশেষ কোনো জ্ঞান ও বিশেষ কোনো যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। এটি প্রত্যেক ঈমানদারের দায়িত্ব। এটি সাধারণ মুসলমানদের স্তর এবং এটিও অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ স্তর। দ্বিতীয়টি বিশেষ স্তর। তাহলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে যে ইলম লাভ করেছেন এবং যে দিকনির্দেশনা ও শরীয়তের অধিকারী হয়েছেন, নিজ নিজ যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুসারে তা অর্জন করা, এবং যথাযথভাবে নবীজির বিশেষ প্রতিনিধিত্ব করা। এটি অতি উঁচু স্তর। এটি উম্মতের বিশেষ শ্রেণীর স্তর। এরাই মূলত নবীগণের উত্তরসূরী ও প্রতিনিধি।

আমাদের মাদরাসাগুলো মূলত কুরআন-হাদীস ও ধর্মীয় অন্যান্য ইলম শিক্ষাদানপূর্বক এমন লোক গড়ে তোলার কারখানা, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্ত বিশেষ প্রতিনিধিত্ব ও উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালন করবে; একে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য বানাবে এবং এ উদ্দেশ্যে নিজেদেরকে ওয়াক্‌ফ করবে।

আমার ভাইয়েরা! এটাই হলো তোমাদের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা। এটাই ছিল আমাদের মাদরাসাগুলোর মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কুরআন মাজীদে কয়েক স্থানে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মা হযরত মারয়াম বিনতে ইমরান রা.-এর জন্মের আলোচনা এসেছে। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে, যখন তাঁর আম্মা [ইমরানের স্ত্রী] সন্তান জন্মলাভের আশা অনুভব করলেন, [এবং সম্ভবত কিছু লক্ষণের ভিত্তিতে তিনি পুত্র সন্তান লাভ করার ধারণা করলেন] তখন তিনি মানত করে বললেন, হে

মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. লিখেছেন– এ বিষয়ে সঠিক কথা এই যে, দ্বীনের হেফাযত ও প্রচারের কাজ পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরয ছিল। পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যেও নায়েবে নবী ও ওয়ারিছে নবী বিদ্যমান ছিল। এ বিষয়টি কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। এখানে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী রহ.-এর বক্তব্য থেকে যে বিষয়টি শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয়, সেটা সামনে আসছে...। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সঠিক বিষয়টি উপলব্ধি করে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আল্লাহ! আমি আমার গর্ভস্থ সন্তানকে তোমার জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিলাম। কুরআন পাকে তাঁর এই মানতের বিবরণ এভাবে এসেছে–

رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

[হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমি উৎসর্গ করে দিলাম তোমার জন্য আমার গর্ভে যা (যে শিশু) আছে তাকে, তাকে তোমার ঘরের সেবার জন্য নির্দিষ্ট রাখা হবে।[১৪] অতএব তুমি আমার পক্ষ থেকে কবুল করো। নিঃসন্দেহে তুমিই সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।]

বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথা ছিল– আল্লাহর নেক বান্দা ও বান্দীগণ তাদের নবজাতককে আল্লাহর ঘরের সেবায় উৎসর্গ করে দিতেন। তাদেরকে مُحَرَّر বলা হতো। তাদের উদ্দেশ্য হতো, আমরা আমাদের সন্তানকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করে দিলাম। সে কোনো কায়-কারবার ও উপার্জন করবে না। বিবাহ-শাদীও করবে না। ঘর-বাড়িও নির্মাণ করবে না। শুধু আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন ও উপাসনালয়ের সেবায় নিযুক্ত থাকবে।

শরীয়তে মুহাম্মদীতে সন্তান উৎসর্গ করার বিধান

ইমাম আবু বকর জাছ্‌ছাছ্ রাযী রহ. তাঁর তাফসীরের কিতাব 'আহকামুল কুরআনে' এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন– সন্তানকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করার এই নিয়ম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়তেও আছে। তবে মুহাম্মদী শরীয়তের স্বভাব অনুযায়ী তার আকৃতিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। তাহলো যাদের তাওফীক হয় তারা নিজেদের সন্তানের ব্যাপারে এভাবে নিয়ত করবে– আমরা তাকে আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দ্বীনের খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ করলাম। তখন সে দ্বীনের ইলম হাসিল করার জন্য এবং দ্বীনের খেদমত করার জন্য ওয়াক্‌ফ হয়ে যাবে। সে শুধু আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। তার জীবনের লক্ষ্য হবে দ্বীনের খেদমত করা, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা ও আল্লাহর ইবাদত করা। কিন্তু মুহাম্মদী

---

১৪. حَرَّرَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ -পিতা তার সন্তানকে আল্লাহর ঘরের সেবার জন্য নির্দিষ্ট করলেন। الْمُحَرَّرُ -আল্লাহর ঘরের সেবার জন্য নির্দিষ্ট। আয়াতে مُحَرَّرًا ইসমুল মাফউলের অর্থ المضارعُ المجهول তথা يُحَرَّرُ দ্বারা করা হয়েছে।

শরীয়তে সে বিবাহও করতে পারবে। জীবিকার জন্য কোনো পথও গ্রহণ করতে পারবে। তবে তার জীবনের লক্ষ্য ও মূল কাজ হবে দ্বীনের ইলম হাসিল করা ও দ্বীনের খেদমত করা। এ উদ্দেশ্যেই হবে তার জীবন এবং এ লক্ষ্যেই হবে তার মরণ। তো আমার ভাইয়েরা! তোমরা যারা এ সকল মাদরাসায় পড়তে এসেছ, তোমাদেরকে এভাবে غُرَبَاء হতে হবে।

আমার ধারণা, তোমাদের মধ্য থেকে এমন খুব কম হবে, যাদেরকে তাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণ এভাবে চিন্তা করে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করেছেন, এবং এই উদ্দেশ্যে দ্বীনের ইলম শিক্ষায় নিয়োজিত করেছেন। তবে তোমাদের জন্য এই সুযোগ আছে, স্বয়ং তোমরা নিজেদের জন্য এই নিয়ত ও সিদ্ধান্ত করে নাও, এবং নিজেদেরকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দাও।

যেভাবে তোমরা নামাযের নিয়ত কর, তখন নামায আল্লাহর জন্য হয়ে যায়; সেভাবে পুরো জীবনের জন্য নিয়ত করে নাও যে, আমি নিজেকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওয়াক্‌ফ করলাম। এখন আমি আল্লাহর দ্বীনের খেদমত করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ইলম শিখব এবং দ্বীনের খেদমত করব। এটাই আমার জীবনের লক্ষ্য। এর জন্যই নিবেদিত হবে আমার জীবন ও আমার মরণ। (مَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ) তাহলে তোমাদের পুরো জীবন আল্লাহর জন্য হয়ে যাবে। তোমরা হয়ে যাবে 'হিজবুল্লাহ' [আল্লাহর দল] ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈন্যবাহিনীর সদস্য।

এটি সর্বোচ্চ মর্যাদা ও অবস্থান

আমার ভাইয়েরা! আল্লাহর ওয়াস্তে ভেবে দেখো, পৃথিবীতে এর চেয়ে উঁচু কোনো অবস্থান ও মর্যাদা নেই। আমি তোমাদেরকে বলছি, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি বিষয়টি এখনো অনুধাবন না করে থাক, তাহলে এখন অনুধাবন করো। পূর্ণ বুঝ ও সমঝের সাথে নিয়ত করো এবং নিজেকে আল্লাহর জন্য ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওয়াকফ্ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও। এই নিয়তে যদি তোমাদের পূর্ণ আন্তরিকতা ও সততা থাকে, তাহলে বিশ্বাস করে নাও যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কবুল করে নিয়েছেন।

আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওয়াকফ্ হওয়ার নিয়ত ও সিদ্ধান্তের পর তোমাদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ এক বিরাট পরিবর্তন আসবে। তোমরা কখনো সেই হীনমন্যতার শিকার হবে না, আমাদের মাদরাসাগুলোর অনেক ছাত্র বরং দুর্ভাগ্যবশত অনেক শিক্ষকও যার শিকার। তারা মনে করে, পৃথিবীতে আমরা বিরাট ক্ষতি ও লোকসানে পড়ে গেছি। আলেম ও মাওলানা হওয়ার পর বড় কোনো চাকরি পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পৃথিবীর আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাশিতা থেকে আমরা চিরতরে বঞ্চিত হয়ে গেলাম। অভাব ও দারিদ্রের কষ্ট আমাদের নিত্যসঙ্গী থাকবে। আমাদের কোনো ভবিষ্যত নেই।[১৫]

তোমরা যদি এ বিষয়টি বুঝে নাও যে, আমরা এখন আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত দ্বীনের খেদমত হলো আমাদের মিশন ও জীবনের লক্ষ্য, এবং আল্লাহ আমাদেরকে এর তাওফীক দান করে কবুল করেছেন বলে আমরা সৌভাগ্যবান, তাহলে ইনশাআল্লাহ হীনমন্যতার অনুভূতি কখনো তোমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না। উপরন্তু তোমাদের এই অনুভূতি হবে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে যে পদমর্যাদা দান করেছেন ও যে গন্তব্যে তোমরা পৌছার ইচ্ছা করছ, তা পৃথিবীর বড় থেকে বড় কোনো মানুষ কল্পনাও করতে পারে না, তখন তোমরা এমন আত্মিক শান্তি ও হৃদয়ের প্রশান্তি অনুভব করবে যা বিশেষভাবে আল্লাহওয়ালাদের অর্জন হয়।

তারপর যদি কখনো কষ্ট, অভাব ও দারিদ্রের শিকার হও, তাহলে তাকে আল্লাহর পথে ত্যাগ ও কোরবানী এবং জিহাদ ও মুজাহাদাই মনে করবে এবং এই সওদাকে তখন বড় লাভজনক ও সফলতার সওদা মনে করে নিজেদেরকে সৌভাগ্যবান ভাববে।[১৬] এমন উপলক্ষ্যেই কুরআন পাকে

---

[১৫]. টীকাটি ৪৩ নং পৃষ্ঠায় পড়ো।

[১৬]. হযরত নো'মানী রহ.-এর আলোচ্য ভাষণের অনুবাদে আদীব হুজুর মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা. বা. লিখেছেন– কারণ ... আপনার নবীকে তো পাগল বলা হয়েছে, পাথর ছোঁড়া হয়েছে। কী জন্য? শুধু দ্বীনের জন্য! সেই যিল্লতি ও উপহাসের কিছু হিছ্ছা আপনারও ভাগে এসেছে।

ইরশাদ হয়েছে–

فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

[সুতরাং তোমরা যে সওদা করেছ তার জন্য আনন্দ করতে থাক, আর সেটাই তো বিরাট সফলতা।]

এই বক্তব্য দ্বারা তোমাদের মধ্যে আল্লাহ না করুন আত্মগর্ব ও অহঙ্কার যেন পয়দা না হয় এবং নিজেদেরকে তোমরা যেন আল্লাহর ওলী ও আদরের দুলাল মনে করা শুরু না করে দাও। এমনটা আমার কখনই উদ্দেশ্য নয়। অহঙ্কার ও আত্মমুগ্ধতা তো আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত হওয়ার কারণ।[১৭]

বরং আমার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা দ্বীনের ইলম অর্জন ও দ্বীনের খেদমতের দায়িত্বকে সবচে' মর্যাদার বিষয় মনে করবে; এর জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিবে; আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকবে, তিনি যেন তোমাদেরকে কবুল করে নেন; পাশাপাশি নিজেদের ভুল-ত্রুটি ও দুর্বলতার জন্য সবসময় তাওবা-ইস্তিগফার করবে, তাঁর দরবারে কান্নাকাটি যেমন করবে, তেমনি তাঁর দয়ার আশা ও প্রত্যাশাও করবে।

আমাদের মূল্য শুধু আল্লাহই পরিশোধ করতে পারেন

তো তোমাদের প্রতি আমার প্রথম কথা বা উপদেশ এটাই যে, তোমরা যদি এখনো নিজেদের অবস্থান ও মর্যাদা না বুঝে থাক এবং নিজেদের ব্যাপারে এমন কোনো সিদ্ধান্ত না নিয়ে থাক, তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে এই মসজিদে বসেই এই মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও।[১৮] যেভাবে এক সেকেণ্ডে ইজাব ও

---

[১৭]. আদীব হুজুর লিখেছেন– আসলে আমাদের মনে যেন গর্ব ও অহঙ্কার না আসে, এ জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ পথে কিছুটা অভাব ও দারিদ্র এবং হীনতা ও যিল্লতি রেখে দিয়েছেন। তারপরো তো অনেকের মধ্যে অহঙ্কার ও বড়ত্বের অনুভূতি এসে পড়ে এবং যিন্দেগিতে হালাকাত ও বরবাদি নেমে আসে।

[১৮]. আদীব হুজুর লিখেছেন– এ মুহূর্তে, এই মসজিদে বসেই ফায়সালা করে ফেলুন যে, আমাদের জান-মাল আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিলাম, কিসের বিনিময়ে? জান্নাতের বিনিময়ে। খরিদ করার ইজাব করেছেন স্বয়ং আল্লাহ, আপনি তা কবুল করছেন। ইজাব ও কবুল দ্বারাই বেচা-কেনা হয়ে যায়। মুহূর্তের কাজ। আপনি এক বিরাট বাগান খরিদ করবেন। আপনি শুধু বললেন, বাগানটি আমি খরিদ করতে চাই একলাখ টাকার বিনিময়ে। বাগানের মালিক বললো, আমি রাজি। ব্যস হয়ে গেলো বেচা-কেনা। মুহূর্তের

কবুলের পর অপরিচিত দু'জনের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে যায়, এভাবে তোমরা এক সেকেণ্ডে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আল্লাহর হয়ে যেতে পার এবং আল্লাহ হয়ে যাবেন তোমাদের। তাহলে লক্ষ করবে, এর পর তোমাদের চিন্তা-চেতনায় কেমন পরিবর্তন আসে! হিম্মত ও মনোবলে কেমন উচ্চতা সাধিত হয়! এবং তোমরা কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে যাও!

এখন তোমরা নিজেদেরকে না চেনার কারণে এবং নিজেদের মাকাম ও মর্যাদা না জানার কারণে, নিজেদেরকে বরং সমগ্র ইলমী পরিবারকে সম্পূর্ণ মূল্যহীন ও বাজারের অচল মুদ্রা মনে করছ, এবং নির্জীব ও মনমরা হয়ে আছো। কিন্তু যদি তোমরা নিজেদের মাকাম ও মর্যাদা বোঝে নিজেদের ব্যাপারে সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও যা আমি তোমাদেরকে বলছি, এবং নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দাও যেভাবে মারয়াম সিদ্দীকার আম্মা করেছিলেন, তাহলে তোমাদের অনুভূতি এটাই হবে যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ আমাদের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না।[১৯] نرخ بالا کن کہ ارزانی ہنوز [মূল্য বৃদ্ধি করো, এখনও কমই বলছ।]

সাথে সাথে আমি তোমাদেরকে এমন দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি যার উপর ভিত্তি করে আমার শপথ করাও বৈধ হবে– তোমাদের মধ্য থেকে যারা

মধ্যে আপনি বাগানের মালিক হয়ে গেলেন, এমনকি এখনো মূল্য পরিশোধ না করেও। তো এখানে আল্লাহর ঘরে বসে এই মুহূর্তে আপনি আল্লাহর সঙ্গে বেচা-কেনা করে ফেলুন। আল্লাহ ইজাব ও প্রস্তাব করেছেন, হে আমার বান্দা, আমি তোমার জান-মাল খরিদ করতে চাই জান্নাতের বিনিময়ে! বড় লোভনীয় প্রস্তাব, আপনি বলে ফেলুন, আমি রাজি! ব্যস হয়ে গেলো। আপনার জান-মাল চলে গেলো আল্লাহ তা'আলার মালিকানায়, আপনি হয়ে গেলেন জান্নাতের মালিক! জান্নাতের সওদা! মুহূর্তের কাজ, এখনই, এই মুহূর্তে করে ফেলুন।

১৯. আদীব হুজুর লিখেছেন– দুনিয়ার বাজারে যেকোনো বস্তুর ও যেকোনো ব্যক্তির মূল্য নির্ধারণ করা এবং পরিশোধ করা সম্ভব, সম্ভব নয় শুধু কোনো তালিবে ইলমের মূল্য নির্ধারণ করা। কেননা তাঁর মূল্য তো দুনিয়ার তুচ্ছ সোনা-চাঁদি ও মণি-কাঞ্চন দ্বারা হয় না; তাঁর মূল্য নির্ধারণ করা যায় শুধু এবং শুধু জান্নাত দ্বারা। আমরা যদি নিজেদের মূল্য বুঝতে পারি, তাহলে ঈমানের দৃঢ়তা এবং বিশ্বাসের দৃপ্ততা নিয়ে মানব-সভায় এ ঘোষণা দিতে পারি– হে মানুষ! দুনিয়ার বাজারে সবকিছুর সওদা হতে পারে, আমাদের সওদা হতে পারে না।

সাচ্চা দিলে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিবে এবং সিদ্ধান্তের উপর অনড় ও অবিচল থেকে এর শর্তগুলো পূর্ণ করতে থাকবে, তাদের উপর ইনশাআল্লাহ্ দুনিয়াতেই আল্লাহর অনুগ্রহ বর্ষিত হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এমন সব মাধ্যমে সাহায্য করবেন, যা তাদের কল্পনাও আসবে না। مَنْ كَانَ لِلّٰهِ كَانَ اللّٰهُ لَهٗ যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য হয়ে যায় আল্লাহ্ তার জন্য হয়ে যান।

আমার নিজের অভিজ্ঞতা

আমি এ প্রসঙ্গে তোমাদের সামনে আমার নিজের অভিজ্ঞতা তুলে ধরতে সংকোচ বোধ করছি না। আমার মূল বাড়ি হলো উত্তর প্রদেশের মুরাদাবাদ জেলার সম্ভল নামক মহকুমায়। প্রশাসনিক দিক থেকে এটি একটি মহকুমা ও সাবডিভিশন হলেও জনবসতির দিক থেকে এটি একটি বড় শহর। সম্ভলের জনসংখ্যা এক লাখের উপরে। আজ থেকে ষাট সত্তর বছর পূর্বে আমার পিতা মহকুমার নেতৃস্থানীয় ও ধনী লোকদের মধ্যে গণ্য হতেন। তাই নিজের সন্তানদেরকে জাগতিক উচ্চশিক্ষা দান করার তাঁর পূর্ণ সুযোগ ছিল। কিন্তু তিনি নিয়ত করে রেখেছিলেন, যদ্দুর সম্ভব হয় তিনি তাঁর সন্তানদেরকে দ্বীনী শিক্ষা দান করবেন, যেন তারা আখেরাতে তাঁর উপকারে আসে।

আমার বয়স যখন বারো তের বছর হবে, তখন আমাদের জেলায় একজন ইংরেজ কালেক্টর আসলেন। জানা নেই, কী কারণে আমার পিতার প্রতি তিনি অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন। তিনি যখন জানতে পারলেন আব্বাজান তাঁর কোনো সন্তানকেই জাগতিক শিক্ষা দান করেন নি, তখন তাঁকে উদ্বুদ্ধ করলেন এবং আমার বয়স ইত্যাদি বিবেচনা করে বিশেষভাবে আমার সম্পর্কে বললেন, তাকে আগামী কাল হাইস্কুলে পাঠিয়ে দিন। পাঁচ বছরে এন্ট্রান্স পাশ করে ফেলবে। তখন আমি তাকে নায়েব তহশীলদারের চাকুরি দিয়ে দেবো।

তখনকার যুগে নায়েব তহশীলদারের চাকুরি অনেক বড় ব্যাপার ছিলো। তা থেকে উন্নতি করে একজন চাকুরিজীবি তহশীলদার হয়ে যেত। তারপর ডেপুটি কালেক্টরের পদে উন্নতি লাভ করত। আর এটিই ছিলো ভারতীয়দের জন্য চাকুরির সর্বোচ্চ পদ। কালেক্টর তখনকার যুগে সাধারণত ইংরেজরাই হতো।

আল্লাহ তা'আলা আব্বাজানের রূহের উপর অসংখ্য রহমত বর্ষণ করুন। তিনি কালেক্টরের এই পরামর্শ সত্ত্বেও আমাকে ইংরেজি পড়ানোর জন্য উদ্বুদ্ধ

হন নি। বিষয়টি যখন আব্বাজানের কয়েকজন আন্তরিক বন্ধু অবগত হলেন, তখন তারা আব্বাজানকে অনেকবার বোঝালেন– এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। তাকে অবশ্যই স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেয়া উচিত।

আব্বাজান শেষে তাদেরকে বললেন, আসল কথা হলো, এ বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত যে, আমার জীবদ্দশায় আমার সন্তানদের উপার্জনের আমার কোনো প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেই তাদের আহার-বিহারের ব্যবস্থা করতে পারব ইনশাআল্লাহ। হাঁ, মৃত্যুর পর কবরে আমার তাদের উপার্জনের প্রয়োজন হবে। অতএব আমি তো তাকে ঐ শিক্ষাই দান করব, যা কবরে আমার উপকারে আসবে।

তো আব্বাজান আমাকে এই নিয়তেই দ্বীনের শিক্ষা দান করেছেন যে, আমি যেন শুধুই দ্বীনের খেদমত করি এবং তিনি আখেরাতে তা দ্বারা উপকৃত হন। আমার শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হওয়ার পরও দীর্ঘ কাল পর্যন্ত তিনি আমার খরচারির ব্যবস্থা করতেন। বরং বলা যায়, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি আমার খরচ বহন করেন।

আমার ধারণায় আব্বাজানের নিয়ত ও ইখলাসেরই বরকত এই হয়েছে যে, দুনিয়াতেও আল্লাহ তা'আলা আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন। অথচ আমি বিত্তবান নই। যাকাত কখনো ফরয হয়, কখনো ফরয হয় না। কিন্তু আমার মালিক আমাকে এত শান্তি ও সুখ দান করেছেন, যা অনেক বিত্তবানদের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। উড়োজাহাজে উড়ি, কারে সফর করি, অথচ আমার কাছে সাইকেলও নেই। আলহামদুলিল্লাহ, জীবনের সকল প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে পূরণ হয়ে যায় এবং অনেক ভালোভাবে পূরণ হয়।[২০] যদি ডেপুটি কালেক্টর হতাম, এমনকি কালেক্টরও

---

২০. এটি এ পথের প্রত্যেক পথিকের অভিজ্ঞতা। এর জন্য এ যুগেও এবং বাংলাদেশেও অসংখ্য ব্যক্তির উদাহরণ দেয়া যাবে। আলহামদুলিল্লাহ, আমার আব্বাজান রহ.ও [মৃ. ১৪২২ হি./ ১৪০৮ বাং./ ২০০১ খ্রি.] আমাকে এই নিয়তেই মাদরাসায় দিয়েছেন। আমি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী সমাপ্ত করি, তখন আব্বাজানের বেশ কয়েকজন সুহৃদ খুব অনুরোধ করেছিলেন, আমাকে যেন আলিয়ায় পড়ান, যেন দ্বীন ও দুনিয়া উভয়টি অর্জন হয়। আব্বাজান রহ. আমাদের এলাকার 'জামেয়া ইসলামিয়া আলতাফিয়া

হতাম, তাহলেও এমন জীবন আমার ভাগ্যে জুটত না। আর এ সবই হয়েছে আমার আব্বাজানের নিয়ত ও ইখলাসের বরকতে।

আমার সম্পদশালী না হওয়ার কারণও আব্বাজানের একটি দু'আ। তিনি হজ্বে গিয়েছেন। ফিরে এসে আমাকে নির্জনে বললেন, আমি তোমার জন্য কিছু আনিনি। হাঁ, একটি দু'আ আমি তোমার জন্য করেছি এবং ইনশাআল্লাহ তা কবুল হবে। আমি দু'আ করেছি, তোমার কাছে যেন কখনো সম্পদ জমা না হয় এবং তোমার যেন কখনো অর্থকষ্ট না হয়। এটি আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। এখন পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার আচরণ আমার সঙ্গে হুবহু এটাই যে, আমার কাছে কখনো সম্পদ জমা হয় না। অথচ আল্লাহর শোকর, আমার সবসময় শান্তি ও আরাম ছিল। কখনো এমন কোনো কষ্ট হয়নি, যা অভাব ও দরিদ্রতার কারণে হয়। আমি আমার অবস্থার উপর অন্তর থেকে খুশী।[২১]

মাদরাসা' [দারোরা মাদরাসা]-এর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আলতাফ আলী রহ. ওরফে 'আলী সাহেব' [মৃ. ১৩৯৭ বাং / ১৯৯১ খ্রি.]-এর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক রাখতেন। তিনি পেশাদার জীবনে ছিলেন এক হাইস্কুলের ইংরেজি ভাষার শিক্ষক। তিনি ছিলেন ইংরেজি ভাষার একজন শাস্ত্রজ্ঞ শিক্ষক। আব্বাজানকে বললেন, তুমি যদি চাও তোমার ছেলে জাগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, তাহলে আমি যে স্কুলে ইংরেজি পড়াই সেই স্কুলে ভর্তি করাও, আমি তাকে ইংরেজি পড়াব। আর যদি চাও যে, সে তোমার আখেরাতে উপকারে আসুক, তাহলে মাদরাসায় ভর্তি করাও, আলিয়ায় নয়। আলিয়ায় পড়লে দ্বীনও হবে না, দুনিয়াও হবে না। আল্লাহ তা'আলা আব্বা-আম্মা ও 'আলী সাহেব'সহ সংশ্লিষ্ট সকলের আখেরাত আমার ওসিলায় নিরাপদ করুন এবং আমাকেও কবুল করুন! আমীন!!

২১. আদীব হুজুর লিখেছেন– আমার মত গুনাহগার বান্দার সঙ্গেও আল্লাহর মু'আমালা অনুরূপ। আমি আমার মরহুম আব্বাজানকে অনেকবার বলেছি, আব্বা! আমার জন্য দু'আ করুন, আল্লাহ যেন আমাকে অনেক সম্পদ দান করেন এবং আমি তা দ্বীনের পথে ব্যয় করতে পারি। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে এ দু'আ আমি আদায় করতে পারিনি। তিনি বলতেন, আমি তোমার জন্য সম্পদের দু'আ করবো না। আমি দু'আ করি, আল্লাহ সব সময় তোমার জরুরত পুরা করে দেন।

কেউ আল্লাহর হয়ে দেখুক!

তো আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আমি বলছিলাম, তোমরা যদি এখনো নিজেদেরকে আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত করার এবং দ্বীনের খেদমতের জন্য ওয়াক্‌ফ করার নিয়ত না করে থাক, তাহলে এখন আল্লাহর সঙ্গে এই চুক্তি করে নাও। তারপর নিজেদেরকে এর মোতাবেক বানাও। আমি শপথ করে তোমাদেরকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, তখন আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকেও তোমাদের সাথে বিশেষ আচরণ হবে, যার প্রকৃত প্রকাশ তো আখেরাতে ঘটবে, কারণ আখেরাত হলো প্রতিদানের নিবাস। কিন্তু এ পৃথিবীতেও তোমাদের উপর স্পষ্ট অনুগ্রহ বর্ষিত হবে।

আমরা দুর্বল। আমরা শক্তিহীন। আমরা অসহায়। আমাদের পরিবেশ প্রতিকূল। সম্ভবত এ কারণে বারবার আল্লাহ তা'আলার এই বদান্যতা ও অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ হয় যে, যে ব্যক্তি নিজকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সপে দেয়, আল্লাহ তা'আলা আপন মহানুভবতার সাথে তাকে লালনপালন করেন এবং তাঁর বান্দাদের অন্তরসমূহকেও তাঁর দিকে ধাবিত করে দেন।[২২] কেউ আল্লাহর হয়ে দেখুক!

আব্বার জীবদ্দশায় যখন অভাবনীয়ভাবে আমার জরুরত পুরা হতো, আব্বা বলতেন, "দেখছনি আব্বু! আল্লায় তোমার জরুরত পূরা করছেনি!" তারপরো আমি বলতাম, আব্বা আমার জন্য ..., আর তিনি একই কথা বলতেন।

তো আমার জীবনে আব্বার দু'আর বরকত দু'ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। প্রথমত যখন যে জরুরতের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করেছি, আল্লাহ গায়েব থেকে তা পূরা করে দিয়েছেন, কখনো আসবাব দ্বারা, কখনো আসবাব ছাড়া।
দ্বিতীয়ত যখন আমার চাওয়া কোনো জরুরত পূরা হয়নি, তখন আল্লাহ তা'আলা আমার দিলে এই ইতমিনান ঢেলে দিয়েছেন যে, আমি যেটাকে জরুরত ভেবেছি, সেটা আসলে জরুরত ছিলো না, ছিলো জরুরতের ওয়াহম বা ভুল ধারণা। জরুরত হলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা পূরা করতেন। রাব্বির হাম হুমা কামা রাব্বায়ানী ছাগীরা।

২২. আদীব হুজুর লিখেছেন– এখন আমাদের সামান্য আমলের অনেক বেশী আজর। কেন আপনারা কি পড়েননি সেই হাদীস–

তো আমার প্রথম নিবেদন ও প্রথম উপদেশ দ্বীনী মাদরাসাসমূহের শিক্ষার্থীদের প্রতি এটিই যে, তোমরা তোমাদের মাকাম ও মর্যাদা এবং দ্বীনী ইলমের লক্ষ্য ও মহত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হও। এ পথে যদি চলতে চাও, তাহলে পুরো পরিষ্কারভাবে চিন্তা করে এবং নিয়ত খাঁটি করে অগ্রসর হও। নিজকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দাও। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ইলম হাসিল করার জন্য এবং এর মাধ্যমে দ্বীনের

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه (في حديثٍ) : سَيَأْتِيْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقِلُّ عُلَمَاؤُه وَيَكْثُرُ خُطَبَاؤُه، مَنْ تَمَسَّكَ فِيْه بِعُشْرِ مَا يَعْلَمُ نَجَا. (مُسْنَدُ أَحْمَدَ ٥ : ١٥٥)

[মানুষের সামনে এমন এক যামানা আসবে যখন আলেম কম হবে, বক্তা বেশী হবে। তখন যারা যদ্দুর জানে তার দশমাংশের উপর আমল করবে, নাজাত পেয়ে যাবে।]

আপনারা কি পড়েননি সেই হাদীস–

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِيْ عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِيْ فَلَه أَجْرُ شَهِيْدٍ.

[আমার উম্মতের ফাসাদের সময় যে আমার সুন্নত আঁকড়ে ধরবে, তার জন্য থাকবে শহীদের আজর।]

তদ্রূপ এখন আমাদের সামান্য মেহনত এবং সামান্য সবর-মুজাহাদার উপর অনেক বেশী গায়বী মদদ ও নোছরত নাযিল হয়ে থাকে। এটা শুধু আমার মত গুনাহগার মানুষের যিন্দেগির তাজরেবাই নয়, আল্লাহর নেক বান্দা যারা, তাঁদেরও সারা জীবনের অভিজ্ঞতা। আপনারা একটু অগ্রসর হয়ে দেখুন, আল্লাহর কসম, প্রায় প্রত্যক্ষভাবেই অনুভব করতে পারবেন যে, আল্লাহ তা'আলা আপনাদের দিকে দৌড়ে আসছেন। জীবনের বিভিন্ন মোড়ে, বিভিন্ন যোগে-দুর্যোগে দেখবেন কীভাবে আল্লাহ তা'আলা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। এখন শুধু বিশ্বাস করছেন, তখন প্রত্যক্ষ করবেন যে, সত্যি আল্লাহ তাআলা হচ্ছেন– نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ

কেউ যদি নিজেকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে, আল্লাহ তখন তার বান্দাদের দিলকে তার দিকে ধাবিত করে দেন। আসমান থেকে তখন ঘোষণা নেমে আসে, অমুক বান্দাকে তিনি ভালোবাসেন, সুতরাং আহলে যমীনও যেন তাকে ভালোবাসে।

খেদমত করার জন্য পুরো জীবন, সকল যোগ্যতা ও শক্তি-সামর্থ ব্যয় করো। এর জন্যই উৎসর্গিত হোক তোমাদের জীবন-মরণ ও বাঁচা-মরা।

এই নিয়ত ও সিদ্ধান্তের নবায়নও করতে থাকবে। আমি তো এই বলব যে, প্রতিদিন ওযীফা হিসেবে এই মোরাকাবা করবে– আমি নিজেকে আল্লাহর জন্য ওয়াক্‌ফ করে দিয়েছি। দ্বীনের ইলম ও দ্বীনের খেদমতের জন্য আমি উৎসর্গিত। দু'আ করবে, আল্লাহ তা'আলা অবিচলতা দান করুন এবং আমাদেরকে কবুল করুন!

[হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী রহ.-এর আলোচনা শেষ হয়েছে।]

---

৩৫ নং পৃষ্ঠার টীকা

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. এক প্রসঙ্গে লিখেছেন– যদি এই পেরেশানী উপায়-উপার্জনের চিন্তার কারণে হয়ে থাকে, তবে আপনি তাকদীরের আকীদাটি পুনরায় স্মরণ করুন এবং إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ আয়াতটির মুরাকাবা করুন। তাওয়াক্কুল ও তাফবীজ সম্পর্কীয় আয়াত ও হাদীসসমূহ এবং সালাফে সালেহীনের ঘটনাবলি পুনরায় পড়ুন। পাশাপাশি يَا وَهَّابُ! يَا رَزَّاقُ! يَا بَاسِطُ!-এর ওযীফাও মাঝে মাঝে করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ মানসিক প্রশান্তি লাভ হবে। আপনি যদি নিজেকে আল্লাহর দ্বীনের জন্য ওয়াকফ করে দেন, তবে তো আপনি আল্লাহরই হয়ে গেছেন। আপনার যিম্মাদার আল্লাহ তা'আলা। আল্লাহ তাঁর যিম্মাদারী কীভাবে পূরণ করবেন এ ব্যাপারে আপনার চিন্তিত হওয়ার কী প্রয়োজন? আপনি অন্তর থেকে وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ ۚ إِنَّ اللهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ বলে সবকিছু আল্লাহর হাওয়ালা করে দিন এবং নিজের কাজে লেগে থাকুন। [সূত্র. 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' পৃ. ৩৫৭]

একটি হাদীস শোনো। সহীহ বুখারীতে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের দারিদ্রতায় শংকিত নই। আমার আশংকা হলো দুনিয়া তোমাদের সামনে উন্মোচিত করা হবে যেমন উন্মোচিত করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের সামনে। আর তোমরা তা অর্জনে প্রতিযোগিতা করবে যেমন তারা প্রতিযোগিতা করেছে। এভাবে দুনিয়া তোমাদেরকে ধ্বংস করে ছাড়বে, যেমনি তাদেরকে ধ্বংস করে ছেড়েছে।'

এখানে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর একটি ঘটনাও উল্লেখ করছি। তাঁর লিখিত 'আপবীতি' কিতাবে আছে, লখনৌর সাব জজ মাওলানা বদরুল আহসান ছাহেব একবার তাঁকে বললেন, –তিনি তখন সবেমাত্র নতুন শিক্ষক হয়েছেন– তুমি ফাযিল পরীক্ষা দাও। ফাযিল পরীক্ষা তোমার জন্য একেবারেই সহজ হবে।

পরীক্ষার পরে আমি তোমাকে লখনৌ নিয়ে যাব। সেখানে অল্প কিছু দিনের মধ্যে ইংরেজি শিখিয়ে তোমাকে বি.এ পরীক্ষা দেওয়াব। তারপর আমার এক দরখাস্তেই আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দীনিয়াত বিভাগের চেয়ারম্যানের চাকুরী তোমার হয়ে যাবে। প্রতি মাসে তোমার বেতন হবে ৩০০ রুপি।

শায়খুল হাদীস রহ. বলেন, তিনি আমাদের খান্দানের সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি বলে গণ্য হতেন। খান্দানের কেউ তাঁর সামনে মুখ খুলত না। তিনি খুব কম কথা বলতেন। আমি খুব বিনয়ের সাথে এই বলে অপারগতা প্রকাশ করলাম যে, সাহারানপুর ছাড়ার আমার ইচ্ছা নেই। তিনি রেগে গিয়ে আমাকে বেওকুফ ইত্যাদি বলে অনেকক্ষণ ধমকালেন। আমি শুধু চুপ করে সব শুনে গেলাম। পরদিন তিনি আমার আব্বার আপন মামা ও আমার স্ত্রীর আপন জ্যাঠাকে আমাকে বুঝানোর জন্য পাঠালেন। তিনি আমাদের খান্দানে অত্যন্ত রাগী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর রাগী মেজাযের কারণে তাঁর সামনে খান্দানের বড়রাও কথা বলতে ভয় পেতেন।

মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত তিনি আমাকে বোঝালেন। আমার চপলতা দেখে দু' একবার রেগেও উঠলেন। তার মূলকথা ছিল, বিয়েশাদী করেছ। কিছুদিনের মধ্যে বাবাও হয়ে যাবে। ওদিকে তোমার বোনদেরকেও বিবাহ দিতে হবে। ইতিমধ্যে ৮ হাজার রুপি ঋণী হয়ে পড়েছ। অথচ বেতন পাও মাত্র ১৫ রুপি। এই সামান্য বেতন দিয়ে কিভাবে সংসার চালাবে?

আমি বললাম, তাকদীরে যা আছে, তাতো পাবই। আর যা তাকদীরে নেই, তা শত চেষ্টা করেও পাব না। আমি যে পরিবেশে আছি তাতে যদি শুধু গোনাহ থেকে বাঁচতে পারি, তা-ই আল্লাহর অনুগ্রহ হবে। এ অল্প বয়সে আলীগড়ের পরিবেশে আমার টিকে থাকা সম্ভব নয়।

তিনি বললেন, দুনিয়া দারুল আসবাব। এখানে উপায় উপকরণের গুরুত্ব অনেক বেশী। শুধু ভাগ্যের উপর ভরসা করে থাকা যায় না। আমি বললাম, অবশ্যই। তবে আমার দু'টি উপকরণ নির্ধারিত আছে। ১. মাদরাসার চাকুরী, এতে আয় নিশ্চয়ই সীমিত; ২. কিতাবের ব্যবসা, এতে আল্লাহ তা'আলা যত ইচ্ছা দিতে পারেন।

তখন তিনি বললেন, তুমি যদি এসব কথা মন থেকে বলে থাক, তাহলে তো অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু আমি তো মনে করি, তুমি এসব শুধু উপর থেকে বলছ, ভেতর থেকে বলনি। আমি বললাম, দোয়া করুন আল্লাহ যেন কথাগুলো আমার মনেও বসিয়ে দেন।

আমার সমবয়স্ক কিছু আত্মীয়ের কাছে বিষয়টি এতই অপছন্দ হয়েছে যে, আত্মীয়দের অনেকে বসে কথা বলছেন, এমন সময় যদি আমি সেখানে যেয়ে বসতাম, একজন এই বলে উঠে যেত যে, আমি এমন ছোট লোকদের সাথে বসা

পছন্দ করি না, যারা সদকা আর যাকাতের রুটিকে সম্মানজনক রুযীর উপর প্রাধান্য দেয়। তিনি আমাকে দেখলেই জ্বলে উঠতেন। কিন্তু অধমের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার সর্বদা এ ব্যবহারই প্রত্যক্ষ করেছি যে, প্রথম প্রথম যারাই আমার প্রতি রাগান্বিত ও বিতৃষ্ণ ছিল, পরে এরাই আমার প্রতি ততধিক বেশি ভক্তি-ভালবাসা বরং আমি যদি বলি আমার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাহলে অত্যুক্তি হবে না। মরহুম শেষ জীবনে বহু দিন অসুস্থ ছিলেন। আল্লাহ্ তাকে মাগফেরাত দান করুন। আমাকে বারবার কান্দালা যেতে তারবার্তা পাঠাতেন। আমার বারবার যাওয়া তো কঠিন ছিল। কখনো কখনো যেতাম। তিনিই বেশিরভাগ সময় চলে আসতেন। একবার আসলে কয়েকদিন থাকতেন। তিনি আমাকে অনুরোধ করতেন যে, আমার বুকে হাত রাখ, আমি শান্তি পাই। ...

আমার যে আত্মীয় আলীগড়ের ঘটনায় আমার প্রতি দু' তিন বছর ধরে রাগ করেছিল সে বলল, আজকে তুমি আমাকে তোমার চেয়ে নিচু প্রমাণ করলে। আমি ঋণ জানার পর তা কখনো ফিরিয়ে দিতাম না। বরং তার সাথে ঝগড়া বাধিয়ে দিতাম। কয়েক বছর পর ঋণ পরিশোধ করছে কিন্তু ভাবটা যেন এমন যে, অনেক বড় অনুগ্রহ করছে, হাদিয়া দিচ্ছে। আমার মাথায় কী চাপল, খোঁচা মেরে তাকে বললাম, ভাই! তোমরা বড় লোক, সর্দার লোক। আর আমি ফকির, গরিব, নিকৃষ্ট, যাকাতের রুটি ভক্ষণকারী। তোমাদের সাথে আমার তুলনা চলে? যে দু' চারজন পুরানো ঘটনা জানত তারা ঠিকই বুঝে ফেলল যে, আমি কী বলতে চাই। মরহুম খুব লজ্জিত হলো। এরপর অবশ্য আমার অনুশোচনা হয়েছে যে, আমি খোঁচা মেরে কেন কথা বলতে গেলাম। [সূত্র. 'আপবীতি' ১ ঃ ১১৭ - ১১৮, ১২০ - ১২১]

এ সংশ্লিষ্ট আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। প্রসঙ্গ দীর্ঘ হয়ে যাবে তাই এখানে উল্লেখ করছি না। 'কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা' শিরোনামের পরিশিষ্টে ৪৫৭ - ৪৫৮ নং পৃষ্ঠায় কথাগুলো পড়ো।

যেসকল ছাত্রকে তাদের পরিবারের লোকেরা 'আলিয়া'য় পড়া বা পরীক্ষা দেয়ার জন্য চাপ দেয়, ৬৪ - ৬৫ নং পৃষ্ঠার টীকায় তাদের উপকারী কিছু আলোচনা আছে। 'আপবীতি' দ্বিতীয় ভলিয়মে [পৃ. ৩৯১ - ৩৯২] 'দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ' শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। আলোচনাটি পড়া উচিত।

উল্লেখ্য, এ পুস্তকদ্বয়ে ['শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' ও 'লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি'] যেখানেই 'আপবীতি' কিতাব থেকে কিছু উল্লেখ করেছি, তা মাওলানা মুহাম্মদ অছিউর রহমান ছাহেব অনুদিত ও থানভী লাইব্রেরী [২০১৪ ঈ.] প্রকাশিত 'আপবীতি'র বাংলা অনুবাদ থেকে উল্লেখ করেছি। অবশ্য বিভিন্ন স্থানে মূল উর্দুর সঙ্গেও মিলিয়ে দেখেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি

জীবনে সফল হওয়ার অন্যতম শর্ত

আত্মপরিচয় লাভ করার পর জীবনে সফল হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম যা দরকার তাহলো, ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি। ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করতে হবে এবং ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে। ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করার অর্থ হলো, নিজের ব্যাপারে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, 'ইনশাআল্লাহ আমি পারব'। যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস পোষণ করে এবং ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হয়, সে আল্লাহর রহমতে পারে। 'ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি'র ব্যাখ্যা সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ। ইতিবাচক মানসিকতা গ্রহণ করা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হওয়া প্রত্যেক সফল ব্যক্তির সফলতার প্রধান শর্ত।

পৃথিবীর বহু কিছু মানুষের হাতেই সম্পন্ন হয়েছে

পৃথিবীতে যারা সত্যের পতাকা উড্ডীন করেছেন, সত্যের বার্তা পৌঁছিয়েছেন এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি[২৩] প্রচার করেছেন, তারা সকলে মানুষই ছিলেন।

মক্কা, মদীনা, দামেস্ক, ফুস্‌তাত্‌, কায়রো, আলকায়রাওয়ান, ফেয্‌, কর্ডোভা, সেভিয়া, বাগদাদ, জুরজান, ইস্পাহান, সীরাজ, সমরকন্দ, বুখারা[২৪] প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে, এ সমস্ত ভূখণ্ডের জ্ঞানী-গুণী, তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিক আবিস্কার, রচনাবলী, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা অবগত হলে, এই স্থানগুলোর ইসলামী বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ও পাঠাগারগুলোর ইতিহাসে চোখ বুলালে, এসব নগর ও প্রধান নগরীর যাদুঘর ও

---

২৩. সভ্যতা (الحضارة) হলো সভ্য জাতির জীবনযাত্রা নির্বাহের পদ্ধতির নাম। আর সংস্কৃতি (الثقافة) হলো জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা ও মানব জীবনের বিভিন্ন অবস্থা জানার নাম।

২৪. এখানে উল্লেখিত স্থানগুলোর পরিচিতি চলতি অধ্যায়ের শেষে ১০০ নং পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

প্রত্নতত্ত্বগুলো পরিদর্শন করলে জানা যাবে যে, চৌদ্দ শতাব্দী ধরে পৃথিবীতে সত্যের পতাকা উড্ডীন করার জন্য, সত্যের বার্তা পৌঁছানোর জন্য এবং সুস্থ সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রসার করার জন্য, আমাদের পূর্বসূরীগণ কত সাধনা করেছেন। আর তাঁরা মানুষই ছিলেন।

ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইমাম বোখারী, ইমাম মুসলিম, ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কোদামা, ইবনুল হুমাম ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ. প্রমুখ, যারা ছিলেন উম্মাহর ইমাম ও রাহবার, বহু জ্ঞান ও শাস্ত্র এবং বহু চিন্তাধারার প্রবর্তক, বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতির শিক্ষক ও দীক্ষক, অনেক অনেক গ্রন্থাগারের জনক, তাঁরা সকলে মানুষই ছিলেন।

হযরত হাসান আল-বাছরি, ওমর বিন আব্দুল আযীয, সুফয়ান ছাওরী, ফুযাইল বিন ইয়ায, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী ও হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া রহ. প্রমুখ মনীষী, যারা ছিলেন যুহ্দ ও তাকওয়া, ইবাদত ও মুজাহাদা এবং রূহানিয়াত ও নুরানিয়াতের মূর্তপ্রতীক, তাঁরা মানুষই ছিলেন।

ইমাম আবুল আসওয়াদ দুআলী, খলীল বিন আহমদ, সীবাওয়ায়্, কিসাঈ, আবু আলীসফারসী, আব্দুল কাহের জুরজানী, সাক্কাকী, ইবনে মানযূর, মাজদুদ্দীন ফীরোযাবাদী ও সাইয়েদ মুরতাযা যাবিদী রহ. প্রমুখ মনীষী, যারা ছিলেন বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রের জনক এবং ইলম ও হিকমতের সাধক, তাঁরা মানুষই ছিলেন।

খলীফা হারুনুর রশীদ, ওয়ালীদ বিন আব্দুল মালিক, সুলতান নুরুদ্দীন যঙ্গী, সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়্যুবী, সাইফুদ্দীন কুত্য, মালিক শাহ সেলজুকী, বাদশাহ আলমগীর ও তুর্কী খলীফা সোলায়মানে আযম রহ. প্রমুখ মনীষী, দুনিয়ার বড় বড় জালিম জাতি ছিল যাদের পদানত, প্রতাপশালী বহু খোদাদ্রোহী রাজা ও রাজ্য ছিল যাদের অনুগত, তাঁরা সকলে মানুষই ছিলেন।

সাইয়েদ আহমদ শহীদ, সাইয়েদ জামালুদ্দীন আফগানী, আমীর সাঈদ হালীম, মাওলানা মুহাম্মদ আলী জাওহার, শায়খ হাসানুল বান্না, মুহাম্মদ আক্বিফ, আল্লামা ইকবাল ও কবি ফর্রুখ রহ. প্রমুখ, যারা ছিলেন মৃত্যু-ভয়হীন জীবনজয়ী বিপ্লবী ও ইসলামী চেতনার বরেণ্য কবি, তাঁরা সকলে মানুষই ছিলেন।

হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী, মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী, মাহমুদ হাসান দেওবন্দী, শাহ আশরাফ আলী থানবী, সাইয়েদ হোসায়ন আহমদ মাদানী, সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী, দাঈ ইলাল্লাহ মাওলানা ইলয়াছ কান্দলবী ও সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. প্রমুখ মনীষী, যারা ছিলেন আত্মশুদ্ধি, ইলমের গভীরতা, জিহাদ ও কুরবানির মিলন-মোহনা, তাঁরা সকলে মানুষই ছিলেন।

হযরত শাহ জালাল ইয়ামানী, শায়খ শারফুদ্দীন আবু তাওয়ামা, কারী ইবরাহীম উজানবী, শামসুল হক ফরিদপুরী, মুহাম্মদুল্লাহ হাফেজ্জীহুজুর, আব্দুল ওহ্হাব পিরজীহুজুর, মুফতী আজম ফয়জুল্লাহ, মুশাহিদ আহমদ বায়মপুরী, ফখরে বাঙ্গাল তাজুল ইসলাম ও আতহার আলী রহ. প্রমুখ, যুগের দুর্যোগে যারা ছিলেন মুসলিম বাংলাদেশের রাহবর, তাঁরা সকলে মানুষই ছিলেন।[২৫]

বিশ্বাসের শক্তি

আমরা যখন তাঁদেরই উত্তরসূরী, তখন উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁদের থেকে প্রাপ্ত কিছু দ্বীনি সম্পদের ধারক-বাহক হওয়া এবং তাঁদের আদর্শে আদর্শবান হওয়া কেন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে, যদি আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করে তাঁরা যেভাবে নিজেদেরকে গড়ে তুলেছেন সেভাবে নিজেদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করি?

অতএব আমাদের উচিত, আমরা সবাই যেন নিজেদের ব্যাপারে এই শুভধারণা পোষণ করি এবং এই আশাবাদী হই যে, আল্লাহর রহমতে আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের যোগ্য উত্তরসূরী হতে পারব ইনশাআল্লাহ।

তো জীবনে সফল হওয়ার জন্যে সর্বপ্রথম যা জরুরি তা হলো, এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আমি একজন মানুষ। পৃথিবীর বহু কিছু আল্লাহর তাওফীকে মানুষের হাতে সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং মানুষ যা পেরেছে আমিও তা পারব ইনশাআল্লাহ।

---

২৫. আলোচ্য স্থানসংশ্লিষ্ট কথাগুলো ডক্টর মুহাম্মদ আব্দুল মুন'ইম লিখিত أَضْوَاءٌ عَلَى الطَّرِيقِ প্রবন্ধের ছায়া অবলম্বনে লেখা হয়েছে এবং মনীষীদের অধিকাংশ নাম সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.-এর الطريقُ إلى المدينة المنورة কিতাবের رُقُودُ الأُمَّةِ بَيْنَ يَدَيْ نَبِيِّهَا প্রবন্ধ থেকে নেয়া হয়েছে।

শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. 'তরজমায়ে শায়খুল হিন্দ'-এর টীকায় لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ [অবশ্যই আমি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে সৃষ্টি করেছি[২৬]] আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন– আমি মানুষকে অতি উত্তম ছাঁচে ঢেলে সাজিয়েছি। তার অস্তিত্বে বহু শক্তি এবং প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বহু সৌন্দর্যের সমাবেশ ঘটিয়েছি। মানুষ যদি নিজেদের জন্মগত স্বভাব অনুযায়ী উন্নতি লাভ করতে থাকে, তাহলে একসময় ফিরিশতাদেরকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে।

মোটকথা, জীবনে সফল হওয়ার জন্যে সর্বপ্রথম আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। মূলত الثِّقَةُ بِالنَّفْسِ তথা আত্মবিশ্বাস সকল সাফল্যের ভিত্তি। যারা পারবে বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহর রহমতে তারাই পারে। আত্মবিশ্বাস-ই যুগে যুগে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের মোড় পাল্টে দিয়েছে।[২৭] যে মনে করতে পারে, পৃথিবীতে বড় কিছু করার জন্যেই আমি

---

[২৬]. সূরা তীন, আয়াত নং ৪

[২৭]. বায়রন নামক একজন কবি ছিলেন। আত্মবিশ্বাস সম্পর্কিত তাঁর একটি কবিতা এখানে উল্লেখযোগ্য–

যদি মনে কর, পরাজিত তুমি
তাহলেই তুমি পরাজিত।
যদি মনে কর, তোমার সাহস কুলাবে না
তাহলেই তুমি প্রতিহত।
জিততে চাও; অথচ ভাবছ, পারবে না
তাহলে কিছুতেই পারবে না তুমি।
যদি ভাব, তুমি হেরে যাবে
তাহলে হেরেই যাবে তুমি।
পৃথিবীতে সফল সে-ই হয়,
যে প্রবল মনে চায়।
জীবনযুদ্ধে সর্বদা জিততে থাকে সে-ই,
যে তোমার চেয়ে বলশালী, দ্রুতগামী।
সে-ই জিতে যে বলে–
ভয় করি নাক, পারবই আমি।

জন্মেছি, সে বড় কাজ করতে পারবেই ইনশাআল্লাহ। যারা মনে মনেও পারে না, তারা বাস্তবে কি করে পারবে?[২৮]

আমরা জন্ম থেকেই বিজয়ী

জীববিজ্ঞানীদের মতে, স্বামীর দেহ থেকে ৪০ হতে ৫০ কোটি শুক্রাণু বের হয়। সেগুলোর মধ্য থেকে মাত্র একটি শুক্রাণু চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়ে স্ত্রীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়। জন্মলাভকারী শিশু হয় সেই বিজয়ী শুক্রাণুর বিকশিত রূপ। সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা যায়, আমরা জন্ম থেকেই বিজয়ী।

জীবনের প্রথম সংগ্রামেই যখন আমরা জয়ী হয়েছি, তখন এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই সফল হব, যদি সফলতার প্রাকৃতিক নিয়মগুলো মেনে চলি। আর শিক্ষার্থীদের সফলতার প্রাকতিক নিয়মগুলো হলো–

১. আত্মপরিচয় লাভ

২. ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি;

৩. সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য;

৪. পরিশ্রম-সাধনা, সময়ের সদ্ব্যবহার, লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে প্রবল তাড়না সৃষ্টি;

---

২৮. দেখো, সম্প্রতি নির্বাচিত ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মা মানুষের থালা-বাসন মেজে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাবা ছিলেন চা-বিক্রেতা। নিজে কেটলি নিয়ে রেল স্টেশনে চা বিক্রিও করেছেন। এমন অবস্থা থেকে মোদি প্রথমে হয়েছেন বিজেপির [ভারতীয় জনতা পার্টি] সাধারণ সম্পাদক। তারপর হিমাচল প্রদেশের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা। তারপর গুজরাট প্রদেশের পরপর তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী। তারপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী। বিজেপির সর্বাধিক প্রভাবশালী নেতা লালকৃষ্ণ আদভানি বলেছিলেন, 'মোদিই প্রধানমন্ত্রী হবেন'। তিনি এর কারণ ব্যাখ্যা করেছিলেন এই ভাষায়– 'কোনো ব্যক্তির অভিলাষ যদি নির্ভেজাল হয় আর খুব ইচ্ছাশক্তি থাকে, তবে সে তার লক্ষ্যে সফল হবেনই।' মোদির ঘনিষ্ঠ অমিত শাহ বলেন, নরেন্দ্র ভাইয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, তিনি না ভেবে কোনো কাজ করেন না। পরিকল্পনা করে ধাপে ধাপে এগোনই তার বৈশিষ্ট্য।

৫. শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন'ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাঁদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা;

৬. তাকওয়া-তা'আল্লুক মা'আল্লাহ্, তাওবা-ইস্তেগফার ও দু'আ-মুনাজাত

হীনম্মন্যতা আত্মবিকাশের পথে অন্যতম বাধা

মূলত নিজের প্রতি আস্থার দুর্বলতা মনের আশা ও প্রত্যাশাকে খুন করে ফেলে। জীবনকে বরবাদ করে দেয়। হীনম্মন্যতা আত্মবিকাশের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায়, সম্ভাবনার পথের সবচেয়ে বড় বাধা, সাফল্যের পথের দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধক। অতএব সাফল্য অর্জন করতে হলে হীনম্মন্যতার শৃঙ্খল ছিন্ন করতে হবে।

সাবধান! কখনো নেতিবাচক কথা বলবে না

কখনো এ ধরনের কথা বলবে না– 'আমি খারাপ ছাত্র, আমার পড়া মনে থাকে না, আমার দ্বারা কিছুই হবে না, ইত্যাদি।" কারণ অবচেতন মন কথা ও ভাবনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। তুমি যা বলবে এবং যা কল্পনা করবে, অবচেতন মন সেটাই বাস্তব করবে। কখনো কোনো নেতিবাচক শব্দ মুখ থেকে বেরিয়ে গেলে 'তওবা তওবা' বা 'বাতিল বাতিল' বলে তাকে প্রত্যাখ্যান করে দিবে। ইতিবাচক কথা দিয়ে বক্তব্য শেষ করবে।

নিম্নের জিনিসগুলো প্রধান সমস্যা নয়

আমরা যদি বিশ্বাস করতে পারি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল-ামের আদর্শে আদর্শবান হওয়ার জন্য এবং সকলকে সেই আদর্শের পথ প্রদর্শন করার জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে আমরা মনোনীত, যদি বাস্তবেই এমন বিশ্বাস করতে পারি, তাহলে সফল আমরা হবই। কোনো বাধাই আমাদেরকে থামিয়ে রাখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ। মেধার স্বল্পতা, শারীরিক অসুস্থতা, আর্থিক অসচ্ছলতা, আর্থিক অধিক সচ্ছলতা, পারিবারিক প্রতিকূলতা, পরিবেশের প্রতিকূলতা, বংশীয় আভিজাত্যহীনতা, ইয়াতীম হওয়া, বয়স বেশী হওয়া, জীবনের দীর্ঘ সময় বিপথে কেটে যাওয়া, এমনকি শারীরিক ত্রুটি যেমন বধিরতা বোবাত্ব ও অন্ধত্ব, মোটকথা কোনো কিছুই আমাদেরকে বাধা দিয়ে রাখতে পারবে না।

মেধার স্বল্পতা

১. ইমাম শাফেয়ী [১৫০ - ২০৪হি.] রহ.-এর দিকে সম্বন্ধযুক্ত এ কবিতা-পঙ্‌ক্তি তো অতিপ্রসিদ্ধ–

شَكَوْتُ إلى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ • فَأَوْصَانِيْ إلى تَرْكِ المَعَاصِيْ

فَإِنَّ العِلْمَ نُوْرٌ مِنْ إِلٰه • ونُوْرُ اللهِ لا يُعْطَى لِعَاصِ

অর্থ. আমি 'ওকী'র নিকট আমার মুখস্থশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম। তিনি আমাকে গুনাহ ত্যাগ করার উপদেশ দিলেন। কারণ, ইলম হলো আল্লাহর একটি নূর। আর আল্লাহর নূর কোনো গুনাহগারকে দেয়া হয় না।

এই পঙ্‌ক্তিদু'টিযদি বাস্তবেই ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর হয়ে থাকে[২৯], তাহলে এর দ্বারা বোঝা যায়, শুরু জীবনে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর মেধা দুর্বল ছিল।

ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর জীবনে আমাদের অনেকের জন্য অনেক সান্ত্বনা ও দিক-নির্দেশনা আছে। কিন্তু আমরা কি সেসকল দিক-নির্দেশনা গ্রহণ করি? তিনি একাধারে এতিম, দরিদ্র ও দুর্বল মেধার ছিলেন। কিন্তু সঠিক নিয়ম অনুসরণ করে আল্লাহর রহমতে সকল বাধা জয় করেছেন। তিনি হয়েছেন মুসলিম উম্মাহর প্রসিদ্ধ চার ইমামের অন্যতম।

---

[২৯]. إنما كتبناه بصيغة التمريض لأن مصادر ترجمته كـ«الانتقاء» و«تهذيب الأسماء واللغات» وغيرهما تَنُصُّ على أنه رحمه الله حفظ موطأ الإمام مالك قبل قُدُومه إليه وهو ابن بضعة عشر سنةً، وأَسْمَعه إياه بعدما لقيه عن ظَهْر قلبه. هذا وقد وَرَد هذا البيت في «ديوان الإمام الشافعيّ» جمع وتعليق الدُّكْتُور أحمد أحمد شيتوي، ص ١٠٦ طَبْع «دار الغد الجديد». كَتَب الدُّكتور في الحاشية: «المستطرَف ص ٢٥ بلا نسبة، وأظنها جملة الأبيات المنسوبة للإمام الشافعيّ وليست له».

২. ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর জাদীদ মাযহাবের বর্ণনাকারী আর্‌রবী' বিন সুলাইমান মুরাদী রহ. এত দুর্বল মেধার অধিকারী ছিলেন যে, একটা জিনিস বুঝাতে তাঁর যথেষ্ট সময় ব্যয় হত। ইমাম শাফেয়ী রহ. একবার তাঁকে একটি মাসআলা চল্লিশ বার বুঝান। তারপরও তিনি বুঝেননি। এক পর্যায়ে লজ্জায় তিনি দরস থেকে উঠে চলে যান। বিষয়টি বুঝতে পেরে ইমাম শাফেয়ী রহ. তাঁকে নির্জনে ডেকে আরও কয়েকবার বুঝান। তখন তিনি বুঝতে সক্ষম হন।

কিন্তু অধ্যবসায় ও অবিরাম সাধনার উসিলায় আল্লাহর মেহেরবানীতে তিনিই পরিবর্তীতে এমন স্তরে উন্নীত হন যে, এক সময় তাঁর মুখে ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর কিতাব শ্রবণ করার জন্য সাতশ' উটে আরোহন করে দূর-দুরান্ত থেকে লোকজন তাঁর নিকট আসে।[৩০]

৩. আমাদের দরসে নেজামীর شَرْح العقائد، مختصر المعاني، التهذيب প্রভৃতি কিতাবের মুসান্নিফ আল্লামা সা'দুদ্দীন তাফতাযানী রহ.-এর নাম জানে না এমন ক'জন আছে? কাযী আল্লামা মুহাম্মদ বিন আলী শাওকানী [মৃ.১২৫০হি.] রহ.-এর বর্ণনানুযায়ী নাহ্‌ব, ছার্‌ফ, মানতিক, মা'আনী, বয়ান, উসূল, তাফসীর ও কালামসহ অনেক বিষয়ে তিনি সমকালীনদের থেকে উর্ধ্বে ছিলেন। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে তাঁর দক্ষতার বিষয়াদিতে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর যুগে ও তাঁর পরবর্তী যুগে যে পরিমাণ সুখ্যাতি তাঁর অর্জন হয়েছে, তা আর অন্য কারো অর্জন হয়নি।[৩১]

সেই আল্লামা তাফতাযানী রহ. সম্পর্কে কেউ কেউ বলেছেন, শিক্ষাজীবনের শুরু দিকে তিনি অত্যন্ত দুর্বল মেধার অধিকারী ছিলেন। বরং তাঁর উস্তাদ আল্লামা আয্‌দুদ্দীন রহ.-এর দরসে তিনিই ছিলেন সবচে' দুর্বল মেধাসম্পন্ন। কিন্তু চেষ্টা-মেহনত ও কিতাব অধ্যয়নের

---

৩০. إحقاقُ الحقِّ بإبطالِ الباطلِ في مُغِيث الخَلْقِ কৃত, আল্লামা যাহেদ কাওছারী। سلسلةُ مؤلَّفاتِ الإمامِ الكوثريِّ-এর চতুর্থ ভলিয়মের ১৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩১. البَدْرُ الطَّالِعُ بِمَحَاسِنِ مَنْ بَعْدَ القَرْنِ السَّابِعِ ২ ঃ ১৬৪ - ১৬৫

দিক থেকে তাঁর সমপর্যায়ের কেউ ছিল না। একবার স্বপ্নে দেখেন, একজন অপরিচিত লোক তাঁকে বলছেন– সা'দুদ্দীন! চলো একটু ঘুরে আসি। তিনি বললেন, আমাকে ঘুরে বেড়ানোর জন্য সৃষ্টি করা হয়নি। অক্লান্ত পরিশ্রম করার পরও যখন আমি কিতাব বুঝি না, তখন ঘুরে বেড়ালে আমার কী দশা হবে! এ উত্তর শুনে লোকটি চলে গেল এবং একটু পর পুনরায় আসল। এভাবে তিনবার আসা-যাওয়ার পর সে বলল, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে ডাকছেন।' তখন তিনি ঘাবড়ে গিয়ে খালি পায়ে বের হয়ে গেলেন। শহরের বাইরে এক জায়গায় কিছু গাছ ছিল সেখানে পৌঁছে দেখলেন, কয়েকজন সাহাবীসহ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপস্থিত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আমি তোমাকে কয়েকবার ডাকলাম, কিন্তু তুমি আসলেনা যে! তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে যে আপনি স্মরণ করেছেন তা আমার জানা ছিল না। তারপর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর মেধার দুর্বলতার অভিযোগ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, افْتَحْ فَمَكَ! [তোমার মুখ খোলো]। তিনি মুখ খুললেন। তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মুখে নিজ লালা মোবারক দিয়ে তাঁর জন্য দু'আ করলেন।

জাগ্রত হওয়ার পর যখন তিনি তাঁর উস্তাদ আয্‌দুদ্দীন রহ.-এর দরসে উপস্থিত হন এবং রীতিমত দরস শুরু হয়, তখন দরসে এক পর্যায়ে তিনি উস্তাদকে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। না বোঝার কারণে সহপাঠীরা প্রশ্নগুলোকে অর্থহীন ভাবল। কিন্তু উস্তাদ অবাক হয়ে বললেন, إِنَّكَ الْيَوْمَ غَيْرُكَ فِيمَا مَضَى! [আজ তুমি পূর্বের ব্যক্তি নও][৩২]।

হ্যাঁ, বান্দা যখন আন্তরিকতার সাথে সঠিক পদ্ধতিতে অবিরাম সাধনা করতে থাকে, তখন তার সাধনা বিফলে যায় না। আমাদের কর্তব্য

---

৩২. ظَفَرُ الْمُحَصِّلِيْنَ بِأَحْوَالِ الْمُصَنِّفِيْنَ পৃ. ৪১১

হলো আমাদের সাধ্যে যতটুকু আছে, আশাবাদী হয়ে ততটুকু চেষ্টা নিয়মিত চালিয়ে যাওয়া। إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

৪. দারুল উলুম দেওবন্দের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক আমার হযরাতুল উস্তাদ মাওলানা হাবীবুর রহমান আ'জমী দা. বা. বলেছেন– হযরত মাওলানা ইজাজ আলী রহ. [১৩০০ - ১৩৭৪ হি.] শুরুর দিকে অত্যন্ত দুর্বল মেধার অধিকারী ছিলেন। [হযরাতুল উস্তাদের বক্তব্য এখানেই শেষ।] অথচ পরবর্তীতে এক সময় তিনি দারুল উলুম দেওবন্দের মতো বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষাসচিব হয়েছেন। তিনি হয়েছেন দারুল উলুম দেওবন্দের নিজ সময়ের আরবী সাহিত্য ও ফিকাহ শাস্ত্রের প্রধান। তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে দীর্ঘ চুয়াল্লিশ [৪৪] বছর শিক্ষকতা করেছেন।[৩৩]

শারীরিক অসুস্থতা

১. ইমাম শাফেয়ী রহ. মিশরের 'ফুসতাত' শহরে চার বছর অবস্থান করেন। তখনই তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ كِتَابُ الأُمِّ ও السُّنَنَ সহ অনেক কিতাব রচনা করেন। তিনি তখন এতো কঠিন অর্শরোগের শিকার ছিলেন যে, বাহনে আরোহণ করা অবস্থায় কখনও এতো রক্ত ঝরত যে, রক্তে তাঁর পাজামা ও মোজা ভরে যেত।[৩৪]

২. তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলয়াছ কান্দলবী রহ.-এর সাফল্যের পরিধি কল্পনা করো তো। তাঁর স্তরের বিশ্ববরেণ্য মহান সংস্কারক ক'জন দেখানো যাবে? অথচ তিনি ছিলেন শিশু বয়স থেকেই দুর্বল ও শীর্ণ দেহী। অসুস্থতা লেগেই থাকতো। গঙ্গুহ অবস্থান কালে একবার মারাত্মক সাস্থ্যাবনতি ঘটেছিল। কী এক মাথাব্যথা শুরু হয়েছিল যে, কয়েকমাস সামান্য মাথা ঝুঁকানো, এমনকি তাকিয়ার

---

৩৩. «العالِمُ الهِنْدِيُّ الفَرِيدُ الشيخُ المُقْرِئُ محمد طَيِّب» للشيخ نور عالم خليل الأميني ص. ١٢٨

৩৪. «عُلُوُّ الهِمَّةِ» لمحمد أحمد إسماعيل المقدم ص. ١٩٨

উপর মাথা রেখে সিজদা করাও অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল। এ সময় তিনি হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.-এর পুত্র হাকীম মাসউদ আহমদ ছাহেবের চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর চিকিৎসার বিশেষ পদ্ধতি ছিল এই যে, কোনো কোনো রোগীকে তিনি দীর্ঘ দিনের জন্য 'পানিমুক্ত' রাখতেন। এক ফোঁটা পানিও পান করার অনুমতি ছিল না তখন। বলাবাহুল্য, খুব কম মানুষের পক্ষেই সম্ভব হতো এমন অদ্ভুত 'পানিসংযম' রক্ষা করা। কিন্তু হযরত ইলয়াছ রহ. তাঁর স্বভাবগত নিয়মনিষ্ঠা ও আনুগত্যপ্রিয়তার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন এবং আল্লাহপ্রদত্ত প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অটুট মনোবলের কারণে -যা তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রোজ্জ্বল ছিল- দীর্ঘ সাত বছর এক ফোঁটা পানিও গ্রহণ না করে পূর্ণ 'পানিসংযম' পালন করেছেন। এর পরবর্তী পাঁচ বছরও নাম মাত্র পানি পান করতেন।

এই আশঙ্কাজনক অসুস্থতা এবং বিশেষত মস্তিষ্ক দুর্বলতার কারণে তাঁর লেখাপড়ায় ছেদ পড়ে। দ্বিতীয়বার তা শুরু হওয়ার কোনো আশাও দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু শিক্ষা অসমাপ্ত থাকায় তিনি খুবই অস্থির পেরেশান ছিলেন। একদিকে ছিল তাঁর নতুনভাবে শিক্ষাজীবন শুরু করার অনমনীয়তা, অন্যদিকে ছিল শুভানুধ্যায়ীদের পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণের পরামর্শ। তিনি বলতেন, এ অবস্থায় একদিন মুহতারাম ভাই আমাকে বললেন, আচ্ছা, লেখাপড়া করে শেষ পর্যন্ত করবেটা কি শুনি! আমি বললাম, বেঁচে থেকেই বা করবোটা কি বলুন? এমন মরণপণ মনোভাব দেখে শেষপর্যন্ত সবাই হাল ছেড়ে দিলেন। আর তিনি পুনরায় পড়াশোনার হাল ধরলেন।[৩৫]

আর্থিক অসচ্ছলতা

১. ইমাম মালিক রহ. শিক্ষাজীবনের প্রথম দিকে এতো দরিদ্রতার শিকার ছিলেন যে, ঘরের চালের কাঠ বিক্রি করে লেখাপড়ার খরচের ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

---

১. "হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. ও তাঁর দ্বীনী দাওয়াত", পৃষ্ঠা ৫৩ - ৫৪

২. শিক্ষাজীবনে কাগজ ক্রয় করার মতো সামর্থ না থাকায় ইমাম শাফিয়ী রহ. পথ-ঘাটে পরে থাকা হাড্ডিতে হাদীস লিখতেন।

৩. বসরায় অবস্থানকালে একবার ইমাম বুখারী রহ.-এর সহপাঠীরা কয়েকদিন ইমাম বুখারীকে হাদীস লেখার মজলিসে পায়নি। তালাশ করে তারা তাঁকে এক ঘরে বস্ত্রহীন অবস্থায় পেয়েছে। তাঁর এ পরিমাণ সামর্থ ছিল না যে, তিনি কোনো কাপড় ক্রয় করবেন। তখন সহপাঠীরা টাকা তুলে তাঁর জন্য একটি কাপড় ক্রয় করল। তারপর তিনি তা পরিধান করে হাদীস লেখার মজলিসে পুনরায় অংশগ্রহণ করেন।

৪. শিক্ষাজীবনের এক পর্যায়ে ইমাম আবু হাতেম রাযী রহ.-এর হাতে খরচ করার মতো টাকা ছিল না। তখন তিনি তাঁর পরিধেয় কাপড় বিক্রি করতে বাধ্য হন। তিনি তাঁর এক বন্ধুসহ বিভিন্ন উস্তাদের নিকট গিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাদীস শোনতেন। তারপর সন্ধ্যায় বন্ধু তার বাড়ীতে চলে যেত। আর তিনি একটি খালি ঘরে ফিরে যেতেন এবং পানি পান করে ক্ষুধা নিবারণ করতেন।

৫. হাদীসের ইমাম বাকি বিন মাখলাদ রহ. লেখার কাগজ ক্রয় করার জন্য একাধিকবার নিজের পাজামা বিক্রি করেছেন।

৬. একই ধরনের ঘটনা ফকীহ আলিম আবু জাফর আলকায়রাওয়ানী রহ.-এর জীবনেও ঘটেছে।

৭. শাফেয়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু হামিদ আলইসফারায়ীনী রহ. শিক্ষাজীবনে পাহারাদারি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন এবং পাহারার আলোতে লেখাপড়া করতেন।

৮. ইমাম আবুল হোসাইন নিশাপূরী রহ. বাতির তেল ক্রয় করার সামর্থ না থাকার কারণে চাঁদের আলোতে কিতাব পড়তেন।[৩৬]

৯. জামেয়া মাদানিয়া বারিধারা [ঢাকা] মাদরাসার আমার এক সহপাঠী এশার নামাযের পর রিক্সা চালিয়ে তার খরচাদির ব্যবস্থা করত।

---

৩৬. صَفَحَاتٌ من صَبْر العلماء على شدائد العلم والتحصيل নবম সংস্করণ, পৃষ্ঠা- ১৬৮, ১৭৩, ২৩৬, ১৯১, ১৯০, ১৯৪, ২০৫, ২০৭

১০. হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখেছেন, হযরত আকদাস শাহ্ আব্দুর কাদির রায়পুরী রহ. নিজের ছাত্র জীবনের ঘটনা অনেক শোনাতেন। তিনি বলেছেন, একবার শীতের মৌসুমে শীতের কোনো কাপড় ছিল না। কারো কাছে প্রকাশ করতে আত্মমর্যাদাবোধে বাধছিল। সদা সতর্ক থাকতাম কেউ যেন না জানে। যতক্ষণ পর্যন্ত মসজিদের দরজা খোলা থাকত, ওযুখানার উনুনের সামনে বসে থাকতাম। যখন সবাই চলে যেত তখন মসজিদের ভেতরে প্রবেশ করতাম এবং শিকল তুলে দিয়ে কাতারে বিছানো চটের এক প্রান্তে শুয়ে বদল করতে করতে অপর প্রান্তে পৌঁছে যেতাম। চট শরীরে পেঁচিয়ে যেত। আর তা-ই বালিশ ও লেপ-কাঁথার কাজ দিত। পায়ে ও মাথায় খুব ঠাণ্ডা লাগত। তাহাজ্জুদের সময় আবার পাশ বদল করে করে প্রথম প্রান্তে এসে পড়তাম। এভাবে চট কাতারে বিছানোও হয়ে যেত।[৩৭]

১১. হযরত শাহ্ আব্দুর কাদির রায়পুরী রহ.-এরই ঘটনা। তিনি বলেছেন, সাহারানপুরের ছাত্রজীবনে মাদরাসায় একবার ভর্তি শেষ হয়ে গিয়েছিল। বোর্ডিং তখনও চালু হয়নি। ছাত্রাবাস তখনও নির্মিত হয়নি। ছাত্ররা বিভিন্ন মসজিদে থাকত। এক মসজিদে আমরা পাঁচজন থাকতাম। একজন ছাত্র ইমাম ছিল। তার খাবার মহল্লা থেকে আসত। আর দু'জন মাদরাসা থেকে ভাতা পেত। দরস শেষ হওয়ার পর তারা নিজেদের রুটি নিজেরাই রান্না করত। কখনো রুটির সাথে ডাল থাকত, কখনো কিছুই থাকত না। তিনজনের খাবার আমরা পাঁচজনে খেতাম। পেট শুধু সেদিন ভরত যেদিন মহল্লায় কোথাও দাওয়াত থাকত কিংবা কোনো দিন যদি মসজিদে কোথাও থেকে অতিরিক্ত খাবার আসত। তা না হলে প্রায়ই অর্ধাহারে কাটাতাম। এখন তোমরা বোর্ডিং চালু করে কী করেছ? উভয় বেলা ছাত্ররা নিশ্চিন্তে খাবার পাচ্ছে। তাই কোনো দিন রুটি কাঁচা থাকার আবার কোনো দিন রান্না পছন্দ না হওয়ার অভিযোগ উঠছে।[৩৮]

---

৩৭. 'আপবীতি' ১ ঃ ৪৮। এরপর তিনি বলেছেন, সেই শীতের মৌসুম তো এভাবেই পার হলো। কিন্তু এর পর থেকে কোনো একটি বছরও এমন কাটেনি যে, অতি উত্তম এক দু'টি লেপ আল্লাহর পক্ষ থেকে হাদিয়া আসেনি।

৩৮. 'আপবীতি' ১ ঃ ৪৮ - ৪৯

১২. এখন ভিন্নধর্মী একটি ঘটনা শোনো, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. 'আপবীতি'তে[৩৯] লিখেছেন- একবার সুরাটের জমিদার মৌলভী মুহাম্মদ সুরাটী মাওলানার [মাওলানা নুরুল হাসান কান্ধলবী রহ.] খ্যাতির কথা শুনে তাঁর নিকট পড়তে আসে। কয়েকজন চাকর ও অনেক সামানপত্র সাথে ছিল। খুব সুন্দর ও উৎকৃষ্ট একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করল। প্রতিদিন নতুন পোষাকে দরসে উপস্থিত হত। চাকররা কিতাব নিয়ে আসত। এভাবে কয়েকদিন অতিবাহিত হল।

মাওলানা নুরুল হাসান ছাহেব যখন দেখলেন ছেলেটি মেধাবী ও সম্ভাবনাময়, তখন একদিন তাকে বললেন, বেটা! বাবার সম্পদ এভাবে নষ্ট করো না। যদি ইলম অর্জন করতে চাও তাহলে এই কাপড় ও পাত্র নাও এবং মসজিদে অন্য ছাত্রদের সাথে গিয়ে থাক। দু'বেলা খাবার ঘর থেকে পেয়ে যাবে। যদি এটা না পার, তাহলে অযথা সময় ও সম্পদ নষ্ট করো না। শান-শওকতের সাথে ইলমে দ্বীনের মতো সম্পদ অর্জিত হয় না। সে তখন কাপড় ও পাত্র হাতে নেয় এবং মসজিদে গিয়ে কাপড় পরিবর্তন করে। চাকর ও সকল সামান বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। কয়েক বছর সেখানে থেকে ইলম অর্জনে পূর্ণতা লাভ করে।[৪০]

দেখেছ কিছুটা অভাব ও কষ্টের সাথে ইলমের কেমন সম্পর্ক? একথা সেই কবে ইমাম ইয়াহইয়া বিন আবী কাছীর রহ.ও বলে গেছেন। সহীহ মুসলিমে আছে, তিনি বলেছেন, দেহের আরামের সাথে ইলম অর্জন করা যায় না।[৪১]

আর্থিক অধিক সচ্ছলতা

আর্থিক অধিক সচ্ছলতাও কারো কারো জন্য ইলমী লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়। কিন্তু ইতিহাসে এমন অনেক মনীষী অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের যথেষ্ট পরিমাণ আর্থিক সচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও ইলমী অঙ্গনে তাঁরা বিরাট ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছেন। অধিক সচ্ছলতা ইলমী অঙ্গনে বড় হতে এবং বড় বড় ইলমী কাজ করতে তাঁদের জন্য প্রতিবন্ধক হয়নি।

---

৩৯. ২ ঃ ৫৮

৪০. مشائخ کاندہلہ মৌলভী ইহতেশামুল হাসান, পৃ. ১৫০

৪১. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪২১

১. উদাহরণ হিসেবে উমাইয়া বংশের রাজকীয় ভোগবিলাশপূর্ণ পরিবেশে বেড়ে উঠা শাহজাদা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান [যিনি নিজেও পরবর্তীতে খলীফা হয়েছেন]-এর ইলমী অবস্থান দেখো। ইমাম আবুয্ যিনাদ রহ. বলেছেন– 'মদীনার ফকীহ হলেন সাঈদ বিন মুসাইয়্যাব, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান, উরওয়া বিন যুবাইর ও কাবীসা বিন যুআ'ইব'। ইমাম শা'বী রহ. বলেছেন– 'আমি যার সঙ্গেই বসেছি তিনি আমার থেকে ইলমী উপকার লাভ করেছেন। তবে আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান এর ব্যতিক্রম। আমি যখনই তাঁর সামনে কোনো হাদীস উল্লেখ করতাম, তিনি আমাকে অতিরিক্ত আরও শোনাতেন। অনুরূপভাবে যখনই তাঁকে কোনো কবিতা শোনাতাম, তিনি আমাকে অতিরিক্ত আরও শোনাতেন।'[৪২] দেখেছো, রাজকীয় ভোগবিলাশে মত্ত একজন রাজপুত্রের ইলমী অবস্থান?

২. এবার রাজকীয় জীবনযাপনকারী একজন রাজার ইলমী অবস্থান দেখো। তিনি হলেন আব্বাসী বংশের দ্বিতীয় খলীফা আবু জাফর মানসূর রহ.। তিনি ইমাম মালেক রহ.কে একই সঙ্গে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন। ইমাম মালেক রহ.-এর ভাষায়ই তাহলে শোনা যাক সেই ঘটনা। ইমাম মালেক রহ. বলেছেন– '-হজ্বের সফরে- আবু জাফর মানসূর আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমি ও আপনি ছাড়া আর কোনো আলেম অবশিষ্ট নেই। আমি তো রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছি। অতএব আপনি মানুষের জন্য সুন্নত ও ফিকহের একটি কিতাব রচনা করুন। তাতে ইবনে আব্বাস-এর ছাড়গুলো, ইবনে ওমর-এর কঠোরতাগুলো ও ইবনে মাসউদ-এর ব্যতিক্রম মতগুলো পরিহার করবেন।" ইমাম মালেক বলেন– 'তিনি আমাকে কিতাব লেখার পদ্ধতি শেখালেন।' অর্থাৎ খলীফা মানসূর ইমাম মালেককে কিতাব লেখা ও ফতোয়া দানের সঠিকতর ও ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতির পথনির্দেশনা করেছেন।[৪৩]

---

৪২. تاريخ الخلفاء للسيوطي পৃ. ১৭৮

৪৩. «الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» للحجوي الفاسي ২ ঃ ৪০৬

কতটুকু ইলমী অবস্থানের অধিকারী হলে রাজা হয়ে ইমাম মালেক রহ.-এর মতো মহান ইমামকে সুন্নত ও ফিকাহবিষয়ক কিতাব লেখার পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনা দিতে পারেন! ইমাম মালেকও তাঁর পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনাকে 'তিনি আমাকে কিতাব লেখার পদ্ধতি শেখালেন' বলে মূল্যায়ন করলেন!

৩. এই আব্বাসী বংশেরই শাহজাদা [খলীফা আল্‌মু'তায্ বিল্লাহ-এর পুত্র] আবুল আব্বাস আব্দুল্লাহ عِلْمُ الْبَدِيْعِ বিষয়ের প্রথম কিতাবের লেখক।[৪৪]

৪. ফিকাহ শাস্ত্রের জাহিরী মাযহাবের দ্বিতীয় ইমাম ইবনে হায্‌ম আন্দালুসী রহ.[৪৫] এতো সচ্ছল ও ভোগবিলাশপূর্ণ পরিবেশে থেকে ইলম অর্জন করেছেন যে, রাতে তিনি যে দীপাধারের আলোতে পড়াশোনা করতেন তা ছিল স্বর্ণের।[৪৬]

পারিবারিক প্রতিকূলতা

পারিবারিক প্রতিকূলতার উদাহরণ হিসেবে মুজাহিদে আজম আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তিনি যে লজিং বাড়িতে থেকে স্কুলের পড়াশোনা করতেন, সেই বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম ছাহেব নামে একজন প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। স্কুল ছুটির পর লজিং বাড়িতে এসেই কিছু খেয়ে বালক শামসুল হক সাড়ে তিন মাইল দূরে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম ছাহেবের নিকট গিয়ে মাদরাসার কিতাবাদি পড়তেন। কোনো দিন লজিং বাড়ির রান্না দেরি হলে না খেয়েই চলে যেতেন। তিনি উস্তাদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং উস্তাদের খেদমত করতেন। এমনকি উস্তাদের পারিবারিক কাজকর্মও করতেন। উস্তাদের নিরবচ্ছিন্ন সাধনা এবং নিজের অধ্যাবসায়ে অল্প দিনের

---

৪৪. «كَشْفُ الظُّنُوْنِ عَنْ أَسَامِي الكُتُبِ والفُنُوْنِ» لِحَاجِيْ خَلِيْفَةَ ১ ঃ ২২৯

৪৫. প্রথম ইমাম হলেন ইরানের ইস্পাহান শহরের অধিবাসী ইমাম দাউদ বিন আলী জাহিরী রহ.।

৪৬. «تاريخُ المَذَاهِبِ الإسلاميَّة» للإمامِ محمد أَبِي زُهْرَة পৃ. ৫৩৯

মধ্যেই তিনি প্রাথমিক স্তরের কিতাবাদি পড়ে সমাপ্ত করেন। কিভাবে আলেম হওয়া যায়, কুরআন-হাদীস পড়া যায়– সে চিন্তায় তিনি বিভোর থাকতেন।

হঠাৎ ছন্দপতন ঘটে। মাদরাসার কিতাবাদি পড়ার সংবাদ তাঁর পিতার কানে পৌঁছে যায়। এ সংবাদ শোনার পর পিতা রাগে আর স্থির থাকতে পারলেন না। সাথে সাথে মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম ছাহেবের নিকট চিঠি লিখে তার পুত্রকে মাদরাসার কিতাবাদি পড়াতে নিষেধ করে দিলেন এবং পুত্রকে লিখে জানালেন, 'তাড়াতাড়ি আরবী পড়া [মাদরাসার পড়া] বন্ধ করে ভালোভাবে ইংরেজি পড়ায় [স্কুলের পড়া] মন দাও। বারবার তোমাকে আরবী পড়তে নিষেধ করা সত্ত্বেও কেন আবার আরবী পড়তে লেগেছ? এটা তোমার মহা অপরাধ। আমার পত্র পাঠ করে আরবী পড়া বন্ধ না করলে আমি তোমাকে কঠিন শাস্তি দিব এবং প্রয়োজন হলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র হিসেবেও ঘোষণা করতে পারি। কাজেই এখন থেকে সাবধান হয়ে যা পড়তে বলি তা পড়ায় লেগে যাও।'

অনেক চিন্তা-ভাবনা করার পর বালক শামসুল হক কলকাতা চলে যান। পোশাক-পরিচ্ছদ ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ছিল অতি সামান্য। অর্থকড়িও নেই। কলকাতায় অনেক চেষ্টা-তদবির করে কয়েকটি টিউশনি যোগাড় করলেন। এতে মাসিক আয় হতো প্রায় পয়ত্রিশ টাকা। এর দ্বারা ছোট ভাই তৈয়বুর রহমানের খরচ দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকত, তা দিয়ে নিজের ব্যয় নির্বাহ করতেন। প্রতিদিন চার জায়গায় টিউশনি করা এবং চার জায়গায় মাদরাসার কিতাবাদি প্রাইভেট পড়ার জন্য তাঁকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল হাঁটতে হতো। সাধারণত পঞ্চাশ মাইলের কম হলে তিনি সেখানে পায়ে হেঁটেই গমন করতেন।

পিতার কঠোরতার কথাও তাঁর মনে জেগে উঠত– স্কুলের পড়া বাদ দিলে হয়ত পিতা কোনো অঘটন ঘটিয়ে ফেলতে পারেন। তাই চিন্তাভাবনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন, যতদিন পিতা জীবিত থাকবেন, তার অবাধ্য কোনোক্রমেই হবেন না, তার মনে কষ্ট দিবেন না। তিনি স্থির করলেন, যেকোনোভাবেই হোক কলেজে তিনি ভর্তি হবেন না। কলেজে ভর্তির দু'চার দিন বাকি থাকতে বাড়ি যাবেন। বাড়িতে চার-পাঁচ দিন অবস্থান করে ভর্তির তারিখ

শেষ হয়ে গেলে কলকাতায় এসে পিতাকে জানিয়ে দিবেন, এ বছর ভর্তির সময় শেষ হয়ে গেছে। তাই এ বছর আপাততঃ মাদরাসায় পড়ি, আগামী বছর নির্দিষ্ট সময়ে কলেজে ভর্তি হওয়া যাবে।

পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কলেজে ভর্তির শেষ তারিখের পাঁচ দিন পূর্বে তিনি বাড়ির পথে রওয়ানা হন। 'পাটগাতী' ঘাটে স্টিমার থামল। তিনি আসবাবপত্র হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে স্টিমার থেকে নামছেন। হঠাৎ সামনে দেখেন পিতা দাঁড়িয়ে আছেন ভয়ঙ্কর চেহারায়। স্টিমার থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, কলেজে ভর্তি হয়েছো? তিনি মাথা নিচু করে শান্তভাবে উত্তর দিলেন, 'না, বাড়ি থেকে কলকাতা গিয়ে ভর্তি হবো'। পিতা বললেন, বাড়িতে যাওয়ার আশা ছাড়। মায়ের সঙ্গে এবার আর দেখা করতে হবে না। ফেরত স্টিমারেই তুমি কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে যাও। পিতার আদেশ শিরোধার্য। কোনোক্রমেই তিনি পিতার অবাধ্য হবেন না। ফিরতি স্টিমারেই কলকাতা চলে গেলেন। কলকাতায় পৌঁছে নিজের বিষয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ একটি লবণের ঠোঙ্গা মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন। তিনি ঠোঙ্গার তলার শক্ত কাগজটুকু ফেলে দিয়ে ঠোঙ্গাটি সমান করে ছিঁড়ে ঐ কাগজেই ভর্তির জন্য দরখাস্ত লিখলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, লবণের ঠোঙ্গায় দরখাস্ত দেখে কর্তৃপক্ষ তা ফেলে দিবেন। তখন পিতাকে বলা যাবে, ভর্তির জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। কিন্তু কলেজের কর্তৃপক্ষ ভর্তি করেন নি। তাতে পিতার কাছেও মিথ্যা বলা হবে না। অপরদিকে কলেজে ভর্তি হওয়া থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে। এভাবেই মাদরাসায় পড়ার একটি সুযোগ হাতে এসে যাবে। কিন্তু তাতেও কাজ হয়নি। ...

একটি ভাঙ্গা ছাতা, একটি ট্রাংক ও একটি ঘটি সম্বল করে তিনি দ্বীনের ইলম অর্জন করার উদ্দেশ্যে দেওবন্দে রওয়ানা হন। হাওড়া স্টেশনে এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করে জীবনের একান্ত কিছু কথা বলে পিতার কাছে লেখা একটি চিঠি তার হাতে দিলেন, যেন সে তা ডাকযোগে পিতার নিকট পাঠান। চিঠির ভাষা ছিল নিম্নরূপ–

মাননীয় আব্বাজান!

পত্রে অধমের আন্তরিক সালাম ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা বিজড়িত কদমবুছি গ্রহণ করতে মর্জি হয়। আশা করি, করুণাময়ের অশেষ কৃপায় কুশলেই আছেন। আমি দেওবন্দে যাচ্ছি। আমার জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করবেন, যেন

উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করতে পারি। আপনি যদি আমাকে আরবী পড়ার [মাদরাসার পড়া] জন্য টাকা-পয়সা না দেন বা ত্যাজ্যপুত্রও করে দেন, তাতেও আমি দুঃখ পাব না। শুধু আপনার খেদমতে আমার একান্ত অনুরোধ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর আপনি আমার জন্য দোয়া করতে ভুলবেন না। আল্লাহ যেন আমাকে কামিয়াব করেন। আমি যেন জীবনে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে ফিরতে পারি। এই দোয়াই শুধু আপনার খেদমতে চাই। আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। আমার জীবনে মঙ্গল হয়, করুণাময়ের দরবারে এই দোয়াটুকু করতে অবশ্যই ভুল করবেন না। আপনি দোয়া করলেই আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হবো। আমি আমার উদ্দেশ্য সফল না করে দেশে ফিরব না। মাকে আমার ভক্তিপূর্ণ সালাম জানিয়ে দোয়া করতে বলবেন। ভুলত্রুটি ও বেয়াদবী মার্জনা করবেন।

ইতি

আপনার দোয়াপ্রার্থী পুত্র

শামছুল হক[৪৭]

মাদরাসার যেসকল তালিবে ইলমকে তাদের অভিভাবক আলীয়ায় পড়ার বা পরীক্ষা দেয়ার জন্য চাপ দেন, হযরত শামছুল হক ফরিদপুরী রহ.-এর জীবনে তাদের জন্য দিকনির্দেশনা আছে।[৪৮]

---

৪৭. "মুজাহিদে আযম হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী সদর সাহেব হুযুর রহ.-এর ছাত্রজীবন" পৃষ্ঠা, ২৩, ২৪, ২৬, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৪৩, ৪৪

৪৮. একজন তালিবে ইলম মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা.-এর নিকট এই সমস্যা তুলে ধরেছিল যে, তার পরিবারের লোকজন তাকে 'জামায়াতে ইসলামে' যোগদান করার এবং আলিয়ায় পড়ার জন্য চাপ দিচ্ছে। তিনি উত্তরে তাকে লিখেন– আপনি আল্লাহ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুল করে যথারীতি আপনার পড়াশোনা চালিয়ে যান। উপরোক্ত দু'টির কোনোটিই গ্রহণ করবেন না। আল্লাহ আপনার সাহায্যকারী হবেন। তবে কারো সাথে তর্ক-বিতর্ক ও ঝগড়া-বিবাধে জড়াবেন না এবং কোনো মুরুব্বীর সাথে বেআদবী হয় এমন কোনো আচরণও করবেন না। ইস্তিকামাত ও দৃঢ়তার জন্য সালাতুল হাজাত পড়ে দুআ করতে থাকবেন এবং নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে পড়াশোনায় মগ্ন থাকবেন। আল্লাহ তা'আলার মেহেরবানীতে মজবুত ইলমই

এখানে আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.-এর একটি বাণী উল্লেখ করা অতীব উপযোগী মনে করছি। তিনি বলেছেন– 'আমি আমার অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বলছি, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কোনো গ্রন্থাগার মানুষ তৈরি করে না, বরং নিজের যোগ্যতা এবং চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত-মোজাহাদার মাধ্যমে মানুষ নিজেই গড়ে ওঠে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আধ্যাত্মিকতার জগতে দেখুন, বড় বড় সাধক পুরুষরূপে যারা জগতব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের অভিভাবক ও মুরুব্বী বিশেষ কোনো অলী-বুযুর্গ ছিলেন না। পরিবার ও পরিবেশও তেমন অনুকূল ছিলো না। শুধু পিপাসা ও ব্যাকুলতা, চেতনা ও প্রেরণা এবং ত্যাগ ও সাধনা দ্বারা রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার এতো উচ্চ মার্গে তাঁরা উপনীত হয়েছেন। কামিল অলী-বুযুর্গরূপে উম্মাহর ইতিহাসে স্মরণীয় বরণীয় হয়েছেন। আযরের ঘরে ইবরাহীম পয়দা হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ উম্মাহর ইতিহাসে রয়েছে।'[৪৯]

পরিবেশের প্রতিকূলতা

পরিবেশের প্রতিকূলতাও ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের জন্য অন্তরায় হয় না। শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তকী উসমানী দা.বা. 'দেশে দেশে' নামে বাংলাভাষায় অনূদিত[৫০] তাঁর সফরনামায় মধ্য এশিয়ার দেশ 'কিরগিজিস্তান'-এর আলেমদের সম্পর্কে লিখেন– 'সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনামলে আকীদাবিশ্বাসে অবিচল অধিকাংশ আলেমকে নির্দয়ভাবে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। অনেককে তুলে

সকল ফেতনা থেকে বাঁচার উপায় হতে পারে। এজন্য ইলমের এ স্তরটি অর্জনের সাধনায় মগ্ন থাকুন। কোনো অভিজ্ঞ ও মুশফিক উস্তাদকে অবশ্যই নিজের মুরুব্বী বানিয়ে নিন। আল্লাহ তা'আলা আপনার সহায় হোন। [সূত্র. 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' পৃ. ৩৯৮]

আলিয়ায় পরীক্ষা দেয়া বিষয়ে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি এ পুস্তকের নং ৪৩ - ৪৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত হয়েছে।

৪৯. অনুবাদ, "জীবন পথের পাথেয়" পৃ. ৫৬। মূল, چراغ راہ زندگی পৃ. ৫৯, ৬০

৫০. মূল বইয়ের নাম– سفر در سفر

নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়েছে সাইবেরিয়ার বরফ অঞ্চলে। তাঁরা সেখানে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুবরণ করেছেন। ফাঁক গলিয়ে যারা বেঁচে গেছেন তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল পাঠদান ওয়াজ নসিহত এবং দ্বীনি দাওয়াত। তারপরও তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে প্রয়োজনীয় দ্বীনি শিক্ষার ধারাকে অব্যাহত রেখেছেন। কেউ বা নিজ গৃহে রুদ্ধ কক্ষে রাত তিনটার পর থেকে ফজর পর্যন্ত ছাত্রদেরকে পাঠদান করেছেন। এতটা সন্তর্পনে যেন কেউ টের না পায়। কাউকে বা সরকার কার্পাসের [তুলাবিশেষ] কৃষিকর্মে নিযুক্ত করে দিয়েছে। তিনি লুকিয়ে লুকিয়ে কৃষিজমিতেই পড়াতে শুরু করেছেন। ছাত্ররা কাস্তে হাতে পৌঁছে যেত শিক্ষকের কাছে। শিক্ষক কার্পাসের আড়ালে মগ্ন হয়ে পড়তেন দ্বীনের পাঠদানে। এভাবে জীবন নিয়ে খেলে খেলে বাঁচিয়ে রেখেছেন দ্বীনের প্রদীপ।'[৫১]

মধ্য এশিয়ার অপর দেশ 'তাজাকিস্তান'-এর সফরনামায় শায়খুল ইসলাম দা. বা. উক্ত বইয়ে[৫২] এক পর্যায়ে লিখেন– 'সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসনামলে এসে সেই জুলুম অত্যাচার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে। মসজিদগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয়। নামায নিষিদ্ধ করা হয়। দ্বীনি শিক্ষার তো কথাই নেই। কুরআনে কারীমের কোনো কপি সংরক্ষণকে পর্যন্ত অপরাধ বলে ঘোষণা করা হয়। যেসকল আলেম এই সব অবিচার-অত্যাচারের প্রতিরোধ করবার চেষ্টা করেছেন তাঁদেরকে দুর্বিসহ মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়েছে। মুসলমানদের প্রায় তেয়াত্তর বছর এই দুঃসহ নির্যাতনের ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় হলো, মুসলমানগণ বিশেষকরে উলামায়ে কেরাম এই কঠিন পরিস্থিতিতেও দ্বীনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বর্ণানাতীত কোরবানী দিয়েছেন। লুকিয়ে লুকিয়ে নামায পড়তেন। একে অপরকে দ্বীন শেখাতেন। রাতের অর্ধেক পার হয়ে যাওয়ার পর যখন রুশ বাহিনী সুখনিদ্রায় বিভোর হয়ে পড়তো, তখন উলামায়ে কেরামের নির্জনকক্ষে এবং মাটির নীচে সংরক্ষিত ঘরে দ্বীনশিক্ষার কার্যক্রম শুরু হতো। তারপর ভোর হবার আগেই আবার শেষ হয়ে যেত আলোকময় এই কর্মধারা।"

---

৫১. 'দেশে দেশে' পৃ. ১২০ - ১২১

৫২. পৃ. ২৩৮

শায়খ আলী তানতাভী রহ. তাঁর قَصَصٌ مِّنَ التَّارِيخِ কিতাবে[৫৩] স্পেনের আলেম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রফী' রহ.-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন। চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রতিকূল পরিবেশেও যে আমাদের পূর্বসূরীগণ দ্বীন ও দ্বীনের ইলম নিজেদের সন্তানদেরকে শিখিয়েছেন এবং সন্তানরা শিখেছে, পরিবেশের কোনো প্রতিকূলতা যে তাঁদেরকে দ্বীন ও দ্বীনের ইলম থেকে বঞ্চিত করতে সক্ষম হয়নি, বহু গ্রন্থের প্রণেতা স্পেনীয় আলেম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রফী' রহ.-এর ঘটনাটি তার অতি উৎকৃষ্ট একটি উদাহরণ। কল্পনা করা যায়? পরিবেশ কেমন প্রতিকূল হলে নিজের কোলে লালিতপালিত এবং নিজের নিকট অবস্থানকারী আদরের সন্তানের কাছে তার বয়স নয় পেরিয়ে দশ শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত এ আশঙ্কায় নিজের ধর্মীয় পরিচয় গোপন রাখতে হয় যে, না বুঝার কারণে সন্তান যদি তা অন্যদের কাছে প্রকাশ করে দেয়, তাহলে তো 'তথ্য-তল্লাশি দফতরে'র জল্লাদদের লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রফী' রহ.-এর মহান পিতামাতা, চাচা ও তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন!

ঘটনাটি অত্যন্ত উদ্দীপক। তা জানা আমাদের সকলের উপকারে আসবে। তাই দীর্ঘতা সত্ত্বেও ঘটনার বিবরণটি বাংলায় অনুবাদ করে এখানে উল্লেখ করার ইচ্ছা করেছি। বিবরণটি সংক্ষিপ্ত করার আমি অনেক ইচ্ছা করেছি। কিন্তু শিক্ষার্থী ভাইয়েরা! তোমরা আমার কলমের অক্ষমতা ক্ষমা করবে। বারবার চিন্তা করার পর মনে হয়েছে, এর আবেদন অক্ষুণ্ন রেখে সংক্ষিপ্ত করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি চাই, পুরো বিবরণটি পড়ে আমি যতটুকু উপকৃত হয়েছি, তোমরাও ততটুকু উপকৃত হও। তাই পুরো বিবরণটির অনুবাদ পেশ করছি। তিনি [মুহাম্মদ বিন আব্দুর রফী' রহ.] বলেন–

তখন আমি ছোট ছিলাম। গোপনে কী চলতো তার কিছুই বোঝতাম না। তবে যখনই স্কুল থেকে ফিরে এসে বাইবেলের যতটুকু মুখস্থ করেছি তা আব্বুকে শোনাতাম এবং স্প্যানিশ ভাষা যে পরিমাণ শিখিছি তা তাঁকে অবগত করতাম, তাঁকে দেখতাম, তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হতেন; তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। তারপর তিনি আমাকে আমার অবস্থায় রেখে ঘরের সর্বশেষ কামরায় যেতেন, যার দরজার নিকটে যাওয়ারও কারো জন্য

---

৫৩. দশম সংস্করণ, পৃ. ৫৬ - ৬৪

অনুমতি ছিল না। তিনি সেখানে দীর্ঘ সময় থাকতেন। আমি জানতাম না তিনি সেখানে কী করতেন। তারপর রক্তিম চেহারায় সেখান থেকে বের হতেন, যেন দীর্ঘ সময় কেঁদেছেন। কয়েকদিন ধরে আমার দিকে দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বিষণ্নতার দৃষ্টিতে তাকাতেন। এমন ভঙ্গিতে ঠোঁট নাড়তেন, যেন তিনি কিছু বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু আমি যখন মনোযোগসহকারে শোনার জন্য দাঁড়াতাম, তিনি কিছুই না বলে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে আমার থেকে সরে যেতেন।

আমি যখনই স্কুলে যেতাম, আম্মু অশ্রুসিক্ত চোখে বিষণ্ন মনে আমাকে বিদায় জানাতেন। আগ্রহ ও ব্যথাভরা মনে চুমু খেতেন। তিনি তৃপ্ত হতেন না। ডেকে আবার চুমু খেতেন। ক্রন্দনরত অবস্থায়ই আমার থেকে পৃথক হতেন। আমি পুরো দিন তাঁর অশ্রুর উষ্ণতা গণ্ডদেশে অনুভব করতাম। তাঁর ক্রন্দন দেখে অবাক হতাম। কোনো কারণ খুঁজে পেতাম না। তারপর যখন স্কুল থেকে ফিরতাম, দীর্ঘশ্বাস ও আগ্রহের সাথে আমাকে স্বাগত জানাতেন, যেন আমি দশ বছর তাঁর থেকে অনুপস্থিত ছিলাম।

আমি লক্ষ করতাম, আব্বু-আম্মু আমার থেকে দূরে সরে ফিসফিস করে স্প্যানিশ ভাষা ছাড়া অন্য এক ভাষায় কথা বলেন যা আমি জানি না ও বুঝিনা। আমি কাছে গেলে তাঁরা কথা কেটে দেন এবং উক্ত ভাষার পরিবর্তে স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলা শুরু করেন। আমি যুগপৎ অবাক হই ও কষ্ট পাই এবং মনে মনে বিভিন্ন সন্দেহ করি। এমনকি আমার ধারণা হতো, আমি তাঁদের সন্তান নই। বরং আমি কুড়িয়ে পাওয়া শিশু যাকে তাঁরা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছেন। ফলে আমার কষ্ট হতো। আমি ঘরের এক বিচ্ছিন্ন অংশে গিয়ে তিক্ত কাঁদা কাঁদতাম।

আমি ক্রমাগত বিভিন্ন কষ্টের শিকার হতাম। সেগুলো আমার মধ্যে এক বিশেষ মানসিকতা সৃষ্টি করত, যা আমার বয়সের শিশুদের মানসিকতা থেকে ভিন্ন। আমি খেলাধুলা ও প্রমোদ-বিনোদনে সমবয়সীদের সঙ্গে মোটেই অংশগ্রহণ করতাম না। বরং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোথাও গিয়ে একাকী বসে থাকতাম। হাতের দুই তালুর মধ্যে মাথা রেখে চিন্তায় ডুবে থাকতাম এবং এ সকল সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার বৃথা চেষ্টা করতাম। এক পর্যায়ে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে গীর্জায় যাওয়ার জন্য পাদরী আমার জামার আস্তিনে টান দিত।

আম্মুর একবার সন্তান হলো। কিন্তু আমি যখন আব্বুকে সুদর্শন শিশুর সুসংবাদ দিলাম, তিনি আনন্দিত হন নি। তাঁর ঠোঁটদ্বয়ে মুচকি হাসির কোনো ঝিলিক প্রকাশ পায় নি। তিনি বরং যন্ত্রণাগ্রস্ত ও শোকাহত অবস্থায় পা টেনে পাদরীর নিকট গেলেন এবং ছোট ভাইকে পবিত্র জলে স্নান করিয়ে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য তাকে ডাকলেন। তারপর মাটির দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে পাদরীর পিছনে পিছনে আসলেন। তাঁর চেহারায় তীব্র মর্মবেদনা ও ধংসাত্মক হতাশার ছাপ ছিল। হাঁটতে হাঁটতে তাকে নিয়ে বাড়ি আসলেন এবং আম্মুর সামনে উপস্থিত হলেন। আমি দেখলাম, লোকটিকে দেখামাত্র আম্মুর চেহারা ভীতসন্ত্রস্ত ও বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন। আমি লক্ষ করলাম, ভীত-বিহ্বল চেহারায় শিশুটিকে তার হাতে তুলে দিয়েই আম্মু চোখ বুজে ফেললেন। আর তাকিয়ে থাকতে পারলেন না। সবকিছুই দেখছিলাম। কিন্তু কেন ঘটছে এ সব দৃশ্য, তার কারণ খুঁজে খুঁজে শুধুই হতবুদ্ধি হতাম ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়তাম। মনের ব্যথা বাড়তেই থাকত।

এরপর যখন 'নিস্তার পর্বদিনে'র[৫৪] রাত উপস্থিত হলো এবং সুগন্ধি ও আলোর বন্যায় গ্রানাডা নগরী প্লাবিত হলো, মশাল ও বাতির আলোয়ে 'আল-হামরা'[৫৫] জ্বলজ্বল করছিল, 'আল-হামরা'র বারান্দা ও মিনারগুলোতে

---

৫৪. খ্রিস্টধর্মের উপাসনা বর্ষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন হলো 'নিস্তার পর্বদিন'। একে খ্রিস্টীয় পরিভাষায় 'পুনরুত্থানের দিন'ও বলা হয়। খ্রিস্টানদের ধারণায় তথাকথিত শুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করার পর হযরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম এ দিনে পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন। 'নিস্তার পর্বদিন'কে আরবীতে عِيْدُ الفِصْح বলা হয়। [সূত্র, 'খ্রীষ্টধর্মীয় শব্দার্থ', লেখক, ফাঃ দানিয়েল লৌয়ারী, ভূক্তি নং ৩০০ ও ৩৩৯]

৫৫. 'আল-হামরা' স্পেনের ঐতিহাসিক দূর্গ। শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা.বা. তাঁর স্পেনের ভ্রমণকাহিনীতে লিখেছেন– এ ঐতিহাসিক দূর্গটি মূলত হিজরী চতুর্থ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। এরপর থেকেই গ্রানাডার বিভিন্ন শাসক এতে সংযোজন ও সংস্কার করেন। অবশেষে ৬৩৫ হিজরিতে মুহাম্মদ ইবনুল আহমার নাসরী এতে অনেক কিছু সংযোজন ও এর সম্প্রসারণ করে একে রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করেন। এরপর হিজরি সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে তাঁর পুত্র এ দূর্গে এক রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন যা 'আলহামরা রাজপ্রাসাদ' নামে বিশ্বখ্যাত। এরপর তাঁর পুত্ররা এ প্রাসাদে অনেক নতুন কিছু সংযোজন করে তথা আধুনিকায়নের মাধ্যমে একে

ক্রুশ চিহ্নগুলো চক্‌চক্ করছিল, তখন ...

মধ্যরাতে ...

পরিবারের সবাই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ...

আব্বু আমাকে ডাকলেন। নিরবে নিয়ে গেলেন তাঁর কামরায়, তাঁর পবিত্র 'হেরেমে'।

আমার হৃৎপিণ্ড প্রবলভাবে কাঁপছিল। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ছিলাম। কিন্তু দৃঢ়তা প্রদর্শন করলাম এবং শান্ত থাকলাম।

আব্বু আমাকে নিয়ে কামরার মাঝখানে পৌঁছে দরজাটা ভালোভাবে বন্ধ করলেন। অতঃপর বাতি খুঁজতে লাগলেন। কয়েক মুহূর্ত আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হচ্ছিল, এক একটি মুহূর্ত যেন একটি বছর বা তার চেয়েও বেশী।

কিছুক্ষণ পর আব্বু ছোট একটি বাতি জ্বালালেন। আমি আশেপাশে তাকালাম। দেখলাম, কামরাটি শূণ্য। কামরাটিতে বিস্ময়কর অনেক জিনিস থাকার যে কল্পনা আমি করতাম, তার কিছুই দেখলাম না। কামরায় ছিল শুধু একটি বিছানা, শেল্‌ফের উপর রাখা একটি কিতাব আর দেয়ালে ঝুলানো একটি তরবারি।

আব্বু আমাকে উক্ত বিছানায় বসিয়ে চুপচাপ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর দৃষ্টিগুলো ছিল বিরল ও বিস্ময়কর। একদিকে আব্বুর অদ্ভুত দৃষ্টি, অপর দিকে কামরার নির্জনতা ও গভীর রাতের নিস্তব্ধতা। সবকিছু মিলিয়ে আমার জন্য চূড়ান্ত এক ভীতিকর অবস্থার সৃষ্টি হলো। মনে হচ্ছিল, দরজার বাহিরে রেখে আসা পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে আমি এখন অন্য জগতে, যেখানকার অনুভূতির বিবরণ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তারপর পরম স্নেহ ও মমতার সাথে আব্বু তাঁর দু' হাতে আমার হাত ধরলেন। ক্ষীণ আওয়াজে বললেন, বাবা! তুমি এখন দশম বছরে পদার্পণ করেছ এবং প্রাপ্ত বয়স্ক হতে চলেছ। আজ আমি তোমার নিকট দীর্ঘদিন

সমকালীন স্থাপত্যশিল্প ও বিলাসিতার বিস্ময়ে পরিণত করেন। ['স্পেনের কান্না' পৃ. ৫৩, 'মাকতাবাতুল হাসান' সংস্করণ ২০১৩ ঈ.। অনুবাদ, কাজী মোহাম্মদ হানিফ]

লুকিয়ে রাখা একটি গোপন বিষয় প্রকাশ করতে চাচ্ছি। বলো, তুমি কি পারবে এর গোপনীয়তা রক্ষা করতে? তোমার আম্মু, পরিবারের লোকজন ও বন্ধু-বান্ধব সকলের নিকট থেকে গোপন রাখতে পারবে? বিশ্বাস করো, তোমার পক্ষ হতে এ বিষয়টির প্রতি সামান্য ইঙ্গিতও তোমার আব্বুর দেহকে 'জেরা ও তদন্ত বিভাগে'র জল্লাদদের শাস্তির মুখে নিক্ষেপ করবে।

'জেরা ও তদন্ত বিভাগ' নামটি শোনামাত্র আমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমি ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম। কারণ, আমি যদিও ছোট ছিলাম, কিন্তু এ বিভাগ যে কি পরিমাণ ভয়ংকর, তা ভালোভাবেই জানতাম। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে প্রতিদিনই দেখতাম, এদের বলির শিকার অসহায় মানুষগুলোকে–

কত পুরুষকে শূলিতে চড়ানো হয়!

কতজনকে আগুনে পোড়া হয়!

কত মহিলাকে তাদের চুল উপরে বেধে মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা হয়!

কতজনের পেট ফাড়া হয়!

তাই আব্বুর জিজ্ঞাসার জবাবে আমি চুপ করে রইলাম। কোনো উত্তর দিলাম না।

কি ব্যাপার, উত্তর দিচ্ছ না যে? যা বলব, তা কি পারবে তুমি গোপন রাখতে?

জ্বি-হ্যাঁ।

তোমার আম্মু ও তোমার ঘনিষ্ঠ লোকদের থেকেও গোপন রাখতে পারবে?

জ্বি-হ্যাঁ।

তাহলে আরও কাছে এসো। কান পেতে শোনো। আওয়াজ করে বলা যাবে না। ভয় হয়, দেয়ালেরও কান থাকতে পারে। কেউ আমাদের কথা শোনে 'তথ্য-তল্লাশি দফতরে'র নিকট প্রকাশ করে দিতে পারে। তখন তারা আমাকে জীবন্ত পোড়াবে।

আমি আব্বুর আরও কাছাকাছি হয়ে বললাম, আমি কান পেতে আছি, বলুন।

তিনি শেল্‌ফের উপর রাখা কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, এ কিতাবটি চেন?

জ্বি-না।

এটি আল্লাহর কিতাব।

সেই পবিত্র কিতাব যা নিয়ে আল্লাহর পুত্র ঈসা মসীহ আগমন করেছেন?

আব্বু অস্থির হয়ে উঠলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, কখনোও না। বরং এটি একক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব আল-কুরআন। এটি এমন সত্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, যিনি অমুখাপেক্ষী, যিনি কাউকে জন্ম দেন নি এবং কারো থেকে জন্ম নেন নি, যার সমকক্ষ কেউ নেই। সেই মহান সত্তা এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুক, নবীগণের সরদার, নবীয়ে আরাবী আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর।

আশ্চর্য, আব্বুর মুখে এসব আমি কি শুনছি! বিস্ময়ে হত-বিহ্বল হয়ে পড়লাম। কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আব্বু বলে চললেন–

এটি ইসলামের গ্রন্থ। যে ইসলাম নিয়ে আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সকল মানুষের নিকট প্রেরণ করেছেন। তিনি আবির্ভাব হয়েছেন

সাগর ও মরুভূমির ওপারে,

পানি ও গাছপালাহীন দূর অনুর্বর ভূমিতে,

মক্কার এক উষর প্রান্তরে,

এক কলহ-বিবাদকারী বর্বর জাতিতে,

মূর্খ ও পৌত্তলিকদের মধ্যে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই কুরআনের মাধ্যমে তাওহীদের পথ প্রদর্শন করেছেন। তাদেরকে উপহার দিয়েছেন একতা, শক্তি, জ্ঞান ও সভ্যতা। ফলে তাঁরা কুরআনের বদৌলতে পূর্ব-পশ্চিম জয় করে চললেন। এক সময় তাঁরা পদার্পণ করলেন এই উপদ্বীপে, স্পেনে।

তখন স্পেনের শাসক ছিলো স্বেচ্ছাচারী ও ঔদ্ধত; সরকার ছিল জালিম ও অত্যাচারী; জনগণ ছিলো নির্যাতিত, দরিদ্র, মূর্খ ও পশ্চাদপদ্।

মানবতার মুক্তিকামী সেই মুসলিম বাহিনী এখানকার স্বেচ্ছাচারী বাদশাকে হত্যা করলেন। অত্যাচারী সরকারের অবসান ঘটালেন। স্পেনের বাগডোর নিজেদের হাতে নিলেন। মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করলেন। মানুষের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করলেন। তাদের জান-মালের নিরাপত্তা

নিশ্চিত করলেন। তাঁরা এখানে আটশ' বছর অবস্থান করলেন। হ্যাঁ, আ-ট শ' বছর। তাঁরা স্পেনকে পৃথিবীর সবচে' সমৃদ্ধ ও সুন্দর দেশে পরিণত করেছেন। হ্যাঁ, বেটা! আমরা, আরব মুসলমানরা।

হতবুদ্ধিতা, বিস্ময় ও আতঙ্কে আমি আমার জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলাম। চিৎকার করে বলে উঠলাম– কী? আমরা? আরব মুসলমানরা?

আব্বু বললেন, হ্যাঁ, সত্যি বেটা! এটিই সেই রহস্য যা অচিরেই আমি তোমাকে অবগত করছি।

এ দেশের মালিক আমরা। এই প্রাসাদসমূহ আমরা নির্মাণ করেছি। এগুলো আমাদের ছিল। এখন তা হয়ে গেছে আমাদের শত্রুদের। এই মিনারসমূহ আমরা উঁচু করেছি যেখান থেকে মুয়াজ্জিনের আযানধ্বনি গুঞ্জরিত হতো। এখন সেগুলোতে কাঁসার ঘণ্টা বাজানো হয়। এই মসজিদগুলো আমরা নির্মাণ করেছি যেগুলোতে মুসলমানগণ আল্লাহর সামনে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াত। তাদের সামনে ইমামগণ মেহরাবে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কালাম তেলাওয়াত করতেন। এখন সেগুলো গির্জায় পরিণত হয়েছে। সেগুলোতে এখন পুরোহিত ও পাদ্রীরা দাঁড়ায়। তারা সেগুলোতে সুরেলা আওয়াজে ইঞ্জীল আবৃত্তি করে। ... হ্যাঁ, বেটা! আমরা আরব মুসলমানরাই।

স্পেনের প্রতিটি ভূ-খণ্ডে আমাদের ঐতিহ্য ও অবদান রয়েছে। এ ভূ-খণ্ডের প্রতি বিঘত মাটির নিচে আমাদের কোনো না কোনো পূর্বপুরুষের বা শহীদের দেহাবশেষ রয়েছে।

হ্যাঁ, এ সকল শহর আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি। এ সকল সেতু আমরা নির্মাণ করেছি। এ সকল পথ আমরা সুগম করেছি। এ সকল খাল আমরা খনন করেছি। এ সকল বৃক্ষ আমরা রোপণ করেছি।[৫৬]

---

[৫৬]. এখানে একটি টীকা লেখা শুরু করেছিলাম। 'স্পেনকে মুসলমানগণ কেমন সভ্য ও সমৃদ্ধ করেছিলেন' এই ছিল টীকার বিষয়বস্তু। العربيَّةُ للنَّاشِئين কিতাবের পঞ্চম খণ্ডে الحَضَارَةُ الإسلاميَّةُ في أَسْبَانِيَا। [স্পেনে ইসলামী সভ্যতা] শিরোনামে একটি লেখা আছে। এখানে সেই লেখার মূল বক্তব্যটি তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। লেখাটি মূলত স্পেন উপদ্বীপে আরবী ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে

কিন্তু চল্লিশ বছর হয়েছে ... তুমি শোনতে পাচ্ছ? চল্লিশ বছর হয়েছে; স্পেনের আমাদের শেষ বাদশা হতভাগ্য সম্রাট আবু আব্দুল্লাহ আছ-ছগীর স্পেনীয়দের প্রতিশ্রুতি ও প্রতিজ্ঞাতে প্রতারিত হয়েছেন।[৫৭] তিনি তাদের

'ব্লাসকো আবানিয' নামীয় বিংশ শতাব্দীর একজন স্প্যানিশ বিজ্ঞানী-এর সাক্ষ্য। কিন্তু তা তুলে ধরলে قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ-এর তাফসীরে কারবালার ইতিহাস বর্ণনা করার মতো ঘটনার নতুন সংস্করণ হয়ে যায় কি-না, সেদিকে লক্ষ করে প্রায় অর্ধেক টাইপ করার পর মুছে ফেললাম। কারণ আমি মূলত এ আলোচনায় ছিলাম যে, "পরিবেশের প্রতিকুলতাও ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির লোকদের জন্য অন্তরায় হয় না।"

৫৭. মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা. তাঁর উপরিউক্ত ভ্রমণকাহিনীতে [পৃ. ৪৮ - ৪৯] লিখেছেন– খ্রিষ্টানরা গ্রানাডাকে যুদ্ধ করে নয়, বরং লিখিত চুক্তিনামার ভিত্তিতে সন্ধি করে জয় করেছিল। যে সময় রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইছাবেলা আবু আব্দুল্লাহর কাছ থেকে আলহামরা কবজা করে, তখন তারা ৬৭ টি দফাসম্বলিত একটি চুক্তিপত্রে সাক্ষর করেছিল। সে চুক্তিপত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল–

১. ধনী-গরিব নির্বিশেষে কোনো মুসলমানের জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি করা যাবে না। তারা যেখানে খুশি সেখানে স্বাধীনভাবে বসবাস করতে পারবে।

২. মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা অনধিকার চর্চা করতে পারবে না এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না।

৩. মসজিদ ও ওয়াকফ-সম্পত্তি যথারীতি বহাল থাকবে।

৪. কোনো খ্রিষ্টান মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না।

৫. মুসলমানদের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান অনুসরণ করা হবে।

৬. যেসব খ্রিষ্টান ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে তাদের পুনরায় খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। যদি কোনো মুসলমান খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করতে চায়, তাহলে একজন মুসলমান ও একজন খ্রিষ্টান বিচারক তার অবস্থার অনুসন্ধান করবেন যে, এ ব্যাপারে তাকে বাধ্য করা হচ্ছে কি-না।

উক্ত শর্তসমূহ মেনে নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করার পর তা শুধু কাগজ পত্রেই রয়ে গিয়েছিল। প্রাণহীন একটি কাগজের টুকরার মর্যাদাও সে চুক্তিপত্রকে দেয়া

হাতে গ্রানাডা নগরীর চাবীগুলো হস্তান্তর করেছেন। তার জাতির আশ্রয়স্থল ও পূর্বপুরুষদের গোরস্থানগুলোকে তাদের জন্য বৈধ করে দিলেন। তারপর বিতাড়িত অবস্থায় একাকী মৃত্যুবরণ করার পরিণতি ভোগের জন্য মরক্কোর বনের পথ ধরলেন।

স্পেনীয়রা আমাদেরকে স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু যখনই তারা ক্ষমতাসীন হলো, তখন তারা তাদের সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল এবং 'জেরা ও তদন্ত বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করল। আমাদেরকে জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে প্রবেশ করাল। আমাদেরকে আমাদের ভাষা বর্জন করতে বাধ্য করল। খ্রিস্টধর্মের সভ্যতা-সংস্কৃতির ভিত্তিতে প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে আমাদের থেকে আমাদের সন্তানদেরকে ছিনিয়ে নিল।

তুমি যে আমাদেরকে লুকিয়ে ইবাদত করতে দেখছ এবং ইসলামের অবমাননার কারণে ও সন্তানদের কাফের বানানোর আচরণে আমাদের বিষণ্নতা লক্ষ করছ, এ-ই হলো তার রহস্য।

বেটা! চল্লিশ বছর যাবৎ আমরা এমন শাস্তি সহ্য করে আসছি যা সহ্য করা বিশাল প্রস্তরখণ্ডের পক্ষেও সম্ভব নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বস্তির অপেক্ষায় আছি। নিরাশ হচ্ছিনা। কারণ, নিরাশা আমাদের ধর্মে নিষিদ্ধ। শক্তি, ধৈর্য্য ও জিহাদের ধর্মে নিরাশার অনুমতি নেই।

বেটা! এ-ই হলো রহস্য। বিষয়টিকে গোপন রাখবে। মনে রাখবে, তোমার পিতার জীবন তোমার ঠোঁটদ্বয়ের সাথে ঝুলন্ত। আল্লাহর শপথ, আমি

হয়নি। চুক্তিপত্রের এমন কোনো শর্ত ছিল না যা নির্লজ্জভাবে প্রকাশ্যে ভঙ্গ করা হয়নি।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা.-এর আলোচনা শেষ হয়েছে। মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবরাবাদী রচিত "মুসলমানদের উত্থান ও পতন" বইয়ে 'গ্রানাডার রাজত্ব', 'আবু আব্দুল্লাহর ইন্তিকাল', 'গ্রানাডার মুসলমান অধিবাসীদের প্রতি অত্যাচার', 'পুস্তকে অগ্নিসংযোগ', 'জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ' ও 'সাধারণ হত্যাকান্ড' প্রভৃতি শিরোনামের লেখাগুলো সুযোগ করে অবশ্যই পড়ে নিবে। বইটি 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত।

মৃত্যুকে ভয় করি না এবং আল্লাহর সাক্ষাতকে অপছন্দ করিনা। কিন্তু এ জন্য বেঁচে থাকতে চাই, যেন তোমাকে তোমার ভাষা শিখাতে পারি, তোমাকে তোমার ধর্ম সম্পর্কে অবহিত করতে পারি এবং তোমাকে কুফরের অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে ঈমানের আলোতে নিয়ে আসতে পারি। এখন তুমি ঘুমাতে যাও।

এরপর যখনই আমি 'আল-হামরা'র গ্যালারী অথবা গ্রানাডার মিনারগুলো দেখতাম, এক প্রবল কম্পন আমাকে আন্দোলিত করত। আগ্রহ-উদ্দীপনা, দুঃখ-কষ্ট, ঘৃণা-অবজ্ঞা ও প্রীতি-ভালোবাসার এক বিচিত্র শিহরণ আমাকে আচ্ছন্ন করত। প্রায়ই দীর্ঘক্ষণ আত্মভোলা থাকতাম। যখন সতর্ক হতাম, তখন নিজকে দেখতাম, 'আল-হামরা' প্রদক্ষিণ করছি এবং তাকে সম্বোধনকরত তিরস্কার করে বলছি, হে 'আল-হামরা'! হে বর্জনকারিণী প্রিয়া! তুমি কি তোমার সেসকল নির্মাতা ও প্রতিষ্ঠাতাদেরকে ভুলে গেলে, যারা প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে তোমার পুষ্টি যুগিয়েছেন এবং রক্ত ও অশ্রু দিয়ে তোমার পিপাসা নিবারণ করেছেন? তুমি যে তাঁদের যুগকে ভুলে যাওয়ার ভান করে আছ! এবং তাদের প্রেম ও ভালোবাসা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ভণিতা করছ! ভুলে গেলে সেসকল বাদশাকে, যারা তোমার নয়নাভিরাম কক্ষগুলোতে ঘুরে বেড়াত, তোমার স্তম্ভগুলোতে হেলান দিয়ে বসত? তুমি যেমন সম্মান, মহত্ত্ব, ঔজ্জ্বল্য ও সৌন্দর্য চাইতে, তা দিয়ে তোমাকে ঢেলে সাজাত। ওরাই সেই মহামান্য ব্যক্তিবর্গ, যখন কথা বলতেন দুনিয়া তাঁদের কথা কান পেতে শোনত। যখন আদেশ করতেন যামানা লাব্বাইক বলত। তবে কি মুয়াজ্জিনের আজানের বিপরীতে তুমি খ্রিস্টানদের ঘণ্টাধ্বনির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়লে? ইমামদের পরিবর্তে তুমি কি সন্ন্যাসীদের প্রতি তুষ্ট হলে?

তারপর আশঙ্কা হত যদি 'দফতরে'র গোয়েন্দারা আমার কথা শোনে ফেলে, তখন আব্বুর দেয়া আরবী পাঠ মুখস্থ করার জন্য দ্রুত ঘরে ফিরে যেতাম। আমার কল্পনায় এখনও ভাসছে, আব্বু আমাকে অনারবী হরফ লেখার আদেশ করছেন, তারপর তিনি তার বিপরীতে আরবী হরফ লিখে আমাকে বলছেন, এগুলো আমাদের হরফ। তিনি আমাকে সেগুলোর উচ্চারণ ও লেখা শেখাতেন। আমাকে ইসলামের আলোচনা শোনাতেন। অযু ও নামায

শেখাতেন। তাঁর নির্জন ও ভয়ানক কামরায় আমি তাঁর পিছনে চুপিসারে নামায পড়তাম।

ভয় ছিল পদস্খলন হয়ে যাওয়ার। ফলে গোপন রহস্য প্রকাশ করে দেব। তাই তিনি আমাকে পরীক্ষা করতেন। আম্মুকে আমার কাছে পাঠাতেন। আম্মু আমাকে জিজ্ঞাসা করতেন, তোমার আব্বু তোমাকে কী শেখান?

কিছুই না।

আমি জানি তিনি তোমাকে কী শেখান। অতএব আমার কাছ থেকে গোপন রাখতে চেষ্টা করো না।

না, তিনি আমাকে কিছুই শেখান না।

এভাবে যখন আরবী ভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করলাম, কুরআন বোঝলাম এবং দ্বীনের নিয়মনীতি ও মূলনীতি শিখলাম, তখন তিনি আমাকে তাঁর এক ধর্মীয় ভাইয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। আমরা তিনজন এবাদতে ও তেলাওয়াতে একত্রিত হতাম।

* * *

তারপর 'জেরা ও তদন্ত বিভাগে'র নিষ্ঠুরতা তীব্র হলো এবং অবশিষ্ট আরবদেরকে কঠোর শাস্তিদান বৃদ্ধি করল।

তখন এমন কোনো দিন অতিবাহিত হতো না, যেদিন বিশ ত্রিশ জন ব্যক্তিকে শূলিবিদ্ধ দেখতাম না, অথবা আগুনে জীবন্ত দগ্ধ নজরে পড়ত না।

এমন কোনো দিন অতিক্রান্ত হতো না, যেদিন শত শত মুসলমানকে ভয়াবহ ও লোমহর্ষক শাস্তি দিতে শোনতাম না।

চোখের সামনে নিজেদের নখগুলো উপড়ে ফেলা হতো।

শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত পানি পান করানো হত।

পা ও পার্শ্বে আগুনের দাগ দেয়া হতো।

আঙ্গুলগুলো কেটে ভুনা করে তাদের মুখে রাখা হতো।

এমন বেত্রাঘাত করা হতো যে, শরীরের গোশত ঝরে পড়ত।

এ অবস্থা দীর্ঘ দিন অব্যাহত থাকল। একদিন আব্বু আমাকে বললেন, বেটা! মনে হচ্ছে মৃত্যু আমার সন্নিকটে। এদের হাতে আমার শাহাদাত হোক। আল্লাহ যেন আমাকে জান্নাত নসীব করেন। তাহলে আমি বড় ধন্য

হবো। তোমাকে কুফরির অন্ধকার থেকে বের করার পর এবং তোমার কাঁধে ইসলামের মহা আমানত বহন করানোর পর এ দুনিয়াতে বেঁচে থাকার আমার কোনো আগ্রহ নেই। তোমাকে ইসলামের আমানত বুঝিয়ে দেয়ার বোঝায় আমার পিঠ ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম ছিল। যদি আমার কিছু হয়, তাহলে তোমার এই চাচার অনুসরণ করবে। কোনো বিষয়ে তাঁর বিরোধিতা করবে না।

এরই মধ্যে কিছুদিন দিন অতিবাহিত হলো। অমাবশ্যার এক অন্ধকার রাতে হঠাৎ চাচা আমাকে ডেকে তাঁর সাথে বের হতে আদেশ করলেন। বললেন, আল্লাহ আমাদের জন্য মুসলমানদের দেশ মরক্কোর উপকণ্ঠে পলায়নের পথ সহজ করে দিয়েছেন। আমি বললাম, আব্বু-আম্মু?

তিনি আমার সঙ্গে কঠোর আচরণ করে শক্তভাবে আমার হাত ধরে বললেন, তোমার আব্বু কি তোমাকে আমার অনুসরণের নির্দেশ দেন নি?

অবনত ও অনিচ্ছুক অবস্থায় আমি তাঁর সাথে চলতে লাগলাম। এক পর্যায়ে যখন শহর থেকে দূরে চলে গেলাম এবং অন্ধকার আমাদেরকে ঢেকে নিল, তখন তিনি বললেন, বেটা! ধৈর্য ধারণ করো, আল্লাহ তা'আলা তোমার ঈমানদার পিতামাতাকে 'জেরা ও তদন্ত বিভাগে'র হাতে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করেছেন। [আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করুন। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে কাফের সম্প্রদায়ের পরীক্ষার বস্তুতে পরিণত করো না। আমীন! -ফুআদ]

* * *

এভাবে কিশোর মুহাম্মদ মরক্কোর ভূমিতে পৌছালেন। তিনিই পরবর্তী স্প্যানিশ আলেম ও লেখক সাইয়েদ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রফী' রহ.। আল্লাহ তাঁর ব্যক্তি ও রচনাবলি দ্বারা উপকৃত হওয়ার ধারা অব্যাহত রাখুন।

[قِصَصٌ مِّنَ التَّارِيخِ কিতাবে উল্লেখিত শায়খ আলী তানতাভী রহ.-এর বিবরণ সমাপ্ত হলো।]

বংশীয় আভিজাত্যহীনতা

বংশীয় আভিজাত্যহীনতাও জীবনে বড় হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা নয়। এ প্রসঙ্গে খলীফা আব্দুল মালিক বিন মারওয়ান রহ.-এর সাথে ইমাম ইবনে শিহাব যুহ্‌রী রহ.-এর একটি কথোপকথন উল্লেখ করা যায়। এতে আমরা লক্ষ করব, তাবেয়ীদের যুগ যা ছিল সাহাবায়ে কেরামের যুগের পর ইলমচর্চার

শীর্ষ যুগ এবং যখন বড় বড় মনীষীও বিদ্যমান ছিলেন সর্বত্র, সে যুগেও অনেক ভূখণ্ডে ধর্মীয় নেতৃত্বে যেখানে আরবদের থাকা স্বাভাবিক ছিল, সেখানে ছিলেন অনেক 'মাওলা'।[৫৮] তাহলে এবার শোনা যাক কথোপকথনটি–

আব্দুল মালিক ঃ কোত্থেকে আসলেন?

যুহ্‌রী ঃ মক্কা থেকে।

আব্দুল মালিক ঃ মক্কার অধিবাসীদের [ধর্মীয়] নেতৃত্ব দেয়ার জন্য কাকে রেখে আসলেন?

যুহ্‌রী ঃ আতা ইবনে আবী রাবাহ্‌কে।

আব্দুল মালিক ঃ তিনি আরব না মাওলা?

যুহ্‌রী ঃ মাওলা।

আব্দুল মালিক ঃ একজন মাওলা কিসের ভিত্তিতে আরবদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন?

যুহ্‌রী ঃ দ্বীনদারি ও ইলমের ভিত্তিতে।

আব্দুল মালিক ঃ দ্বীনদারী ও ইলমের ভিত্তিতেই নেতৃত্ব দেয়া উচিত। আচ্ছা, ইয়ামানবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে?

যুহ্‌রী ঃ তাউস ইবনে কায়সান।

আব্দুল মালিক ঃ তিনি আরব না মাওলা?

যুহ্‌রী ঃ মাওলা।

আব্দুল মালিক ঃ তিনি আরবদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কিসের ভিত্তিতে?

যুহ্‌রী ঃ যে ভিত্তিতে 'আতা আরবদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আব্দুল মালিক ঃ হ্যাঁ, এমন ব্যক্তিরই নেতৃত্ব দেয়া উচিত। আচ্ছা, মিশরের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে?

যুহ্‌রী ঃ ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব।

আব্দুল মালিক ঃ তিনি আরব না মাওলা?

যুহ্‌রী ঃ মাওলা।

---

৫৮. যারা দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল কিংবা শুরু জীবনে ইসলাম থেকে বঞ্চিত ছিল, পরিভাষায় বিশেষকরে তাদেরকে 'মাওলা' বলা হয়।

আব্দুল মালিক ঃ সিরিয়ার নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে?

যুহ্‌রী ঃ মাকহুল।

আব্দুল মালিক ঃ তিনি আরব না মাওলা?

যুহ্‌রী ঃ মাওলা।

আব্দুল মালিক ঃ 'আরব উপদ্বীপে'র নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে?

যুহ্‌রী ঃ মায়মুন ইবনে মিহ্‌রান।

আব্দুল মালিক ঃ তিনি আরব না মাওলা?

যুহ্‌রী ঃ মাওলা।

আব্দুল মালিক ঃ খোরাসানবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে?

যুহ্‌রী ঃ যাহ্‌হাক ইবনে মুযাহিম।

আব্দুল মালিক ঃ তিনি আরব না মাওলা?

যুহ্‌রী ঃ মাওলা।

আব্দুল মালিক ঃ বস্‌রাবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে?

যুহ্‌রী ঃ হাসান বসরী।

আব্দুল মালিক ঃ তিনি আরব না মাওলা?

যুহ্‌রী ঃ মাওলা।

আব্দুল মালিক ঃ তোমার নাশ হোক! কূফাবাসীদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন কে?

যুহ্‌রী ঃ ইবরাহীম নাখ্‌য়ী।

আব্দুল মালিক ঃ তিনি আরব না মাওলা?

যুহ্‌রী ঃ তিনি আরব।

আব্দুল মালিক ঃ যুহ্‌রী! তোমার নাশ হোক, এতক্ষণে তুমি আমার পেরেশানি লাঘব করেছ। এভাবে মাওলারা আরবদের নেতৃত্ব দিতে থাকলে এক সময় তাদের নামে মিম্বরে ভাষণ দেয়া হবে, আর আরবরা নীচে বসে বসে সে ভাষণ শোনবে।

যুহ্‌রী ঃ আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর বিধান ও দ্বীনকে যারা সংরক্ষণ করবে, তারাই নেতৃত্বে থাকবে। আর যারা

তাকে অবহেলা করবে, তারা নেতৃত্ব থেকে বঞ্চিত হবে।[৫৯]

শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা. তাঁর تَكْمِلَةُ فَتْحِ الْمُلْهِمِ কিতাবে[৬০] লিখেছেন, 'ইসলামের ইতিহাসে কত দাস মর্যাদা ও নেতৃত্বের শীর্ষে পৌঁছেছে! কত দাস জ্ঞান-বিজ্ঞানে স্বাধীন লোকদের প্রত্যাবর্তনস্থলে পরিণত হয়েছে! কত দাস ইসলামে এমন জীবনযাপন করেছে যা নিয়ে স্বাধীন লোকেরা ঈর্ষা করেছে! আমাদের ইতিহাস এ ধরনের দৃষ্টান্তে কানায় কানায় পূর্ণ। ... যে কেউ 'রিজাল শাস্ত্রে'র গ্রন্থাবলি এবং হাদীসের বর্ণনাকারী ও আলেমদের অবস্থা অধ্যয়ন করবে, সে অবাক হয়ে লক্ষ করবে, এ সকল মনীষীদের অধিকাংশ দাস ছিলেন। মক্কার আতা বিন আবী রাবাহ, ইয়ামেনের তাউস বিন কায়সান, মিশরের ইয়াযিদ বিন হাবীব, শামের মাকহুল ও হেজাজের যাহ্হাক বিন মুযাহিম– তাঁরা সকলে দাস ছিলেন। তাঁরা একই যুগের ছিলেন। নিজ নিজ ভূখণ্ডে ইলম ও ফিক্হের নেতৃত্ব তাঁদের হাতেই ছিল।'

---

৫৯. مقدّمة ابن الصّلاح পৃ. ৩৩৮ - ৩৩৯ দারুল হাদীস, কায়রো, ১৪৩১হি. / ২০১০ঈ.

أورَدَ الإمام الذهبيّ أيضا القصةَ في كتابه «سِيَر أعلامِ النُّبَلاء» ٥ : ٤٢٧ ثم قال : الحكايةُ منكَرَة، والوليدُ بن محمد -الراوي عن الزهري- وَاهٍ، فلعلَّها تمَّتْ للزهريّ مع أحد أولاد عبد الملِكِ. وأيضا ففيها «مَنْ يَسُود أهلَ مصر؟ قلت : يزيد بن أبي حبيب، وهو من الموالي»، فيزيد كان ذاكَ الوقتَ لا يُعرَفُ بعدُ، والضحَّاكُ فلا يَدري الزهري مَنْ هو في العالَم، وكذا مكحول يَصْغُر عن ذاكَ. انتهى كلامُ الذهبيِّ.

قلت : إن القصة وإن كان فيها من النَّكَارَة ما ذكَرَه الذهبيُّ كان المذكورون فيها علماءَ كبارًا ومَوَالِيَ بلا اختلافٍ، كما تدل عليه مراجعةُ كُتُب التراجم والسِّيَر، فلا تَضُرُّ نكارةُ خصوصِ القصة فيما استَشْهَدْنا له بها.

৬০. ১ : ১৭৬

ইয়াতীম হওয়া

ইয়াতীম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করা বা ইয়াতীম অবস্থায় বেড়ে ওঠাও জীবনে বড় হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা নয়। দেখো, সকল যুগের সকল স্থানের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবী-রাসূলগণের সর্দার বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াতীম ছিলেন। উম্মতের বরেণ্য মনীষীদের মধ্যেও ইয়াতীমদের সংখ্যা কম নয়। ইমাম সুফিয়ান সাওরী, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আমহদ বিন হাম্বল, ইমাম বুখারী, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী, ইমাম গায্যালী[৬১], ইমাম ইবনুল জাওযী, শেখ সা'দী, হাফেজ ইবনুল মুলাক্কিন, হাফেজ সিব্তু ইবনিল আজ্মী, আল্লামা কাসেম বিন কুত্লুবুগা, হাফেজ জালালুদ্দীন সুয়ূতী, শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী, শায়খ আহমদ ইয়াসিন প্রমুখ সকলে ইয়াতীম ছিলেন। শায়খ আব্দুল্লাহ সালেহ আলজুমুআহ্-এর أَيْتَامٌ غَيَّرُوْا مَجْرَى التَّارِيْخ [ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দিয়েছেন এমন কতিপয় ইয়াতীম] শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র কিতাব আছে।

---

৬১. শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা. লিখেছেন– শব্দটি গায্যালী ও গাযালী দু'ভাবেই পড়া যায়। তাঁর বাবা 'গায্যাল' [সুতার ব্যবসায়ী] ছিলেন, সে হিসাবে তিনি গায্যালী। আর তাঁর জন্মস্থানের নাম 'গাযাল', সে হিসাবে তিনি গাযালী। আল্লামা সাম'আনী রহ. 'গাযালী' গ্রহণ করেছেন। তবে অধিকাংশ গবেষক তাঁকে 'গায্যালী' বলাকেই অধিক যুক্তিযুক্ত বলেছেন। [সূত্র, "দেশে দেশে" পৃ. ৫৩]

قلت : قال ابن الأثير في «اللُّبَاب في تهذيب الأنساب» : الغَزَّالِيّ بفتح الغين والزاي المشددة وبعد الألف لام، أظن أن هذه النسبة إلى الغَزَّال على عادة أهل جُرْجَان وخوارزم كالعَصَّاري نسبة إلى العَصَّار، واشتهر بها الإمامُ أبو حامد محمد بن محمد الغزاليُّ الفقيهُ الشافعيُّ المشهور، تُوفي سنة خمس وخمسمائة. وسمعت مَنْ يقول : إنه بالتخفيف، نسبة إلى غزالة قرية من «طُوْس»، وهو خلاف المشهور.

وقال الجلال السيوطيُّ في «لُبّ اللُّبَابِ في تحرير الأنساب» : الغَزَّالِيُّ بالتشديد إلى الغَزْل كالغزال، وقيل : هو بالتخفيف إلى غزالة قرية بـ«طُوْس».

বয়স বেশী হওয়া ও জীবনের দীর্ঘ সময় বিপথে কেটে যাওয়া

অনেক বিশ্ববরেণ্য মনীষী যথেষ্ট বয়স হওয়ার পর দ্বীনের ইলম শেখা শুরু করেছেন। শুরু জীবনে তাঁদের কেউ কেউ তো আল্লাহর অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে ডুবন্ত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়–

১. মুসলমানদের ইতিহাসের একটি কঠিনতম যুগ ছিল তাতারীদের যুগ। মুসলমানদের তৎকালীন দারুল খেলাফত [রাজধানী] বাগদাদসহ আরো অনেক ইসলামী দেশ ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত হয়েছিল তাতারীদের হাতে। কোটি কোটি মুসলমানকে হত্যা করে তারা পৃথিবীর ইতিহাসে রচনা করেছিল এক নির্মম অধ্যায়। তাদের প্রভাব এতটাই গভীর ও বিস্তৃত ছিল যে, তখন মানুষের মধ্যে এই উক্তি প্রচলিত ছিল– 'যদি কেউ বলে, তাতারীরা পরাজিত হয়েছ, তাহলে বিশ্বাস করো না।' এই তাতারীদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য প্রথম বিজয়-ইতিহাসে যাদের প্রজ্ঞা, সাহস ও অভিযান প্রধান ভূমিকা রেখেছে, তাঁদের অন্যতম হলেন শায়খুল ইসলাম ইয্যুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম রহ.। তাঁর সম্পর্কে আল্লামা তাজুদ্দীন সুব্কী রহ. বলেছেন– إنه لم يَرَ مِثْلَهُ الناسُ، ولم يَرَ هو مِثْلَ نَفْسِه [মানুষ তাঁর মতো কাউকে দেখেনি এবং তিনিও নিজের মতো কাউকে দেখেন নি।] তাঁর মিশরে পৌঁছার পর الترغيبُ والترهيبُ কিতাবের লেখক আব্দুল আজীম মুনযিরী রহ. ফতওয়া প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বলেন, 'যে শহরে ইয্যুদ্দীন ইবনে আব্দুস্ সালাম থাকেন, সেখানে অন্যদের ফতওয়া দেয়া সমীচীন নয়।' অথচ তিনিও ইলম অর্জনের স্বাভাবিক বয়স পার হওয়ার পর ইলম অর্জন শুরু করেছিলেন। উপরন্তু ছিলেন না কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। ছিল না তাঁর পরিবারে ইলমের চর্চা। এতো দরিদ্র পরিবারের সন্তান ছিলেন যে, অন্য কোথাও গিয়ে রাত্রিযাপন করতে হতো।[৬২]

---

৬২. «رجالٌ مِّنَ التاريخ» لِعَلِيٍّ الطَّنْطَاوِيِّ ص. ٢٨٥

وفي «تاريخ الإسلام» للذهبيّ ٤٨ : ٣٣٤ - ٣٣٥ : وُلِد سنة سبعٍ أو ثمانٍ وسبعين وخمسمائة (٥٧٨/٥٧٧) . . . . . وقد رَحَل إلى بغداد سنة سبعٍ وتسعين

২. হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে কে না চেনে! কিন্তু তাঁর শুরু জীবনটাও ভালো অবস্থায় কাটেনি। বন্ধুদেরকে নিয়ে বাগানে রাতে আড্ডা দেয়া এবং বীণা ও ঢাক তাম্বুরা[৬৩] বাজানো ছিল তাঁর স্বাভাবিক কাজ। অথচ পরবর্তীতে তিনি হয়েছেন 'আমীরুল মুমিনীনা ফিল্ হাদীস'। উপরন্তু হয়েছেন ইসলামের বিরল বীর ও বিচক্ষণ মুজাহিদ সেনাপতি।[৬৪]

৩. হযরত ফুযাইল বিন ইয়ায রহ. শুরু জীবনে ছিলেন এক দুর্ধর্ষ ডাকাত। কাফেলা তাঁর ভয়ে রাতে সফর করা থেকে বিরত থাকত। অধিকন্তু এক কিশোরীর সঙ্গে ছিল তাঁর ভালোবাসার সম্পর্ক। রাতে দেয়াল টপকিয়ে কোথাও যাওয়া তাঁর জন্য স্বাভাবিক ছিল। অথচ পরবর্তীতে তিনি হয়েছেন মুত্তাকীদের শিরোমণি। পৃথিবীর প্রথম সারির মুত্তাকী ও পরহেযগার এবং তিনি হয়েছেন অনেক বড় মুহাদ্দিস। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে তাঁর হাদীস স্থান পেয়েছে।[৬৫]

৪. আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. ৮০ [আশি] বছর বয়সে কুরআনের দশ কেরাত শিখেছেন।

৫. ইমাম কাফ্ফাল ৪০ বছর বয়সে ইলম শেখা শুরু করেন।

৬. শায়খ আহমদ বিন ইবরাহীম কিন্নাঈ ৩০ বছর বয়সে ইলম শেখা শুরু করেন।[৬৬]

৭. শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা.-এর চাচাত ভাই মাওলানা মুহাম্মদ ফাহীম উসমানী রহ. সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম দা. বা. তাঁর 'বরেণ্যদের স্মৃতিচারণ' গ্রন্থে লিখেছেন, 'হাদীসের প্রামাণ্যতা বিষয়ে তিনি "হেফাযত ও হুজ্জিয়াতে হাদীস" নামে বেশ বড় একটি কিতাব লিখেছেন যার পৃষ্ঠাসংখ্যা প্রায় ছয়শো। কিতাবটি

وخمسمائة (٥٩٧) وأقام بها أشهرا. انتهى كلامُ الذهبي. يدل كلامه على طَلَب العِزِّ بن عبد السلامِ العلمَ منذ مَطْلَع شبابه، فليُتَأَمَّل.

৬৩. এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র।

৬৪. «الفوائدُ البَهِيَّةُ في تراجِم الحَنَفِيَّة» لعبد الحي اللَّكْنَوِيِّ پৃ. ১৩৩

৬৫. «سِيَر أَعْلامِ النُّبَلاء» للحافظ الذَّهَبِيِّ ٧ ঃ ৩৯৩ - ৩৯৪,

৬৬. «عُلُوُّ الْهِمَّةِ» لمحمد أحمد إسماعيل المقدَّم پৃ. ২০৩ - ২০৬

অত্যন্ত সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সম্ভবত উর্দু ভাষায় এ বিষয়ে এটি-ই একমাত্র বড় কিতাব। এ কিতাবটিতে তিনি হাদীস অস্বীকারকারীদের সমস্ত দলিল ও প্রশ্ন-অভিযোগের নাড়িভুঁড়ি বের করে দিয়েছেন। তাছাড়া নামাযের আহকাম ও মাসায়েলের উপর তিনি যে কিতাবটি সংকলন করেছেন, সেটিও আপন বিষয়ের উপর উর্দুতে সম্ভবত সর্বাধিক ও সমৃদ্ধ পুস্তক। পরে আবার তিনি নিজেই ইংরেজিতে অনুবাদ করে বইটির উপকারিতাকে সার্বজনীন বানিয়ে দিয়েছেন। আব্বাজীর কিতাব "আহকামুল হজ্ব"-এর ইংরেজি অনুবাদও তিনি করেছেন। এগুলো ছাড়াও তিনি এক ডজনেরও বেশি ছোট-বড় গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিষয়বস্তুর বিশুদ্ধতা, আলোচনার গভীরতা, পূর্ণাঙ্গতা ও বর্ণনার সাবলীলতার বিচারে উর্দু ভাষায় ইসলামী গ্রন্থভাণ্ডারে এই কিতাবগুলো এক মূল্যবান সংযোজন। ...'

এই মাওলানা মুহাম্মদ ফাহীম উসমানী রহ.-এর শুরু অবস্থা সম্পর্কে শায়খুল ইসলাম দা. বা. লিখেছেন, 'শুরুতে তিনি ইংরেজি শিক্ষা অর্জন করেছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর জীবনের বিরাট একটি অংশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে চাকুরির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করেন। এই সময়টিতে দ্বীনী ইলমের সঙ্গে তাঁর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ... তিনি অর্থনৈতিক সমস্যার কোনো পরোয়া না করে ব্যাংকের চাকুরিটি ছেড়ে দিলেন। জাগতিক বিচারে একটি সম্মানজনক চাকুরিকে পরিত্যাগ করে একটি মুদি দোকান নিয়ে বসে গেলেন। ... এই চাকুরিতে অধিষ্ঠিত থাকা কালেই তার অন্তরে দ্বীনী ইলম অর্জনের জযবা সৃষ্টি হলো। ফলে বড়সড় একটি পরিবারের দায়িত্ব ও সেই সঙ্গে অফিসের দায়িত্বের গুরুভার মাথায় নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আরবী ভাষা ও ইসলামী জ্ঞান অর্জন শুরু করে দিলেন। প্রথমে এককভাবে কয়েকজন উস্তাদের কাছে কিছু পড়াশোনা করেন। পরে নিয়মতান্ত্রিকভাবে ভর্তি হয়ে জামিয়া আশরাফিয়া লাহোরে তাফসীর, হাদীস ও ফিক্‌হ-এর কিতাবগুলো যোগ্য উস্তাদগণের কাছে পড়েন। তারপর ইসলামিয়াত ও আরবী ভাষায় কৃতিত্বের সঙ্গে এমএ করেন।'[৬৭]

জীবনের দীর্ঘ সময় যাদের বিপথে কেটেছে, উল্লেখিত মনীষীগণ তাদের জন্য আদর্শ।

---

৬৭. 'বরেণ্যদের স্মৃতিচারণ' পৃ. ২৪৭, ২৪৫, ২৪৬

শারীরিক ত্রুটি যেমন বধিরতা বোবাত্ব ও অন্ধত্ব

অন্ধত্ব প্রসঙ্গে ইমাম কাতাদা রহ.-এর উদাহরণ পেশ করা যায়। তিনি জন্ম থেকেই অন্ধ ছিলেন। কিন্তু এই অন্ধত্ব তাঁর شَيْخُ الْمُفَسِّرِيْنَ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক হয়নি। অদ্রূপ ফকীহ যুবাইর আলবাস্‌রী, নাহ্‌বী আবু জাফর, আদীব আবুল 'আলা আলমাআর্‌রী, কবি বাশ্‌শার বিন বুর্‌দ, ইল্‌মুল্ কিরাতের ইমাম আল্লামা শাতিবী রহ. প্রমুখ মনীষীগণও অন্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের অন্ধত্বও তাঁদের বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়নি।[৬৮]

অনেক বধির, বোবা ও অন্ধ লোকও দ্বীন প্রচারের বিভিন্ন অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ডক্টর মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী তাঁর اِسْتَمْتِعْ بِحَيَاتِكَ কিতাবে[৬৯] নিজের প্রত্যক্ষ করা একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। নিম্নে ঘটনাটির বাংলা অনুবাদ তুলে ধরছি–

আবু আব্দুল্লাহ আমার [ডক্টর মুহাম্মদ আরিফী] অন্যান্য বন্ধুদের থেকে বেশি ভিন্ন ছিলেন না। তবে আল্লাহ সাক্ষী আছেন, তিনি তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভালো কাজের প্রতি আগ্রহী। তাঁর অনেক দাওয়াতী উদ্যোগ রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো যা তিনি তাঁর চাকুরির পাশাপাশি করে থাকেন। তিনি 'বধির ও বোবা ইনস্টিটিউটে' মুখপাত্রের চাকুরি করেন।

একদিন আমার সাথে যোগাযোগ করে বললেন-

আমি যদি 'বধির ও বোবা ইনস্টিটিউটে'র সাথে সংশ্লিষ্ট দু'জনকে আপনার মসজিদে নিয়ে আসি মুসল্লীদের সামনে কিছু আলোচনা করার জন্য, তাহলে কেমন মনে করেন?

আমি অবাক হয়ে বললাম, নির্বাক লোক সবাক লোকদের সামনে বক্তৃতা করবে?

তিনি উত্তরে বললেন, হাঁ, তাহলে আমাদের আসাটা হোক রবিবারে।

আমি অধীর আগ্রহে রবিবারের অপেক্ষা করতে থাকলাম।

নির্ধারিত সময়ে মসজিদের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম।

---

৬৮. القراءةُ الراشدةُ দ্বিতীয় খণ্ড।

৬৯. পৃ, ৩১৮ - ৩২২, الدارُ العالَمِيَّةُ للتجليد সংস্করণ, ১৪৩১হি./২০১০খ্রি.

হঠাৎ দেখতে পেলাম, আবু আব্দুলাহ্ তাঁর গাড়ি নিয়ে এগিয়ে আসছেন। দরজার কাছে থামলেন। তিনি নামলেন। তাঁর সাথে দু'জন।

একজন তাঁর পাশে নিজে নিজে হাঁটছিলেন। অন্যজনকে আবু আব্দুল্লাহ্ হাত ধরে নিয়ে আসছিলেন।

প্রথমজন ছিলেন বধির ও বোবা। শোনেন না ও কথা বলেন না, তবে দেখেন।

দ্বিতীয়জন বধির, বোবা ও অন্ধ। শোনেন না, কথা বলেন না এবং দেখেনও না।

হাত বাড়িয়ে আবু আব্দুল্লাহর সঙ্গে মুসাফাহা করলাম। যিনি তাঁর ডান পাশে ছিলেন [পরে জানতে পারলাম তাঁর নাম আহমদ], তিনি আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসছিলেন। তখন তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে তাঁর সাথেও মুসাফাহা করলাম।

আবু আব্দুল্লাহ্ অন্ধের দিকে ইশারা করে আমাকে বললেন, ফায়েয্কেও সালাম করুন।

আমি বললাম, ফায়েয্! আস্সালামু আলাইকুম।

আবু আব্দুল্লাহ্ বললেন, তাঁর হাতে ধরুন। তিনি শোনেন না এবং দেখেন না।

তাঁর হাতে হাত রাখলাম। তিনি আমাকে শক্তভাবে ধরলেন এবং আমার হাত নাড়লেন।

সকলে মসজিদে প্রবেশ করলেন।

নামায শেষে আবু আব্দুল্লাহ্ চেয়ারে বসলেন। তাঁর ডান পাশে আহমদ, বাম পাশে ফায়েয্।

মানুষ বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাকিয়ে আছেন। তারা কোনো বোবাকে বক্তৃতার চেয়ারে বসতে দেখে অভ্যস্ত নন।

আবু আব্দুল্লাহ্ আহমদকে ইঙ্গিত করলেন। আহমদ উভয় হাত দ্বারা ইশারা করতে লাগলেন। মানুষ তাকিয়ে আছেন। কিছুই বুঝতে পারছেন না। আবু আব্দুল্লাহর দিকে ইঙ্গিত করলাম যেন তিনি আমাদের জন্য অনুবাদ করেন। কারণ আহমদের ইঙ্গিতগুলো বধির ছাড়া কারো বুঝা সম্ভব নয়, অথবা যারা বধিরদের ভাষা শিখেছেন। তখন আবু আব্দুল্লাহ্ লাউড স্পীকারের নিকটবর্তী হয়ে বললেন-

আহমদ আপনাদেরকে তাঁর হেদায়েত লাভের ঘটনা শোনাচ্ছিলেন। তিনি আপনাদেরকে বলছিলেন, আমি বধির অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেছি। জেদ্দায় লালিত পালিত হয়েছি। আমার পরিবারবর্গ আমাকে উপেক্ষা করতেন। আমার প্রতি মনোযোগ দিতেন না। আমি মানুষকে মসজিদে যেতে দেখতাম। জানতাম না, কেন?

বাবাকে বিভিন্ন সময় জায়নামায বিছিয়ে রুকূ'-সিজদা করতে দেখতাম। জানতাম না, কি করছেন।

যখন পরিবারবর্গকে কোনো বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতাম, তাঁরা আমাকে অবজ্ঞা করতেন। আমার কথার উত্তর দিতেন না।

আবু আব্দুল্লাহ চুপ হয়ে আহমদকে ইঙ্গিত করলেন। আহমদ তাঁর বক্তৃতা চালিয়ে গেলেন। তিনি হাত দ্বারা ইঙ্গিত করতে থাকলেন। তারপর তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেল। যেন তিনি প্রভাবিত।

আবু আব্দুল্লাহ মাথা নিচু করলেন। আহমদ কাঁদলেন এবং ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন। অনেক লোক প্রভাবিত হলো। কিন্তু জানেন না, আহমদ কেন কাঁদছেন।

আহমদ আবেগের সাথে তাঁর বক্তৃতা ও ইঙ্গিত অব্যাহত রাখলেন। অতঃপর থামলেন।

আবু আব্দুল্লাহ বললেন, আহমদ আপনাদেরকে তাঁর জীবনের পরিবর্তনের মুহূর্তটি তুলে ধরছিলেন। তিনি কিভাবে রাস্তার এক ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহকে চিনলেন এবং নামায জানলেন। রাস্তার লোকটি তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েছিল এবং তাঁকে শিখিয়েছিল। তিনি আপনাদেরকে অবগত করছিলেন, যখন তিনি নামায পড়া শুরু করলেন, কীভাবে আল্লাহর নৈকট্য লাভের বিষয়টি অনুভূত করলেন। কীভাবে তাঁর বধিরতা ও বোবাত্বের বিরাট সওয়াব কল্পনা করলেন এবং কীভাবে তিনি ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করলেন।

আবু আব্দুল্লাহ আমাদেরকে আহমদের অবশিষ্ট ঘটনা বর্ণনা করে চলছিলেন।

অধিকাংশ লোক এতটাই প্রভাবিত হয়েছিল যে, তাদেরকে যেন বেঁধে রাখা হয়েছে।

কিন্তু আমি ছিলাম ব্যস্ত।

একবার আহমদের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আরেকবার ফায়েযের দিকে।

মনে মনে বললাম, আহ্! আহমদ তো চোখে দেখে এবং ইঙ্গিতের ভাষা বুঝে। আবু আব্দুল্লাহ ইশারায় তাঁর সাথে ভাবের আদান-প্রদান করছেন।

কিন্তু ফায়েযের সঙ্গে কীভাবে ভাবের আদান-প্রদান করবেন? সে তো দেখে না, শোনে না এবং কথাও বলতে পারে না।

আহমদ তাঁর বক্তৃতা সমাপ্ত করলেন এবং চোখের অবশিষ্ট অশ্রু মুছতে লাগলেন।

আবু আব্দুল্লাহ ফায়েযের দিতে তাকালেন।

আমি মনে মনে বললাম, ফায়েয কী করবে?

আবু আব্দুল্লাহ নিজের আঙ্গুল দিয়ে ফায়েযের হাঁটুতে টোকা মারলেন। অমনি ফায়েয তীর গতিতে ছুটলেন এবং মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করলেন। জানো, কীভাবে তিনি বক্তৃতা করলেন?

কথার মাধ্যমে? কখনও না। কারণ, তিনি বোবা, কথা বলতে পারেন না।

ইঙ্গিতের মাধ্যমে? না। কারণ, তিনি অন্ধ, ইঙ্গিতের ভাষা জানেন না।

স্পর্শ করার মাধ্যমে বক্তৃতা করলেন। হ্যাঁ, স্পর্শ করার মাধ্যমে।

আবু আব্দুল্লাহ নিজের হাতকে ফায়েযের দু'হাতের সামনে রাখেন। ফায়েয তাঁকে নির্ধারিত কয়েকবার স্পর্শ করেন। সেসকল স্পর্শ দ্বারা আবু আব্দুল্লাহ ফায়েযের উদ্দেশ্য বুঝেন। এরপর তিনি ফায়েয থেকে কী বুঝতে পারলেন, তা আমাদেরকে বর্ণনা করে চললেন। আর তাতে কখনো পনের মিনিট লেগে যেত।

ফায়েয নিরব ও শান্ত। তিনি জানেন না, আবু আব্দুল্লাহ তাঁর বর্ণনা সমাপ্ত করেছেন কি-না। কেননা তিনি শুনেনও না, দেখেনও না।

আবু আব্দুল্লাহ তাঁর কথা শেষ করার পর ফায়েযের হাঁটুতে টোকা মারতেন। ফায়েয তাঁর দু'হাত বাড়াতেন এবং আবু আব্দুল্লাহ তাঁর হাতকে নিজের সামনে রাখতেন। ফায়েয আরো কয়েকবার তাঁকে স্পর্শ করেন।

শ্রোতারা একবার তাকাতেন ফায়েযের দিকে, আরেকবার আবু আব্দুল্লাহর দিকে।

ফায়েযের দিকে তাকিয়ে অবাক হতেন এবং আবু আব্দুল্লাহর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হতেন। ফায়েয মানুষকে তাওবার প্রতি উৎসাহিত করছিলেন।

কখনো দুই কান ধরতেন, কখনো জিহ্বাকে। আবার কখনো হাতের তালুদ্বয়কে চোখদ্বয়ের উপরে রাখতেন। আবু আব্দুল্লাহর অনুবাদ করা পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারিনি, তিনি কী বুঝাতে চেয়েছেন। অনুবাদ দ্বারা বুঝলাম, তিনি চোখ ও কানকে হারাম থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য মানুষকে উপদেশ দিচ্ছেন।

আমি মানুষের দিকে তাকাচ্ছিলাম।

কেউ চাপা গলায় বলছেন– সুবহানাল্লাহ।

কেউ তাঁর পাশের জনের সাথে ফিসফিস করে কথা বলছেন।

কেউ আগ্রহের সাথে তাঁকে পর্যবেক্ষণ করছেন।

কেউ কাঁদছেন।

আর আমি? আমি দূরে চলে গেলাম। অনেক দূরে। তাঁর ও উপস্থিত লোকদের দক্ষতা তুলনা করছিলাম এবং তাঁর ও উপস্থিত লোকদের দ্বীনের খেদমতের পরিমাণ তুলনা করছিলাম।

একজন অন্ধ, বধির ও বোবা ব্যক্তি যে পরিমাণ চিন্তা লালন করছে, সম্ভবত সেই চিন্তা তাদের সকলের চিন্তার সমান হবে।

লোকটি প্রতিবন্ধী। কিন্তু ইসলামের খেদমতের জন্য জ্বলছে।

তাঁর অনুভূতি হলো, তিনি ইসলামের একজন সৈনিক; প্রত্যেক অবাধ্য ও অবহেলাকারীর দায়িত্বশীল।

জ্বলন ও যন্ত্রণার সাথে হাত নেড়ে তিনি যেন বলছিলেন–

হে নামায ত্যাগকারী! আর কত দিন?

হে হারাম দৃষ্টি নিক্ষেপকারী! আর কতক্ষণ?

হে অশ্লীল কাজে লিপ্ত!

হে হারাম ভক্ষণকারী!

বরং হে শিরকে লিপ্ত! সকলকে বলছি– আর কতদিন?

ফায়েযের চেহারা বিবর্ণ হচ্ছিল। মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য তিনি নিজকে নিংড়াচ্ছিলেন। মানুষ অনেক প্রভাবিত হলো।

আমি তাদের দিকে তাকালাম না। তবে কান্না ও সুবহানাল্লাহর আওয়াজ শোনছিলাম।

ফায়েয তাঁর বক্তৃতা শেষ করে দাঁড়ালেন। আবু আব্দুল্লাহ তাঁর হাত ধরলেন। মানুষ তাঁকে সালাম করার জন্য ভিড় করল।

আমি দেখছিলাম, তিনি মানুষকে সালাম করছেন। লক্ষ করলাম, তিনি সকলকে এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, সকলে তাঁর নিকট সমান। তিনি পার্থক্য করছেন না রাজা ও প্রজার মাঝে, নেতা ও জনতার মাঝে এবং শাসক ও শাসিতের মাঝে।

ধনী-গরীব, জনসাধারণ ও নেতৃবর্গ সকলে তাঁকে সালাম করছেন। সকলে তাঁর কাছে সমান। আমি মনে মনে বলছিলাম, ফায়েয্! যদি কিছু স্বার্থবাদী লোক তোমার মতো হতো?

আবু আব্দুল্লাহ ফায়েযের হাত ধরে মসজিদ থেকে বের হচ্ছেন।

আমি তাঁদের পাশে হাঁটছিলাম। তাঁরা গাড়ির দিকে এগিয়ে চলছেন। আবু আব্দুল্লাহ ও ফায়েয্ মনের সুখে রসিকতা করছিলেন।

হায়, দুনিয়াটা কতো তুচ্ছ!

ফায়েয্! কত মানুষ আছে যে তোমার বিপদের এক চতুর্থাংশ দ্বারাও আক্রান্ত হয়নি এবং শঙ্কট ও দুঃচিন্তাকে জয় করতে সক্ষম হয়নি।

কিডনীর অচলতা, পক্ষাঘাত, তঞ্চিত রক্তপিণ্ড, ডায়াবেটিস ও মলমূত্র আটকে যাওয়া প্রভৃতি জটিল ও দীর্ঘমেয়াদী রোগের আক্রান্তরা কোথায়? কেন তাঁরা নিজেদের জীবন উপভোগ করছেন না এবং নিজেদের বাস্তবতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছেন না? [اِسْتَمْتِعْ بِحَيَاتِكَ কিতাবের ঘটনা শেষ হয়েছে।]

* আজকের[৭০] 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়েছে– 'নড়াইল' জেলার 'সদর' উপজেলার 'কাশিপুর' ইউনিয়নের এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দশ বছরের এক প্রতিবন্ধী মেয়ে 'প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা"য় অংশগ্রহণ করেছে। তার হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলো

---

[৭০]. ১৯. ১. ১৪৩৫ হি./১০. ৮. ১৪২০ বাং/২৪. ১১. ২০১৩ ঈ. রোববার।

খুব সরু। কোনো জিনিস নিচে পড়ে গেলে সারা শরীর নুইয়ে পায়ের সাহায্যে বাম হাত দিয়ে তার উঠাতে হয়। তার লিখতে হয় হাঁটু গেড়ে বসে বাম পায়ের সাহায্যে বাম হাত ঘুরিয়ে। পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা এ স্তরের যে, মেয়েটির জন্য একটি হুইল চেয়ার কেনার মতো সামর্থ তাদের নেই।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তার মা ও সে ইতিবাচক মানসিকতার অধিকারী। চেহারায় তার হাসির ঝিলিক থাকে। ভবিষ্যতে শিক্ষিকা হওয়া তার জীবনের স্বপ্ন। তার হস্তাক্ষর বেশ সুন্দর। লেখার লাইনগুলো সোজা। সে অতীতে প্রতি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। শারীরিক প্রতিবন্ধী হওয়া তার অগ্রযাত্রার জন্য প্রতিবন্ধক হচ্ছে না।

* গতকালের[৭১] 'দৈনিক ইনকিলাব' পত্রিকার সংবাদ, 'নওগাঁ' জেলার 'মহাদেবপুর' উপজেলার 'গাহলী' গ্রামের একটি মেয়ের দুটো হাতই অকেজো। তার লিখতে হয় পা দিয়ে। এভাবে পা দিয়ে লিখে চতুর্থ শ্রেণী পাস করে এবার সে পঞ্চম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা দিচ্ছে। তার পিতামাতা অত্যন্ত দরিদ্র। পরিবারের দরিদ্রতা ও শারীরিক এ স্তরের ত্রুটি সত্ত্বেও মেয়েটির মনোবল অটুট রয়েছে।

নারী হওয়া

ইলমী অঙ্গনে বিরাট ভূমিকা পালন করেছেন এমন নারীর সংখ্যাও ইতিহাসে কম নয়। হাফেজ ইবনে হাজার রহ. তাঁর الإصابةُ في تمييز الصحابة কিতাবে পনের শত তেতাল্লিশ জন মহিলার জীবনী উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অনেক ফকীহ, মুহাদ্দিস ও সাহিত্যিক। অনুরূপভাবে খতীব বাগদাদী রহ. তাঁর تاريخُ بغداد কিতাবে, ইমাম নববী রহ. তাঁর تهذيبُ الأسماءِ واللُّغاتِ কিতাবে, সাখাবী রহ. তাঁর الضَّوءُ اللامِعُ কিতাবে এবং طَبَقات ও تَراجِم-এর অন্যান্য কিতাবের লেখকবৃন্দ নিজ নিজ কিতাবসমূহে হাদীস, ফিকাহ, তাফসীর, সাহিত্য ও কাব্যসহ বিভিন্ন অঙ্গনের অনেক মহিলার বিস্তারিত জীবনী উল্লেখ করেছেন। প্রসিদ্ধ আরব লেখক উমর রেজা কাহ্হালা তো أَعْلامُ النِّساءِ في عالَمَيِ العَرَبِ والإسلامِ [আরব

---

[৭১]. ২৫. ১. ১৪৩৫ হি./১৬. ৮. ১৪২০ বাং/৩০. ১১. ২০১৩ ঈ. শনিবার।

মোহান ও ইসলামী দুনিয়ার বিশিষ্ট মহিলা] নামে বড় বড় পাঁচ খণ্ডের বিশাল এক গ্রন্থই রচনা করে ফেলেছেন। আমাদের হযরত হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিতে মিল্লাত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.ও 'বেহেশতী জেওর' কিতাবের অষ্টম খণ্ডে ইতিহাসের আদর্শ একশত নারীর আলোচনা করেছেন। তো নারী হওয়াও ইলমী অঙ্গনে বড় হওয়া এবং বড় বড় ইলমী খেদমত আঞ্জাম দেওয়ার জন্য প্রতিবন্ধক নয়। এখানে উদাহরণ হিসেবে মাত্র দু'জন নারীর আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।[৭২]

১. تُحْفَةُ الْفُقَهَاءِ কিতাবের লেখক হানাফী ফকীহ আল্লামা মুহাম্মদ বিন আহমদ সামারকান্দী রহ.-এর কন্যা ফাতেমা রহ. ছিলেন নিজ সময়ের অন্যতম ফেকাহ শাস্ত্রবিদ। পিতার লিখিত ফতোয়ায় পিতার সাক্ষরের পাশাপাশি তাঁর সাক্ষরও থাকত। মালিকুল উলামা আল্লামা আবু বকর কাসানী রহ. تُحْفَةُ الْفُقَهَاءِ কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থরূপে بَدَائِعُ الصَّنَائِعِ কিতাব লিখে যখন আল্লামা সামারকান্দীকে দেখান, তখন আল্লামা সামারকান্দী তাঁর এই কন্যা ফাতেমাকে আল্লামা কাসানী-এর সঙ্গে বিয়ে দেন। এর পর থেকে প্রকাশিত ফতোয়ায় তিন জনের সাক্ষর থাকত– পিতা আল্লামা সামারকান্দী, কন্যা ফাতেমা ও স্বামী আল্লামা কাসানী রহ.। পুরো تُحْفَةُ الْفُقَهَاءِ কিতাব তাঁর [ফকীহা ফাতেমা] মুখস্থ ছিল। স্বামী আল্লামা কাসানীর ভুল হলে তিনি স্বামীকে সঠিকটা বুঝিয়ে দিতেন।[৭৩]

২. ১৪৩৩ হিজরী মোতাবেক ২০১২ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকালকারী নও মুসলিম 'মারয়াম জামীলা' রহ. ছিলেন অনেক উঁচু স্তরের চিন্তাবিদ, দাঈ ও লেখিকা। দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত মাসিক আরবী সাময়িকী الدَّاعِي-এর ১৪৩৪ হিজরীর রবীউল আউয়াল সংখ্যায় আমার

---

৭২. মাসিক আরবী সাময়িকী الدَّاعِي-এর ১৪৩৫ হিজরীর রজব সংখ্যায় مِنْ أَوْجَهِ تكريمِ المَرْأَةِ في الإسلامِ حَثُّهَا على طَلَبِ العِلْمِ ودَوْرُهَا في تعليمه শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাতে ইলমী অঙ্গনে বরেণ্য অনেক নারীর আলোচনা স্থান পেয়েছে।

৭৩. «الفَوَائِدُ البَهِيَّةُ في تَرَاجِمِ الحَنَفِيَّةِ» للإمامِ عبدِ الحَيِّ اللَّكْنَوِيِّ পৃ. ২০৫ ও ৬৯

হযরাতুল উস্তাদ মাওলানা নূর আলম খলীল আমীনী দা. বা. اَلدَّاعِيَةُ وَالْكَاتِبَةُ الْمُفَكِّرَةُ الإِسْلامِيَّةُ الْمُهْتَدِيَةُ مَرْيَمُ جَمِيْلَةُ رَحِمَهَا اللهُ تعالى শিরোনামে তাঁর জীবনী লিখেছেন।

তিনি আমেরিকার নিউইয়র্ক প্রদেশের 'নিউরুশিলা' নগরীর এক ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছেন। শিক্ষাজীবনের এক পর্যায়ে ইসলামের সত্যতার ব্যাপারে আশ্বস্ত হন এবং ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন। সহজে ইসলামী জীবনযাপন করার আগ্রহে তিনি পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে পাকিস্তান চলে আসেন। আমেরিকা থেকে পাকিস্তানে বিমানে আসার মতো আর্থিক সামর্থ তাঁর ছিলনা। তাই একটি মালবাহী স্টীমারে দীর্ঘ এক মাসে তিনি পাকিস্তান পৌঁছেন। পাকিস্তানে আসার পথে মিশর ও সুদানসহ এমন অনেক দেশ অতিক্রম করেন, যেসব দেশের নৌবন্দরগুলোতে মাল উঠানো ও খালাস করার প্রয়োজনে স্টীমার থেমেছে।

পাকিস্তানে এমন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, যার পূর্ব থেকে একজন স্ত্রী ছিলেন। এই স্বামীর ঔরষে মারয়াম জামীলার দু' ছেলে ও তিন মেয়ে জন্ম হয়। মারয়াম জামীলা তাঁর সতীনের মন এমনভাবে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, উক্ত সতীন সাগ্রহে তাঁর সন্তানদের লালনপালনসহ তাঁর সকল কাজের দায়িত্ব নেন এবং তাঁকে পড়াশোনা, গবেষণা ও লেখালেখির জন্য অবসর করে দেন। [এভাবে যোগ্য লোকদেরকে যারা বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজ করার সুযোগ করে দেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন! আমীন!!] ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব এবং মানবতার ধ্বংস ও বিনাশে পশ্চিমা সভ্যতা-সংস্কৃতির মন্দ প্রভাব তুলে ধরাই হলো তাঁর রচনাবলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজি ভাষায় তাঁর লিখিত গ্রন্থাদির সংখ্যা আটত্রিশটি। হযরাতুল উস্তাদ লিখেছেন– তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা, মালয়েশিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান ও তুর্কীসহ অনেক জীবন্ত ভাষায় অনুদিত হয়েছে। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.-এর নির্দেশে তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ভারতের 'নাদওয়াতুল উলামা'-এর আন্তর্জাতিক প্রকাশনাসংস্থা اَلْمَجْمَعُ الْعِلْمِيُّ الإِسْلامِيُّ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ইউরোপের বহুল প্রচলিত অনেক পত্রিকা ও সাময়িকীতেও তাঁর গবেষণামূলক অনেক প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

* * *

মোটকথা, সাফল্য লাভের প্রাকৃতিক নিয়মগুলো অনুসরণ করলে দেখা যাবে, মেধার স্বল্পতা, শারীরিক অসুস্থতা, আর্থিক অসচ্ছলতা, আর্থিক অধিক সচ্ছলতা, পারিবারিক প্রতিকূলতা, পরিবেশের প্রতিকূলতা, বংশীয় আভিজাত্যহীনতা, ইয়াতীম হওয়া, বয়স বেশী হওয়া, জীবনের দীর্ঘ সময় বিপথে কেটে যাওয়া, এমনকি শারীরিক ত্রুটি যেমন বধিরতা বোবাত্ব ও অন্ধত্ব প্রভৃতি কোনো কিছুই বাধা নয়। সফলতার প্রাকৃতিক নিয়মাবলি অনুসরণকারীদেরকে এ ধরনের কিছুই বাধা দিয়ে রাখতে পারে না। এগুলো মূলত প্রধান সমস্যা নয়। প্রধান সমস্যা হলো নেতিবাচক মানসিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি।

তাছাড়া একটি বাস্তবতা হলো, যারা কোনো বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় না, তাদের তুলনায় যারা বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, তাদের আত্মবিশ্বাস ও কর্মক্ষমতা অনেক বেশী হয়।

তো পূর্বের কথাটা আবার বলছি– জীবনে সফল হওয়ার জন্য এই বিশ্বাস পোষণ করা জরুরি যে, আমি একজন মানুষ। সুতরাং মানুষ যা পেরেছে আমিও তা পারব ইনশাআল্লাহ। জীবনে সফল হওয়ার জন্যে সর্বপ্রথম আমাদেরকে আত্মবিশ্বাসী হতে হবে। যারা পারবে বলে বিশ্বাস করে, আল্লাহর রহমতে তারাই পারে। আত্মবিশ্বাসই যুগে যুগে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। ইতিহাসের মোড় পাল্টে দিয়েছে। যে মনে করতে পারে– পৃথিবীতে বড় কিছু করার জন্যেই আমি জন্মেছি, সে বড় কাজ করতে পারবেই ইনশাআল্লাহ।

এতক্ষণ ইতিবাচক মানসিকতা সম্পর্কে আলোচনা হলো। এখন আমরা আলোচনা করব ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে।

দৃষ্টিভঙ্গির প্রভাব

'দৃষ্টি' অর্থ দেখা, আর 'ভঙ্গি' অর্থ ধরণ। তো 'দৃষ্টিভঙ্গি' শব্দের শাব্দিক অর্থ দাঁড়ায় 'দেখার ধরণ'। বিভিন্ন সমস্যার শিকার যে সকল মনীষীর নাম এতক্ষণ উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের সমস্যাগুলো কি অবাস্তব ছিল? উপরিউক্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত এ সকল সমস্যার শিকার আর কেউ কি হন নি? অন্য যারা এ সকল সমস্যার শিকার হয়েছেন তাদের কারো জীবনেই কি সমস্যাগুলোর নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি? উত্তর

পরিষ্কার। অবশ্যই তাঁদের সমস্যাগুলো বাস্তব ছিল। তাঁদের ছাড়াও পৃথিবীতে অসংখ্য মানুষ এ সকল সমস্যার শিকার হয়েছেন। অসংখ্য মানুষের জীবনে এ জাতীয় সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এ সকল সমস্যা অনেক মানুষকে তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেছে।

প্রশ্ন করা যায়, কেন এমন পার্থক্য হয়? কেন একই সমস্যার প্রভাব দুই ব্যক্তির মধ্যে দু' রকম হয়? উত্তর হলো, দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা। একজন সমস্যাকে এক দৃষ্টিতে দেখেন। অপর জন অন্য দৃষ্টিতে দেখেন। একজন সমস্যাকে গুরুত্ব দেন। অপর জন সমস্যাকে তোয়াক্কা করেন না।

দৃষ্টিভঙ্গির প্রকারভেদ

দৃষ্টিভঙ্গি দু' প্রকার– ক্রিয়াশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল। মনে করো, দু'জন ব্যক্তির বাইরে যাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হলো। এর কারণে একজন বাইরে যাওয়া স্থগিত করল। অপরজন তার ইচ্ছার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প থাকল। ছাতার ব্যবস্থা করল এবং নিজের লক্ষ্য বাস্তবায়ন করল। প্রথমজনের দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিক্রিয়াশীল। দ্বিতীয়জনের দৃষ্টিভঙ্গি ক্রিয়াশীল।

প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির অবস্থা

প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যক্তি যখন কোনো সমস্যার শিকার হয়, তখন সে সমস্যাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। সমস্যাকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাধা মনে করে। তাই সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে যে, আমার জন্য এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তার নিয়ন্ত্রণ অন্যের হাতে চলে যায়। সে অন্যের কথায় কষ্ট পায়। অন্যের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়। অদ্রূপ অন্যের প্রশংসায় প্রতারিত হয়। যা নেই তা নিয়ে তার অভিযোগ এত সোচ্চার থাকে যে, যা আছে তার দিকে নজর দেয়ার ফুরসত থাকে না। তাই সে মনে করে, গ্লাস অর্ধেক খালি। অথচ এটাও তো মনে করার সুযোগ ছিল যে, গ্লাসে অর্ধেক পানি আছে।

ক্রিয়াশীল ব্যক্তি কেন সফল হয়?

পক্ষান্তরে ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ব্যক্তি থাকে নিজের লক্ষ্য অর্জন করার ব্যাপারে দৃঢ়সংকল্প। কারো নিন্দায় কষ্ট নেয় না। কারো প্রশংসায় প্রতারিত হয় না। অর্থাৎ অন্যের কোনো আচরণ বা উচ্চারণের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কোনো কাজ করে না। সবসময় ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে পদক্ষেপ

গ্রহণ করে। সর্বাবস্থায় নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুকূল আচরণ করে। কী কী নেই তা নিয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে যা আছে তা নিয়েই পরিকল্পিতভাবে কাজ করতে থাকে। তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত থাকে, যেভাবেই হোক লক্ষ্য আমার অর্জন করতেই হবে। লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যেকোনো বিসর্জন দেয়ার জন্য সে সর্বদা প্রস্তুত থাকে। সে যখন কোনো সমস্যাব শিকার হয়, তখন সমস্যাকে তোয়াক্কা করে না। সমস্যাকে লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাধা মনে না। যেহেতু লক্ষ্যের ব্যাপারে থাকে পূর্ণ আন্তরিক ও নিবেদিত এবং এর জন্য যেকোনো বিসর্জন দেয়ার জন্য থাকে সদা প্রস্তুত, তাই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে এক সময় হয়তো সমস্যাই দূর হয়ে যায়। আর সমস্যা দূর না হলেও তা তার লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা থাকে না। প্রবাদ আছে– ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। বস্তুত, ঐকান্তিকতা ও অধ্যাবসায় ব্যক্তির জন্য সাফল্য ছিনিয়ে আনে। আল্লাহর ইচ্ছায় ঐকান্তিক ও অধ্যাবসায়ী ব্যক্তির লক্ষ্য অর্জন হয়েই যায়। পূর্বের উদাহরণগুলো এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

'সর্বাবস্থায় নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের অনুকূল আচরণ করে' প্রসঙ্গে 'আপবীতি' কিতাব থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখেছেন, জজ আকবর হোসাইন বড় সুন্দর বলেছেন, লোকেরা যুগের দোষ দেয় যে, ভাই! কী করব, সময়টাই যে পাল্টে গেছে। কিন্তু আসল কথা হলো, তোমাদের পরিবর্তনই যুগের পরিবর্তন। যুগ ভিন্ন কোনো জিনিস নয়। তুমি নিজেই যুগ। প্রকৃত সত্য এটাই। যুগের বাস্তবতা তো আমরা নিজেরাই। যদি আমরা পরিবর্তন না হই, তাহলে যুগও পরিবর্তন হবে না।

তাবলীগের ক্ষেত্রে আমার চাচা হযরত ইলয়াস রহ.-এরও এই নীতি ছিল। তিনি বলতেন, তোমরা পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতার অধীন হইও না। পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতাকে নিজের অধীন বানাও। তোমরা বেদ্বীন ও দুনিয়াদারদের মতো চলো না। নিজের রীতি-নীতির উপর অবিচল থাক। পরিবেশ এমনিতেই বদলে যাবে। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লক্ষ করে বলেছেন– لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ[৭৪]

---

৭৪. সূরা হিজ্‌র, আয়াত নং ৮৮

অর্থ. তুমি কখনো চোখ তুলেও সেদিকে দৃষ্টি দিবে না যা আমি তাদের [কাফেরদের] বিভিন্ন শ্রেণীকে উপভোগের জন্য দিয়ে রেখেছি।[৭৫]

'লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যেকোনো বিসর্জন দেয়ার জন্য সে সর্বদা প্রস্তুত থাকে' প্রসঙ্গে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। তিনি লিখেছেন– আব্বাজানের ইন্তেকালের দ্বিতীয় দিনই আমার বয়সস্বল্পতা, আব্বার ঋণের বোঝা, কুতুবখানার বেচা-বিক্রি বন্ধ হয়ে যাওয়া, মরহুমা আম্মাজান ও বোনের দেখাশোনা ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি লক্ষ করে তিনি [হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ.] আমাকে বলেছিলেন, এগুলো খুবই চিন্তার বিষয়, তুমি এখনো ছোট, ব্যবসা সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই। মাওলানা আশেক এলাহী মিরাঠীর ভাল অভিজ্ঞতা আছে। তাই তুমি তোমাদের কুতুবখানা মিরাঠে স্থারান্তরিত করো এবং মাওলানা আশেক এলাহী সাহেবের তত্ত্বাবধানে ব্যবসা করো। তাহলে ঋণও দ্রুত পরিশোধ হয়ে যাবে এবং সংশ্লিষ্টদের প্রতি কর্তব্যও পালন করতে সক্ষম হবে।

হযরত গভীর মমতাপূর্ণ ও স্নেহসিক্ত ভাষায় দীর্ঘক্ষণ লাগিয়ে বিষয়টি আমাকে বুঝিয়েছেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, তখন আমার পায়ের নিচে মাটি ছিল না। আমি চোখে মুখে অন্ধকার দেখছিলাম। আমি বিনীত ভাষায় আরজ করলাম, হযরত! যদি এটা আপনার নির্দেশ হয় তাহলে সর্বান্তকরণে মেনে নিচ্ছি। আর যদি পরামর্শ হয় তাহলে আমার ইচ্ছা যে, হযরত সাহারানপুরী তো ইনশাআল্লাহ কিছুদিনের মধ্যেই চলে আসছেন। [হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ. তখন নৈনিতাল জেলে বন্দী ছিলেন। পুরো ঘটনা تذكرة الخليل কিতাবে আছে।] আমার ইচ্ছা হযরত সাহারানপুরীর জীবদ্দশায় আমি অন্য কোথাও যাব না।

হযরত আকদাস রায়পুরী আমার উত্তর শুনে বললেন, ব্যস, ব্যস। তারপর অত্যন্ত আনন্দ ও ইখলাসের সাথে এ পরিমাণ দু'আ দিলেন যে, আজও সেই দু'আগুলোর স্মরণ আমার জন্য অত্যন্ত সুখকর। সেগুলোর বরকত আমি সবসময় অনুভব করি। এরপর তিনি বললেন, আমারও এটাই ইচ্ছা ছিল। কিন্তু মাওলানা আশেক এলাহী সাহেব আমাকে খুব জোর দিয়ে বললেন যে, যাকারিয়া তো আমার কথা শোনে না। আপনি তাকে নির্দেশ

---

[৭৫]. 'আপবীতি' ২ ঃ ৫৬ - ৫৭

দিন যাতে সে কুতুবখানা মিরাঠে স্থানান্তরিত করে। অবশ্য তিনি যে কারণ দেখেয়িছেলেন তা বাস্তব ছিল। এ জন্য আমি তোমাকে এ পরামর্শ দিয়েছি।

আল্লাহ মাফ করুন, হযরতের এ উত্তর শোনে মাওলানা আশেক এলাহী মিরাঠীর উপর আমি সীমাহীন রাগান্বিত হয়েছিলাম। যদিও মাওলানা মিরাঠী স্নেহবশত ঐ কথা বলেছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিহীনতার কারণে আমার দেহ-মনে তখন আগুন ধরে গিয়েছিল। অবশ্য পরে আমি মাওলানার স্নেহের যথার্থ মূল্যায়ন করেছি। যদি ঐ সময় ভুলবশত কোনো অভদ্রসূচক বা বেআদবীমূলক শব্দ মুখ থেকে বের হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ মাফ করুন! আল্লাহ তা'আলা মাওলানাকে এর বিনিময়ে উত্তম প্রতিদান দিন![৭৬]

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. [১৩৩৩ - ১৪২০ হি.]-এর *دعوت وعزیمت* কিতাবটি সকলে অবশ্যই অধ্যয়ন করবে। এর বাংলা অনুবাদ বের হয়েছে 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' নামে। কিতাবটি অধ্যয়ন করলে তোমরা প্রত্যক্ষ করবে, যুগে যুগে উম্মাহর সংস্কার ও পুনর্জাগরণে যেসকল মনীষী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন, তাঁরা সকলে ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন। জীবনে তাঁরা যেসমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন, সেগুলোর কারণে তাঁরা হতাশ হননি। তাঁরা সেগুলোর প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করেননি। অতএব আমাদের সকলকে ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে হবে।

ক্রিয়াশীল শিক্ষার্থীদের কয়েকটি গুণ

যেসকল শিক্ষার্থী ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে, যাদের দ্বারা অন্যরা প্রভাবিত হয়, তারা চরিত্রে অভিজাত, কথায় সত্যবাদী এবং দুর্বলদের প্রতি কল্যাণকামী হয়। তারা মিশুকপ্রকৃতির হয়।[৭৭] তারা নিজেদের কাজ-কর্মে দায়িত্ববান

---

[৭৬]. 'আপবীতি' ১ ঃ ১৯ - ২০

[৭৭]. তবে যাদের প্রতি মনের অবৈধ আকর্ষণ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা আছে, নিজকে 'মিশুক প্রকৃতি'র ও ক্রিয়াশীল সাব্যস্ত করার জন্য তাদের সঙ্গে আবার মিশতে যেয়ো না। আল্লাহ পানাহ! ৪৭৪ নং পৃষ্ঠায় যে তিন ধরনের পলায়নের কথা বলা হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে নিজের জন্য উক্ত তিন ধরনের পলায়নকেই আবশ্যক করে নিবে। নিজের ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করো এবং কোনো মুসলিহ

থাকে। সময়ের সদ্ব্যবহার করে। নিয়মিত ব্যায়াম করে। তাদের বসা ও দাঁড়ানোর ভঙ্গিও প্রত্যয়দৃপ্ত হয়। তাদের আচরণে একইসঙ্গে আত্মপ্রত্যয় ও বিনয় প্রকাশ পায়। তারা নিয়মিত দাঁত, চুল, নখ ও ত্বকের যত্ন নেয়। নাকের ছিদ্রপথে ময়লা লেগে আছে কি-না, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকে। কখনও লুঙ্গি পড়লে লুঙ্গির নীচের অংশ সমান আছে কি-না, সে ব্যাপারে সচেতন থাকে। তাদের জামা-কাপড় পরিষ্কার থাকে। তারা দরসের কিতাবসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পাশাপাশি, নিজেদের তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় আধুনিক প্রযুক্তি সম্পর্কেও জ্ঞানার্জন করে।

---

৪৬ নং পৃষ্ঠার স্থানসমূহের পরিচিতি

দামেস্ক ঃ 'দামেস্ক' সিরিয়ার রাজধানী। তদুপরি পৃথিবীর সু-প্রাচীন নগরী হিসেবেও পরিচিত। নগরীটি উমাইয়া শাসনামলে [৪০ - ১৩২ হি. / ৬৬১ - ৭৫০ ঈ.] মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এ নগরীর জামে মসজিদের মিনারায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কিয়ামতের পূর্বে আকাশ থেকে অবতরণ করবেন।

ফুস্‌তাত্ ঃ ফুস্‌তাত্ মিসরের নীল নদের পূর্বপার্শ্বে ব্যাবিলনের (بَابِـل) নিকটে অবস্থিত একটি শহর। হযরত আম্‌র ইবনুল আস্ রা. মিসর বিজয়ের পর সেখান থেকে রোমকদের বিতাড়িত করে ২১ হিজরী মোতাবেক ৬৪২ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বাহিনীর জন্য একটি সেনানিবাস প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এর নামকরণ করেন ফুস্‌তাত্। এটি বসরা ও কুফার পর মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় শহর।

কায়রো ঃ কায়রো মিসরের রাজধানী। ৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ফাতেমী সেনাপতি জাওহার আসসিকিল্লী (جَوْهَرُ الصَّـقِلِّيُّ) মিসর বিজয়ের পর এই শহর নির্মাণ করেন। বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় 'জামে আযহার' এ শহরেই অবস্থিত।

ও মুযাক্কীর তত্ত্বাবধান গ্রহণ করো। আল্লাহ আমাকেও তাওফীক দান করুন, তোমাকেও তাওফীক দিন। আমীন!

আলকায়রাওয়ান ঃ আফ্রিকা মহাদেশের তিউনিসিয়া দেশের একটি শহর। হযরত উমর রা.-এর শাসনামলে সেনাপতি উক্‌বা ইবনে নাফে' আফ্রিকা বিজয়ের পর ৫০ হিজরী মোতাবেক ৬৭০ খ্রিস্টাব্দে শহরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

'ফেষ' ঃ মরক্কোর (المَغْرِبُ) একটি শহর। 'ফেয' শহরটি এক সময় মরক্কোর রাজধানী ছিল।

কর্ডোভা ঃ স্পেনের একটি প্রাচীনতম নগরী। মুসলিম স্পেনের রাজধানী। ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান সম্রাট ফার্ডিন্যান্ড ও রানী ইসাবেলার ষড়যন্ত্রে শহরটির পতন ঘটে।

সেভিয়া ঃ বাংলায় 'সেভিয়া' বলা হয়। ইংরেজিতে বলা হয় 'সেভিলা'। ইংরেজির অনুকরণে বাংলায়ও কেউ কেউ 'সেভিলা' লিখেন। এটি স্পেনের একটি শহর। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে আরবদের হাতে শহরটি বিজিত হয়। ১২৪৮ খ্রিস্টাব্দে রাজা ফার্ডিন্যান্ড ও রাণী ইসাবেলার ষড়যন্ত্রে শহরটির পতন ঘটে।

বাগদাদ ঃ বাগদাদ ইরাকের রাজধানী। ৭৬২ খ্রিস্টাব্দে আব্বাসী খালীফা মনসূর শহরটি নির্মাণ করেন।

জুরজান ঃ কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বে অবস্থিত ইরানের একটি শহর।

ইস্পাহান ঃ মধ্য ইরানে অবস্থিত একটি শহর। তেহরান ও সীরাজের মধ্যস্থলে শহরটির অবস্থান।

সীরাজ ঃ পশ্চিম ইরানে অবস্থিত একটি শহর। শেখ সা'দী ও হাফিজ কবিদ্বয় এ শহরের অধিবাসী ছিলেন।

সমরকন্দ ঃ আধুনিক উজবেকিস্তানের একটি শহর। ১২২০ খ্রিস্টাব্দে চেঙ্গিস খাঁ শহরটি ধ্বংস করে।

বুখারা ঃ বুখারাও আধুনিক উজবেকিস্তানের একটি শহর। ইমাম বুখারী রহ.সহ শত শত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের জন্মস্থান।

তৃতীয় অধ্যায়

সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য

সফলতার প্রধান ভিত্তি

জীবনে সফল হওয়ার প্রধান ভিত্তি দু'টি– ১. ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি, ২. সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য। আল্লাহর তাওফীকে এতক্ষণ প্রথম ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করলাম। এখন দ্বিতীয় ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা

মনে করো এক ব্যক্তি কোনো গন্তব্যস্থল নির্ধারণ না করেই শুধু হাঁটছে। সে সারাদিন হাঁটলেও কি কোনো গন্তব্যস্থলে পৌঁছবে? কিছুতেই না। কারণ, তার যে কোনো গন্তব্যস্থল নেই। অন্য একজন উদাহরণস্বরূপ তার এক উস্তাদের নিকট যাবে। সে তার উস্তাদ থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের দূরত্বে অবস্থান করে। তো সে মাত্র পাঁচ মিনিট হাঁটলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।

কেন? একজন সারাদিন হেঁটেও কেন কোনো গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবে না? অপরজন মাত্র পাঁচ মিনিট হেঁটে কেন একটি গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে? একি আশ্চর্যের বিষয় নয়?

না, এতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। বরং এমন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ, সারাদিন হাঁটলেও প্রথমজনের কোনো লক্ষ্য ছিল না। পক্ষান্তরে মাত্র পাঁচ মিনিট হাঁটলেও দ্বিতীয়জনের একটি লক্ষ্য ছিল। তাই সারাদিন হেঁটেও প্রথমজন বিফল। আর মাত্র পাঁচ মিনিট হেঁটেও দ্বিতীয়জন সফল।

দুঃখের সাথে বলতে হয়, অনেক শিক্ষার্থী কমবেশী লেখাপড়া করে। কিন্তু তাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, বেটা!/বেটি! তোমার জীবনের লক্ষ্য কী? তুমি জীবনে কী হতে চাও? সে হতভম্ব হয়ে যায়। যেন একটি অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন করা হলো। এ প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার জন্য সে আদৌ যেন প্রস্তুত ছিল না। উত্তরে সুনির্দিষ্টভাবে কিছুই বলতে পারে না। লেখাপড়া কমবেশী করে যাচ্ছে। পরীক্ষায়ও মোটামুটি নম্বর পাচ্ছে। এক শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে অন্য শ্রেণিতে প্রবেশ করছে। এভাবে একসময়

লেখাপড়ার নির্দিষ্ট সিলেবাস সমাপ্ত করছে। তারপর পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হিসেবে কোনো কাজে লেগে যাচ্ছে। গোছানো কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই। সামনে যা আসছে, সুযোগ অনুযায়ী তা-ই করে যাচ্ছে। চলছে আর চলছে, কী হচ্ছে আর কী হচ্ছে না, কতটুকু করার নিজের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভা ছিল, আর বাস্তবে কতটুকু করছে, তা নিয়ে চিন্তা করার যেন কোনো প্রয়োজনও নেই এবং সুযোগও নেই। এক ধরনের আয়েশী ও বিলাশী জীবনযাপন। আল্লাহপ্রদত্ত সুপ্ত প্রতিভাগুলোর অবমূল্যয়ন করছে। নিজের সম্ভাবনাগুলো দ্বারা নিজেও উপকৃত হচ্ছে না, দেশ ও জাতিরও তার দ্বারা কোনো উপকার হচ্ছে না।

তো বেটা! জীবনে কিছু হতে হলে আগে প্রথমে তোমাকে নির্দিষ্ট করতে হবে– তুমি কী হবে। তখন তোমার মধ্যে তেমন হওয়ার জন্য প্রেরণা জাগবে। বিশ্বাস করো, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে বিস্ময়কর অনেক সুপ্ত প্রতিভা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। পূর্বের মানুষেরা বড় বড় যত কাজ করেছেন সেসকল কাজ করার মতো সুপ্ত প্রতিভা তোমার মধ্যে আছে। আল্লাহর উপর ভরসা করে তুমি নিজের জন্য যে লক্ষ্যই স্থির কর, সফলতার প্রাকৃতিক নিয়মাবলি অনুসরণ করলে অবশ্যই তুমি উক্ত লক্ষ্যে উন্নীত হতে পারবে ইনশাআল্লাহ। পূর্বের আলোচনায় তুমি দেখেছ, ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে পারলে লক্ষ্য বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যাই প্রতিবন্ধক হয় না। যদি ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হও, তারপর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ কর -তা যতো উচ্চাভিলাষীই হোক-, অতঃপর যদি সফলতার প্রাকৃতিক নিয়মগুলো অনুকরণ কর, তাহলে পূর্বেকার মনীষীদের মতো তুমিও সফল হবে নিঃসন্দেহে। তোমার লক্ষ্যগুলোও বাস্তবায়িত হবে ইনশাআল্লাহ।

লক্ষ্য হতে হবে উচ্চাভিলাষী

এতক্ষণের আলোচনায় তুমি লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পেরেছ। আশাকরি একথাও বুঝতে পেরেছ যে, লক্ষ্য হতে হবে উচ্চাভিলাষী।

দেখো, দুনিয়াতে অসংখ্য মানুষ ছিলেন যাদের মধ্যে জীবনে অনেক বড় হওয়ার এবং অনেক বড় বড় কাজ করার সুপ্ত প্রতিভা ছিল। বাস্তবে যারা অনেক বড় হয়েছেন এবং অনেক বড় বড় কাজ করেছেন, তাঁদের তুলনায়

তাদের সুযোগ-সুবিধা কম ছিল না। বস্তুত যে কয়টি মৌলিক ভিত্তির অভাব ছিল, সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল– তাদের উচ্চাভিলাষী কোনো লক্ষ্য না থাকা। ফলে অনেক বড় হওয়ার এবং অনেক বড় বড় কাজ করার তাদের সুপ্ত প্রতিভাগুলো বিকাশ লাভ করেনি।

উচ্চাভিলাষের সংজ্ঞা

আলামা জাহিয রহ. [১৫৭? - ২৫৫ হি.] তাঁর تَهْذِيْبُ الأَخْلاقِ কিতাবে উচ্চাভিলাষের (عُلُوُّ الْهِمَّةِ) সংজ্ঞা দিয়েছেন এই ভাষায়–

هُوَ اسْتِصْغَارُ مَا دُوْنَ النِّهَايَةِ مِنْ مَعَالِيْ الأُمُوْرِ، وَطَلَبُ الْمَرَاتِبِ السَّامِيَةِ، وَاسْتِحْقَارُ مَا يَجُوْدُ بِهِ الإِنْسَانُ عِنْدَ الْعَطِيَّةِ، وَالاِسْتِخْفَافُ بِأَوْسَطِ الأُمُوْرِ، وَطَلَبُ الْغَايَاتِ، وَالتَّهَاوُنُ بِمَا يَمْلِكُهُ، وَبَذْلُ مَا يُمْكِنُ لِمَنْ يَسْأَلُهُ مِنْ غَيْرِ امْتِنَانٍ وَلاَ اعْتِدَادٍ بِهِ.

অর্থ. উচ্চাভিলাষ হলো সুউচ্চ বিষয়াদির চূড়ান্ত স্তরে পৌছার পূর্ববর্তী স্তরগুলোকে হেয় জ্ঞান করা, উন্নত স্তরসমূহ অন্বেষণ করা, দান-দক্ষিণা করার সময় নিজের বিসর্জন দেয়া সব কিছুকে অবজ্ঞা করা, মাঝারি পর্যায়ের কাজসমূহকে গুরুত্বহীন মনে করা, শেষ সীমা সন্ধান করা, নিজের প্রাপ্তির পরিমাণকে তুচ্ছজ্ঞান করা এবং অনুগ্রহ প্রদর্শন না করে ও হিসেবে না ধরে প্রার্থীকে যতটুকু সম্ভব দান করা।

উচ্চাভিলাষের কিছু ঘটনা

আমাদের পূর্বসূরী মনীষীগণ উচ্চাভিলাষী ছিলেন। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষ ছিল তাঁদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ইলম অর্জন, রচনা ও সাংবাদিকতা, তাকওয়া, ইবাদত, সত্যানুসন্ধান, আল্লাহর পথে জিহাদ, সেবা, বিনয় প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই তাঁরা ছিলেন উচ্চাভিলাষী।

ইলমের পথে পূর্বসূরীদের উচ্চাভিলাষ

১. মহান তাবেয়ী ইমাম শা'বী রহ. [১৯ - ১০৩ হি.] মাত্র তিনটি হাদীস যা তাঁর জানা ছিল, সেগুলো সরাসরি কোনো সাহাবীর মুখ থেকে শোনার জন্য ইরাকের কূফা নগরী থেকে সুদূর মক্কায় সফর করেছেন।

২. প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস বাকী বিন মাখলাদ রহ. [২০১ - ২৭৬ হি.] ইলম অন্বেষণে সুদূর স্পেন থেকে প্রাচ্যের মিশর, সিরিয়া, হিজাজ ও বাগদাদে দু'বার **পায়ে হেঁটে** সফর করেছেন। প্রথম বারের সফর ছিল চৌদ্দ বছর ব্যাপী। আর দ্বিতীয় বারের সফর ছিল বিশ বছর ব্যাপী।

৩. হাফেজ ইবনে মানদাহ্ রহ. [৩১০ - ৩৯৫ হি.] হাদীসের উদ্দেশ্যে সফর শুরু করেছেন বিশ বছর বয়সে। নিজ দেশে ফিরেছেন পঁয়ষট্টি বছর বয়সে। এভাবে জীবনের সুদীর্ঘ পয়তাল্লিশ বছর ইলম অন্বেষণে সফরে কাটিয়েছেন। তারপর বিয়ে করেছেন। তিনি ১৭০০ জন উস্তাদ থেকে হাদীস সংগ্রহ করেছেন।

৪. ইরান ও আরমিনিয়ার মধ্যবর্তী দেশ আযারবাইযানের প্রসিদ্ধ শহর তিবরীযের অধিবাসী খতীব আবু যাকারিয়া তিবরীযী রহ. [৪৬১ - ৫০২ হি.] আবু মনসূর আযহারী রহ.-এর লিখিত التهذيبُ في اللغة কিতাবের একটি কপি পেলেন। তখন তাঁর ইচ্ছা হলো কিতাবটি কোনো আরবী ভাষাবিদের কাছে পড়বেন। তিনি প্রসিদ্ধ আরবী ভাষাবিদ আবুল আ'লা মা'আররীর কথা জানতে পারলেন। আবুল আ'লা মা'আররী ছিলেন সিরিয়ার অধিবাসী। খতীব তিবরীযির এ পরিমাণ আর্থিক সামর্থ ছিলো না যে, কোনো বাহন ভাড়া করবেন। ফলে কিতাবের কপিটি একটি ব্যাগে ভরে পিঠে নিয়ে **পায়ে হেঁটেই** রওয়ানা করলেন। গরমে এতো ঘর্মাক্ত হয়েছিলেন যে, পিঠের ঘামে ব্যাগ ভিজে কিতাব পর্যন্ত ভিজে গিয়েছিল। কিতাবের সেই কপিটি এখনও খতীব তিবরীযির ঘামের চিহ্নসহ বাগদাদের একটি গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে।[৭৮]

৫. আমাদের দেশের 'সত্যের সূর্য' হযরত শামসুল হক ফরীদপুরী রহ.-এর ঘটনা পূর্বে[৭৯] উল্লেখ করা হয়েছে, নিজের ও ছোট ভাইয়ের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য প্রতিদিন তাঁকে চার জায়গায় টিউশনি করতে হতো। তারপর চার জায়গায় মাদরাসার কিতাবাদি প্রাইভেট পড়তেন। এর জন্য তাঁকে প্রতিদিন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল **হাঁটতে** হতো। সাধারণত পঞ্চাশ মাইলের কম হলে তিনি **পায়ে হেঁটেই** গমন করতেন।

---

[৭৮]. صَفَحَاتٌ مِنْ صَبْرِ العُلَمَاءِ على شَدَائِدِ العلمِ والتحصيلِ পৃ. ৫০, ৬০, ৬৪, ৬৯

[৭৯]. ৬১ - ৬৪ নং পৃষ্ঠায়।

অধ্যয়ন ও গবেষণায় তাঁদের উচ্চাভিলাষ

১. আল্লামা আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী [মৃ. ৯৭৩ হি.] রহ. ছিলেন হিজরী দশম শতাব্দীর একজন সুপ্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ফকীহ ও সূফী। এখানে আমরা অধ্যয়ন ও গবেষণায় তাঁর উচ্চাভিলাষের বিবরণ তুলে ধরব। তাঁর লিখিত الميزان الكبرى কিতাবের ভূমিকায়[৮০] তিনি নিজেই এক প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করেছেন।

তিনি তাঁর অধ্যয়নকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন–

প্রথম প্রকার ঃ যেসকল কিতাব তিনি আদ্যোপান্ত মুখস্থ করেছেন এবং বড় বড় আলেমদেরকে শুনিয়েছেন। সেগুলো হলো–

١. المِنْهَاجُ للنوويِّ

٢. كتابُ الروض لابن المقري

٣. مختصَرُ الرَّوْضَة (إلى باب القضاء على الغائب)

٤. جَمْعُ الجوامع في أصول الفقه والدين لتقيِّ الدين السُّبْكِيِّ

٥. أَلْفِيَّةُ ابْنِ مالك في النحو

٦. تلخيص المِفْتَاح في المعاني والبيان لجلال الدين القَزْوِينيِّ

٧. أَلفيَّةُ العِرَاقِيِّ في علم الحديث

٨. التوضيح في النحو لابن هشام

٩. كتاب الشاطِبِيَّةِ في علم القراءات

এগুলো ছাড়াও আরও অনেক মতন।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ যেসকল কিতাব তিনি বড় বড় আলেমদের নিকট পড়েছেন। সেগুলো হলো–

١. شَرْح المِنْهَاجِ للشيخ جلال الدين المَحَلِّيِّ مع تصحيح ابن قاضي عجلون.

কিতাবটি তিনি ঐ সকল ব্যাখ্যাগ্রন্থসহ দশ বার পাঠ করেছেন যেগুলো

---

৮০. পৃ. ৯১ - ৯৫

তখন মিশরে পাওয়া যেত।

٢. شَرْح الروض لشيخ الإسلام زكريا
٣. شَرْح المنهاج له أيضا
٤. شرح البَهْجَة الكبير
٥. شرح التحرير
٦. شرح التنقيح
٧. شرح رسالة القُشَيْرِيِّ
٨. شرح آداب البحث وآداب القضاء
٩. شرح البخاريّ للمؤلِّف
١٠. شرح البخاريّ للشيخ شمس الدين الجوجريّ
١١. كتاب القوت للأذرعيّ
١٢. القطعة والتكملة للزَّرْكَشِيِّ
١٣. قطعة السُّبْكِيِّ على المنهاج
١٤. كتاب التوشيح لولده
١٥. شرح ابن الْمُلَقِّن على المنهاج والتنبيه
١٦. شرح ابن قاضي شهبة الكبير والصغير

উপরিউক্ত কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করার পর তিনি লিখেছেন- شَرْحُ الـرَّوْض। কিতাবটি আমি শায়খ শিহাবুদ্দীন রাম্‌লীর নিকটও পড়েছি। আমি কিতাবটির প্রত্যেক পাঠের সঙ্গে شرحُ الـرَّوْض، الخـادم، المُهِمَّـات، شرح المهذب। প্রভৃতি কিতাবের زَوَائد লিখতাম। শায়খ আমার এ সকল কিতাবের অধ্যয়নের দ্রুততা দেখে অবাক হয়ে বলতেন- তুমি যদি কিতাবগুলোর زوائـد না লিখে রাখতে, তাহলে এসকল কিতাবের কোনো একটি কিতাব তুমি অধ্যয়ন করেছ, তা আমার বিশ্বাস হতো না।

তিনি আরও লিখেছেন, আমি যখন شرح الـروض কিতাবটি তার লেখক

শায়খুল ইসলাম যাকারিয়ার নিকট পড়ি, তখন আমি তার সঙ্গে কিতাবটির ঐ সকল উৎসগ্রন্থও অধ্যয়ন করতাম, যেগুলো অধ্যয়ন করা তখন আমার জন্য সহজ ছিল। এবং সেসকল উৎসগ্রন্থের আলোকে কিতাবের সবগুলো ইবারত যাচাই বাচাই করতাম। ফলে কিতাবটি রচনায় লেখক যেসকল উৎসগ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন আমি সেগুলোর ব্যাপারে পূর্ণ অবগতি লাভ করলাম। যথা- المُهِمَّات، الخَادِم، شرحُ المُهَذَّب، القطعةُ والتكملة، شرح ابن قاضي شهبة، الرَّافِعِيّ الكبير، البَسِيط، الوَسِيط، الوجيز، فَتَاوَى القَفَّالِ، فتاوى القاضي حسين، فتاوى لبن الصلاح، فتاوى الغزَّالي প্রভৃতি উৎসগ্রন্থ থেকে বর্ণনার সময় যেসকল ইবারতের কিছু ছুটে গেছে, আমি শায়খকে তা অবগত করতাম।

আমি শায়খকে এমন বারটি মাসআলা অবগত করেছি, যেগুলো সম্পর্কে শায়খ লিখেছেন- এগুলো الروض-এর মধ্যে অতিরিক্ত আছে, কিন্তু الروضة-এর মধ্যে নেই। অথচ এগুলো الروضة-এর মধ্যে উল্লেখ আছে। তবে যেসকল অধ্যায়ে থাকা স্বাভাবিক ছিল সেগুলো ছাড়া অন্যান্য অধ্যায়ে রয়েছে। তখন শায়খ সেগুলোকে তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে যুক্ত করেছেন। [উল্লেখ্য, الروض কিতাবটি الروضة কিতাবের সংক্ষিপ্ত রূপ।]

অনুরূপভাবে আমি শায়খকে এমন অনেক স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছি যেগুলো সম্পর্কে শায়খ লিখেছেন- এগুলো الخادم কিতাবে যারকাশী ও অন্যান্যদের আলোচনা। অথচ সেগুলো 'আসহাব'-এর বক্তব্য। তখন শায়খ তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থের সেসকল স্থান সংশোধন করেছেন।

١٧. شرح أَلْفِيَّة ابن مالك لابن المصنِّف

١٨. شرح أَلْفِيَّة ابن مالك للأعمى

١٩. شرح أَلْفِيَّة ابن مالك للبصير

٢٠. شرح أَلْفِيَّة ابن مالك لابن أم قاسم

٢١. شرح أَلْفِيَّة ابن مالك للمكوديّ

٢٢. شرح أَلْفِيَّة ابن مالك لابن عَقِيل

٢٣. شرح أَلْفِيَّة ابن مالك للأشمونيّ

أَلْفِيَّة ابن مالك-এর উল্লেখিত ব্যাখ্যাগ্রন্থগুলো তিনি শায়খ শিহাবুদ্দীন হুসামী ও অন্যান্যদের নিকট কয়েকবার পড়েছেন।

٢٤. شرح التوضيح للشيخ خالد

٢٥. كتاب المُغْنِي وحواشيه

٢٦. شرح أَلْفِيَّة الحديث للعراقيّ

٢٧. شرح أَلْفِيَّة الحديث للسخاويّ

তিনি আলোচ্যমান শরাহ্‌টির একটি সংক্ষিপ্ত রূপও তৈরি করেছেন।

٢٨. شرح أَلْفِيَّة الحديث للجلال السيوطيّ

٢٩. شرح أَلْفِيَّة الحديث للشيخ زكريا

٣٠. علوم الحديث لابن الصلاح

٣١. التقريب للنوويّ

٣٢. شرح جمع الجوامع للشيخ جلال الدين المحليّ

٣٣. حاشية شرح جمع الجوامع لابن أبي الشريف

তিনি যখন ভুলে شرحُ جَمْع الجَوَامع ও তার হাশিয়ার নুস্‌খা [কপি] বাড়িতে রেখে আসতেন, তখন কিতাবদু'টি তিনি উস্তাদকে মুখস্থ পড়ে শোনাতেন। উস্তাদ তাঁর মুখস্থ করার দ্রুততা ও অধ্যয়নের সৌন্দর্য দেখে অবাক হতেন।

٣٤. العقائد العضديَّة للقاضي عضد الدين وحواشيه

٣٥. المطوَّل لسعد الدين التفتازانيّ

٣٦. مختصَر المعاني له أيضا وحواشيه

٣٧. شرح الشاطبيَّة للسخاويّ

٣٨. شرح الشاطبيَّة لابن القاصح وغيرهما

٣٩. مَعالم التنزيل للبغويّ

٤٠. الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشريّ وحواشيه

٤١. أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف ب«تفسير البيضاوي»

٤٢. حاشية تفسير البيضاويّ للشيخ جلال الدين السيوطيّ

তিনি উপরিউক্ত কিতাব তিনটি উস্তাদের কাছে পাঠকালে অনেক কিতাব অধ্যয়ন করতেন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো–

أ. تفسير ابن زهرة

ب. تفسير ابن عادل

ج. تفسير الكواشيّ

د. البَسيط في التفسير للواحديّ

ه. الوَسيط في التفسير له أيضا

و. الوَجيز في التفسير له أيضا

ز، ح، ط. تفاسير الشيخ عبد العزيز الدَّيْرِينيّ الثلاثة

ي. الكشف والبيان في تفسير القرآن المعروف ب«تفسير الثعالبيّ»

ك. الدُّرُّ المنثورُ في التفسير المأثور للجلال السيوطيّ

٤٣. إرشاد الساري على صحيح البخاريّ للشيخ شهاب الدين القسطلّانيّ

তিনি আলোচ্যমান কিতাবটি উস্তাদের কাছে পাঠকালে সহীহ বুখারীতে উল্লেখিত আয়াতসমূহ সম্পর্কে মুফাস্‌সিরগণের বক্তব্য জানার জন্য 'তাফসীরে ইবনে কাছীর' অধ্যয়ন করতেন। পাশাপাশি আরও অনেক কিতাব অধ্যয়ন করতেন। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো–

أ. فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ لابن حجر العسقلانيّ

ب. الكواكب الدَّرَاريّ المعروف ب«شرح الكِرْمانيّ»

ج. عمدة القاري في شرح صحيح البخاريّ لبدر الدين العينيّ

د. شرح صحيح البخاريّ للبرماويّ

٤٤. شرح صحيح مسلم للنوويّ

٤٥. إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض

٤٦. شرح صحيح مسلم للقسطلّانيّ

٤٧. عارضة الأحوذي بشرح جامع الترمذيّ لأبي بكر بن العربيّ

٤٨. الشِّفَاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض

٤٩. المَوَاهب اللَّدُنِيَّة في المِنَح المحمديَّة للقسطلّانيّ

উপরিউক্ত কিতাবগুলোর নাম উল্লেখ করার পর তিনি লিখেছেন, তিনি এগুলো ছাড়াও আরও কিতাব তাঁর বিভিন্ন উস্তাদের কাছে পড়েছেন।

তৃতীয় প্রকার ঃ প্রথম প্রকার ও দ্বিতীয় প্রকারের কিতাবগুলো সমাপ্ত করার পর যেসকল কিতাব তিনি নিজে নিজে অধ্যয়ন করেছেন এবং অস্পষ্ট স্থানগুলো বড় বড় আলেমদের থেকে বুঝে নিয়েছেন, সেগুলো হলো–

১. شرح الروض

তিনি কিতাবটি প্রায় পনের বার অধ্যয়ন করেছেন।

২. كتاب الأم للإمام الشافعيّ [খণ্ড ১১]

তিনি কিতাবটি তিন বার অধ্যয়ন করেছেন। নিজ নিজ শরাহ্ ও হাশিয়াতে 'আসহাব'গণ كتاب الأم-এর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে যা লিখেছেন, তিনি সেগুলোও তখন অধ্যয়ন করেছেন।

৩. مختصَرُ المُزَنِيّ

٤. شرح مختصَرِ المُزَنِيّ لشيخ الإسلام زكريا

কিতাবটি তিনি কয়েকবার অধ্যয়ন করেছেন।

٥. مُسْنَد الإمام الشافعيّ কয়েকবার

٦. الحاوي

٧. المُحَلَّى في الخلاف العالي لابن حزم ৩০ খণ্ড

٨. المِلَل والنِّحَل له أيضا

٩. المُعَلَّى مختصَر المُحَلَّى للشيخ محي الدين بن العربيّ

١٠. الحاوي الكبير في الفروع للماورديّ ১৫ খণ্ড

١١. الأحكام السُّلْطانيَّة له أيضا

١٢. فروع ابن الحَدَّاد

١٣. الشامل لابن الصباغ

١٤. العدة لأبي محمد الجُوَيْنِيّ

١٥. المُحِيط له أيضا

١٦. الفروق له أيضا

١٧. الرافعيّ الكبير

١٨. الرافعيّ الصغير

١٩. شرح المُهَذَّب للنوويّ [২২ খণ্ড]

٢٠. قطعة السُّبْكِيّ على شرح المُهَذَّب

قِطْعَة السُّبْكِيّ ও شَرْح المُهَذَّب কিতাবদু'টি তিনি প্রায় পঞ্চাশ বার অধ্যয়ন করেছেন।

٢١. شرح مسلم للنوويّ ৫ বার [৯ খণ্ড]

٢٢. المُهِمَّات والتعقُّبات عليها ২ বার

٢٣. خادم الرافعيّ والروضة في الفروع আড়াই বার

٢٤. قُوْت المحتاج في شرح المِنْهَاج للأذرعيّ

٢٥. التوسط له أيضا

٢٦. الفتح له أيضا

٢٧. العُمْدَة لابن المُلَقِّن

٢٨. العُجَالة له أيضا

٢٩. شرح التنبيه له أيضا

٣٠. تفسير الجلالين প্রায় ৩০ বার

٣١. شرح المنهاج للجلال المَحَلِّيّ প্রায় ১০ বার

٣٢. فتح الباري بشرح صحيح البخاريّ للعسقلانيّ

٣٣. عمدة القاري شرح صحيح البخاريّ للعينيّ

٣٤. الكواكب الدَّرَارِيّ المعروف ب«شرح الكِرْمانيّ» ৩ বার [২৫ খণ্ড]

٣٥. شرح صحيح البخاريّ للبرماويّ ২ বার

٣٦. التنقيح للزركشيّ ৩ বার

٣٧. إرشاد الساري على صحيح البخاريّ للقسطلانيّ ৩ বার [১৫ খণ্ড]

٣٨. إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض [৯ খণ্ড]

٣٩. شرح صحيح مسلم للفارسيّ

٤٠. مَعالم التنزيل للبغويّ ৩ বার

٤١. تفسير الخازن ৫ বার

٤٢. تفسير ابن عادل

٤٣. تفسير الكواشيّ ৩ বার

٤٤. تفسير ابن زهرة المكيّ

٤٥. الدُّرُّ المنثورُ في التفسير المأثور للجلال السيوطيّ ৩ বার প্রায় [৬ খণ্ড]

٤٦ - ٤٩. الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشريّ بحواشيه لمحو حاشية الطيبيّ وحاشية التفتازانيّ وحاشية ابن المنير ৩ বার

আলোচ্য তাফসীরে আল্লামা যামাখশারী যেসকল স্থানে মু'তাযিলাদের মত অবলম্বন করেছেন তিনি কিতাবটি পাঠকালে সেই স্থানগুলো চিহ্নিত করেছেন এবং সেগুলোকে এক খণ্ডে সংকলন করেছেন।

٥٠. البحر المُحيط لأبي حيان الأندلسيّ

٥١. الدُّرُّ المَصُون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبيّ

٥٢. المجيد في إعراب القرآن المَجِيد لإبراهيم السَّفَاقُسيّ

٥٣، ٥٤. أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف ب«تفسير البيضاوي» مع حاشية الشيخ زكريا عليه ৩ বার

٥٥. تفسير ابن النقيب المقدسيّ ১০০ খণ্ড

٥٦. البَسيط في التفسير للواحديّ

٥٧. الوَسيط في التفسير له أيضا

٥٨. الوَجيز في التفسير له أيضا

٥٩، ٦٠، ٦١. تفاسير عبد العزيز الديرينيّ الثلاثة প্রতিটি কয়েকবার

এর পর তিনি লিখেছেন, আমি হাদীসের কত কিতাব যে অধ্যয়ন করেছি, এ মুহূর্তে আমার কাছে তার হিসাব নেই। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি হলো–

٦٢. موطأ الإمام مالك

٦٣. مسند الإمام أحمد [৫২ খণ্ড]

٦٤، ٦٥، ٦٦. مسانيد الإمام أبي حنيفة الثلاثة

٦٧. صحيح البخاريّ

٦٨. صحيح مسلم

٦٩. سنن أبي داود

٧٠. سنن الترمذيّ

٧١. سنن النسائيّ

٧٢. صحيح ابن خزيمة

٧٣. صحيح ابن حبان

٧٤. مسند الإمام سعيد بن عبد الله الأزديّ

٧٥. مسند عبد الله بن حميد

٧٦. الغيلانيات

٧٧. مسند فردوس الكبير

٧٨. المعجم الكبير للطبرانيّ [১১ খণ্ড]

٧٩. المعجم الأوسط له أيضا [৯ খণ্ড]

٨٠. المعجم الصغير له أيضا

٨١. جامع الأصول لأحاديث الرسول لابن الأثير [১৫ খণ্ড]

৮২. جمع الجوامع المعروف ب«الجامع الكبير» لجلال الدين السيوطيّ [খণ্ড ২৪]

৮৩. الجامع الصغير من حديث البشير والنذير له أيضا

৮৪. زيادة الجامع الصغير له أيضا

৮৫. السنن الكبرى للبيهقيّ [খণ্ড ১১]

কিতাবটি অধ্যয়ন করার পর তিনি কিতাবটির একটি সংক্ষিপ্তরূপ তৈরি করেছেন।

তিনি নিম্নোক্ত আরবী অভিধানগুলো অধ্যয়ন করেছেন–

৮৬. تاج اللغة وصحاح العربية المعروف ب«صحاح الجَوْهَريّ»

৮৭. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير

৮৮. القاموس المحيط للفيروزآباديّ

৮৯. تهذيب الأسماء واللغات للنوويّ ৩ বার

তারপর তিনি লিখেছেন, আমি أُصُول الدين ও أُصُول الفقه বিষয়ে প্রায় ৭০ টি কিতাব অধ্যয়ন করেছি। এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাসের পাশাপাশি মু'তাযিলা, কাদ্‌রিয়্যা, পথভ্রষ্ট সূফীসাধক প্রমুখের আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে পূর্ণ অবগতি লাভ করেছি।

তিনি আরও লিখেছেন, আমি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ফকীহদের অগণিত ফতোয়া-সংকলন অধ্যয়ন করেছি। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি হলো–

১৬০. فتاوى القَفَّال

১৬১. فتاوى القاضي حسين

১৬২. فتاوى الماورديّ

১৬৩. فتاوى الغزاليّ

١٦٤. فتاوى ابن الحداد

١٦٥. فتاوى ابن الصلاح

١٦٦. فتاوى ابن عبد السلام

١٦٧. فتاوى السُّبْكِيّ

١٦٨. فتاوى البُلْقِينِيّ

١٦٩. فتاوى شيخه زكريا الأنصاريّ

١٧٠. فتاوى شيخه الشيخ شهاب الدين

١٧١. فتاوى النوويّ الكبرى

١٧٢. فتاوى النوويّ الصغرى

١٧٣. فتاوى ابن الفركاح

١٧٤. فتاوى ابن أبي شريف

ফতোয়ার উপরিউক্ত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করার পর সবগুলো ফতোয়াকে তিনি পুনরুক্তি বাদ দিয়ে এক ভলিয়মে সংকলন করেছেন।

তিনি قواعدُ الفقهِ-এর নিম্নলিখিত কিতাবগুলো অধ্যয়ন করেছেন–

١٧٥. قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام

١٧٦. قواعد ابن عبد السلام الصغرى

١٧٧. قواعد العلائيّ

١٧٨. قواعدُ ابن السبكيّ

١٧٩. الدُّرُّ المنثور في ترتيب القواعد الفقهية للزركشيّ

অধ্যয়নের পর শেষোক্ত কিতাবটির তিনি একটি সংক্ষিপ্তরূপও তৈরি করেছেন।

তিনি সীরাত বিষয়েও অনেক কিতাব অধ্যয়ন করেছেন। উদাহরণস্বরূপ–

١٨٠. سيرة ابن هشام

١٨١. سيرة الكلاعيّ

١٨٢. عُيُون الأثر في فُنُون المغازي والشمائل والسِّيَر لابن سيد الناس

١٨٣. سُبُل الهُدى والرَّشَاد في سيرة خير العباد للشيخ محمد الشاميّ

١٨٤. الخصائص الكبرى للجلال السيوطيّ

তিনি কিতাবটির একটি সংক্ষিপ্তরূপও তৈরি করেছেন। তারপর তিনি বলেছেন, আমি তাসাউওফ বিষয়ে এতো কিতাব অধ্যয়ন করেছি যে, তার কোনো হিসাব এখন আমার কাছে নেই। উদাহরণস্বরূপ–

١٨٥. قُوْت القلوبِ لأبي طالب المكيّ

١٨٦. الرعاية للحارث المُحَاسِبِيّ

١٨٧. رسالة القشيريّ

١٨٨. إحياء علوم الدين للغزاليّ [৫ খণ্ড]

١٨٩. عوارف المعارف للسَّهْرَوَرْدِيِّ

١٩٠. رسالة النُّوْر لسيده أحمد الزاهد ২ খণ্ড

١٩١. منح المنة لسيده محمد الغمريّ ৬ খণ্ড

١٩٢. الفُتُوْحَاتُ المَكِّيَّةُ فِي مَعْرِفَةِ أَسْرَارِ المَالِكِيَّةِ والمَلَكِيَّةِ ১০ খণ্ড

তিনি কিতাবটির একটি সংক্ষিপ্তরূপও তৈরি করেছেন।

তিনি শাফিয়ী মাযহাবের কিতাবসমূহের পাশাপাশি অন্যান্য মাযহাবের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবসমূহও অধ্যয়ন করেছেন। যেমন মালেকী মাযহাবের নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেছেন–

١٩٣. المُدَوَّنَة الكبرى [৬ খণ্ড]

তিনি কিতাবটির একটি সংক্ষিপ্তরূপও তৈরি করেছেন।

١٩٤. المدوَّنة الصغرى

١٩٥. كتاب ابن عرفة

١٩٦. كتاب ابن رشد

١٩٧. شرح رسالة ابن أبي زيد للتتائيّ

١٩٨. شرح رسالة ابن أبي زيد للشيخ جلال الدين بن قاسم

١٩٩. شرح مختصَر الخليل لبهرام

٢٠٠. شرح مختصَر الخليل للتتائيّ

٢٠١. مختصَر ابن الحاجب

তিনি হানাফী মাযহাবের নিম্নোক্ত কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করেছেন–

٢٠٢. شرح القُدُوريّ

٢٠٣. شرح مَجْمَع البحرين

٢٠٤. شرح الكَنْز

٢٠٥. فتاوى قاضي خان

٢٠٦. منظومة النَّسَفِيّ

٢٠٧. شرح الهداية

٢٠٨. نَصْب الرَّاية لتخريج أحاديث الهداية للزَّيْلَعِيّ [৪ খণ্ড]

তিনি হাম্বলী মাযহাবের নিম্নোক্ত কিতাবদু'টি ছাড়াও আরও কিতাব অধ্যয়ন করেছেন–

٢٠٩. المُغْنِي بشرح الخرقيّ [১৬ খণ্ড]

٢١٠. شرح ابن بطة

আল্লামা শা'রানী রহ. তাঁর অধ্যয়নের উপরিউক্ত তালিকা উল্লেখ করার পর লিখেছেন– এটি আমার অধ্যয়নকৃত সেসকল কিতাবের তালিকা, যেগুলো এ মুহূর্তে স্মরণ পড়ছে। আমার এ সকল কিতাবের অধ্যয়নের ব্যাপারে কারো যদি সন্দেহ হয়, সে যেন তার ইচ্ছামত এসবের যে কোনো একটি কিতাব নিয়ে আমার নিকট আসে। আমি তাকে নতুনভাবে অধ্যয়ন না করেই উক্ত কিতাব বুঝিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন কিতাবের যেসকল খণ্ড-সংখ্যা বন্ধনীর মধ্যে দেয়া হয়েছে, সেগুলো আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে। সেগুলো আল্লামা শা'রানী উল্লেখ করেন নি। আল্লামা শা'রানী যেসকল কিতাবের খণ্ড-সংখ্যা নিজে উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আমরা বন্ধনী ছাড়াই লিখেছি। অনুরূপ আরেকটি জ্ঞাতব্য বিষয় হলো, আল্লামা শা'রানী রহ. অধিকাংশ কিতাবের নাম সংক্ষিপ্তকারে লিখেছেন। আমরা কিছু কিতাবের নাম পূর্ণাঙ্গরূপে লেখার চেষ্টা করেছি।

উল্লেখ্য, একজন ব্যক্তি যা অধ্যয়ন করবে সবকিছুই যে তাঁর স্মরণ থাকবে তা কিন্তু নয়। বড় বড় মনীষীদের অনেকেরও অনেক কিছু স্মরণ থাকে না। অধ্যয়নের প্রধান অর্জন হলো রুচি। তথ্য তোমার পুরোপুরি স্মরণ না থাকলেও মনোযোগের সাথে বুঝে বুঝে অধ্যয়নের ফলে যে রুচি তৈরি হয়, তা থেকে তুমি কখনো রিক্তহস্ত হবে না ইনশাআল্লাহ। অতএব কোনো কিছু পূর্ণ মনোযোগের সাথে বুঝে বুঝে অধ্যয়ন করার পরও পরবর্তীতে ভুলে গেলে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে মাঝে মধ্যে পুনরাবৃত্তি করতে থাকতে হবে। ৩৬৭ - ৩৭৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত 'অধ্যয়নে চাই পূর্ণ সচেতনতা' শিরোনামের আলোচনাটি সুযোগ হলে এখানেই পড়ে নিবে।

২. আল্লামা আব্দুল হাই লখনভী রহ.। তিনি আমাদের শেষ যুগেরই মানুষ। তাঁর মৃত্যু হয়েছে ১৩০৪ হিজরীতে। ভারতের লখনৌ শহরের বাসিন্দা ছিলেন তিনি। তাঁর রচিত الْفَوَائِدُ الْبَهِيَّةُ فِي تَرَاجِمِ الْحَنَفِيَّةِ ও এর হাশিয়া التَّعْلِيقَاتُ السَّنِيَّةُ عَلَى الْفَوَائِدِ الْبَهِيَّةِ কিতাবদু'টিতে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তিনি যেসব কিতাব অধ্যয়ন করেছেন বলে নিজে উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর সংখ্যা আমাদের গণনামতে ৪০৬ [চারশ' ছয়] টির বেশী। এগুলোর মধ্যে কিছু কিছু কিতাব কয়েক খণ্ডবিশিষ্ট এবং কোনো কোনো কিতাব তিনি কয়েকবার পড়েছেন।

উল্লেখ্য, তিনি কিতাবদু'টি যখন রচনা সমাপ্ত করেছেন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ২৮ [আটাইশ] বছর। তাছাড়া الفَوَائِدُ البَهِيَّةُ তে তিনি শুধু হানাফী মাযহাবের ফকীহগণের জীবনী আলোচনা করেছেন। আর الفَوَائِدُ البَهِيَّةُ রচনায় যাদের কিতাব থেকে সাহায্য নিয়েছেন, التَّعْلِيقَاتُ السَّنِيَّةُ তে শুধু তাঁদের জীবনী উল্লেখ করেছেন। তো এই দুই কিতাবে যাদের আলোচনা আসেনি, তাঁদের কি পরিমাণ কিতাব তিনি অধ্যয়ন করেছেন, সে কথা এখানে বলা হয়নি।

এবার চিন্তা করে দেখো, আমাদের পূর্বসূরীদের অধ্যয়নের পরিধি কতো ব্যাপক ছিল!

৩. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর মহান পিতা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া রহ. সম্পর্কে শায়খুল হাদীস রহ. লিখেছেন, আব্বাজান সাত বছর বয়সে পুরো কুরআন শরীফের হাফেজ হয়েছেন এবং আমার দাদার অগোচরে স্বীয় চাচাজান রহ.-এর নিকট ফারসীও পড়েছিলেন। سکندرنامہ، زُلیخا، بوستاں এবং এ ধরনের আরো কয়েকটি কিতাব শেষ করেছিলেন। সাত বছর বয়স হলে দাদা তাঁকে বলেছিলেন, দৈনিক এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করবি, বাকি সারা দিন তোর ছুটি। ছয় মাস পর আরবী কিতাব শুরু করাব।

আব্বাজান তাঁর নানী ছাহেবার ঘরের ছাদের দিকে ইঙ্গিত করে বলতেন, ফজরের নামায পড়েই আমি ঐ ছাদে তেলাওয়াত করতে বসতাম এবং জোহরের পূর্বেই কুরআন খতম করে ফেলতাম। এরপর ছাদ থেকে নেমে এসে খাবার খেতাম। বিকাল বেলা সাগ্রহে আরবীর প্রাথমিক কিতাবাদি পড়া শুরু করি।[৮১]

রচনার অঙ্গনে তাঁদের উচ্চাভিলাষ

১. রচনার ক্ষেত্রে নিজ সময়ের ইমাম সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ.-এর উচ্চাভিলাষ দেখো। তাঁর রচিত التصريحُ بِمَا تَوَاتَرَ فِي نُزُوْلِ

---

৮১. 'আপবীতি' ১ ঃ ৭৩

الْمَسِيْحِ গ্রন্থটি আপন বিষয়বস্তুর সবচে' বড় সংকলন হোক- এই অভিলাষে উদ্যমহীনতার বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুরো 'মুসনাদে আহমদ' কিতাবটি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেছেন।[৮২]

উল্লেখ্য, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর 'মুসনাদ' কিতাবটি হাদীসের এত বড় সংকলন যে, সম্প্রতি কিতাবটি শায়খ শু'আইব আলআরনাউত দা. বা.-এর তাহকীকে مُؤَسَّسَةُ الرِّسَالَةِ প্রকাশনাসংস্থা থেকে বড় বড় ৫২ [বায়ান্ন] খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে।

২. الْجَوَاهِرُ الْحِسَانُ فِي تفسيرِ القرآن নামে আল্লামা আব্দুর রহমান ছা'আলাবী [মৃ. ৮৭৬ হি.] রহ.-এর একটি তাফসীরের কিতাব আছে। এ কিতাবের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, তাঁর এ কিতাবটি 'তাফসীরে ইবনে আতিয়্যা'র গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্বলিত হওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত অনেক জিনিসের সংকলনও বটে। এই অতিরিক্ত সংকলনের কাজটি তিনি করেছেন প্রায় একশ'টি কিতাব অধ্যয়ন করে। এই একশ' কিতাবের প্রতিটি কিতাব প্রসিদ্ধ ও গবেষক এক একজন ইমামের রচিত।[৮৩]

৩. অধ্যয়ন ও গবেষণায় শায়খ আব্দুল ওয়াহ্হাব শা'রানী [মৃ. ৯৭৩ হি.] রহ.-এর উচ্চাভিলাষের আলোচনা সামান্য আগে অতিবাহিত হয়েছে। এখন তোমাকে রচনার অঙ্গনে তাঁর উচ্চাভিলাষের গল্প শোনাব। তাঁর রচিত الْيَوَاقِيْتُ والْجَوَاهِرُ فِي بَيَانِ عَقَائِدِ الأَكَابِرِ কিতাবে তিনশত অধ্যায় রয়েছে। হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ.

---

৮২. «تَرَاجِمُ سِتَّةٍ مِنْ فُقَهَاءِ العَالَمِ الإِسْلاَمِيِّ فِي القَرْنِ الرَّابِعِ عَشَرَ وآثَارُهُمُ الفِقْهِيَّةُ» ص. ২৪ بِقَلَمِ الشَّيْخِ عَبْدِ الفَتَّاحِ أَبُوْ غُدَّةَ

৮৩. «التفسيرُ والمُفَسِّرُوْن» لِلدُّكْتُوْرِ محمَّد حُسَيْن الذَّهَبِيِّ ১ ৪ ২১৫

বর্ণনা করেছেন, তিনি কিতাবটির প্রতিটি অধ্যায় লেখার পর শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী [মৃ. ৬৩৮ হি.] রহ.-এর الفُتُوحَاتُ কিতাবটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করতেন। আর الفُتُوحَاتُ কিতাবটি কয়েক হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত।[৮৪] সে হিসেবে اليَوَاقِيتُ والجَوَاهِرُ কিতাবটি লেখার সময় আল্লামা শা'রানী রহ. পুরো الفُتُوحَاتُ কিতাবটি তিনশত বার পাঠ করেছেন। الفُتُوحَاتُ কিতাবটির পুরো নাম হলো الفُتُوحَاتُ المَكِّيَّةُ فِي مَعْرِفَةِ أَسْرَارِ المَالِكِيَّةِ والمَلَكِيَّةِ

নিজের রচনায় যেন কোনো ভুল না থাকে এবং প্রয়োজনীয় কোনো কথা যেন ছুটে না যায়, এর জন্য আল্লামা শা'রানী রহ.-এর উচ্চাভিলাষ লক্ষ করেছ?!

৪. আল্লামা শামসুল আইম্মাহ্ সারাখ্সী [মৃ. ৪৩৮ হি.] রহ. হানাফী মাযহাবের একজন বড় ইমাম ছিলেন। তিনি একবার সমকালীন জালেম শাসকের মর্জির বিরুদ্ধে একটি ফতোয়া দেন। ফলে শাসক তাঁকে কূপের মতো একটি গর্তে বছরের পর বছর বন্দি করে রাখে। সেখানে হাঁটা-চলা করার কোনো সুযোগ ছিল না। উক্ত কূপটি মধ্য এশিয়ার দেশ 'কিরগিজিস্তান'-এর 'ওয্জান্দ' (أُوزجند) শহরে অবস্থিত ছিল।

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব হতে বিচ্ছিন্ন থেকে ছোট একটি অন্ধকার কূপে বছরের পর বছর জীবনযাপন করার সময় তাঁর মনের অবস্থা যে কেমন ছিল, তা আমাদের জন্য উপলব্ধি করাও কঠিন। এ অবস্থায় মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়া এবং হতাশ হয়ে জীবনের হাল ছেড়ে দেয়া একান্তই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তাঁর উচ্চাভিলাষ দেখো, কলম নেই, কাগজ নেই, সাথে কোনো কিতাবও নেই। এ অবস্থায় তিনি ইমাম হাকেম শহীদ [মৃ. ৩৪৪ হি.]-এর রচিত الكَافِي কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখার ইচ্ছা করেন এবং জ্ঞানের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল এক মহান, শ্রেষ্ঠ ও বিরল গ্রন্থ রচনা করেন।

---

৮৪. 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত' পৃ. ৩০৭

প্রিয় উস্তাদের বিচ্ছেদে মর্মাহত তাঁর শিষ্যগণ প্রতিদিন গর্তের মুখে উপস্থিত হতেন। তিনি গর্তে বসে বসে মাথা উঁচু করে বলে যেতেন। আর গর্তের উপরে বসে শিষ্যরা তা লিপিবদ্ধ করতেন। এভাবে উস্তাদ ও শাগরিদদের লেখানো ও লেখা বছরের পর বছর ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত থাকে। তারপর এক সময় ৬৩৩৩ [ছয় হাজার তিনশত তেত্রিশ] পৃষ্ঠার ত্রিশ খণ্ডের সুবিশাল المَبْسُوْط কিতাব রচনা সমাপ্ত হয়। তাতে ফেকাহ্ শাস্ত্রের চূড়ান্ত ও জটিল বিষয়াবলী স্থান পেয়েছে এবং তা শত শত বছর ধরে উলামা-ফুকাহা মহলে পঠিত হয়ে আসছে। তা এমন তাহকীকী ও শক্তিমান রচনা হয়েছে যে, মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা. লিখেছেন, আজ পর্যন্ত কেউ এ অভিযোগ করেনি– বন্দিজীবনের স্মৃতিনির্ভর রচনা হওয়ার কারণে অমুক জায়গায় এ ভুল রয়ে গেছে। বরং এটাকে বরাবরই হানাফী ফেকহের নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এমনকি আল্লামা নাজ্মুদ্দীন তারাসূসী [মৃ. ৭৫৮ হি.] রহ. এর সম্পর্কে এ কথাও লিখেছেন– 'এর বিপরীত বক্তব্যের উপর আমল করা হয় না। এর উপরই আস্থা রাখা হয়। এর ভিত্তিতেই ফতোয়া দেয়া হয় এবং এর উপরই নির্ভর করা হয়।'

কথা শুধু এতটুকুই নয়। আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ شَرْحُ السِّيَرِ الكَبِيْرِ যা যুদ্ধ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে ইসলামী আইনের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য একটি গ্রন্থ, তা-ও ইমাম সারাখ্সী রহ. এই গর্তের বন্দিজীবনেই লিখেছেন। এ গ্রন্থ যখন রচিত হয়, তখন এ বিষয়ে এতটা বিস্তারিত আর কোনো গ্রন্থ ছিল না। উপরন্তু তাঁর অপর এক গ্রন্থ المُحَرَّرُ فِي أُصُوْلِ الفِقْهِ যা أُصُوْلُ السَّرَخْسِيْ নামে পরিচিত, তার রচনার কাজও তিনি তখন শুরু করেছিলেন।[৮৫]

---

৮৫. «الجَوَاهِرُ المُضِيَّةُ فِي طَبَقَاتِ الحَنَفِيَّةِ» لِعَبْدِ القَادِرِ القُرَشِيِّ ৩ ঃ ৮০, (বিচারপতি মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা.-এর ভ্রমণকাহিনী) 'দেশে দেশে' পৃ. ২৫৭ - ২৬৪ ও «شَرْحُ عُقُوْدِ رَسْمِ المُفْتِيْ» পৃ. ১০২

তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের উচ্চাভিলাষ

১. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখেছেন, اوراق شاذ কিতাবে[৮৬] হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.-এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে– হযরত শাহ ইসহাক দেহলভী রহ.-এর শাগরিদদের মধ্যে তিন জন খুব মুত্তাকী ছিলেন। প্রথম ছিলেন হযরত মুযাফফর হোসাইন কান্দলভী রহ,[৮৭] দ্বিতীয় ছিলেন হযরত শাহ আব্দুল গণী দেহলভী রহ, আর তৃতীয় ছিলেন নবাব কুতুবুদ্দীন ছাহেব রহ.।

একবার নবাব কুতুবুদ্দীন ছাহেব উস্তাদ শাহ ইসহাক দেহলভী ছাহেব, মাওলানা ইয়াকুব ছাহেব, মাওলানা মুযাফফর হোসাইন ছাহেবসহ আরো কয়েকজন বন্ধুকে দাওয়াত করেন। শাহ ইসহাক ছাহেব ও ইয়াকুব ছাহেব দাওয়াত কবুল করলেন। কিন্তু হযরত মুযাফফর হোসাইন ছাহেব দাওয়াত কবুল করেননি। এতে শাহ ছাহেব মাওলানা মুযাফফর হোসাইন ছাহেবকে তিরস্কার করে বললেন, মুযাফফর হোসাইন! তোমার তাকওয়ার বদহজমী হয়েছে। কুতুবুদ্দীন ছাহেবের খাবারও কি হারাম?

তিনি বললেন, আল্লাহ পানাহ! কুতুবুদ্দীন ছাহেবের খাবারের ব্যাপারে আমি এমন ধারণা পোষণ করি না। আমার দাওয়াত কবুল না করার কারণ হলো, তিনি আপনাকেও দাওয়াত করেছেন। দাওয়াত করেছেন মাওলানা ইয়াকুব ছাহেবকেও। আরো অনেক মেহমানকে দাওয়াত করেছেন। আবার আপনাকে নিয়ে যাবে পালকিতে করে। তাতেও নিঃসন্দেহে খরচ হবে। ওদিকে কুতুবুদ্দীন ছাহেবের পূর্বের নবাবী অবস্থা এখন যদিও নেই, তবু তিনি নবাবজাদা। দাওয়াতে বেশ খরচ করবেন। আর এ-ও শুনেছি যে, তিনি ঋণগ্রস্ত। অন্যদিকে দাওয়াতে তিনি যে পরিমাণ রুপি খরচ করবেন, তা নিশ্চয়ই তাঁর একান্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এমতাবস্থায় এ রুপিগুলো তিনি তাঁর ঋণ পরিশোধে কেন ব্যয় করেন না? অতএব তাঁর খাবার নিশ্চয়ই মাকরূহ থেকে খালি নয়।

---

৮৬. পৃ. ১৯১

৮৭. তিনি শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর দাদির নানা ছিলেন। 'আপবীতি' ১ঃ৫১

শাহ ছাহেব রহ. মুযাফফর হোসাইন ছাহেবের যুক্তি গ্রহণ করে কুতুবুদ্দীন ছাহেবকে বললেন, মিয়া কুতুবুদ্দীন! আমিও এখন তোমার বাড়ীতে দাওয়াত খাব না।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. টীকায় লিখেছেন, 'মাকরূহ থেকে খালি নয়' এ উক্তির ব্যাপারে আমি বলব, এটি মূলত ঋণ পরিশোধে গড়িমিসি করার ক্ষেত্রে দূর থেকে সহযোগিতা করা। কত সূক্ষ্ম তাঁদের তাকওয়া! উস্তাদও কত মহান! যেখানে শাগরিদকে তিরস্কার করছিলেন, সেখানে নিজেই শাগরিদের অনুসরণ করলেন।[৮৮]

২. যার নামে সাহারানপুরের 'মাদরাসায়ে মাযাহেরুল উলূমে'র নাম রাখা হয়েছে সেই হযরত মাওলানা মাযহার ছাহেব নানূতবী রহ.-এর নিকট কেউ যদি ব্যক্তিগত সাক্ষাতের জন্য মাদরাসার নির্দিষ্ট সময়ে আসতেন, তিনি কথা শুরু করার আগে ঘড়ি দেখে নিতেন। ঐ ব্যক্তি চলে যাওয়ার পর পুনরায় ঘড়ি দেখে কতটুকু সময় ব্যয় হলো তা লিখে রাখতেন। মাস শেষে এ ধরনের সময়গুলোকে যোগ করতেন। মোটসময় যদি অর্ধেক দিনের কম হত, তাহলে অর্ধেক দিনের ছুটির, আর অর্ধেক দিনের বেশী হলে পূর্ণ একদিনের ছুটির দরখাস্ত মাদরাসায় লিখে দিতেন। অবশ্য কেউ ফাতওয়া বা মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে তার সাথে কথা বলার সময়টুকু লিখতেন না।[৮৯]

৩. দারুল উলুম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা মুনীর ছাহেব রহ. একবার দারুল উলুমের বার্ষিক কার্যবিবরণী ছাপানোর উদ্দেশ্যে আড়াইশত রুপি নিয়ে দিল্লী যান। ঘটনাক্রমে রুপিগুলো চুরি হয়ে যায়। তিনি অবস্থা কাউকে না জানিয়ে বাড়ী এসে জমি বা এ জাতীয় কিছু বিক্রি করে পুনরায় আড়াইশত রুপি নিয়ে দিল্লী যান এবং কার্যবিবরণী ছাপানোর ব্যবস্থা করে আসেন। পরবর্তীতে মাদরাসার অন্যান্য কর্তৃপক্ষ ঘটনা অবগত হন। তখন তাঁরা হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.-এর নিকট এ ব্যাপারে ফতোয়া জানতে চাইলেন। ফতোয়ায় তিনি লিখলেন– 'যেহেতু মাওলানা মুনীর ছাহেবের নিকট উক্ত টাকা আমানতরূপে ছিল এবং টাকাটা তাঁর কোনো অসতর্কতা

---

৮৮. 'আপবীতি' ২ ঃ ১৮৬ - ১৮৭

৮৯. 'আপবীতি' ২ ঃ ১৮৮

ছাড়াই চুরি হয়েছে, তাই এর জন্য তিনি দায়ী নন।" তখন মাদরাসা কর্তৃপক্ষ মাওলানা মুনীর ছাহেবকে উক্ত টাকা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন এবং হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর ফতোয়াও দেখান। একথা শোনে তিনি রাগতস্বরে বললেন, 'মিয়া রশীদ আহমদ ফিকাহ কি শুধু আমার জন্যই পড়েছিলেন? মাসআলা কি শুধু আমারই জন্য? নিজের বুকের উপর হাত রেখে বলুক তো দেখি, যদি এমন ঘটনা তাঁর নিজের বেলায় ঘটত, তাহলে তিনি কি রুপি নিয়ে নিতেন?[৯০] যাও, এ ফতোয়া নিয়ে যাও। আমি কোনো অবস্থাতেই দু' পয়সাও নেব না।'[৯১]

---

৯০. হযরত মাওলানা মুনীর ছাহেব রহ. ঠিকই বলেছেন। 'আপবীতি'তে [২ ঃ ১৯০] আছে– হযরত গঙ্গুহী রহ. সম্পর্কে تذكرة الرشيد গ্রন্থকার লিখেছেন, নিজের বিষয়ে হযরতের তাকওয়া ও সতর্কতা এত বেশি ছিল যে, বিরোধপূর্ণ মাসআলায় তিনি راجح তথা প্রাধান্যপ্রাপ্ত মতের তুলনায় أحوط তথা অধিক সতর্কতাপূর্ণ মতকে গ্রহণ করতেন। প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি সতর্কতাকে কখনও পরিহার করতেন না।

হযরত রহ.-এর অতি সতর্কতার একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ হলো, হযরত রহ.-এর অসুস্থ অবস্থায়, অসুস্থতা যত মারাত্মকই হোক না কেন, কখনো বসে নামায পড়েন নি। যে অসুখে হযরত ইন্তেকাল করেন, সেই অসুখেও যতদিন পর্যন্ত হযরত দু'জনের কাঁধে বা শরীরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পেরেছেন, ততদিন পর্যন্ত দাঁড়িয়েই নামায পড়েছেন। এমনও হয়েছে যে, দু' তিনজন খুব কষ্ট করে হযরতকে দাঁড় করিয়েছেন। হযরত উভয় পার্শ্বের কাপড় ধরে দাঁড়িয়ে থেকেছেন এবং রুকূ'-সিজদা তাদের শরীরে ভর দিয়েই আদায় করেছেন। খাদেমরা যতই আরজ করেছেন যে, হযরত! বসে বসেই নামায পড়ে নিন। কিন্তু হযরত তাদের অনুরোধ রক্ষা করেন নি। সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করেন নি।

একদিন মৌলভী মুহাম্মদ ইয়াহয়া ছাহেব আরজ করলেন, হযরত! এ অবস্থায়ও যদি বসে নামায পড়া জায়েয না হয়, তবে সে সময় আর কখন হবে, যখন বসে নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে? তিনি বলেন, অন্যের ক্ষমতায় যে ক্ষমতাবান সেও তো ক্ষমতাবান বলেই গণ্য হয়। যখন আমার এমন বন্ধু আছে যারা আমাকে দাঁড় করিয়ে নামায পড়ায়, তখন আমি কীভাবে বসে নামায পড়তে পারি?

৯১. 'আপবীতি' ২ ঃ ১৯২ - ১৯৩

৪. হযরত থানবী রহ.-এর الإفاضات اليومية কিতাবের উদ্ধৃতিতে হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখেছেন, হযরত থানবী রহ.-এর পিতা চারটি বিয়ে করেছিলেন। মহিলারা তখন মোহরের দাবী করতেন না, বরং মোহর মাফ করে দেয়ারই তখন ব্যাপক প্রচলন ছিল, তাই হযরত থানবী রহ.-এর পিতা এদিকে কখনো মনোযোগ দেন নি। পিতার মৃত্যুর পর হঠাৎ করে এ ঋণের কথা হযরত থানবী রহ.-এর মনে জাগ্রত হয়। তখন পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের যে অংশ তাঁর ভাগে এসেছিল, তার মধ্য থেকে মোহরের অংশ যা মাতৃকুলের আত্মীয়দের হক ছিল, তিনি তা আদায় করার ব্যবস্থা করলেন। নতুনভাবে ফারায়েয [মীরাছের মাসআলা] লেখার পারশ্রমিক বাবদ তাঁকে চৌদ্দ রুপি ব্যয় করতে হয়। তারপর দীর্ঘ এক বছর ধরে আত্মীয়দের খোঁজ নিলেন। কারণ, আত্মীয়দের কেউ তখন মক্কায়, কেউ মদীনায়, কেউ বোম্বাইতে, কেউ কলিকাতায়, কেউ লাহোরে, মোটকথা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। খোঁজ নেয়ার পর তিনি সকলের নিকট তাদের প্রাপ্য টাকা পৌঁছে দেন। প্রায় আট শ' রুপি তাঁর অংশে এ ঋণ এসেছিল। কেউ কেউ তা থেকে এক বা দু' পয়সা পেয়েছিলেন। এদের মধ্যে কান্ধালার অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য লোকও ছিলেন। সকলেই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করেছেন। হযরত থানবী রহ. এ কারণে খুবই খুশী হয়েছেন যে, তাঁরা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করেছেন। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.ও এ টাকা থেকে সম্ভবত দু' পয়সা পেয়েছেন। তাঁর ভাষা হলো, 'আমার যতদূর মনে পড়ে আমার ভাগে দু' পয়সা পড়েছিল।'[৯২]

৫. শীত-গরম সব সময়ই হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর মাথা গরম থাকত। তাই তিনি মাথায় কোনো কাপড় ব্যবহার করতে পারতেন না। এর বিপরীতে পা শীত-গরম সব সময়ই ঠাণ্ডা থাকত। তাই সবসময় পায়ের উপর কম্বল দিয়ে রাখতেন। মহিলাদেরকে পর্দার আড়ালে রেখে তাদের মাহরাম পুরুষদের মাধ্যমে তাদেরকে মুরিদ করতেন। একবার এক বেপর্দা মহিলা তার করুণ অবস্থা শোনানোর

---

৯২. 'আপবীতি' ২ ঃ ১৯৫ - ১৯৬

জন্য সামনে এসে গেল। তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে পা ঢাকার কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন। ঐ মহিলা যতক্ষণ পর্যন্ত কথা বলছিল, প্রচণ্ড গরম সত্ত্বেও পুরো সময় তিনি কম্বল দিয়ে মুখ ঢেকে রেখেছিলেন।[৯৩]

৬. দাড়িবিহীন সাবালক ও সাবালকত্বের নিকটবর্তী বালকদের ব্যাপারে আমার শায়েখ ও মুর্শিদ আরেফবিল্লাহ্ মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন দামাত্ বারাকাতুহুম [পীর ছাহেব, ঢালকানগর, ঢাকা] এতটাই সতর্ক থাকেন যে, তাদের কারো জন্য তাঁর জুতা বহন করারও অনুমতি নেই। যেমন মসজিদে প্রবেশ করার সময় হযরত যখন জুতা খুলেন, তখন জুতা উঠিয়ে রাখবে এবং মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় জুতা বিছিয়ে দেবে। না, এ স্তরের বালকদের জন্য হযরতের এ ধরনের কোনো খেদমত করারও অনুমতি নেই। কখনো তাদের কারো সঙ্গে মুসাফাহা করার পরিস্থিতি হলে নিঃসঙ্কোচে রুমাল ব্যবহার করেন। নিজের হাতকে সরাসরি এমন কারো হাতের সঙ্গে স্পর্শ করার সুযোগ দেন না।

ইবাদতে তাঁদের উচ্চাভিলাষ

১. তাবেয়ী উমায়ের বিন হানী রহ. প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন এবং এক লক্ষ বার তাসবীহ পাঠ করতেন।

২. তাবেয়ী আমের বিন আব্দুল্লাহ বিন কায়স রহ. প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নামায পড়া নিজের উপর আবশ্যক করে নিয়েছিলেন।

৩. আসওয়াদ নাখায়ী রহ. রমযানের প্রতি দুই রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। রমযান ছাড়া প্রতি ছয় রাতে একবার খতম করতেন।

৪. সাঈদ বিন মুসাইয়াব রহ. পঞ্চাশ বছর এশার অযু দিয়ে ফজর নামায পড়েছেন।

৫. সাবেত বুনানী রহ. পঞ্চাশ বছর রাতে না ঘুমিয়ে ইবাদত করেছেন। শেষ রাতে বলতেন– হে আল্লাহ! তুমি যদি কাউকে কবরে নামায পড়ার তাওফীক দান কর, তাহলে সেই তাওফীক আমাকে দান করো।

---

৯৩. 'আকাবির কা তাকওয়া' পৃ. ১০৩

৬. কাতাদা রহ. প্রতি সাত রাতে একবার কুরআন খতম করতেন। আর রমযানের প্রতি তিন রাতে একবার খতম করতেন। রমযানের শেষ দশকের প্রতি রাতে একবার খতম করতেন।

৭. ইবরাহীম বিন আদহাম রহ. রমযানের দিনে ক্ষেতের ফসল কাটতেন এবং রাতে নামায পড়তেন। রমযানের পুরো ত্রিশ দিনে কখনো ঘুমাতেন না।

শু'বা রহ. ও ওয়াকী' রহ. নির্দিষ্ট পাঁচ দিন ব্যতীত পুরো বছর রোযা রাখতেন।[৯৪]

৮. تَذْكِرَةُ الرَّشِيْدِ কিতাবের[৯৫] উদ্ধৃতিতে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.-এর এই উক্তি নকল করেছেন, শায়খ আব্দুল কুদ্দুস গঙ্গুহী রহ. ইশা থেকে ফজর পর্যন্ত উচ্চস্বরে জিকির করতেন। শেষদিকে শায়খের উপর জিকির এতটাই প্রভাব বিস্তার করে যে, সকাল বেলা তাঁর ছেলে আসলে শায়খ তাকে তার নাম জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি নাম বলতেন কিন্তু এরপর আর কিছু বলার সুযোগ পেতেন না। এরই মধ্যে শায়খ আবার জিকিরে মশগুল হয়ে পড়তেন। এভাবে কয়েকবার প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে কথা বলার সুযোগ হত।

টীকায় এ ঘটনা সম্পর্কে হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর বরাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত শায়খ রহ. বলতেন, আমি আমার কলবকে শুরুতেই উচ্চস্বরে জিকির দ্বারা যে পরিমাণ তুলাধুনা করেছি, তাতে এখন তা আমাকে কিছুতেই ছাড়ে না।[৯৬]

৯. দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম হযরত মাওলানা হাবীবুর রহমান উসমানী [মৃ. ১৩৪৮ হি./১৯২৯ খ্রি.] রহ.-এর সময় দারুল উলূমের কার্যক্রম অনেক প্রসার লাভ করেছিল। তখন অনেক বিভাগ প্রতিষ্ঠা হয়েছে। প্রচুর সংখ্যক ছাত্র মাদরাসায় অবস্থান করত। তাই রাত-দিন

---

৯৪. مَجْمُوْعَةُ رَسَائِلِ اللَّكْنَوِيِّ দ্বিতীয় খণ্ডের إِقَامَةُ الْحُجَّةِ عَلَى أَنَّ الْإِكْثَارَ فِي التَّعَبُّدِ لَيْسَ بِبِدْعَةٍ শীর্ষক পুস্তিকা, পৃ. ২১ - ৩৪

৯৫. ২ ঃ ২৬৫

৯৬. 'আপবীতি' ২ ঃ ১৫২

তিনি মাদরাসার ব্যবস্থাপনার কাজে নিমগ্ন থাকতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাগরিব ও ফজরের তেলাওয়াতের পাশাপাশি প্রতিদিনের সোয়া লক্ষ বারের ইসমে যাতের যিকির তাঁর কোনো দিন কাযা হতো না।[৫৭]

১০. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. নিজের সম্পর্কে লিখেন– তবে ১৩৩৮ হিজরী থেকে রমযানে কুরআন পাক দৈনিক এক খতম করার আমল শুরু হয়েছিল। প্রায় '৮০ হিজরী পর্যন্ত তা যথানিয়মে চলছিল। বরং এর পরেও চলছিল।

প্রথম প্রথম দৈনিক শোয়া পারা তেলাওয়াত করার অভ্যাস ছিল। হাকীম ইসহাক ছাহেবের মসজিদে সাধারণত তারাবীতে সোয়া পারা পড়তাম। এ মসজিদটি সাহারানপুরের 'মহল্লায়ে মুফতি'তে অবস্থিত। এ মসজিদে আমার হযরত[৫৮] সর্বদা জুমার নামায আদায় করতেন। তারাবীর পর পরের দিন পরবর্তী যে সোয়া পারা পড়ব, তা হযরত সাহারানপুরীর ঘরে প্রথমে কয়েকবার দেখে দেখে তরজমাসহ, এরপর মুখস্থ পড়তাম। সেহরী পর্যন্ত পাঁচ ছ'বার পড়া হয়ে যেত। গরমকালে কম হত আর শীত কালে একটু বেশী হত। এরপর তাহাজ্জুদে দু'বার, সাহরী খাওয়ার পর ফজরের সুন্নতে এবং নামাযের পর শোয়া পর্যন্ত একবার। দশটার দিকে ঘুম থেকে উঠে চাশতের নামাযে শীত মৌসুমে একবার, গরমকালে দু'বার। এরপর জোহরের আযানের পনের মিনিট পূর্ব পর্যন্ত এক বা দু'বার দেখে তেলাওয়াত করতাম। জোহরের সুন্নতে প্রথম দিকে দু'বার– আগের চার রাকাতে একবার আর পরের দু' রাকাতে একবার তেলাওয়াত করতাম। পরবর্তীতে উভয় সুন্নতে একবার তেলাওয়াতের অভ্যাস গড়ে উঠে। বাদ জোহর কোনো সহপাঠীকে একবার শোনাতাম। এরপর আসর পর্যন্ত মৌসুমভেদে এক বা দু'বার তেলাওয়াত করার সুযোগ পেতাম। বাদ আসর কোনো বুযুর্গকে শোনাতাম। প্রথম প্রথম হযরতের জীবদ্দশায় হাফেজ মুহাম্মদ হোসাইন ছাহেবকে, এরপর দু' তিন বছর মাযাহেরে উলুমের শিক্ষক মাওলানা আকবর আলী ছাহেবকে শোনাতাম। এরপর সুদীর্ঘকাল

---

৫৭. آپ بیتی ۱/۷۸ পৃ. ৭০ - ৭১

৫৮. হযরত খলীল আহমদ সাহারানপুরী রহ.।

মুফতী মুহাম্মদ ইয়াহইয়া এবং তাঁর দু'ভাই হাকীম মুহাম্মদ ইলয়াছ ও মৌলভী মুহাম্মদ আকিলকে শোনাতাম। বাদ মাগরিব নফলে একবার, এরপর তারাবী পর্যন্ত একবার পড়তাম। তারাবীর পর পরবর্তী দিনের পারা একই নিয়মে পড়া শুরু হত। এভাবে চব্বিশ ঘণ্টায় ত্রিশ পারা পরিমাণ তেলাওয়াত করার জন্য আমার উপর নির্দেশ ছিল। আল্লাহর অশেষ করুণায় বহু বছর ধরে এ আমল চলে এসেছে। শেষ বয়সে অসুস্থতার কারণে এ আমল আর ধরে রাখতে পারিনি।[৯৯]

এরপর হযরত শায়খুল হাদীস রহ. একটি চমৎকার ঘটনা লিখেছেন। ঘটনাটি 'লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি' বইয়ের ৩০৫ - ৩০৬ নং পৃষ্ঠায় পড়ো। আমি চিন্তা করেছি, ঘটনাটির নাম হতে পারে– 'শায়খের তো এখন রমযান মাস'।

১১. 'কান্দালা'র হাফেজ রহীম বখশ ইবনে খোদাবখশ রহ.-এর চল্লিশ বছরে একবার মাত্র তাকবীরে উলা ছুটেছে। এ ছাড়া আর কখনো ছুটেনি।[১০০]

সত্যের জন্য তাঁদের উচ্চাভিলাষ

১. হযরত সালমান ফারসী রা. সত্যানুসন্ধানে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দিয়েছেন। তিনি ছিলেন বর্তমান ইরানের ইস্পাহান শহরের অধিবাসী। বিরাট সম্মান ও বিশাল সম্পদের অধিকারী পিতার আদরের দুলাল হয়ে বিলাসী জীবনযাপন করার তাঁর ছিল পুরো সুযোগ। কিন্তু তিনি সত্যের সন্ধানে প্রশান্ত চিত্তে সবকিছু থেকে রিক্ত হয়েছেন এবং অভাব ও দরিদ্রতাকে স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন। সত্য ধর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখে অগ্নিপূজক পিতা তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল। সত্যের সন্ধানে তিনি পিতার বন্দীশালা থেকে পালিয়ে সিরিয়ায় চলে যান এবং সেখানের ধর্মযাজকের খেদমত করেন।

সেই ধর্মযাজকের মৃত্যুর পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত দ্বিতীয় ধর্মযাজকের খেদমত করেন।

---

৯৯. 'আপবীতি' ১ ঃ ৭৯ - ৮০

১০০. 'আপবীতি' ১ ঃ ৭৮

দ্বিতীয়জনের মৃত্যুর পর তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী ইরাকের মুসেল শহরে এক ধর্মযাজকের খেদমত করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অসিয়ত অনুসারে নসীবীনের এক ধর্মযাজকের খেদমত করেন।

তাঁর মৃত্যুর পর আমুরিয়া নামক স্থানে এক ধর্মযাজকের খেদমত করেন। তাঁর মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে হযরত সালমান ফারসী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন– আপনার মৃত্যুর পর আমি কার খেদমতে যাব। তিনি বললেন, শেষ নবীর আগমনের সময় আসন্ন। তিনি আরব দেশে জন্ম লাভ করবেন। ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী হবেন। তিনি এমন জায়গায় হিজরত করবেন যেখানে খেজুর বেশী হয়। সে জায়গার দু' পাশে কঙ্করময় ভূমি থাকবে। তিনি হাদিয়া গ্রহণ করবেন। সদকা গ্রহণ করবেন না। তাঁর উভয় কাঁধের মাঝে মোহ্‌রে নবুওয়ত থাকবে। অতএব সম্ভব হলে আপনি সেখানে চলে যাবেন। আমুরিয়ার ধর্মযাজকের নিকট থাকা অবস্থায় তিনি কিছু রোজগারও করেন।

আমুরিয়ার এই ধর্মযাজকের মৃত্যুর পর সেখানে মক্কার বনূ কাল্‌বের কতিপয় বণিক ছিল। হযরত সালমান ফারসী রা. তাদেরকে বললেন, আপনারা যদি আমাকে আপনাদের সঙ্গে আরব দেশে নিয়ে যান, তাহলে আমার সমুদয় সম্পদ আপনাদেরকে দিয়ে দিব। তারা তাঁকে নিজেদের সঙ্গে মক্কায় নিয়ে গেল। তিনি প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদেরকে তাঁর সঞ্চিত সকল সম্পদ দিয়ে দেন। কিন্তু তারা অন্যায়ভাবে তাঁকে ক্রীতদাস পরিচয় দিয়ে মদীনার বনী কুরায়যার জনৈক ইহুদীর কাছে বিক্রি করে দেয়।

এভাবে তিনি সেই জায়গায় পৌঁছেন যেখানে খেজুর বেশী হয়। যে জায়গার দু' পাশে কঙ্করময় ভূমি বিদ্যমান। মদীনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত করার পর তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবত লাভে ধন্য হন।

আড়াই শ' বা সাড়ে তিন শ' বছরের তাঁর সুদীর্ঘ পুরো জীবন সত্যের সন্ধানে নিবেদিত ছিল। সত্যানুসন্ধান ছাড়া জীবনের আর কোনো লক্ষ্য

ও ব্যস্ততা ছিল না তাঁর। এমনই ছিল সত্যানুসন্ধানে হযরত সালমান ফারসী রা.-এর উচ্চাভিলাষ।[১০১]

২. এখন সত্যের অনুসন্ধানের উচ্চাভিলাষের এ যুগের একটি ঘটনা

---

[১০১]. «عُلُوُّ الهِمَّةِ» لمحمد أحمد إسماعيل المقدّم ص. ٢١٩ - ٢٢٢

قال الحافظ الذهبيّ رحمه الله في «سِيَر أعلام النُّبَلاء» ٣ : ٣٣٩ – ٣٤٠ : قال العباس بن يزيد البحراني : يقول أهل العلم : عاشَ سلمان ثلاث مائة وخمسين سنةً، فأما مائتان وخمسون فلا يَشُكُّون فيه. . . . . .

وقد فتَّشتُ فما ظفِرت في سِنِّه بشيء، سوى قول البحراني، وذلك منقطع لا إسناد له. ومجموعُ أمره وأحواله وغَزْوه وهِمَّته وتصرُّفه وسَفِّه للجَريد وأشياء مما تقدَّم يُنْبِئُ بأنه ليس بمُعَمَّر ولا هَرِم، فقد فارَقَ وطنَه وهو حَدَث، ولعله قَدِمَ الحجاز وله أربعون سنةً أو أقلَّ، فلم يَنْشَب أنْ سمع بمَبْعَث النبي صلى الله عليه وسلَّم ثم هاجَر، فلعله عاش بضعًا وسبعين سنةً، وما أراه بَلَغَ المائة، فمَنْ كان عنده علم فليُفِدنا.

وقد نَقَل طُول عمره أبو الفرج بن الجوزي وغيره، وما علمت في ذلك شيئا يُركَن إليه.

رَوَى جعفر بن سليمان عن ثابت البناني، وذلك في «العلل» لابن أبي حاتم، قال : لما مرض سلمان خَرَج سعد من الكوفة يَعُوده، فقَدِم، فوافَقَه وهو في الموت يَبْكي، فسلَّم وجلس وقال : ما يُبكيك يا أخي؟ ألا تذكر صحبة رسول الله؟ ألا تذكر المشاهِد الصالحة؟ قال : والله ما يُبكيني واحدة من ثنتين، ما أبكي حبًّا بالدنيا، ولا كراهيةً للقاء الله. قال سعد : فما يُبكيك بعد ثمانين؟ قال : يبكيني أن خليلي عَهِد إليَّ عهدًا، قال : «ليكن بلاغُ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب»، وإنا قد خشينا أنَّا قد تعدَّينا.

رواه بعضهم عن ثابت، فقال : عن أبي عثمان، وإرساله أَشْبَهُ. قاله أبو حاتم، وهذا يُوَضِّح لك أنه من أبناء الثمانين.

وقد ذكرت في «تاريخي الكبير» أنه عاش مائتين وخمسين سنةً وأنا الساعةَ لا أرتضي ذلك ولا أُصَحِّحه.

শোনো। এটি যাঁর ঘটনা সেই 'স্বামী আনন্দ' [মুসলমান হওয়ার পরবর্তী নাম 'মুহিব্বুল্লাহ'] এ যুগেরই মানুষ। তিনি ছিলেন একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু। এশিয়ার পাঁচ বৌদ্ধগুরুর একজন ছিলেন। সারা পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত ছিল। ফলে তিনি দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সতেরটি দেশে এবং এগুলোর বাইরেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধমত প্রচার করেন। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ানোর জন্য তাঁকে গ্রীনকার্ড দেয়া হয়েছিল। আমেরিকার লসএঞ্জেলেসে সাতষট্টিতলা বৌদ্ধ আশ্রমের তিনি তিন বছর প্রধান ছিলেন।

বিভিন্ন নেতা ও শাসক তাদের মাথায় পা রেখে আশীর্বাদ নেয়ার জন্যে তাঁর কাছে আসত। সিঙ্গাপুরের প্রথম রাজা, থাইল্যান্ডের রাজা বরমাপুজো চিউসবিন, ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ও তখনকার ভাইস প্রেসিডেন্টের মাথায় পা রেখে তিনি তাদেরকে আশীর্বাদ দিয়েছিলেন।

শুক্রবার ও মঙ্গলবারে তাঁকে স্বর্ণের সিংহাসনে দাঁড় করিয়ে যদি কেউ এক মটকা পানি দিয়ে তাঁর পা ধুইয়ে দিতে চাইত, তাহলে ঐ ব্যক্তিকে এক লাখ রুপি খরচ করতে হত। আর সেই পা ধোয়া পানি পান করত পাঁচজন লোক।

চিকিৎসার অযোগ্য রোগীদেরকে লোকেরা তাঁর কাছে নিয়ে আসত। ঔষধ হিসেবে তারা তাঁর পেশাব পান করত। একে কেউ দোষের কিছু মনে করত না। কারণ, তারা তাঁকে ভগমান মনে করত।

মোটকথা, তিনি ছিলেন বর্তমান পৃথিবীর জাগতিক প্রথম সারির সম্মানিত ও সম্পদশালী ব্যক্তি এবং তাঁর ছিল চূড়ান্ত স্তরের ভোগ-বিলাশ করার সর্বোচ্চ সুযোগ।

কিন্তু সত্যগ্রহণে তাঁর উচ্চাভিলাষের অবস্থা এই হয়েছে যে, তাঁর সামনে যখন ইসলামের সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে, তখন তিনি পূর্বের ৪৫ [পয়তাল্লিশ] বছরের সকল মান-সম্মান ও ভোগ-বিলাস বিসর্জন দেন এবং ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৩ অক্টোবর ভারতের মাদ্রাজের মামুর মসজিদে কাল্লিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলামে প্রবেশ করেন।[১০২]

---

১০২. "ভারতীয় নওমুসলিমদের ঈমানজাগানিয়া সাক্ষাৎকার" ৪ ঃ ৩৩৮ - ৩৫৬

আল্লাহর পথে জিহাদে তাঁদের উচ্চাভিলাষ

আল্লাহর পথে জিহাদে আমাদের পূর্বসূরীদের উচ্চাভিলাষের উদাহরণ হিসেবে তুরস্কের উসমানী খেলাফতের তরুণ খলীফা মুহাম্মদ আলফাতিহ রহ.-এর কন্‌স্টান্টিনোপল জয়ের ঘটনা উল্লেখ করব। তিনি যখন পূর্ণ যোগ্যতার সাথে তিন লাখ মুজাহিদের বিশাল বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং কন্‌স্টান্টিনোপলে চূড়ান্ত অভিযান চালিয়ে শহরটিকে রোমীয় খ্রিস্টানদের থাবা থেকে মুক্ত করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র চব্বিশ বছর।

তুরস্কের রাজধানী 'ইস্তাম্বুল' শহরের পূর্ব অর্ধেক ইউরোপে আর পশ্চিম অর্ধেক এশিয়াতে অবস্থিত। পৃথিবীতে এটিই একমাত্র শহর যা দুই মহাদেশে বিভক্ত। উভয় মহাদেশের মধ্যে সীমানা নির্ধারণের কাজ করেছে 'বসফরাস প্রণালী'।[১০৩] 'বসফরাস প্রণালী'টি দক্ষিণ-উত্তরে কৃষ্ণসাগর ও মরমরা উপসাগরের মধ্যে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। কৃষ্ণসাগর দক্ষিণে আর মরমরা উপসাগর উত্তরে। ইস্তাম্বুল শহরের ইউরোপ অংশের নাম ছিল 'কন্‌স্টান্টিনোপল'।

কন্‌স্টান্টিনোপল শহরটি ছিল রোম সাম্রাজ্য ও খ্রিস্টধর্ম উভয়ের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। শহরটি মুক্ত করা ছিল প্রায় অসম্ভব বিষয়। এর প্রধান কারণগুলো নিম্নরূপ–

১. শহরটি এমন স্থলে অবস্থিত যে, তার চারপাশের সমুদ্র উপকূল দুর্গের ন্যায় অবরোধ সৃষ্টি করেছিল।

২. সেটি পাহাড়ী অঞ্চল। শীতকালে সেখানকার আবহাওয়া বহিরাগতদের জন্য অসহনীয় থাকে।

৩. শহরটির চারপাশে পরপর তিনটি প্রাচীর ছিল। তাতে ১৭০ ফুট পর পর সুদৃঢ় শৃঙ্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। প্রতিটি প্রাচীর ছিল অত্যন্ত মজবুত। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে একটি অনতিক্রম্য পরিখা খনন করা হয়েছিল, যা ৬০ ফুট চওড়া এবং ১০০ ফুট গভীর ছিল। শহরটিকে পৃথিবীর সর্বাধিক সুদৃঢ় ও অজেয় দূর্গ মনে করা হত।

---

[১০৩]. দু'টি সাগর বা মহাসাগরকে সংযোগকারী সংকীর্ণ জলভাগকে 'প্রণালী' বলা হয়।

৪. খ্রিস্টজগতে শহরটির যে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থান ছিল, তার ভিত্তিতে এর দিকে অন্য কারো হাত প্রসারিত হতে দেখলে সমগ্র খ্রিস্টজগত জীবনবাজি রেখে প্রতিরোধ করার জন্য প্রস্তুত থাকত।[১০৪]

মাত্র চব্বিশ বছর বয়সের তরুণ খলীফা মুহাম্মদ বিন মুরাদ ফাতিহ-এর উচ্চাভিলাষ দেখো, তিনি এই শহরটিকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি যেভাবে অভিযান চালানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং আল্লাহর তাওফীকে শেষ পর্যন্ত শহরটি মুক্ত করেন, তা অবগত হলে আল্লাহর পথে জিহাদে আমাদের পূর্বসূরীগণ কেমন উচ্চাভিলাষের অধিকারী ছিলেন, তা আন্দাজ করতে পারবে।

সামনের লেখায় তাঁর যোগ্যতা সম্পর্কে অবগত হও। জনৈক রোমীয় খ্রিস্টান পর্যটক কন্‌স্টান্টিনোপল জয়ের কাছাকাছি সময়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। তিনি তাঁর দেহাবয়ব, মহামানবোচিত চরিত্র এবং তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনার পর বলেছেন–

'মাত্র ছাব্বিশ বয়সের যুবক[১০৫]। কিন্তু ইটালী, তার রাজধানী এবং সম্রাট সম্পর্কে তাঁর আলোচনা অত্যন্ত বাস্তবানুগ ও নিখুঁত তথ্যভিত্তিক। ইউরোপে কত শত দেশ! অথচ তাঁর সামনে রয়েছে সেগুলোর বিস্তারিত মানচিত্র, প্রতিটি দেশ-অঞ্চল তাতে সুস্পষ্ট। বিশ্বপরিস্থিতি ও যুদ্ধশাস্ত্রের মত প্রিয় ও আনন্দদায়ক আর কোনো আলোচনার বিষয় তাঁর কাছে নেই। বিষয় ও পরিস্থিতি সম্পর্কে খুবই বিচক্ষণ ও সতর্ক। শাসনকার্যে একনিষ্ঠ ও টগবগে। দেখো, ইনি সেই ব্যক্তি যার মোকাবেলা করতে হবে আমাদের খ্রিস্টান-বিশ্বকে। অত্যন্ত সতর্ক, অত্যন্ত তীক্ষ্ম তাঁর পর্যবেক্ষণ। শীত-গরম, ক্ষুধা-পিপাসা ও সর্বপ্রকার কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম।"[১০৬]

---

১০৪. "হারানো ঐতিহ্যের দেশে", পৃ. ২৩ - ২৪

১০৫. আলোচ্য রোমীয় খ্রিস্টান পর্যটকের বক্তব্যটি নেয়া হয়েছে اسْتَنْبُول وحضارةُ الإمبراطوريَّة العثمانيَّة কিতাব থেকে। মূল লেখকের নাম বার্নাড লুয়েস। আরবী অনুবাদক হলেন রিযওয়ান আলী নাদাবী। আরবী অনুবাদক লিখেছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর বয়স তখন ছাব্বিশ নয়, বরং চব্বিশ বছরও অতিক্রম করেনি।

১০৬. "মুসলিম উম্মার পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল?" পৃ. ২৬৮

অন্য এক পশ্চিমা লেখক বলেছেন– মুহাম্মদ আলফাতিহ-এর এ বিজয় নিছক ভাগ্যের উপহার ছিল না, কিংবা ছিল না শুধু প্রতিপক্ষ শক্তির দুর্বলতার ফল, বরং এ জন্য দীর্ঘকাল তিনি প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন এবং সমকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি আয়ত্ত করে যুদ্ধে সেগুলো পূর্ণ কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কামান ছিল তখন সদ্য-উদ্ভাবিত যুদ্ধাস্ত্র। কন্‌স্টান্টিনোলনের প্রাচীরসমূহ বিধ্বস্ত করার জন্য হাঙ্গেরীয় এক প্রকৌশলীর সাহায্যে তিনি এমন একটি কামান তৈরি করেন, যার সমকক্ষ কোনো কামান তখন পৃথিবীর বুকে ছিল না। এর দ্বারা আটমন ওজনের গোলা এক মাইলের বেশী দূরে নিক্ষেপ করা যেতো। বলা হয়, ঐ কামান চালাতো সাতশ' লোক, আর তা বারুদবোঝাই হতো দু' ঘণ্টায়।[১০৭]

তিনি কীভাবে কন্‌স্টান্টিনোপল মুক্ত করলেন, এখন সংক্ষেপে সেই বিবরণ শোনো। আমার এই বিবরণের উৎস হলো বিচারপতি মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা.-এর 'হারানো ঐহিহ্যের দেশে' শিরোনামে প্রকাশিত সফরনামা।

কন্‌স্টান্টিনোপল শহরটি তিন দিক থেকে পানিবেষ্টিত। দক্ষিণে 'গোল্ডেন হর্ন' নামক সাগর, পশ্চিমে 'বসফরাস' নামক প্রণালী, আর উত্তরে 'মরমরা' উপসাগর। শুধু পূর্ব দিক ভূমিবেষ্টিত। তাই কন্‌স্টান্টিনোপলে সফল অভিযান চালানের জন্য একটি শক্তিশালী নৌবহর প্রয়োজন ছিল। মুহাম্মদ আলফাতিহ একশত চল্লিশটি যুদ্ধজাহাজের নৌবহর গড়ে তুলেন।

এই বিশাল প্রস্তুতির পর তিনি শহর অবরোধ করেন। তাঁর স্থলবাহিনী শহরের পূর্ব প্রাচীরের সম্মুখে অবস্থান নেয়। নৌবহর বসফরাস প্রণালীতে ছড়িয়ে পড়ে। শহরের নৌবন্দর 'গোল্ডেন হর্ন' নামক সাগরে। বসফরাস থেকে বন্দরে যেতে হলে 'গোল্ডেন হর্নে' প্রবেশ করে যেতে হবে। কিন্তু রোমীয়রা 'গোল্ডেন হর্নে'র বসফরাসসংলগ্ন মাথায় লোহার বড় একটি শিকল বেঁধে রেখেছিল। ফলে বসফরাস থেকে কোনো জাহাজ গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করতে পারত না। তাই জাহাজগুলো দ্বারা বন্দর অঞ্চল অবরোধ করার কোনো সুযোগ হচ্ছিল না। শুধু পূর্বের স্থলপথেই প্রাচীরের উপর

---

[১০৭]. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৯। এখানে একটি টীকা আছে। ১৫৩ - ১৫৫ নং পৃষ্ঠায় টীকাটি পড়ো।

আক্রমণ করা সম্ভব ছিল। আর রোমীয়রা সমুদ্রের দিককে সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত মনে করে তাদের সম্পূর্ণ শক্তি পূর্ব দিকের প্রাচীর রক্ষায় প্রয়োগ করে।

মুহাম্মদ আলফাতিহ উচ্চাভিলাষ দেখো। তিনি হতাশ হন নি। তিনি বন্দরের দিক থেকে আক্রমণ করার জন্য যেকোনোভাবে কিছু জাহাজ গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করানোর প্রচেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু গোল্ডেন হর্নের প্রবেশদ্বারে লোহার শিকল তো ছিলই। তাছাড়া গোলা নিক্ষেপ করার জন্য তার আশেপাশে কামানও বসানো ছিল। উপরন্তু লোহার শিকল সংরক্ষণের জন্য গোল্ডেন হর্ন সাগরে রোমীয় বড় বড় জাহাজও নিয়োজিত ছিল। ফলে অনেকদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করার কোনো চেষ্টা সফল হয়নি।

অবশেষে উচ্চাভিলাষী মুহাম্মদ আলফাতিহ এমন একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যা পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে একমাত্র বিরল ও বিস্ময়কর স্মৃতি হয়ে আছে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁর জাহাজগুলোকে দশ মাইল পথ অতিক্রম করিয়ে গোল্ডেন হর্নে প্রবেশ করাবেন। বসফরাস প্রণালীর পশ্চিম তীর থেকে জাহাজ তুলে একটি ঘোরাপথে গোল্ডেন হর্নের দক্ষিণ তীরে পৌঁছবেন। উক্ত স্থানটিকে বর্তমানে 'কাসেম পাশা' বলা হয়। সেখান থেকে জাহাজগুলোকে গোল্ডেন হর্নে নামিয়ে দেবেন। সেই দীর্ঘ দশ মাইল স্থলপথটি ছিল পাহাড়ী, বন্ধুর ও মারাত্মক অসমতল। মুহাম্মদ আলফাতিহের উচ্চাভিলাষ এবং অকল্পনীয় ও বিস্ময়কর কর্মশক্তি একটি মাত্র রাতে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করে দেখায়। প্রথমে তিনি সেই স্থলপথে কাঠের তক্তা বিছিয়ে দেন। চর্বি দ্বারা ঘষে ঘষে তক্তাগুলোকে পিচ্ছিল করেন। তারপর জাহাজসদৃশ সত্তরটি নৌকা পর পর 'বসফরাস' থেকে উপরে তুলে সেই তক্তার উপর উঠিয়ে দেন। প্রতিটি নৌকায় দু'জন করে মাল্লা ছিল। বাতাসের সাহায্য পাওয়ার জন্য পাল উড়িয়ে দেয়া হয়। তারপর বলদ ও মানুষ মিলে জাহাজগুলোকে টেনে নিয়ে দশ মাইল দীর্ঘ এই পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে গোল্ডেন হর্নে পৌঁছে দেয়।

মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা. তাঁর তুরস্ক সফরে উক্ত 'কাসেম পাশা' স্থানে গিয়েছেন। তিনি অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন– ঘটনাটি ইতিহাসগ্রন্থে অনেকবারই পড়েছিলাম। বিস্ময়ও জেগেছিল। কিন্তু এখানে এসে আমার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। কারণ, এখানে দাঁড়িয়ে

বসফরাসের দিকে তাকিয়ে পথে অনেকগুলো উঁচু উঁচু পাহাড় দেখতে পেলাম। পাহাড়গুলো প্রস্থে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। সমতল স্থলপথে জাহাজ নিয়ে যাওয়াও রীতিমত এক বিস্ময়ের ব্যাপার। কিন্তু এই পাহাড়গুলোর উপর জাহাজ উঠিয়ে তা নামিয়ে আনা এমন বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এই অঞ্চল দেখে তা কোনো লোকের কল্পনা করতেও ঘাম ঝরাতে হবে। এই পাহাড়গুলো দেখার পর পাহাড়ের উপর দিয়ে জাহাজ নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা একটি লোক কিরূপে করল, সেটিই বড় বিস্ময়ের কথা।

যাই হোক, গোল্ডেন হর্ন সাগরে পৌঁছার পর মুহাম্মদ আলফাতিহ একটি পুল নির্মাণ করে তার উপর ভারী কামান বসিয়ে দেন এবং নগর-রক্ষা প্রাচীরের উপর প্রচণ্ডভাবে গোলা নিক্ষেপ আরম্ভ করেন। সাত সপ্তাহ কাল অবিরাম গোলা বর্ষণের পর প্রাচীরের তিন স্থানে বড় বড় ফাটল দেখা দেয়। তারপর মুহাম্মদ আলফাতিহ চূড়ান্ত আক্রমণের সফলতার ব্যাপারে নিশ্চিত হন। কিন্তু তিনি আক্রমণ করার পূর্বে রোমসম্রাটকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানান। সাথে সাথে প্রজাদের জানমালের কোনো ক্ষতি না করারও প্রতিশ্রুতি দেন। রোমসম্রাট তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে পাঁচ দিন পর মুহাম্মদ আলফাতিহ সর্বশেষ ও চূড়ান্ত আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

২০ই জুমাদাল উলা ৮৫৭ হিজরীর রাত মুজাহিদবাহিনী যিকির-আযকার, তাসবীহ-তাহলীল ও দোয়ার মধ্যে কাটান। খুব ভোরে ফজর নামায আদায় করার পর তাঁরা নগর-প্রাচীরের দিকে যাত্রা করেন। মুহাম্মদ আলফাতিহ এই উচ্চাভিলাষ প্রকাশ করলেন– 'ইনশাআল্লাহ আমরা "আয়া সুফিয়া" গীর্জায়[১০৮] জোহর নামায আদায় করব।' বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ চলতে থাকে। তবে 'সেন্ট রোমাস' ফটকে বেশী জোর দেয়া হয়।[১০৯] কারণ, এখানকার প্রাচীর খুব বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরিখা অতিক্রম করার জন্য তার উপর সিঁড়ি ও জাল ফেলা হয়। রোমীয় সৈন্যরাও সেদিন অসাধারণ বিরত্বের সাথে লড়াই করে। দুপুর পর্যন্ত উভয় পক্ষ থেকে আগুন ও রক্তের ভীষণ সংঘর্ষ চলতে থাকে। একজন মুজাহিদও শহরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি।

---

১০৮. 'আয়া সুফিয়া' গীর্জাটি কনস্টান্টিপোল বিজয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীতে খ্রিস্টানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উপাসনালয় ছিল।

১০৯. বর্তমানে এই ফটকটিকে 'তোপকাপে' বলা হয়।

তারপর মুহাম্মদ আলফাতিহ তাঁর বিশেষ বাহিনীকে [ইয়ানিচারী বাহিনী] সঙ্গে করে 'সেন্ট রোমান্স' ফটকের দিকে অগ্রসর হন। ইয়ানিচারী বাহিনীর নেতা আগা হাসান তাঁর ত্রিশ জন বীর সঙ্গীকে সাথে করে প্রাচীরের উপরে আরোহন করেন। হাসানসহ তাঁর আঠার জন সঙ্গীকে শত্রুরা সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর থেকে নীচে ফেলে দেয়। তাঁরা শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেন। অবশিষ্ট বার জন প্রাচীরের উপর দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হন। তারপর মুজাহিদ বাহিনীর অন্যান্য দলও একের পর এক প্রাচীরে আরোহন করতে থাকেন। এমনিভাবে কন্‌স্টান্টিনোপল প্রাচীরে মুসলমানদের পতাকা উড়িয়ে দেয়া হয়। ইতিমধ্যে রোমীয় অসাধারণ বীর যোদ্ধারা সাহস হারিয়ে ফেলে। রোম সম্রাটও যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হয় এবং কন্‌স্টান্টিনোপল রোমীয়দের দখল থেকে মুক্ত হয়।

যোহরের সময় মুহাম্মদ আলফাতিহ তাঁর উজির ও সর্দারদেরকে নিয়ে সেন্ট রোমান্স ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করেন। তিনি সর্বাগ্রে আয়া সুফিয়া গীর্জায় পৌঁছে অশ্ব থেকে অবতরণ করেন। গীর্জার প্রাচীরে ছবির কারুকার্য ছিল। তাঁর নির্দেশে সেগুলো মিটিয়ে দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। তারপর তাঁর নির্দিষ্ট মুয়াজ্জিন আযান দেন। শিরক ও কুফরের এই কেন্দ্রে প্রথমবার أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ এবং أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ-এর প্রাণবন্ত ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়। মুহাম্মদ আলফাতিহ এখানে যোহর নামায আদায় করেন এবং তাঁর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করেন। তখন থেকে কন্‌স্টান্টিনোপলের জগতবিখ্যাত এই গীর্জা মসজিদে রূপান্তরিত হয়।

এভাবে মুহাম্মদ আলফাতিহ ও তাঁর বাহিনী ইহ-পরকালের সর্দার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই ভবিষ্যৎবাণীর লক্ষ্যে পরিণত হন, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন–

لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِيْنِيَّةُ، فَلَنِعْمَ الأَمِيرُ أَمِيرُهَا! وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذٰلِكَ الْجَيْشُ![১১০]

'অতি অবশ্যই কন্‌স্টান্টিনোপল বিজয় হবে। তার আমীর কত না উত্তম! ঐ বাহিনী কত না উত্তম!'

---

১১০. مسند أحمد بتحقيق شُعَيْب الأَرْنَاؤُوط হাদীস নং ১৮৯৫৭

* জিহাদের অঙ্গনে হযরত 'আলা বিন হাযরামী রা.-এর উচ্চাভিলাষ দেখো। জিহাদ করতে করতে যখন তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে পৌঁছালেন, তখন সাগরের পানিতে ঘোড়া নামিয়ে দিয়ে বলেছিলেন– হে সাগর! আল্লাহর শপথ, যদি জানতাম তোমার ওপারে কোনো ভূখণ্ড আছে, তাহলে আমি তোমার বুকে ঝাঁপ দিতাম এবং আল্লাহর বাণী উঁচু করার জন্য তা জয় করতাম।[১১১]

* এখন স্পেন-বিজয়ের অন্যতম নেপথ্য-নায়ক উক্‌বা বিন নাফে' রহ.-এর উচ্চাভিলাষ দেখো। আটলান্টিক মহাসাগরের পানিতে ঘোড়ার পা নামিয়ে দিয়ে একবার পিছনে তাঁর সারিবদ্ধ বাহিনীর দিকে তাকাচ্ছেন। আরেকবার তাকাচ্ছেন মহাসাগরের তরঙ্গমালাব দিকে। তারপর বলেছিলেন– হে আল্লাহ! তুমি জান আমি এ পথে দম্ভ ও অহঙ্কারবশত বের হয়নি। আমি ও আমার সাথীদের লক্ষ্য শুধু এটিই যে, তোমার দ্বীন প্রসার হোক, তোমার বাণী উঁচু হোক, তোমার শরীয়তের সাহায্য হোক এবং পৃথিবীতে একমাত্র তোমার ইবাদত হোক, তোমাকে ছাড়া আর কারো ইবাদত না হোক। হে আমার প্রভু! আমি ও আমার সাথীরা কান্তির শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। তারপরও যদি এই সমুদ্র না হত, তাহলে তোমার পথে জিহাদ করতে করতে সামনে বাড়তাম।[১১২]

সেবার ক্ষেত্রে তাঁদের উচ্চাভিলাষ

১. খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর রা. যখন বর্তমান সৌদিআরব, সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন দেশসহ আরও অনেক ভূখণ্ডের শাসক, যখন অন্যদেরকে দিয়ে মানুষের সেবা করার যথেষ্ট সুযোগ ছিল তাঁর, তখনও শত ব্যস্ততার মাঝে তাঁর স্বয়ং নিজে সেবা করার বিরল অনেক ঘটনা রয়েছে, যেগুলো সেবার ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চাভিলাষের সাক্ষ্য বহন করে। সে ধরনের একটি ঘটনা হলো–

হযরত ওমর রা. রাতের অন্ধকারে এক বাড়ীতে যেতেন। হযরত তালহা রা. তা লক্ষ করতেন। উক্ত বাড়ীতে হযরত ওমর রা. কেন

---

১১১. عُلُوُّ الهِمَّةِ পৃ. ৩১২

১১২. «الطريق إلى الأَنْدَلُسِ» لعبدِ الرحمن رَأْفَت الباشا পৃ. ৩৬ - ৩৭

যেতেন তা জানার কৌতূহল ছিল হযরত তালহা রা.-এর। তাই তিনি একদিন সকালে ঐ বাড়ীতে গেলেন। দেখলেন সেখানে একজন অন্ধ ও বিকলাঙ্গ বৃদ্ধা মহিলা ছাড়া আর কেউ নেই। হযরত তালহা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রাতে যে লোকটি আপনার নিকট আসেন তিনি কেন আসেন? বৃদ্ধা বললেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার দেখাশোনা করেন। আমার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আসেন এবং আমার মলমূত্র পরিষ্কার করেন।[১১৩]

২. দারুল উলূম দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা আজীজুর রহমান রহ. ইলমী অঙ্গনে এমন উঁচু স্তরের ছিলেন যে, দারুল উলূমের মুহতামিম কারী মুহাম্মদ তাইয়েব ছাহেব রহ.-এর বক্তব্য অনুসারে তাঁর প্রদানকৃত ফতোয়ার সংখ্যা আনুমানিক এক লাখ আঠার হাজার। তাছাড়া তাঁর রচিত 'আজীজুল ফাতাওয়া' কিতাবটি মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা.-এর বক্তব্য অনুসারে আজ সকল মুফতিয়ানে কেরামের জন্য দিকনির্দেশক। ফতোয়ার কাজে তিনি এতই ব্যস্ত থাকতেন যে, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও তাঁর হাতে একটি ফতোয়া ছিল। মৃত্যুবরণ করার ফলে কপিটি হাত থেকে বুকের উপর পড়ে ছিল।

কিন্তু এত উঁচু মর্যাদার অধিকারী ও প্রচণ্ড ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও সেবার ক্ষেত্রে তাঁর উচ্চাভিলাষ এই ছিল যে, তিনি শুধু নিজ পরিবারের বাজার করতেন না। উপরন্তু এলাকার সকল বিধবা ও অসহায় লোকদের বাজারও নিজে করতেন। মুফতী মুহাম্মদ শফী [১৩১৪ - ১৩৯৬ হি.] রহ. বলেছেন, কোনো কোনো সময় এমনও হতো যে, যখন তিনি জিনিস-পত্র দেয়ার জন্য যেতেন, সেগুলো দেখে কোনো কোনো মহিলা বলে উঠতো– মৌলভী সাহেব! এ জিনিস তো ভুল এনেছেন। আমি এ জিনিস এতটুকু নয়, বরং এতটুকু আনতে বলেছিলাম। তখন তিনি পুনরায় বাজারে গিয়ে মহিলাকে চিন্তামুক্ত করতেন।

---

১১৩. «أخبارُ عُمَرَ وأخبارُ عبدِ الله بنِ عُمَرَ» لِعَلِيٍّ الطَّنْطَاوِيِّ وأَخِيه ناجِي الطَّنْطَاوِيِّ ص. ৪৬৩

উল্লেখ্য, তখন মানুষের কাছে নগদ টাকা-পয়সা খুবই কম থাকত। তাই বাজার থেকে কিছু কেনার প্রয়োজন হলে মানুষ সাধারণত শাক-সব্জি ও ফসল প্রভৃতি বাজারে নিয়ে বিক্রি করত। তারপর উক্ত অর্থ দিয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করত।

মুফতী আজীজুর রহমান রহ. মাঝে মাঝে অন্যদের ছেঁড়া জুতাও দোকান থেকে সেলাই করে আনতেন।[১১৩]

৩. এবার সেবার ক্ষেত্রে হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ.-এর উচ্চাভিলাষের দু'টি ঘটনা শোনো। একরাতে দু'জন হযরত শায়খুল হিন্দের মেহমান হয়েছিলেন। একজন হযরত মাওলানা কারী মুহাম্মাদ তাইয়েব ছাহেব রহ.-এর শ্বশুর মাওলানা মাহমুদ ছাহেব। দ্বিতীয়জন তাঁর এলাকার একজন হিন্দু। মাওলানা মাহমুদ ছাহেব বলেন– রাতে যখন সকলে ঘুমিয়ে পড়ল, আমি লক্ষ্য করলাম, হযরত শায়খুল হিন্দ আমাদের নিকট আসছেন। আমি মনে মনে বললাম, হযরত যদি কোনো কষ্টকর কাজ আরম্ভ করেন, তাহলে উঠে সহযোগিতা করব। অন্যথায় নিজের জাগ্রত থাকার কথা প্রকাশ করে হযরতকে পেরেশান করব না। বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করলাম, হযরত আমার হিন্দু সাথীর নিকট গিয়ে তার পা দাবাতে লাগলেন। এদিকে সে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। আমি ওঠে গিয়ে বললাম, হযরত আপনি কষ্ট করবেন না, আমি তার পা দাবিয়ে দিচ্ছি। হযরত বললেন, তুমি শুয়ে থাকো। সে আমার মেহমান, আমার মেহমানের খেদমত আমি করব। হযরতের এ উত্তর শুনে আমি চুপ হয়ে গেলাম। হযরত তার পা দাবাতে থাকলেন।[১১৪]

৪. সেবার ক্ষেত্রে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর দ্বিতীয় ঘটনাটি হলো, রমযান মাসে হযরত শায়খুল হিন্দের এখানে তারাবীর নামায সেহরীর

---

১১৩. اخلاص کا تاج محل دار العلوم دیوبند পৃ. ১৩৯; اکابر دیوبند کیا تھے পৃ. ১০১ - ১০২; (মাওলানা মুহাম্মাদ মনযুর নো'মানী রহ.-এর লিখিত) "আমার জীবনকথা" পৃ. ১০৪

১১৪. اکابر دیوبند کیا تھے পৃ. ১১৪ - ১১৫

সামান্য পূর্বে শেষ হতো। কয়েকজন হাফেজ কয়েক পারা করে তেলাওয়াত করতেন। অল্প খাদ্রগ্রহণ, কম ঘুম ও দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার কারণে একবার হযরতের শারীরিক অসুস্থতা খুব বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর নিয়মে কোনো পরিবর্তন করেননি। এই পরিস্থিতিতে বাড়ীর মহিলাগণ তারাবীর এক ইমামকে বললেন, আজ নিজের ক্লান্তি ও কষ্টের কথা বলে একটু আগে নামায শেষ করে দিবেন। হযরত অন্যদের আরামের প্রতি খুব লক্ষ রাখতেন। তাই সহজেই রাযী হয়ে গেলেন। তারাবীর পর হাফেজ সাহেব শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর অনুভব করলেন, কে যেন আস্তে আস্তে তার পা দাবাচ্ছে। তাকিয়ে দেখলেন, স্বয়ং হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.। তিনি লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত বললেন, এতে কী সমস্যা? তোমার শরীর খারাপ লাগছে। একটু পা দাবিয়ে দিলে আরাম লাগবে।[১১৬]

বিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁদের উচ্চাভিলাষ

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. 'আপবীতি'[১১৭] কিতাবে লিখেছেন–

১. হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. বলেছেন, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ, মাওলানা ফখরুদ্দীন চিশতী রহ. ও হযরত মীর্জা মাযহার জানে জানা রহ. তিনজনই সমসাময়িক ছিলেন। তিনজনই দিল্লিতে থাকতেন। এক ব্যক্তির মনে উদয় হল, তিনজনই যেহেতু এক শহরে থাকেন, তাই তাঁদের পরীক্ষা করা উচিত, তাঁদের মধ্যে কে বেশি মর্যাদাসম্পন্ন। সে প্রথমে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হয় এবং বলে, হযরত! আমার গরীবখানায় আগামীকাল আপনার দাওয়াত; আপনি দাওয়াত গ্রহণ করুন এবং নয়টার সময় মেহেরবানী করে নিজেই চলে আসবেন, আমার আসার অপেক্ষায় থাকবেন না। শাহ ছাহেব বললেন, ঠিক আছে।

---

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭ - ১০৮

১১৭. ২ ঃ ২৩০ - ২৩২, ২৪৬ - ২৪৮, ২৫০ - ২৫১

এরপর সে মাওলানা ফখরুদ্দীন ছাহেবের খেদমতে উপস্থিত হয়। দাওয়াত দেয়ার পর বলে, সাড়ে নয়টার সময় আমার আসার অপেক্ষা না করে অনুগ্রহ করে চলে আসবেন; যা কিছুর ব্যবস্থা হয় গ্রহণ করবেন।

সেখান থেকে উঠে সে মীর্জা মাযহার জানে জানা রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। দাওয়াত দিয়ে বলে, ব্যবসার কাজে ব্যস্ত থাকার দরুন আমি না-ও আসতে পারি। দশটার সময় দয়া করে আমার গরীবখানায় চলে আসবেন।

তিনজনই দাওয়াত গ্রহণ করেন। পরের দিন প্রত্যেকেই যথাসময়ে উপস্থিত হন। নয়টার সময়ে প্রথমে শাহ ছাহেব আসেন। দাওয়াতকারী তাঁকে একটি কামরায় বসিয়ে চলে যায়। সাড়ে নয়টার সময় ফখরুদ্দীন চিশতী রহ. আসেন। তাঁকে অন্য কামরায় বসায়। এরপর দশটার সময় মীর্জা মাযহার জানে জানা রহ. আসেন। তাঁকে আরেক কামরায় বসায়। তিনজনের প্রত্যেককেই পৃথক পৃথক কামরায় বসানো হয়। একজন অপরজনের কথা জানেন না। তিনজনেরই বসার পর সে পানি নিয়ে আসে। হাত ধোয়ানোর পর খাবার নিয়ে আসছি বলে সে ভিতরের ঘরে যায়। কয়েক ঘণ্টা চলে যায়। কিন্তু সে মেহমানদের কোনো খোঁজ খবর নেয়নি। কে গেল আর কে রয়ে গেল সেটাও এসে দেখল না।

যখন যোহর নামাযের সময় ঘনিয়ে এল, তখন সে ভাবল, মেহমানদের তো নামায পড়তে হবে। তাই সে শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.-এর নিকট আসল এবং লজ্জিত হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, হযরত! ঘরে একটু সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তাই খাবারের কোনো ব্যবস্থা করতে পারিনি। দু' পয়সা দিয়ে বলে, হয়রত! দয়া করে এগুলো গ্রহণ করুন। শাহ ছাহেব সানন্দে তা গ্রহণ করেন এবং বলেন, কোনো অসুবিধা নেই; ভাই! ঘরে কখনো কখনো এমন হয়। লজ্জিত হওয়ার কোনো কারণ নেই।

এরপর সে মাওলানা ফখরুদ্দীন চিশতী রহ.-এর নিকটে যায়। শাহ ছাহেবের সামনে যা বলেছে এখানেও তা-ই বলল। আর তাঁকেও দু' পয়সা হাদিয়া দেয়। মাওলানা ফখরুদ্দীন চিশতী রহ. বললেন, চিন্তার কিছু নেই। ভাই! অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটে। তিনি দাঁড়িয়ে অত্যন্ত আগ্রহভরে সম্মানের সাথে রুমাল বিছিয়ে দু' পয়সার হাদিয়া গ্রহণ

করেন। এরপর রুমাল বেঁধে সেখান থেকে রওয়ানা করেন।

দু'জনকে বিদায় করার পর সে হযরত মীর্জা মাযহার জানে জানা রহ.-এর নিকট যায়। আগের মতো ওযর পেশ করে তাঁর সামনেও দু' পয়সার হাদিয়া পেশ করে। মীর্জা মাযহার ছাহেব পয়সা দু'টো তুলে পকেটে রাখেন এবং কপাল ভাঁজ করে বলেন, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু ভবিষ্যতে আমাকে এরূপ কষ্ট দিবেন না। এ বলে তিনি চলে যান।

দাওয়াতকারী এ ঘটনাটি সমকালীন অন্যান্য বুযুর্গদের কাছে বর্ণনা করে। তাঁরা বলেন, মাওলানা ফখরুদ্দীন ছাহেব দরবেশীতে সকলের অগ্রগামী। কারণ তিনি আগ্রহভরে সম্মানের সাথে দাঁড়িয়ে হাদিয়া গ্রহণ করেন। এরপরের স্তরে হলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহ.। তিনি দাঁড়াননি, কিন্তু সানন্দে হাদিয়া কবুল করেন। তৃতীয় স্তরে হলেন মীর্জা ছাহেব। হাদিয়া গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সাথে অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করেছেন।

এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত ইমামে রাব্বানী গঙ্গুহী রহ. বলেন, সে যুগের বুযুর্গদের বক্তব্য এরূপই ছিল। তবে আমার কাছে মীর্জা ছাহেবের স্তরই সকলের উর্ধ্বে। এত স্পর্শকাতর মেযাজের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এ পরিমাণ ধৈর্যধারণ করা এবং 'কোনো অসুবিধা নেই' উত্তর দেয়া তা-ই প্রমাণ করে।[১১৮]

ارواحِ ثلاثہ গ্রন্থেও ঘটনাটি সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। তাতে আমীর শাহ খান ছাহেব বলেন, এ ঘটনা আমাকে হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. শুনিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী ও হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহীও শুনিয়েছেন।

হাজী ছাহেব এ ঘটনা শোনানোর পর বলেন, মাওলানা ফখরুদ্দীন ছাহেবের ব্যবহার অত্যন্ত বিনম্র; চিশতিয়া তরীকার পরিষ্কার বহিঃপ্রকাশ।

মাওলানা নানুতবী রহ. বলেন, শাহ ওয়ালীউল্লাহ ছাহেব রহ.-এর ব্যবহার সবচেয়ে সুন্দর; কারণ তাঁর মনকে বিষয়টি নাড়াই দেয়নি।

হযরত গঙ্গুহী রহ. বলেন, মীর্জা ছাহেবের ব্যবহারই সবচেয়ে সুন্দর। কারণ মীর্জা ছাহেব যা বলেছেন, তা-ই এ ক্ষেত্রে ন্যায়সঙ্গত।

---

১১৮. تذکرۃ الرشید ২ ঃ ২৫৮

হযরত থানবী রহ. ارواحِ ثلاثہ কিতাবের টীকায় হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, আমার ঝোঁক হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর মতের পক্ষে।[১১৯]

২. হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানুতবী রহ.[১২০] سوانح قاسمی তে লিখেন, হযরত মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ. সাদাসিধে জীবনযাপন করতেন। তিনি যখন আমার নিকট থাকতেন, চেহারা-সুরতে তাঁকে আত্মভোলা লোক মনে হত। মাথার চুল লম্বা ও এলোমেলো। চুল ধুতেন না। চুলে তৈল দিতেন না। চুল আঁচড়াতেনও না; এক আশ্চর্য অবস্থা। বন্ধুদের মুখে শুনেছি, মৌলভী আহমদ আলী ছাহেবের ছাপাখানায় যখন মাওলানা নানুতবী কাজ করতেন, দীর্ঘদিন যাবৎ কেউ 'মৌলভী ছাহেব' বলে ডাকলে উত্তর দিতেন না। কেউ নাম ধরে ডাকলে খুশি হতেন। কেউ সম্মান করলে ভয় পেতেন। সকলের সাথে অমায়িকভাবে মিশতেন। তাঁর যেসকল শাগরিদ ও মুরীদ ছিল, তাদের সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতেন। নিজের বেশভূষায় বা চালচলনে মানুষ সম্মান দেখাতে পারে এমন কোনো পরিচ্ছদ রাখতেন না। আলেমগণ যে সব পোষাক পরেন, পাগড়ি বা পাঞ্জাবী কিছুই পরতেন না। একদিন তিনি বলেন, শুধু এই ইলমের কারণে পারছি না। তা না হলে পাগড়ি ও পাঞ্জাবী কিছুই আমি পরিধান করতাম না। নিজের পরিচয়কে এমনভাবে গোপন করতাম যে, কেউ আমাকে জানতেই পারত না।

মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব বলেন, এত প্রসিদ্ধির পরও আসলে লোকেরা তাঁর সম্পর্কে কতটুকু জানতে পেরেছেন? তাঁর মাঝে কী কী কামালাত আছে এবং কী পরিমাণ আছে, তা কে জেনেছে? কতটুকুই

---

১১৯. ارواحِ ثلاثہ পৃ. ১৬

১২০. হযরত মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ. তাঁর থেকে মাত্র কয়েক মাসের বড় ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় ১২৪৮ হিজরীর শা'বান বা রমযান মাসে। সূত্র, 'আপবীতি' ২ ঃ ২৪

বা প্রকাশ পেয়েছে? নিজের কথামত মাটির সাথেই সবকিছু মিশিয়ে দিয়েছেন। কখনো মাসআলা বলতেন না; মাসআলা জিজ্ঞেসকারীকে অন্য কারো কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ফতোয়ায় নিজের নাম লেখা ও সিল মারা তো দূরের কথা। প্রথম প্রথম তো ইমামতি করতেও ভয় পেতেন। জীবনের শেষদিকে নিজ এলাকায় কোনো সময় নামায পড়ালেও ওয়াজ করতেন না। জনাব মৌলভী মুযাফফর হোসাইন কান্দলভী রহ. সর্বপ্রথম জোর করে তাঁকে দিয়ে ওয়াজ করান এবং নিজেও বসে ওয়াজ শুনেন এবং খুব খুশি হন।[১২১]

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম ,নানুতবী রহ. নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভয় করতেন। কোনো গভর্নরের সাথে সাক্ষাতের সুযোগ আসতে দিতেন না। 'খোরাজা'র এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কয়েক বছর যাবৎ এ আশায় ছিল যে, হযরত একবার আমার বাড়ীতে আসবেন। কিন্তু তার এ আশা পূরণ হচ্ছিল না। ঘটনাক্রমে সেসময় রোম ও রাশিয়ার মাঝে যুদ্ধ শুরু হয়। হযরত নানুতবী রহ. তুর্কীদের সাহায্যার্থে চাঁদা উঠানো শুরু করেন। সে সময় এটা 'সুলতানী চাঁদা' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। উক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির জন্য এতে সুযোগ সৃষ্টি হয়। তিনি বলে পাঠান, হযরত যদি তার বাড়িতে এসে ওয়াজ করেন, তাহলে তিনি 'সুলতানী চাঁদা'য় দশ হাজার রুপি দিবেন। হযরত তার দাওয়াত গ্রহণ করেন এবং তার বাড়িতে গিয়ে ওয়াজ করেন। তিনি ওয়াদা মতো দশ হাজার রুপি হযরতের সামনে পেশ করেন। মজলিস শেষ হওয়ার পর হযরত উঠে গেলে মজলিসের লোকেরাও উঠে পড়ে। হযরতের মেহমানদারী নিয়ে লোকদের মাঝে কথাবার্তা ও তর্ক-বিতর্ক হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি চাচ্ছিল হযরতকে আমি আমার ঘরে মেহমান বানাব।

লোকেরা তর্ক-বিতর্ক ও বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত ছিল, হযরত এই ফাঁকে আস্তে করে সেখান থেকে বের হয়ে চলে আসেন। মাগরিবের সময় হয়েছিল। আযান হচ্ছিল। হযরত শহরের প্রান্তে এক অপরিচিত মসজিদে আসেন। ঘটনাক্রমে সেখানে মসজিদের ইমাম তখন

---

১২১. سوانح قاسمی পৃ. ৩১

অনুপস্থিত ছিলেন। লোকদের মধ্যে কথা হচ্ছিল নামায কে পড়াবে? একজন আরেকজনকে ঠেলছিল। একজন হযরতকে বলছিল, ভাই! তুমি নামাযটা পড়িয়ে দাও। তারা হযরতকে চিনত না। হযরত নামায পড়াতে আপত্তি করেন। যখন কেউ নামায পড়ানোর জন্য রাজি হচ্ছিল না, তখন লোকেরা হযরতকে জোর করে ইমামতির জন্য জায়নামাযে এই বলে ঠেলে দিল যে, ভাই! আপনি তো মুসলমান। আপনার কি কুরআন শরীফের দু-চারটি সূরাও মুখস্থ নেই যে, ইমামতি করতে ভয় পাচ্ছেন? হযরত এবার বাধ্য হয়ে নামায পড়ালেন। কিন্তু এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। প্রথম রাকাতে সূরা নাস পড়ে ফেললেন। আর দ্বিতীয় রাকাতে পড়লেন সূরা ফালাক। নামাযের পর মসজিদেই হযরতের সমালোচনা শুরু হয়ে গেল– কী আশ্চর্য লোক, কুরআন শরীফ উল্টা পড়ছে। হযরত নানুতবী রহ. বললেন, ভাই! আমি তো আগেই বলেছিলাম, আমি ইমামতি করার যোগ্য নই। লোকেরা বলল, কারো কি জানা ছিল যে, আপনি কুরআন শরীফ সঠিকভাবে পড়তে পারেন না। হযরত নানুতবী রহ. তাদের এ কথার উত্তরে বলেন, মৌলভীদের থেকে শুনেছি, এভাবে পড়লেও নাকি নামায হয়ে যায়। হযরতের কথা শুনে লোকেরা বিরক্তির সাথে বলে, দেখো, চুরি তো চুরি, তার উপর আবার বদনামী। একে তো নামায উল্টা পড়িয়েছে আবার মৌলভীদের বদনাম করছে। শোরগোল ও বাক-বিতণ্ডা চলছে। ওদিকে হযরতকে খোঁজতে খোঁজতে কিছু লোক এখানে এসে পৌছাল। তারা দেখল, হযরত মূর্খদের ঘেরাওয়ের মধ্যে আছেন। তারা বলল, তোমরা কার সাথে এমন ব্যবহার করছ? তোমরা কি তাঁকে চিন? ইনি তো মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী। লোকেরা লজ্জিত হয় এবং বিনয়ের সাথে ক্ষমা চায়।[১২২]

৩. হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানুতবী রহ. সবক পড়ানোর মাঝখান থেকে নির্দ্বিধায় উঠে যেতেন এবং সবকের যে অংশ তাঁর বুঝে আসত না তা অধীনস্থ উস্তাদদের কারো নিকট জিজ্ঞেস করে আসতেন।

---

১২২. سوانح قاسمی ১ ঃ ৩৯৫

حُسْنُ الْعَزِيزِ গ্রন্থে[১২৩] হযরত থানবী রহ.-এর বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, তিনি বলেছেন, মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব সর্বদা পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন ও ভালো পোষাকে থাকতেন। দেখতে শাহজাদাদের মতো সুন্দর ছিলেন। তাঁর একটি ঘটনা আছে। আমলিয়ার এক ব্যক্তি ছাত্রদেরসহ মাওলানাকে আম খাওয়ার দাওয়াত দেয়। গ্রামটি দেওবন্দ থেকে প্রায় তিন ক্রোশ[১২৪] দূরে। দাওয়াতকারী সাথে কোনো বাহনও নিয়ে আসে নি। মাওলানা সঙ্গীদের নিয়ে হেঁটেই গেলেন এবং আম খেলেন। চলে আসার সময় ঘরের জন্য লোকটি অনেকগুলো আম দিল। কিন্তু আমগুলো পৌছানোর জন্য কোনো লোক দিল না। শুধু সামনে এনে রেখে দিল। অন্যদের তুলনায় মাওলানার অংশ বেশীই দিল। সকলে নিজ নিজ আম কাপড়ে বেঁধে রওয়ানা করল। মাওলানাও আমগুলো কাপড়ে বেঁধে বগলদাবা করে রওয়ানা দেন। একদিকের বগল ব্যথা হয়ে গেলে অন্য দিকের বগলে নিতেন। পথ ছিল অনেক দূরের। তাই বারবার বগল পরিবর্তন করতে হয়। দেওবন্দ পৌছাতে পৌছাতে হাত একেবারে ব্যথা হয়ে যায়। উপায় না দেখে মাওলানা আমের গাঠুরি মাথায় তুলে নেন আর বলেন, এই পন্থাটি তো আগে মাথায় আসেনি। তখন অবস্থা ছিল– বাজারের দুই পার্শ্ব থেকে মাওলানাকে মানুষ সালাম করছিল আর মাওলানা জবাব দিয়ে যাচ্ছিলেন; সামান্য বিব্রতবোধও করেননি। সুবহানাল্লাহ! তাদের মাঝে কি পরিমাণ বিনয় ছিল! মনে হয় তাঁদের নফস বলতে কিছু ছিল না।

['আপবীতি'র বিবরণ সমাপ্ত হয়েছে।]

উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যের একটি নমুনা

এতক্ষণ আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের উচ্চাভিলাষের অনেক ঘটনা শোনলাম। এগুলো দ্বারা আমরা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, আমাদের লক্ষ্য হতে হবে উচ্চাভিলাষী। এখন আমি উচ্চাভিলাষী কিছু লক্ষ্যের একটি নমুনা পেশ করব। এই লক্ষ্যগুলো আমার বিভিন্ন উস্তাদ সেই ছাত্রজীবনে

---

১২৩. ৪ ঃ ২৪০

১২৪. দুই মাইলের কিছু বেশি পথ; ৮০০০ হাত পরিমাণ।

আমাদেরকে বারবার আওড়ানোর আদেশ করতেন। আল্লাহর তাওফীকে লক্ষ্যগুলো আওড়ানো ও স্মৃতিতে জাগ্রত রাখা অনেক সহপাঠীর মতো আমার জন্যও অনেক উপকারী হয়েছে। তোমাদের জন্যও উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ। লক্ষ্যগুলো নিয়ে ভাববে এবং এগুলোর সামগ্রিকতা ও ব্যাপকতা নিয়ে চিন্তা করবে। তাহলে এখন আমার সঙ্গে বলো–

'শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমি হবো একজন ধীমান ও বিদগ্ধ গবেষক। রচনা ও সাংবাদিকতার অঙ্গনে একজন শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক। যুদ্ধের ময়দানে একজন বীর ও বিচক্ষণ সেনাপতি। রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের প্রাঙ্গনে একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও সংস্কারক। সেবার ক্ষেত্রে জনদরদী সেবক। ইহসান ও তাযকিয়ার মহলে অন্তরালোকসম্পন্ন মুসলিহ ও মুযাক্কী। ইনাবত ইলালাহর ক্ষেত্রে সবিনয় দোয়াকারী। আর খাওফে ইলাহীর তাড়নায় প্রকম্পিত এক বান্দা।'

সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নির্ধারণের উপকারিতা

কারো মনে হতে পারে, লক্ষ্যগুলো অস্বাভাবিক বড় হয়ে গেল না? এমন হওয়া কি কারো পক্ষে সম্ভব? তাহলে শোনো, যাদের কাছে এমন হওয়া অসম্ভব মনে হয়, সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নির্ধারণ করা তাদের জন্যও উপকারী। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ মিসরীয় লেখক ড. আহমদ আমীন [১৮৮৬ - ১৯৫৪ খ্রি.] এর একটি কথা মনে পড়ছে। তিনি তাঁর فَيْضُ الْخَاطِرِ কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের এক স্থানে কথাটি লিখেছেন–

وَنَحْنُ نُلاحِظُ فِي حَيَاتِنَا أَنَّ مَنْ عَزَمَ أَنْ يَّسِيْرَ مِيْلاً وَاحِدًا شَعَرَ بِالتَّعَبِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ، وَلٰكِنَّ مَنْ عَزَمَ أَنْ يَّسِيْرَ خَمْسَةَ أَمْيَالٍ قَطَعَ مِيْلاً وَمِيْلَيْنِ وَثَلاثَةً مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ، لأَنَّ غَرَضَهُ أَوْسَعُ وَهَدَفَهُ أَكْبَرُ وَأَبْعَدُ.

অর্থ– আমরা আমাদের জীবনে দেখি, যে ব্যক্তি এক মাইল হাঁটার প্রতিজ্ঞা করে, সে এক মাইল শেষ করার পর ক্লান্তি অনুভব করে। কিন্তু যে ব্যক্তি পাঁচ মাইল হাঁটার প্রতিজ্ঞা করে, সে এক মাইল, দুই মাইল, তিন মাইল কোনো ধরনের ক্লান্তি ছাড়াই অতিক্রম করে। কেননা, তার লক্ষ্য প্রশস্ততর এবং তার উদ্দেশ্য বৃহত্তম ও দূরতম।

তো এটাই বাস্তবতা যে, লক্ষ্য বড় ও সুদূর প্রসারী থাকলে সেই লক্ষ্যে ঘটনাচক্রে পৌঁছাতে না পারলেও তার একটি উল্লেখযোগ্য স্তরে অবশ্যই পৌঁছা সম্ভব হয়, যদি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। অতএব আমরা নির্দ্বিধায় আলোচ্য লক্ষ্যগুলোকে নিজেদের জন্য নির্ধারণ করতে পারি।

---

১৩৮ নং পৃষ্ঠার টীকা

হ্যাঁ, মুসলিম উম্মাহর বিদ্যমান পতন থেকে উত্তরণের জন্য আত্মিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির পাশাপাশি তাদেরকে অর্জন করতে হবে নিজ সময়ের সর্বোচ্চ স্তরের শিল্প, প্রযুক্তি ও সমরশক্তি। সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক সক্ষমতা ও স্বনির্ভরতাও অর্জন করতে হবে। সর্বোপরি নিজেদের যুবকদেরকে পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা থেকে উদ্ধার করতে হবে। এগুলো আমার কথা নয়। এগুলো সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.-এর কথা। ماذا خَسِرَ العَالَمُ بانحطاطِ المسلمينَ কিতাবের অনুবাদ 'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?' বইয়ের ভূমিকা থেকে [পৃ. ১৭ - ১৯] আদীব হুজুর মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা. বা.-এর কিছু বিবরণ তুলে ধরছি। পুরো বইটি তন্ময়তার সাথে পড়বে। মিশরের প্রখ্যাত বিদগ্ধ আলেম ডক্টর মুহাম্মদ ইউসুফ মুসা রহ. যথার্থ বলেছেন– 'এ গ্রন্থটি পাঠ করা এমন প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয, যিনি ইসলামের গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য চেষ্টা করেন।' আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে ইসলামের গৌরব ফিরিয়ে আনার সুযোগ্য কর্মী হিসেবে কবুল করুন! আমীন!! যাই হোক, আদীব হুজুর লিখেছেন–

[মুসলিম উম্মাহর] পতনের কান্না যেমন তিনি [সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.] কেঁদেছেন, তেমনি উত্তরণের পথ ও পন্থাও তিনি বলেছেন। তাঁর ভাষায়–

لا يَنْهَضُ العالَمُ الإسلاميُّ إلا برِسَالته التي وَكَّلَهَا إليه نَبِيُّهُمُ الأَمِينُ، ولا يَنْهَضُ العالَمُ الإسلاميُّ بهذه الرِّسالة التي هي الدعوةُ إلى الله ورسوله إلا بقوة الإيمان، لا بقوة المادة.

'ইসলামী বিশ্বের উত্থানের কোনো পথ নেই, সেই দাওয়াত ও পয়গামকে ধারণ করা ছাড়া, যা তাদের নবী আল-আমীন তাদের কাছে সোপর্দ করে গিয়েছেন। আর বস্তুগত কোনো শক্তি দ্বারা দাওয়াতের এ মহান দায়িত্ব পালন করা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না; সম্ভব হবে শুধু ঈমানের শক্তি দ্বারা।'

এটা তো চিরসত্য কথা! ঈমানই ছিল আমাদের অতীতের শক্তি, ঈমানই হচ্ছে আমাদের বর্তমান শক্তি এবং ঈমানই হবে আমাদের ভবিষ্যতের শক্তি। ঈমান ছাড়া আমাদের কোনো শক্তি নেই, মুক্তিও নেই। এ কথা তিনি বলেছেন, তাঁর আগেও সবাই বলেছেন, এমনকি তাঁর সমকালেরও সবাই বলেছেন। এটা নতুন কোনো কথা নয়। তাঁর স্বকীয়তা এই যে, আধুনিক ও প্রাচীন উভয় সমাজকে চমকিত করে একটি নির্মম সত্যের প্রতি তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। তাঁর ভাষায়–

إذا أراد العالَمُ الإسلاميُّ أن يَعُود إلى قيادة العالَمِ من جديدٍ فعليه أن يأخذ الاستعداد التامَّ في العلوم والصِّنَاعَة والتجارة وفي فَنِّ الحرب، وأن يستغني عن الغَرْب في كلِّ مَرْفَق من مَرَافق الحياة وفي كل حاجة من الحاجات.

'ইসলামী বিশ্ব যদি নতুন করে বিশ্বনেতৃত্বের আসনে ফিরে যেতে চায়, তাহলে তার অবশ্যকর্তব্য হবে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য ও যুদ্ধবিদ্যায় পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা এবং জীবনের যাবতীয় উপকরণ ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যনির্ভরতা পরিহার করা।'

এটা ছিলো একেবারে নতুন কথা যা তাঁর পর্যায়ের কোনো আলিম আগে বলেননি, অন্তত এমন করে বলেননি। তিনি আরো বলেছেন–

ومن واجب رجال التعليم والتربية ووُلاة الأمر أن يُرَبُّوْا الشَّبِيْبَة العربية على الفُرُوسيَّة والحياة العسكريَّة، على مَبْدَأ قول النبيّ صلى الله عليه وسلَّم: «ألا إن القوة الرَّمْيُ، ألا إن القوة الرَّمْيُ».

'শিক্ষা-দীক্ষা ও রাষ্ট্রের কর্ণধার যারা, তাদের কর্তব্য হলো আরবযুবশক্তিকে অশ্বচালনা ও সৈনিকতার উপর গড়ে তোলা এবং তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নীতিনির্ধারণী বাণীর ভিত্তিতে– শোনো, নিক্ষেপই আসল শক্তি; শোনো, নিক্ষেপই আসল শক্তি।'

এটাও একেবারে নতুন কথা, বিশেষ করে এ যুগের 'খানকাহি জীবনে অভ্যস্ত' কোনো বুযুর্গের কলমে। তিনি আরো বলেছেন–

إذا أراد العالَمُ الإسلاميُّ أن يَستأنِف حياتَه ويتحرَّر من رِقَابة غيره، وإذا كان يَطْمَح إلى القيادة فلا بُدَّ من وَضْع مِنْهَاجٍ تعليميٍّ جديد يَجْمَع بَيْنَ مُحْكَمات الكتاب والسنة وبَيْنَ العلوم العصريَّة النافعة، ولا بد من تدوين العلوم العصريَّة

على أساس رُوح الإسلام، ويجب على العالَم الإسلاميّ أولا وقبل كلّ شيء أن يُخَلِّصوا شبابَهم من النظام التعليميّ الغَرْبيّ الذي قد استولَى اليوم على العالَم الإسلاميّ كلِّه.

'ইসলামী বিশ্ব যদি নতুনভাবে জীবন শুরু করতে চায় এবং অন্যের দাসত্ব থেকে মুক্তি লাভ করতে চায়, সর্বোপরি যদি বিশ্বনেতৃত্বের স্বপ্ন দেখতে চায়, তাহলে অবশ্যকর্তব্য হবে এমন নতুন শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা যা কোরআন-সুন্নাহর অপরিবর্তনীয় বিধান এবং কল্যাণপূর্ণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাঝে সমন্বয় সাধন করবে। মুসলিমবিশ্বকে অবশ্যই ইসলামের প্রাণপ্রেরণার উপর ভিত্তি করে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে। মোটকথা, ইসলামী বিশ্বকে প্রথমে এবং সবকিছুর আগে পাশ্চাত্যের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে, যা সমগ্র মুসলিমবিশ্বের উপর আধিপত্য বিস্তার করে আছে, তা থেকে তাদের যুবকদের উদ্ধার করতে হবে।' [আদীব হুজুরের বক্তব্য শেষ হয়েছে।]

কনস্টান্টিনোপলবিজয়ী মুহাম্মদ আলফাতিহ ছিলেন সেই প্রত্যাশিত মুসলিম যুবকের বাস্তব রূপ, যেমনটা পূর্বে 'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?' বইয়ের ২৬৮ - ২৬৯ পৃষ্ঠার আলোচনার থেকে জেনেছ।

চতুর্থ অধ্যায়

পরিশ্রম-সাধনা, সময়ের সদ্ব্যবহার, লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে প্রবল তাড়না সৃষ্টি

পরিশ্রম-সাধনাই হলো লক্ষ্যার্জনের উপায়

এতক্ষণের আলোচনা শোনে এবং উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণের উপকারিতা জেনে আশাকরি নিজের জন্য উপরিউক্ত উচ্চাভিলাষী লক্ষ্যগুলো নির্ধারণ করেছ। আল্লাহ তা'আলা তোমাকে তোমার লক্ষ্যসমূহ অর্জন করার তাওফীক দান করুন। আমীন! এ পর্যায়ে তোমাকে এ বাস্তবতাটি জানতে হবে যে, পৃথিবীতে কারও কোনো লক্ষ্য এমনিতেই অর্জন হয়নি। লক্ষ্যার্জনের উপায় হলো পরিশ্রম ও সাধনা। পরিশ্রম ও সাধনা ছাড়া কারও কোনো লক্ষ্য অর্জন হয় না। লক্ষ্য যত ক্ষুদ্রই হোক, তার জন্য মেহনত-মুজাহাদা ও পরিশ্রম-সাধনা করতেই হয়। মনে করো, তুমি এখান থেকে ঢাকা যেতে চাও। তো, 'ঢাকা যাওয়া'টা হলো তোমার লক্ষ্য। তুমিই বলো, শুধু এ লক্ষ্য নির্ধারণ করার কারণেই কি তোমার ঢাকা যাওয়া সম্পন্ন হয়ে যাবে? তার জন্য কি তোমার কিছুই করতে হবে না? কোনো প্রস্তুতি নিতে হবে না? এখান থেকে বের হতে হবে না? গাড়িতে উঠতে হবে না? এক কথায়, কোনো ধরনের মেহনত-মোজাহাদা করতে হবে না?

লক্ষ্য যে স্তরের হয়, তার জন্য পরিশ্রমও করতে হয় সে স্তরের। তুমি যদি উচ্চাভিলাষী কোনো লক্ষ্য নির্ধারণ কর, তবে তার জন্য সাধনাও করতে হবে উঁচু স্তরের। সেই কবে আরব কবি বলে গেছেন–

بِقَدْرِ الْكَدِّ تُكْتَسَبُ الْمَعَالِيْ فَمَنْ طَلَبَ الْعُلاَ سَهِرَ اللَّيَالِيْ

وَمَنْ رَامَ الْعُلاَ مِنْ غَيْرِ كَدٍّ أَضَاعَ الْعُمْرَ فِيْ طَلَبِ الْمُحَالِ

অর্থ. চেষ্টা অনুপাতে মর্যাদা অর্জন হয়। যে উঁচু মর্যাদা প্রত্যাশা করে সে রাত জাগে। যে ব্যক্তি কষ্ট করা ছাড়া উঁচু মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করে, সে অসম্ভব জিনিস অন্বেষণে জীবন নষ্ট করে।

আরেক কবি বলেছেন–

تَمَنَّيْتَ أَنْ تُمْسِيَ فَقِيْهًا مُنَاظِرًا بِغَيْرِ عَنَاءٍ فَالْجُنُوْنُ فُنُوْنُ

وَلَيْسَ اكْتِسَابُ الْمَالِ دُوْنَ مَشَقَّةٍ تَحَمَّلْهَا فَالْعِلْمُ كَيْفَ يَكُوْنُ

অর্থ. তুমি চেষ্টা না করেই তর্কবাগিশ ফেকাহশাস্ত্রবিদ হওয়ার কামনা করেছ। উন্মাদনার অনেক প্রকার রয়েছে। [এটিও একটি প্রকার।] যখন কষ্ট ছাড়া সম্পদই অর্জন করা যায় না, তখন কষ্ট ছাড়া জ্ঞানার্জন কী করে সম্ভব?!

ড. আহমদ আমীন তাঁর اِصْنَعْ حَيَاتَكَ শিরোনামের এক প্রবন্ধে লিখেছেন–

إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الشُّبَّانِ يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ مُنِحُوْا قُدْرَةً عَلَى التَّفَوُّقِ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ، وَعَلَى الإِتْيَانِ بِالْعَجَائِبِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ، وَعَلَى قَلْبِ التُّرَابِ ذَهَبًا بِعَصًا سِحْرِيَّةٍ، وَلٰكِنَّ كُلَّ هٰذِهِ أَفْكَارٌ مُعَطِّلَةٌ عَنِ الْعَمَلِ وَعَنِ النَّجَاحِ.

অর্থ. অনেক তরুণ মনে করে, এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে চেষ্টা ছাড়াই শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখার, কষ্ট ছাড়াই আশ্চর্যজনক অবদান রাখার এবং যাদুদণ্ড দ্বারা মাটিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এগুলো মূলত কাজ ও সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট করার চিন্তা।

আল্লাহ তা'আলা কোনো বান্দার প্রতি বিশেষ করুণা তখনই করেন, যখন বান্দা মনে-প্রাণে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হয়। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে– وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ[১২৫] অর্থ. এবং যে তাঁর [আল্লাহর] দিকে প্রত্যাবর্তন করে, তাকে তিনি নিজ (দরবার) পর্যন্ত পৌছাবার সামর্থ দান করেন। কুরআন পাকে আরও ইরশাদ হয়েছে– وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا[১২৬] অর্থ. আর যারা আমার রাস্তায় কষ্ট সহ্য করে, আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথসমূহ দেখাব।

আয়াতদু'টো দ্বারা এক দিকে যেমন এ কথা বুঝে আসে যে, আল্লাহর পথে মানুষের চেষ্টা-সাধনা বৃথা যায় না, তদ্রূপ একথাও বুঝে আসে যে, কিছু অর্জন করার স্বাভাবিক পদ্ধতি হলো চেষ্টা-সাধনা।

---

১২৫. সূরা শু'রা, আয়াত ১৩

১২৬. সূরা 'আনকাবূত, আয়াত ৬৯

শায়খ আলী তানতাভী রহ. তাঁর الرِّزْقُ مَقْسُوْمٌ وَلٰكِنَّ الْعَمَلَ لَهُ وَاجِبٌ বইয়ে[১২৭] প্রসিদ্ধ নাহ্বশাস্ত্রবিদ ইয়াহ্য়া রহ. সম্পর্কে লিখেছেন– তিনি শুরু দিকে জ্ঞানার্জনে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হওয়ার উপক্রম হন। তখন শুয়ে শুয়ে দুঃখভারাক্রান্ত মনে চিন্তা করতে থাকেন। ইতোমধ্যে একটি পিঁপড়াকে দেখলেন পিঁপড়াটি দেয়ালে ওঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু এক বা দুই হাত ওঠেই নিচে পড়ে গেল। দেখলেন, পিঁপড়াটি উপরে ওঠার জন্য পুনরায় চেষ্টা করল। আবার পড়ে গেল। আবার চেষ্টা করল। আবার পড়ে গেল। এভাবে পিঁপড়াটি চল্লিশ বার চেষ্টা করল। তারপর দেয়ালে ওঠতে সক্ষম হল। তিনি পিঁপড়াটি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করলেন এবং জ্ঞানার্জনে তাঁর চেষ্টা অব্যাহত রাখলেন। এভাবে এক সময় তিনিও সফল হন।

'চেষ্টা অব্যাহত রাখলে মানুষ সফল হয়-ই' এ সম্পর্কিত আরবী ভাষার একটি প্রসিদ্ধ প্রবচন হলো– مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَ جَدَّ وَجَدَ، وَمَنْ قَرَعَ الْبَابَ وَ لَجَّ وَلَجَ অর্থ. যে ব্যক্তি কোনো জিনিস চায় এবং তার জন্য চেষ্টা করে, সে তা লাভ করে। যে ব্যক্তি দরজা খট্খটাতে থাকে, সে একসময় ভেতরে প্রবেশ করেই।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. বলেছেন– 'নিঃসন্দেহে আল্লাহর তাওফীক ও মদদই হলো সফলতার প্রথম শর্ত। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহ তাদেরই জন্য, যারা মেহনতের পর দু'আ করে। তদ্রূপ সামনে চলার পাথেয়রূপে আসাতেযা কেরামের পথনির্দেশও অপরিহার্য। কিন্তু বারুদ ছাড়া বন্দুক যেমন বেকার, তেমনি চেষ্টা-সাধনা ছাড়া সবই নিষ্ফল।"[১২৮]
তিনি আরও বলেছেন– 'যিনিই গড়ে উঠেছেন এবং আপন কীর্তি ও কর্মে প্রোজ্জ্বল হয়েছেন, নিজের চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের বিরাট বিনিয়োগের মাধ্যমেই হয়েছেন। অলস, কর্মবিমুখ ও নিশ্চেষ্ট মানুষের জন্য সাধনার এই পৃথিবীতে স্থান নেই।' 'বস্তুত ত্যাগ ও কোরবানী এবং পণ ও প্রতিজ্ঞা এমনই মহাশক্তি যে, তা যদি ব্যক্তির মাঝে জাগ্রত হয়, তাহলে তাকে

---

[১২৭]. পৃ. ২৪ - ২৫

[১২৮]. অনুবাদ, "জীবন পথের পাথেয়" পৃ. ২৯। মূল, پاجراغ زندگی পৃ. ৩৫

আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। যদি প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের মাঝে সৃষ্টি হয়, তাহলে পৃথিবী তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।'[১২৯]

হযরত আলী মিঁয়া নাদাবী রহ. আরও বলেছেন– [বাণীটি আমি বইয়ের শুরুতে 'পারিবারিক প্রতিকূলতা' শিরোনামের অধীনেও উল্লেখ করেছি] 'আমি আমার অধ্যয়ন ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে বলছি, কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কোনো গ্রন্থাগার মানুষ তৈরি করে না, বরং নিজের যোগ্যতা এবং চেষ্টা-সাধনা ও মেহনত-মোজাহাদার মাধ্যমে মানুষ নিজেই গড়ে ওঠে এবং প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আধ্যাত্মিকতার জগতে দেখুন, বড় বড় সাধক পুরুষরূপে যারা জগতব্যাপী খ্যাতি লাভ করেছেন, তাঁদের অভিভাবক ও মুরুব্বী বিশেষ কোনো অলী-বুযুর্গ ছিলেন না। পরিবার ও পরিবেশও তেমন অনুকূল ছিলো না। শুধু পিপাসা ও ব্যাকুলতা, চেতনা ও প্রেরণা এবং ত্যাগ ও সাধনা দ্বারা রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার এতো উচ্চ মার্গে তাঁরা উপনীত হয়েছেন। কামিল অলী-বুযুর্গরূপে উম্মাহর ইতিহাসে স্মরণীয় বরণীয় হয়েছেন। আযরের ঘরে ইবরাহীম পয়দা হওয়ার অসংখ্য উদাহরণ উম্মাহর ইতিহাসে রয়েছে।"[১৩০]

اَلْقِرَاءَةُ الرَّاشِدَةُ কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডটি আশাকরি অনেকের পড়া হয়েছে। তাতে اَلْكِيْمِيَاءُ শিরোনামে চমৎকার একটি প্রবন্ধ আছে। তাতে একটি জুমলা আছে– اَلْكِيْمِيَاءُ يَا أَوْلَادِيْ! عَرَقُ الْجَبِيْنِ وَكَدُّ الْيَمِيْنِ অর্থাৎ মাটিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার বিশেষ কোনো বিদ্যা নেই। সবকিছুর মূলে রয়েছে সাধনা ও পরিশ্রম।

انفاس عیسیٰ কিতাবের[১৩১] উদ্ধৃতিতে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখেছেন, হযরত থানবী রহ. লিখেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা যদি সাধনা ও পরিশ্রমের তাওফীক দান করেন তবে বুঝে নাও, ইনশাআল্লাহ লক্ষ্যেও পৌঁছতে পারবে। কারণ সাধনা ও পরিশ্রম করলে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি আছে। উক্ত ওয়াদার ব্যত্যয় ঘটার আশঙ্কা নেই।'

---

১২৯. "জীবন পথের পাথেয়" পৃ. ২৯ ও ৩৬

১৩০. অনুবাদ, "জীবন পথের পাথেয়" পৃ. ৫৬। মূল, پاجا سراغ زندگی পৃ. ৫৯, ৬০

১৩১. انفاس عیسیٰ পৃ. ২৯৬

এখানে যে প্রতিশ্রুতির দিকে ইংগিত করা হয়েছে তা হলো আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী–

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ.[১৩২]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রতিশ্রুতিকে لَامُ التَّاكِيْدِ তথা নিশ্চয়তাবোধক শব্দ দ্বারা সন্দেহাতীত সাব্যস্ত করেছেন।[১৩৩]

'আপবীতি'তে[১৩৪] আছে, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. লিখেছেন, 'জনৈক বন্ধু বলল, হযরত![১৩৫] মা তার সন্তানের প্রতি কত দয়ালু হয় যে, শুয়ে থাকা শিশুকে উঠিয়ে দুধ পান করায়। ... আর বুযুর্গগণ তো মায়ের চেয়েও বেশী দয়ালু হন। তাই তাঁদের পক্ষ থেকেও এরূপ আচরণ আশা করা যায়। উত্তরে হযরত বলেন, ভাই! মায়ের কাজ তো এটুকুই যে, স্তন শিশুর মুখে পুরে দেন। কিন্তু শিশুই যদি মৃত হয় কিংবা ঠোঁট নেড়ে দুধ চুষে নিতে অক্ষম হয়, তবে মায়ের কসুর কোথায়? তাঁর স্নেহ-মমতারই বা কি কমতি হলো?'[১৩৬] এ উক্তিটি উল্লেখ করা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হলো এ কথা বোঝানো যে, সাধনা ও পরিশ্রম ছাড়া কিছুই হয় না। হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. বলেছেন, মানুষের মাঝে যে কথা প্রচলিত আছে যে, অমুক ব্যক্তিকে অমুক বুযুর্গ এক নজরেই কামেল বানিয়ে দিয়েছেন, তা একেবারেই ভুল কথা। বরং সকলকেই প্রথমে রিয়াযত ও মুজাহাদা করতে হয়। এ বিষয়ে 'আপবীতি'র দ্বিতীয় ভলিয়মের ১৫৫ নং পৃষ্ঠা থেকে ১৬৫ নং পৃষ্ঠাগুলো সুযোগ করে পড়ে নিও।

এখন আমি লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিশ্রম ও সাধনা করার পূর্বসূরীদের কিছু ঘটনা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

---

১৩২. সূরা আনকাবূত, আয়াত নং ৬৯

১৩৩. 'আপবীতি' ২ ঃ ১৬৩

১৩৪. ২ ঃ ১৬৫

১৩৫. হযরত আব্দুল কাদির রায়পুরী রহ.।

১৩৬. سوانح حضرت رائے پوری পৃ. ৩৪০

লক্ষ্যার্জনে পরিশ্রম ও সাধনা করার কিছু ঘটনা

পরিশ্রম ও সাধনাই যেহেতু যেকোনো লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্বশর্ত, তাই ইতিহাসে যারাই বরেণ্য হয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জীবনেই রয়েছে পরিশ্রম ও সাধনার প্রচুর ঘটনা। তাঁদের এ জাতীয় অনেক ঘটনা যেমন ইতিহাসের বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তদ্রূপ কিছু কিছু ঘটনা একত্র করে রচিত হয়েছে শতাধিক পৃষ্ঠার স্বতন্ত্র অনেক কিতাব। সেগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে চারটি কিতাব তোমরা অবশ্যই পুরোপুরি পড়বে এবং প্রতিদিন সেগুলোর কিছু কিছু অংশ পুনরায় পড়বে। প্রতিদিনের তা'লীমী হাল্কায় কিতাব চারটির কোনো একটি থেকে তা'লীমও করবে। কিতাব চারটি হলো–

١. «صَفَحَاتٌ مِنْ صَبْرِ العُلَمَاءِ عَلَى شَدَائِدِ العلمِ والتحصيلِ» بقلمِ الشيخ عبد الفَتَّاح أَبُو غُدَّة رحمه الله تعالى.

٢. «قِيْمَةُ الزَّمَنِ عندَ العلماءِ» له أيضا.

٣. «آپ بيتى» بقلمِ شيخِ الحديثِ زكريا بن يحيى الكاندهلويِّ رحمه الله.

٤. «علماء سلف اور نابينا علماء» بقلمِ الشيخ حبيب الرحمن الشِّيْرْوَانِيِّ رحمه الله.

সবগুলো কিতাব বাংলাভাষায় অনূদিত হয়েছে।

এখন আমি সামনে উদাহরণ হিসেবে এ সকল কিতাব থেকে পূর্বসূরীদের মেহনত-মুজাহাদা ও চেষ্টা-সাধনার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ।

১. ইমাম মুহাম্মদ রহ. [১৩২ - ১৮৯ হি.] রাতে ঘুমাতেন না। তিনি সারারাত ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো– আপনি কেন ঘুমান না? তিনি বললেন, 'আমি কী করে ঘুমাতে পারি, যখন মুসলমান ভাইয়েরা আমাদের উপর নির্ভর করে ঘুমিয়ে আছে! তারা বলে, আমাদের কোনো সমস্যা হলে সমাধানের জন্য তার [মুহাম্মদ] শরণাপন্ন হব। অতএব আমি ঘুমিয়ে পড়লে তো দ্বীনের বড় ক্ষতি হবে।" তিনি রাতে বিভিন্ন কিতাব নিয়ে বসতেন। যখন একটি পড়তে পড়তে একঘেয়েমি বোধ করতেন, তখন অন্যটি শুরু করতেন। চোখে পানি ছিটিয়ে ঘুম দূর করতেন এবং বলতেন, উষ্ণতা থেকে ঘুমের উৎপত্তি।

২. এ বইয়ে 'ইলমের পথে পূর্বসূরীদের উচ্চাভিলাষ' শিরোনামে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস বাকী বিন মাখলাদ রহ. [২০১ - ২৭৬ হি.]-এর আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। এখানে তাঁরই শিক্ষাজীবনের চেষ্টা-সাধনার একটি গল্প শোনাব। তিনি বলেন, যখন আমি বাগদাদের নিকটে পৌঁছালাম, তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ.-এর সেই কঠিন বিপদের কথা জানতে পারলাম। আমি এ কথাও জানতে পারলাম, তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করা এবং তাঁর থেকে হাদীস শ্রবণ করা নিষেধ। এতে আমি অত্যন্ত বিষণ্ন হলাম। তারপর আমি তাঁর বাড়ীর সন্ধানে বের হলাম। এক সময় সন্ধান পেয়ে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। ঘড়ের কড়া নাড়লাম। তিনি দরজা খুললেন। আমি বললাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি একজন ভিনদেশী লোক। এই শহরে এটিই আমার প্রথম উপস্থিতি। আমি একজন হাদীস ও সুন্নতের ছাত্র ও সংকলনকারী। এই সফরে আমার একমাত্র উদ্দেশ্য আপনার থেকে হাদীস গ্রহণ করা। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তুমি ভেতরের দরজা দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো, সাবধান! কেউ যেন তোমাকে না দেখে।

তারপর তিনি বললেন, তোমার বাড়ী কোথায়? আমি বললাম, সুদূর পশ্চিমে। তিনি বললেন, আফ্রিকা? আমি বললাম, তার চেয়েও দূরে-স্পেন। আফ্রিকা পৌঁছাতে সমুদ্র পার হতে হয়। তিনি বললেন, তোমার বাড়ী তো বহু দূর। তোমার মতো তালিবে ইলমকে ইলমের পথে উত্তম সহযোগিতা করার চেয়ে অধিক প্রিয় আমার আর কিছু নেই। তবে হয়তো তুমি জেনেছ, আমার নিকট কারো আসা-যাওয়া এখন নিষিদ্ধ। আমি বললাম, হ্যাঁ, এই শহরের কাছাকাছি এসে আমি আপনার এ অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়েছি। অতঃপর আমি বললাম, এ শহরে যেহেতু আমার এটিই প্রথম আগমন, তাই আমি এখানের লোকজনের নিকট অপরিচিত। অতএব আপনার অনুমতি হলে আমি প্রতিদিন ভিখারী সেজে আপনার দরজায় আসব এবং ভিখারীরা যা বলে আমি তা বলব। তখন আপনি বের হবেন। এই সুযোগে আপনি প্রতিদিন একটি করে হাদীস বললেও আমার জন্য যথেষ্ট। তিনি বললেন, ঠিক আছে। তবে শর্ত হলো এ শহরে ইলমের অন্য কোনো

মজলিসে বসবে না। [তাহলে লোকেরা বুঝে ফেলবে তুমি একজন ছাত্র। তখন ভিখারী বেশে আসলেও তুমি বাধাপ্রাপ্ত হবে।] আমি বললাম, আপনার শর্ত মেনে নিলাম।

এরপর থেকে আমি হাতে একটি লাঠি নিয়ে এবং মাথায় কেনা ও নেকড়া পেঁচিয়ে তাঁর বাড়ীর দিকে বের হতাম। আমার আস্তিনে লুকায়িত থাকত কাগজ, কলম ও কালি। তাঁর দরজায় পৌঁছে এই বলতাম- أَبُو عَبْدِ اللهِ!- বাগদাদে তখন এই বলেই ভিক্ষা চাওয়া হত। তিনি আমার নিকট বের হতেন এবং বাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিতেন। তিনি আমাকে দু' তিনটি বা তার চেয়ে কিছু বেশি হাদীস শোনাতেন। এভাবে প্রায় তিনশ' হাদীস তিনি আমাকে শুনিয়েছেন।

৩. ইমাম আবু হাতেম রাযী রহ. ছিলেন সুধাসিন্ধু হাফেজে হাদীস। ইলমের পথে তিনি যেসকল কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হয়েছেন, তাঁর পুত্র ইমাম ইবনে আবী হাতেম রহ. তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেন-

আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি- আমরা দাউদ জা'ফরীর নিকট হাদীস শ্রবণ করে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়ে 'জার' শহরে পৌঁছলাম। তখন পরবর্তী গন্তব্যের জন্য নৌযানে আরোহন করলাম। আমরা ছিলাম তিনজন- আবু যুহাইর আল-নারওয়ারুযী -তিনি ছিলেন বৃদ্ধ-, দ্বিতীয়জন নিশাপুরের, আর আমি।

নৌযানে থাকাকালে একবার আমার স্বপ্নদোষ হলো। আমি ঘুম থেকে উঠে সঙ্গীদেরকে বিষয়টি জানালাম। তারা বলল, পানিতে ডুব দাও। আমি বললাম, আমি ভালোভাবে সাঁতার জানিনা। তারা বলল, আমরা তোমাকে একটি রশিতে বেঁধে পানিতে ঝুলিয়ে দেই। তখন তারা আমাকে একটি রশিতে বেঁধে পানিতে ছেড়ে দিল। আমি ভালোভাবে অযু করলাম। তারপর বললাম, আরেকটু নামাও। তারপর পানিতে ডুব দিলাম। বললাম, এবার আমাকে উঠাও। তারা ওঠাল।

আমাদের নৌযান চলতে থাকল। বাতাস ছিল আমাদের বিপরীতে। তাই সমুদ্রে তিন মাস থাকতে হলো। এতে আমাদের মন সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল। খাবার ও পানীয় ফুরিয়ে এল। অতি সামান্য খাবার অবশিষ্ট থাকল। তখন বাধ্য হয়ে আমরা তিনজন পার্শ্ববর্তী এক তীরে নেমে

গেলাম। কয়েকদিন লাগাতার হাঁটলাম। অবশেষে এক সময় আমাদের বাকি খাবারটুকুও শেষ হয়ে গেল।

তারপর এক দিন এক রাত একটানা হাঁটলাম। খাবার ও পানীয় কিছুই নেই। পরবর্তী দু' দিনও এভাবে খাবার-পানি ছাড়া কাটল। দু' দিনের প্রতিদিন সন্ধা পর্যন্ত হাঁটতাম। সেই নির্জন মরুভূমিতে যেখানেই রাত হত, সেখানেই গা এলিয়ে দিতাম। ক্ষুধা, পিপাসা ও ক্লান্তিতে আমাদের শরীর নিস্তেজ হয়ে যেত। পরবর্তী দিন সাধ্যমত হাঁটতে থাকলাম। এক সময় মারওয়ারুযী সাথী বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলেন। আমরা তাঁকে নাড়া দিলাম। তিনি কোনো সাড়া দিলেন না। তখন তাঁকে রেখেই আমি ও আমার নিশাপূরী সাথী হাঁটতে থাকলাম।

এক বা দুই 'ফরসাখ্'[১৩৭] হাঁটতেই আমিও বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেলাম। আমার সাথী আমাকে রেখেই সামনে হাঁটতে থাকল। হঠাৎ সে কিছু লোক দেখতে পেল যারা হযরত মূসা আলাইহিস্ সালামের কূপে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের জাহাযকে নোঙ্গর করেছিল। সে কাপড় ঘুরিয়ে তাদের দিকে ইঙ্গিত করল। তারা চামড়ার একটি পাত্রে পানিসহ তার নিকট আসল, তাকে পানি পান করাল এবং তার হাত ধরল। সে তাদেরকে বলল, পিছনে আমার দুই সাথী বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। তাদের নিকট যান।

হুঁশ ফিরে আসতেই আমি অনুভব করলাম কেউ আমার চেহারায় পানি ঢালছে। আমি চোখ খুলে বললাম, আমাকে পানি পান করান। তখন সে একটি চামড়ার পানপাত্র থেকে আমার মুখে সামান্য পানি ঢালল। আমি পান পানি করলাম। ফলে জীবন ফিরে পেলাম। কিন্তু এতটুকুতে আমার পিপাসা নিবারণ হল না। তাই আমি বললাম, আমাকে আরেকটু পান করান। তিনি আরেকটু পান করালেন এবং আমার হাত ধরলেন।

আমি বললাম, পিছনে আমার আরেক সাথী পড়ে আছেন। তিনি বললেন, তার নিকট একদল গিয়েছেন। তারপর তিনি আমার হাত ধরলেন। আমি তার উপর ভর করে পা হেঁচড়িয়ে চললাম। তিনি একটু একটু করে আমাকে পানি পান করাতে থাকলেন। অবশেষে যখন

---

[১৩৭]. এক 'ফরসাখ্' হলো পাঁচ কিলোমিটারের কিছু বেশি।

তাদের জাহাযের নিকট পৌছালাম এবং তারা আমার তৃতীয় বৃদ্ধ সাথীকে নিয়ে আসল, তখন জাহাযের লোকেরা আমাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করল। আমরা তাদের নিকট কয়েকদিন অবস্থান করলাম। এর মধ্যে সুস্থতা ফিরে পেলাম।

তারপর তারা 'রায়া' শহরের গভর্নরের নিকট আমাদের জন্য একটি চিঠি লিখল এবং আমাদেরকে পাথেয়স্বরূপ কিছু পিঠা, ছাতু ও পানি দিল। আমরা জনমানবহীন মরুভূমিতে হাঁটতে থাকলাম। এক পর্যায়ে আমাদের সাথের পানি, ছাতু ও পিঠা শেষ হয়ে গেল। আমরা সমুদ্রের তীর ধরে ক্ষুধা ও পিপাসা নিয়ে হাঁটতে থাকলাম। হঠাৎ সমুদ্রের ঢেউয়ে তীরে পড়ে থাকা ঢালের মতো একটি কচ্ছপ দেখতে পেলাম। তখন একটি বড় পাথর দিয়ে কচ্ছপটির পিঠে আঘাত করলাম। এতে পিঠ ফেটে গেল। আমরা তার মধ্যে ডিমের কুসুমের মতো কিছু পেলাম। সমুদ্র-তীরে পড়ে থাকা কিছু ঝিনুক কুড়িয়ে নিলাম। সেগুলো দিয়ে সেই হলুদ পানীয় চুমুক দিয়ে পান করতে লাগলাম। এতে আমাদের ক্ষুধা ও পিপাসা ঠাণ্ডা হলো। অবশেষে আমরা 'রায়া' শহরে পৌছে সেখান থেকে হাদীস শোনার জন্য মিশরে গেলাম।

৪. আল্লামা ইবনে খালদুন রহ. তাঁর 'মুকাদ্দিমা'য় লিখেছেন, চারটি গ্রন্থকে আরবী সাহিত্যের মৌলিক গ্রন্থ মনে করা হয়। সেগুলো হলো–

١. «أَدَبُ الكاتبِ» لابن قُتَيْبَةَ

٢. «كتابُ الكاملِ» للْمُبَرِّدِ

٣. «كتابُ البيانِ والتبيينِ» للجاحظ

٤. «كتابُ النَّوَادِرِ» لأَبِي عَلِي القالِي البغداديِّ

এখানে আমি চতুর্থ গ্রন্থের লেখক আবু আলী কালী রহ.-এর শিক্ষাজীবনের মেহনত-মুজাহাদার একটি গল্প শোনাব। গল্পটি বলেছেন তাঁর শিষ্য ইবনে জানদাল কুরতুবী রহ.। তিনি বলেছেন– আমার উস্তাদ আবু আলী আল-কালী 'কর্ডোবা'র 'আয-যাহ্‌রা' মসজিদে তাঁর রচিত গ্রন্থ النَّوَادِر পড়াতেন। আমরা উক্ত দরসে নিয়মিত যেতাম। একবার আমি তাঁর দরসে উপস্থিত হওয়ার জন্য রওয়ানা হলাম। পথে

বৃষ্টি হলো। বৃষ্টিতে আমার পরিধানের সকল কাপড় ভিজে জবুথবু হয়ে গেল। তিনি আমার অবস্থা দেখে বললেন, 'তোমার এ অবস্থার কারণে আক্ষেপ করো না। কাপড় পরিবর্তন করে নিলে তোমার অসুবিধাটা ক্ষণিকের মধ্যে দূর হয়ে যাবে।' তারপর তিনি নিজের এই ঘটনাটি শুনিয়েছেন–

আমার ছাত্রজীবনে আমি এক বিশেষ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম। সেই দুর্ঘটনায় আমার শরীরে এমন কিছু ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে, যেগুলোর দাগ কবরে যাওয়া পর্যন্ত আমার শরীরে বহাল থাকবে। দুর্ঘটনাটা হলো, আমি আমার উস্তাদ প্রসিদ্ধ কেরাত শাস্ত্রবিদ ইবনে মুজাহিদ রহ. [২৪৫ - ৩২৪ হি.] -এর দরসে নিয়মিত উপস্থিত হতাম। দরসে তাঁর সন্নিকটে বসার জন্য একদিন আমি শেষ রাতেই রওয়ানা হলাম। তাঁর বাড়ীর যে প্রবেশদ্বারটি পার হয়ে তাঁর দরসের মজলিসে পৌঁছাতে হয়, সেখানে গিয়ে দেখি তা বন্ধ। তা খোলা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। মনে খুব দুঃখ হলো, এতো সাতসকালে এসেও কি উস্তাদের সন্নিকটে বসা থেকে বঞ্চিত হব? হঠাৎ বাড়ীটির এক পার্শ্বে বেষ্টনী-প্রাচীরের নিচ দিয়ে একটি সুড়ঙ্গ নজরে পড়ল। চিন্তা-ভাবনা না করেই সেই সুড়ঙ্গ দিয়েই ভেতরে যাওয়ার ঝুঁকি নিলাম। সুড়ঙ্গটির মাঝখানে গিয়ে আমি আটকে গেলাম। না সামনে যেতে পারছিলাম, না ফিরতে পারছিলাম। তখন প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে সুড়ঙ্গটি পার হলাম। পার হয়ে দেখি, আমার শরীরের মাংস ছিঁড়ে হাড় বের হয়ে এসেছে। আমি সেই অবস্থায়ই উস্তাদের দরসের মজলিসে পৌঁছলাম। এখন অনুমান করো, আমি আমার উস্তাদের সন্নিকটে বসার জন্য যে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছিলাম, তার তুলনায় তোমার অবস্থাটা কতো সাধারণ!

ইবনে জানদাল রহ. বলেন, এরপর তিনি আমাকে উৎসাহ প্রদান করার জন্য জনৈক কবির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করে শোনান–

دَبَبْتُ لِلْمَجْدِ وَالسَّاعُوْنَ قد بَلَغُوْا ... جُهْدَ النُّفُوْسِ وَأَلْقَوْا دُوْنَهُ الأُزُرَا

وَكَابَدُوْا المَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُمْ ... وَعَانَقَ المَجْدَ مَنْ أَوْفَى وَمَنْ صَبَرَا

لا تَحْسَبِ المَجْدَ تَمْرًا أَنْتَ آكِلُهُ ... لَنْ تَبْلُغَ المَجْدَ حَتَّى تَلْعَقَ الصَّبِرَا

অথ, গৌরবের জন্যে আমি চলছি হামাগুড়ি দিয়ে, অথচ যারা তার জন্য চেষ্টা করছে তারা সাধনার চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে এবং পড়নের কাপড় পর্যন্ত ফেলে দৌড়াচ্ছে। তারা গৌরবের সাথে সংগ্রাম করছে, এমনকি তাদের অধিকাংশ বিরক্ত হয়ে পড়েছে। সে-ই গৌরবকে আলিঙ্গন করতে সক্ষম হয়েছে, যে পরিপূর্ণ শ্রম দিয়েছে এবং ধৈর্যধারণ করেছে। তুমি গৌরবকে একটি খেজুর মনে করো না যা তুমি অনায়াসে খেয়ে ফেলবে। বিস্বাদ মুসব্বর[১৩৮] লেহন করা ব্যতীত কিছুতেই গৌরব অর্জন করতে পারবে না।

আবু নাস্‌র ইবনে জানদাল কুরতুবী বলেন, বৃষ্টিতে ভিজে আমার যে জবুথবু অবস্থা হয়েছিল, উস্তাদের ঘটনা ও কবিতা-পঙ্‌ক্তিগুলো শোনে তা আমার নিকট অতি সাধারণ মনে হলো।

৫. প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস আবু মুহাম্মদ বিন খিরাশ আল-মারওয়াযী রহ. [মৃ. ২৮৩ হি.] হাদীস অন্বেষণের জন্য জনমানবহীন মরুভূমিতে সুদীর্ঘ পথ সফর করেছেন। সে সকল সফরে তাঁর কী পরিমাণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে তাঁর এ উক্তি দ্বারাই তা অনুমান করা যায়– 'হাদীস অন্বেষণ করতে গিয়ে পিপাসায় আমার পাঁচ বার নিজের পেশাব পান করতে হয়েছে।'

৬. الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ। কিতাবের লেখক হাফেজ ইমাম মুহাম্মদ বিন ফাত্তুহ্ আল-হুমাইদী রহ. [৪২০ - ৪৮৮ হি.] রাতে যাতে ঘুম না আসে সেজন্য গরম কালে কাপড় ধোয়ার বড় পাত্রে পানি ঢেলে তাতে বসে লিখতেন।

৭. হাফেজে হাদীস মুহাম্মদ বিন তাহের আল-মাকদিসী রহ. [৪৪৮ ৫০৭ হি.] নিজের শিক্ষাজীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছেন– হাদীস অন্বেষণে আমি দু' বার রক্ত-পেশাব করেছি। একবার বাগদাদে ও একবার মক্কায়। দুপুরের রোদে আমার খালি পায়ে হাঁটতে হতো। ফলে সে অবস্থা হয়েছিল। হাদীস অন্বেষণে একবার ব্যতীত আর কখনো কোনো বাহনে আরোহণ করতে পারিনি। সবসময় কিতাবের

---

১৩৮. এক প্রকার তিক্ত ও দুর্গন্ধযুক্ত ঔষধবিশেষ।

বোঝা নিজের পিঠেই বহন করতে হতো। শিক্ষাজীবনে আমি কখনো কারো নিকট কোনো সাহায্য চাই নি। চাওয়া ব্যতিরেকে যতটুকু হাতে আসত, ততটুকুর উপর জীবন ধারণ করতাম।

৮. ইমাম নববী রহ. [৬৩১ - ৬৭৬ হি.] বলেছেন, [ইলম চর্চায় নিমগ্ন থাকার কারণে] 'আমি প্রায় দু' বছর বিছানায় পিঠ লাগাইনি।' ঘুমের চাহিদা তীব্র হলে কোনো জিনিসের উপর সামান্য সময় হেলান দিতেন মাত্র।

৯. একবার ইমামুল্ আস্র সাইয়েদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মিরী রহ. [১২৯২ - ১৩৫২ হি.] খুবই অসুস্থ হলেন। দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত থাকলেন। একদিন সকালে গুজব উঠলো, হযরত ইনতেকাল করেছেন। সবার উপর যেন বজ্রপাত হলো। হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. [১৩১৪ - ১৩৯৬ হি.] বলেন, ফজরের নামায পড়েই আমরা সবাই হযরতের বাসায় চলে গেলাম। হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. [১৩০৫ - ১৩৬৯ হি.]ও সাথে ছিলেন। বাসায় পৌঁছে জানতে পারলাম, আলহামদুলিল্লাহ সংবাদটি ভুল ছিল। অবশ্য হযরতের আগের মতই খুব কষ্ট হচ্ছে। আমরা সবাই হযরতের শুশ্রুষা করার জন্য কামরায় পৌঁছে দেখলাম, তিনি নামাযের চৌকিতে বসে আছেন। সামনে বালিশের উপর একটি কিতাব রাখা। অন্ধকারের কারণে হযরত তা ঝুঁকে অধ্যয়ন করছেন। দৃশ্যটি দেখে বিস্ময়ের সাথে সাথে আমাদের দুঃশ্চিন্তাও হল, এমন অসুস্থতায়ও এত কষ্ট সহ্য করে অধ্যয়ন করলে তো রোগের প্রকোপ আরো বেড়ে যাবে। তাই হযরত আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রহ. সাহস করে সুমিষ্টভাবে নিবেদন করলেন, হযরত! বুঝে আসছে না, প্রথমত এমন কোন্ বিষয় রয়ে গেছে যা হযরত এখনও অধ্যয়ন করেন নি? আর যদি এমন কোনো বিষয় থেকেও থাকে, তাহলে এমন কি প্রয়োজন পড়ল যে, ক'দিন অপেক্ষা করা যাবে না? তারপরও যদি ধরে নেই– হঠাৎ কোনো মাস্আলার প্রয়োজন পড়েছে, তাহলে আমরা খাদেমরা কোথায় মরলাম? আপনি কাউকে বলে দিলে সে মাসআলা দেখে এসে বলে দিত।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. বলেন, এর উত্তরে হযরত শাহ্ ছাহেব রহ. অনেকক্ষণ অসহায়ের দৃষ্টিতে অকপট ভঙ্গিতে মাওলানা উসমানী ছাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, ভাই! ঠিকই বলেছ। কিন্তু এই কিতাবও তো এক ব্যাধি। এই ব্যাধির জন্য কী করবো?[১৩৯]

১০. আল্লামা মুহাম্মদ রাওয়াস কাল'আজী নিজ শায়খ রাগেব আত্-তাব্বাখ্ রহ. [১২৯৩ - ১৩৯০ হি.] সম্পর্কে লিখেছেন, শায়খ যেদিন মৃত্যুবরণ করেন সেদিন আমি তাঁর নিকট গিয়েছিলাম। তিনি যেন বসতে সক্ষম হোন, সে জন্য তাঁর চার দিকে বালিশ দেয়া ছিল। তাঁর জিহ্বা ভারী হয়ে গিয়েছিল। চোখের পাতা ঝুলে পড়েছিল। তাই চোখ মেলে তাকাতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। চোখে ছিল অণুবীক্ষণ চশমা। এমতাবস্থায়ও হাতে একটি কিতাব ছিল। এক দুই লাইন পড়তেন। তাতেই যথেষ্ট ক্লান্ত হয়ে যেতেন। কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। তাই কিছু সময় মাথা হেলান দিয়ে রাখতেন। তারপর আবার পড়তেন।

আমি বললাম, হযরত! যদি এখন পড়া বন্ধ করে একটু আরাম করতেন, তাহলে ভালো হয়। কারণ আপনার অনেক কষ্ট হচ্ছে। তখন তিনি উত্তরে এমন কথা বললেন যা তাঁর জিহ্বা ভারী হওয়ার কারণে আমি পুরোপুরি বুঝতে পারিনি। তবে এতটুকু বুঝতে পেরিছি, একটি বিশেষ মাসআলার ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত অবগত হওয়ার পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করতে চাচ্ছেন না। তখন আমার দু' চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমি তাঁকে বললাম, তাহলে আমাকে দিন আমি আপনাকে পড়ে শোনাই। আমি তাঁর হাত থেকে কিতাবটি নিয়ে পড়তে থাকলাম। কিছুক্ষণ পর তাঁর দিকে তাকালাম। দেখলাম, মাথা হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে আছেন। ভাবলাম, তিনি শোনছেন। তাই পড়া চালিয়ে গেলাম। ইতোমধ্যে তাঁর পুত্র প্রবেশ করে পিতাকে অচেতন পেলেন। তখন তিনি আমাকে চলে যাওয়ার অনুরোধ করলেন। আমি বের হয়ে গেলাম। অল্পক্ষণ পরেই আমার নিকট তাঁর মৃত্যুর সংবাদ পৌছল।

---

১৩৯. "আকাবিরে দেওবন্দ ঃ আদর্শ ও চেতনা" পৃ. ৬০ - ৬১

১১. হযরত মাওলানা কারী সাইয়েদ সিদ্দীক আহমদ বান্দভী রহ. [১৯২৩ - ১৯৯৭ হি.] লিখেন, মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আসআদুল্লাহ ছাহেবের এক সন্তান জন্ম হয়। হযরত শাহ্ ছাহেব তখন বললেন, শায়খুল হাদীস [যাকারিয়া] ছাহেবকে সংবাদ দাও। তিনি এসে দু'আ করে যাবেন এবং কানে আযান দিবেন। আমি বললাম, এখন রাত দু'টো বাজে, হযরত হয়ত আরাম করছেন। শাহ্ ছাহেব বললেন, না, তিনি কিতাব অধ্যয়ন করছেন। আমি তাঁর নিকট গিয়ে দেখি সত্যিই তিনি কিতাব অধ্যয়ন করছেন।[১৪০]

১২. মাওলানা কারী সাইয়েদ সিদ্দীক আহমদ বান্দভী রহ. আরও লিখেছেন, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া দা. বা. দীর্ঘদিন যাবৎ শুধু দুপুরে খাবার খেতেন। রাতে খেতেন না। অধম কয়েকবারই হযরত থেকে শুনেছি, আমার এক সদয় সহোদরা ছিল। আমি সন্ধ্যায় মুতালা'আয় রত থাকতাম আর সে আমার মুখে লোকমা তুলে দিত। ফলে খাওয়ার কারণে মুতালা'আর কোনো ক্ষতি হত না। তার মৃত্যুর পর আমার এমন ছলনা সহ্য করার কেউ থাকল না। ওদিকে কিতাব মুতালা'আর ক্ষতি সহ্য করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই রাতে খানা খাওয়াই আমি ছেড়ে দিলাম।[১৪১]

একটি কিতাব বহু বার পড়ার কিছু উদাহরণ

আমরা অনেক সময় একটি পড়া দু'এক বার পড়ে আয়ত্ত না হলে নিরাশ হয়ে রেখে দিই আর মনে করি সেটা আমাদের মেধা ও সাধ্যের ঊর্ধ্বে। অনেকে আবার কয়েকবার পড়ে এই ভাবি যে, একটি পড়া আত্মস্থ করার জন্য যে পরিমাণ চেষ্টা ও পরিশ্রম করা উচিত ছিল, আমার তা হয়ে গেছে। অথচ আমাদের পূর্বসূরীগণ এ পরিমাণ পরিশ্রম করতেন যে, যথাযথ আয়ত্ত করার জন্য তাঁরা এক একটি কিতাব বহু বার পড়তেন। এখানে আমি قِيْمَةُ الزَّمَنِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ কিতাব[১৪২] থেকে এমন কয়েকজন মনীষীর নাম উল্লেখ করব।

---

১৪০. آداب المتعلمين পৃ. ৫৩

১৪১. آداب المتعلمين পৃ. ৬০

১৪২. পৃ. ১৭৫ - ১৮০

১. ইমাম নববী রহ. [৬৩১ - ৬৭৬ হি.] الوَسِيْط। কিতাবটি ৪০০ [চারশ'] বার পড়েছেন।

২. আব্বাস বিন ফারেসী রহ. [মৃ. ২১৮ হি.]-এর কোনো কোনো কিতাবের শেষে লেখা আছে– আমি তা ১০০০ [এক হাজার] বার পড়েছি।

৩. এরিস্টটল-এর النَّفْس। কিতাবের একটি কপির শেষে পৃথিবীর অন্যতম মেধাবী দার্শনিক আবু নাস্‌র ফারাবী রহ. [২৬০ - ৩৩৯ হি.]-এর কলমে লেখা আছে– আমি কিতাবটি ১০০ [একশ'] বার পড়েছি। ফারাবী রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন– আমি এরিস্টটল-এর السَّمَاعُ الطَّبِيْعِيُّ। কিতাবটি ৪০ [চল্লিশ] বার পড়েছি। কিতাবটি আমার আরও পড়া দরকার।

৪. মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ইবনুত্তাব্বান্ রহ. [৩১১ - ৩৭১ হি.] المُدَوَّنَة। কিতাবটি প্রায় ১০০০ [এক হাজার] বার পড়েছেন।

৫. ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আবু বকর আবহারী রহ. [২৮৯ - ৩৭৫ হি.] বলেছেন– আমি مُخْتَصَرُ ابنِ عبدِ الحكيمِ কিতাবটি ৫০০ [পাচশ'] বার, الأَسَدِيَّة। কিতাবটি ৭০ [সত্তর] বার, المُوَطَّأ। কিতাবটি ৪৫ [পয়তাল্লিশ] বার এবং مُخْتَصَرُ البَرْقِيِّ। কিতাবটি ৭০ [সত্তর] বার পড়েছি।

৫. হাফেজ হাসান সামারকান্দী রহ. আল্লামা আব্দুল গাফির ফারিসী রহ. [মৃ. ৪৪৮ হি]-এর নিকট সহীহ মুসলিম ৩০ [ত্রিশ] বারের অধিক পড়েছেন এবং আবু সাঈদ বাহিরী রহ. ২০ [বিশ] বারের অধিক পড়েছেন।

৬. ইমাম আবু ইসহাক সীরাজী রহ. [৩৯৩ - ৪৭৬ হি.] বলেছেন, আমি প্রতিটি قِيَاس ১০০০ [এক হাজার] বার পুনরাবৃত্তি করতাম। এভাবে একটি সমাপ্ত করার পর অন্যটি তারপর অন্যটি পুনরাবৃত্তি করতাম। সেখানে যদি প্রমাণস্বরূপ কোনো কবিতা-পঙ্‌ক্তি উল্লেখ থাকত, আমি পুরো কবিতাটি মুখস্থ করে নিতাম।

৭. ইমাম ইল্‌কিয়া হার্‌রাসী রহ. [৪৫০ - ৫০৪ হি.] বলেছেন, নিশাপুরের সার্‌হাঙ্ক মাদরাসার পুকুরে ৭০ [সত্তর]টি ধাপবিশিষ্ট একটি সিঁড়ি ছিল। আমি কোনো পড়া মুখস্থ করার পর সিঁড়িতে নামতাম এবং নামার সময়

ও উঠার সময় প্রত্যেক ধাপে পড়াটি একবার পুনরাবৃত্তি করতাম। তিনি বলেছেন, আমি যে পড়াই মুখস্থ করতাম তা এভাবে পুনরাবৃত্তি করতাম।

৮. মুহাদ্দিস আবু বকর মুহারিবী আন্দালুসী রহ. [৪৪১ - ৫১৮ হি.]-এর জীবনীতে আছে, তিনি সহীহ বুখারী ৭০০ [সাতশ'] বার পড়েছেন।

৯. আল্লামা আব্দুর রাজ্জাক বিন আবু নাস্‌র তাবাসী রহ. বলেছেন, আমি ইমাম আবু আব্দুল্লাহ ফারাভী রহ. [৪৪১ - ৫৩০ হি.]-এর নিকট ১৭ [সতের] বার সহীহ মুসলিম পড়েছি।

১০ প্রসিদ্ধ আরবী সাহিত্যিক যিয়াউদ্দীন ইবনুল আসীর রহ. [৫৫৮ - ৬৩৭ হি.] বলেছেন, আমি প্রচুর সংখক হাদীস থেকে বাছাই করে তিন হাজার হাদীস সম্বলিত একটি সংকলন তৈরি করেছি। তারপর দশ বছরেরর বেশি সময় যাবৎ সংকলনটি অধ্যয়ন করতে থেকেছি। প্রতি সপ্তাহে একবার অধ্যয়ন সমাপ্ত করতাম। এভাবে সংকলনটি আমার ৫০০ [পাঁচশ'] বারের অধিক অধ্যয়ন করা হয়েছে এবং তা আমার সম্পূর্ণ মুখস্থ হয়ে গেছে।

১১. সাইয়েদ আসীলুদ্দীন রহ. বলেছেন, আমি সহীহ বুখারী প্রায় ১২০ বার পড়েছি।

১২. হাফেজ বুরহানুদ্দীন হালাবী রহ. ছাত্রজীবনের পড়া এবং শিক্ষকজীবনে পড়ানোর হিসেবের বাইরে সহীহ বুখারী নিজে নিজে ৬০ বারের অধিক এবং সহীহ মুসলিম প্রায় ২০ বার অধ্যয়ন করেছেন।[১৪৩]

১৩. শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলবী রহ. লিখেছেন, কুরআন শরীফ হিফজ করার ক্ষেত্রে মরহুম আব্বাজানের নির্দেশ ছিল, প্রতিটি পৃষ্ঠা

---

১৪৩. تحديث بالنعمة তথা আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের আলোচনা হিসেবে বলছি, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সহীহ মুসলিমের মুকাদ্দিমাকে প্রায় ২৫ বার মনোযোগের সাথে পড়ার তাওফীক দান করেছেন। تيسير مقدمة الصحيح لمسلم নামে মুকাদ্দিমায়ে মুসলিমের আমার যে শরাহটি আছে, তা লেখার পূর্বে এই পড়া হয়েছিল। 'ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা'-এর পক্ষ থেকে যে সহীহ মুসলিম প্রকাশিত হয়েছে, তার শুরুতেও শরাহটি যুক্ত করা হয়েছে।

১০০ বার পড়বে। মুখস্থ হল কি হল না, এর দায়-দায়িত্ব তোমার নয়। একশ' বার পড়ে ছেড়ে দাও। একশ' বার পড়তে কতক্ষণ সময় লাগত, এরও একটা ধারণা ছিল। পুরো কুরআন শরীফ এভাবে পড়েই আমি হাফেজ হই।[১৪৪]

পূর্বসূরীদের প্রচুর লেখার কিছু উদাহরণ

এতক্ষণের ঘটনাগুলো ছিল পড়া সম্পর্কিত। এখন আমি উক্ত কিতাব থেকে লেখা সম্পর্কিত পূর্বসূরীদের পরিশ্রম ও সাধনার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করব–

১. হাদীসের ইমাম ইয়াহ্ইয়া বিন মায়ীন রহ. [১৫৮ - ২৩২ হি.]-এর জীবনে এমন অনেক হয়েছে যে, এক একটি হাদীস তিনি ৫০ বার লিখেছেন।

২. পূর্ব যুগে মানুষ বাঁশ ও কাঠের কলম তৈরি করত এবং সেগুলো কালিতে চুবিয়ে চুবিয়ে লিখত। যখন মাথা ভোঁতা হয়ে যেত, তখন মাথাগুলো চেঁছে কলমগুলোকে পুনরায় লেখার উপযোগী বানিয়ে নিত। ইমাম আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী রহ. [৫০৮ - ৫৯৭ হি.] নিজের সকল কলমের নয়, বরং যেসকল কলম দিয়ে তিনি হাদীস লিখতেন শুধু সেসকল কলমের মাথার দিকের চাঁছা অংশগুলো সংরক্ষণ করতেন। আর শুধু সেগুলোই এতো পরিমাণ হয়েছিল যে, মৃত্যুর পূর্বে তিনি অসিয়ত করেছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁকে যে পানি দিয়ে গোসল দেয়া হবে সে পানি যেন এগুলো দিয়ে গরম করা হয়। তা-ই করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো এত অধিক ছিল যে, গোসলের সম্পূর্ণ পানি গরম করা সত্ত্বেও অনেক অবশিষ্ট রয়ে গিয়েছিল। এখন আন্দাজ করো, জীবনে তিনি কী পরিমাণ লিখেছেন!

তিনি শেষ জীবনে বলেছেন, 'আমি আমার এই দুই আঙ্গুলে দু'হাজার খণ্ড লিখেছি।' তিনি যেসকল কুর্‌রাসা[১৪৫] লিখেছেন, সেগুলো একত্র করে তারপর তাঁর জীবনের দিনগুলো হিসাব করে দেখা হয়েছিল। তাতে দেখা গেছে, গড়ে প্রতিদিন তিনি প্রায় ৯০ পাতা লিখেছেন।

---

১৪৪. 'আপবীতি' ১ ঃ ৭৯

১৪৫. প্রায় দশ পাতা সম্বলিত ছোট পুস্তিকাকে 'কুর্‌রাসা' বলা হত।

৩. হাফেজ ইমাম আব্দুল আযীম মুনযিরী রহ. [৫৮১ - ৬৫৬ হি.] নিজে যেসকল কিতাব রচনা করেছেন, সেগুলোর বাইরে উলূমুল হাদীস সম্পর্কিত অন্যদের রচনা নিজ হাতে লিখেছেন ৯০ মুজাল্লাদ[১৪৬] ও ৭০০ জুয্।[১৪৭]

* * *

অতএব তোমার জীবনের লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য পরিশ্রম ও সাধনা শুরু করে দাও। একটি ধাপ তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আরেকটি ধাপের দিকে। প্রথম কাজটি করতে পারলেই পরবর্তী কাজটি করার উদ্দীপনা মনে জাগ্রত হবে। এভাবেই তুমি স্তরের পর স্তর অতিক্রম করতে থাকবে। মনে রাখবে– প্রতিদিনের ছোট ছোট অর্জনই বড় অর্জনের ভিত্তি।

---

[১৪৬]. قال الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى في «الصَّفَحَات» ص ٨٨ : قال ابن خَلِّكَان في «الوَفَيَات» ٢ : ٢٣٠، في ترجمة أبي محمد يحيى بن المبارك اليزيديِّ : «عن أبي حَمْدُون الطيِّب، قال : شهدتُ ابن أبي العتاهِيَة وقد كتب عن أبي محمد اليزيديِّ قريبًا من ألف مجلَّدٍ عن أبي عمرو بن العلاء خاصَّةً، فيكون ذلك عشرةَ آلافِ ورقة، لأن تقدير المجلَّد عَشْرُ ورقاتٍ». انتهى كلامُ ابن خلِّكان.

وقال ابن النَّدِيم في كتابه «الفهرست» ص ٢٢٧ «فإذا قلنا : إن شعر فلان عَشْرُ وَرَقات، فإنما عَنَيْنَا بالوَرَقة أن تكون سُلَيْمَانِيَّة، ومقدارُ ما فيها عشرون سطرًا، أعني في صفحة الورقة».

[১৪৭]. قال الإمام محمد بن جعفر الكَتَّانِي المتوفى ١٣٤٥هـ رحمه الله في «الرسالة المستطرِفَة لبيان مشهورِ كُتُبِ السُّنَّة المشرَّفة» ص ٨٦ : و«الجزء» عندهم تأليف الأحاديث المروية عن رجل واحد من الصحابة أو من بعدهم. وقد يختارون من المطالب المذكورة في صفة الجامع مَطْلَبًا جزئيا يُصنفون فيه مبسوطا، وفوائدَ حديثية أيضا، ووُحْدانيات وثُنائيات إلى العُشَارِيَّات وأربعونيات وثمانونيات والمائة والمائتان وما أشبه ذلك، وهي كثيرة جدا.

ড. আহমদ আমীন লিখেছেন–

كُلُّ مَنْ سَارُوْا فِيْ طَرِيْقِ الْعَمَلِ بَدَؤُوْا حَيَاتَهُمْ بِنَوْعٍ مِنَ الشَّكِّ والظَّلاَمِ، وَلٰكِنْ مَّنْ نَجَحَ مِنْهُمْ إِنَّمَا نَجَحَ لأَنَّهُ بَعْدَ أَنْ بَدَأَ حَيَاتَهُ، شَعَرَ أَنَّ فِيْ يَدِهِ مِصْبَاحًا مِّنْ نَّفْسِهِ يُضِيْءُ لَهُ الطَّرِيْقَ وَيُشَجِّعُه عَلَى السَّيْرِ، وَكُلَّمَا تَقَدَّمَ إِلَى الأَمَامِ خُطْوَةً، شَجَّعَه عَزْمُه عَلَى مُوَاصَلَةِ الْخُطَى فِيْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ مَلَلٍ.

অর্থ– যারাই কাজের পথে চলেছেন, এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও অন্ধকার নিয়েই জীবন শুরু করেছেন। তাদের মধ্যে যিনি সফল হয়েছেন, তিনি এ কারণেই সফল হয়েছেন যে, জীবন শুরু করার পর তিনি অনুভব করেছেন তাঁর হাতে মনের এমন একটি আলোকবর্তিকা আছে, যা তাঁর জন্য পথ আলোকিত করে, তাঁকে সামনে চলতে উৎসাহিত করে। যখনই তিনি সামনের দিকে এক কদম অগ্রসর হন, তাঁর প্রতিজ্ঞা তাঁকে নির্ভয়ে ও আগ্রহভরে পদক্ষেপ অব্যাহত রাখতে অনুপ্রাণিত করে।

সময়ের সদ্ব্যবহার

এতক্ষণ আমরা লক্ষ্যার্জনে পরিশ্রম ও সাধনা করার কিছু ঘটনা শোনলাম। আমরা এ বাস্তবতা পরিষ্কার বোঝলাম যে, ইতিহাসে যারাই বরেণ্য হয়েছেন, তাঁরা ঘটনাক্রমে বরেণ্য হয়ে যাননি। বরং এর জন্য তাঁদেরকে বিরাট পরিমাণ পরিশ্রম ও সাধনা বিনিয়োগ করতে হয়েছে।

তাঁদের জীবনীতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রতীয়মান হয়, পরিশ্রম ও সাধনার পাশাপাশি আরো যে মৌলিক উপাদানটি তাঁদের লক্ষ্যার্জনে বিশেষভাবে ভূমিকা রেখেছে, তাহলো সময়ের সদ্ব্যবহার। তাঁরা সময়ের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ। জীবনের সামান্য সময়ও অনর্থক ব্যয় হবে, তা ছিল তাঁদের জন্য সীমাহীন অসহনীয়। তাঁরা এমন সময়গুলো দ্বারাও উপকৃত হয়েছেন, যেগুলো অন্যদের এমনিতেই ব্যয় হয়ে যায়।

এখানে আমি উপরিউক্ত কিতাবগুলো থেকে এ জাতীয় কিছু ঘটনা উল্লেখ করব। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পূর্বসূরীদের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

১. রাজ পরিবারের সন্তান এবং বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক ফাত্হ্ বিন খাকান রহ. [মৃ. ২৪৭ হি.] ছিলেন আব্বাসী খলীফা মুতাওয়াক্কিল

আল্লাল্লাহ রহ.-এর মন্ত্রী ও একান্ত ঘনিষ্টভাজন। তিনি যখন খলীফার নিকট যেতেন, তখন সঙ্গে কোনো কিতাব নিয়ে যেতেন। তারপর যখন নামাযের উদ্দেশ্যে বা পেশাব করার প্রয়োজনে মজলিস থেকে উঠতেন, তখন মসজিদে বা পেশাবখানায় পৌঁছার আগ পর্যন্ত হাঁটা অবস্থায় কিতাবটি পড়তেন। সেখান থেকে মজলিসে ফেরার পথেও এমনটি করতেন। খলীফাও যখন কোনো প্রয়োজনে মজলিস থেকে উঠতেন, তখন তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত তিনি কিতাবটি পড়তেন।

২. মুহাদ্দিস আহমদ বিন আলী রহ. বলেন, আমি প্রসিদ্ধ হাফেজে হাদীস ইবনে আবী হাতেম রহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার পিতা আবু হাতেম রাযী রহ. [১৯৫ - ২৭৭ হি.] থেকে এতো অধিক পরিমাণ হাদীস শোনা আপনার জন্য কী করে সম্ভব হয়েছে? তিনি বললেন, এমন অনেক হয়েছে, তিনি খানা খাচ্ছেন, তখনও আমি তাঁর নিকট পড়ছি। তিনি পথে হাঁটছেন, তখনও আমি তাঁর নিকট পড়ছি। তিনি প্রাকৃতিক প্রয়োজনে যাচ্ছেন, তখনও আমি তাঁর নিকট পড়ছি। তিনি দরস চলাকালে কোনো প্রয়োজনে ঘরে প্রবেশ করছেন, তখনও আমি তাঁর নিকট পড়ছি।

৩. আরবী ভাষা ও সাহিত্য, আরবী ব্যাকরণ, ইলমে হাদীস ও ইলমে কেরাতের প্রসিদ্ধ ইমাম আহমদ বিন ইয়াহ্য়া 'ছা'লাব' রহ. [২০০ - ২৯১ হি.] সময়কে এ পরিমাণ কাজে লাগাতেন যে, তাঁকে কেউ দাওয়াত দিলে তিনি এই শর্তে দাওয়াত কবুল করতেন– আমাকে এ পরিমাণ জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে হবে যেখানে আমি কিছু রেখে কিতাব অধ্যয়ন করতে পারি।

শেষ জীবনে তাঁর শ্রবণশক্তি হ্রাস পেয়েছিল। খুব জোরে আওয়াজ না হলে শুনতেন না। সেসময়ের এক জুমাবারে আসরের পর জামে মসজিদ থেকে বের হয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটছিলেন এবং কিতাব অধ্যয়ন করছিলেন। –তিনি হাঁটার সময়গুলোতেও কিতাব অধ্যয়ন করতেন।– তখন হঠাৎ একটি ঘোড়ার গাড়ি পিছন থেকে ছুটে আসল। তাঁকে সরার জন্য আওয়াজ দেয়া হলো। কিন্তু তিনি আওয়াজ শুনলেন না এবং সরলেন না। ঘোড়াটি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে খাদে ফেলে দিল। এতে তিনি মাথায় এত গুরুতর আঘাত পেলেন যে, পরদিনই মৃত্যুবরণ করলেন।

৪. নাহ্‌বের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু বকর বিন বাইয়াত রহ. [মৃ. ৩২০ হি.] রাস্তায় চলার সময়ও পড়তেন। কিতাব পড়ার প্রতি এতটাই নিমগ্ন থাকতেন যে, এর কারণে অনেকবার গর্তে পড়ে গেছেন। আবার অনেকবার কোনো জন্তুর সাথে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়েছেন।

৫. ইলমের প্রতি সীমাহীন মনোযোগী আল্লামা আবু জাফর মাহ্‌রী রহ. [২৫০ - ৩৩৩ হি.] সম্পর্কে কাযী ইয়ায রহ. বলেছেন– খুব কমই এমন হতো যে, খানা খাওয়ার সময় তাঁর হাতে কিতাব থাকত না।

৬. কর্ডোভার প্রধান ফকীহ্ ইবনুল মাক্‌ভী রহ. [৩২৪ - ৪০১ হি.] একজন পোশাক-বিক্রেতাও ছিলেন। তখনও উঠা-বসা কোনো অবস্থায় কিতাব অধ্যয়ন থেকে তিনি পৃথক হতেন না।

একবার তাঁর এক বন্ধু ঈদের দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য গিয়েছিলেন। বন্ধু তাঁকে ঘরের ভেতরে পেলেন। দরজা খোলাই ছিল। তিনি বসে বসে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন। 'ইবনুল মাক্‌ভী' বের হতে বিলম্ব করলেন। তাই তিনি তাঁর আগমনের সংবাদ দিলেন। তখন 'ইবনুল মাক্‌ভী' একটি কিতাব দেখতে দেখতে বের হলেন। বন্ধুর উপস্থিতির বিষয়টি তিনি টের পাননি। অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকার কারণে হোঁচট খেয়ে বন্ধুর উপর পড়লেন। তখনই বন্ধুর উপস্থিতির ব্যাপারে অবগত হলেন এবং তাঁকে সালাম করলেন এবং একটি জটিল মাসআলায় ব্যস্ত থাকায় আটকে পড়ার কারণে ওজর পেশ করলেন।

বন্ধু বললেন, আজ তো ঈদের দিন এবং সুন্নতসম্মত আরামের সময়। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ, চিন্তা করা ও কিতাব পড়া ছাড়া অন্য কিছুতে আমি কোনো আরাম ও শান্তি পাই না।

৭. ঐতিহাসিক, মুহাদ্দিস ও সূফী আবু নু'আইম আস্ফাহানী রহ. [৩৩৬ - ৪৩০ হি.] যখন রাস্তায় চলতেন, তখনও তাঁর নিকট কিতাব পড়া হতো।

৮-৯. বাগদাদের মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক খতীব বাগদাদী রহ. [৩৯২ - ৪৬৩ হি.]ও রাস্তায় চলার সময় কিতাব অধ্যয়ন করতেন। বস্‌রার নাহ্‌বী মুহাম্মদ সায়ীদী রহ. [৪২০ - ৫২০ হি.]-এর বর্ণনামতে ইয়াকুব বিন খুর্‌রাযাদ্ নাজিরামী রহ.-এর অবস্থাও অনুরূপ ছিল।

১০. ইমাম আবুল ওয়াফা বিন উকাইল্ হাম্বলী রহ. [৪৩১ - ৫১৩ হি.]-এর জীবনীতে আছে, তিনি বলেছেন, আমার পক্ষে যখন কিতাব পড়া ও

কারো সঙ্গে মুযাকারা করা আর সম্ভব হয় না, তখন আমি বিশ্রামের সাথে সাথে চিন্তাও করি। মনে কিছু উদয় হলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে তা লিখে নিই।

রুটি খাওয়ার মধ্যে সময় তুলনামূলক বেশি ব্যয় হওয়ার কারণে তিনি রুটি খেতেন না। বরং পানি ভিজিয়ে কেকজাতীয় সাধারণ মানের কোনো খাবার খেয়ে জীবন ধারণ করতেন। তাঁর রচিত একটি কিতাবের নাম হলো الفُنُوْن।- হাফেয যাহাবী রহ. বলেছেন, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় কোনো কিতাব রচিত হয়নি। হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী রহ. বলেছেন, কারো কারো বর্ণনামতে কিতাবটি আটশ' খণ্ডের। বস্তুত, এতো বড় সুবিশাল কিতাব রচনা করা তাঁর মতো ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব।

১১. মহান ইমাম ইবনুল জাওযী রহ. [৫০৮ - ৫৯৭ হি.] লিখেছেন, সময় যেন অনর্থক ব্যয় না হয়, তাই আমার সঙ্গে মানুষের সাক্ষাতের সময়ে আমি এমন কিছু কাজ করি, যেগুলো কথা বলার মধ্যেও করা যায়। আমি তখন কাগজ কাটি। কলম ধারাই ও খাতা বাঁধি। কারণ এ কাজগুলো করার জন্য খুব চিন্তা-ফিকিরের প্রয়োজন হয় না। আবার কাজগুলোও প্রয়োজনীয়।

১২. শাইখুল ইসলাম হাফেজ তাকীউদ্দীন ইবনে তাইমিয়া রহ. [৬৬১ - ৭২৮ হি.]-এর পিতামহ ইমাম মাজ্দুদ্দীন আবুল বারাকাত ইবনে তাইমিয়া রহ. [৫৯০ - ৬৫৩ হি.] শৌচাগারে প্রবেশ করার পূর্বে নিজের পুত্রকে বলতেন, এই কিতাব থেকে এমন উঁচু আওয়াজে পড়বে, যেনো আমি ভেতর থেকে শুনতে পাই।

মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা. লিখেছেন– আমার পিতা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. তাঁর শাগরেদদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন– একটি লজ্জার কথা, শুধু তোমাদের বোঝানোর জন্য বলছি, মানুষ যে সময়টা টয়লেটে কাটায়, সে সময়টা এমন যাতে না পারে আল্লাহর জিকির করতে, না পারে অন্য কোনো কাজ করতে। তাই আমার এ সময়টা এক দুঃসহ মর্মবেদনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। সে জন্য আমি এ থেকে উত্তরণের একটি পথ খুঁজে বের করেছি– টয়লেটে থাকাকালে আমি বসে বসে লোটা-বদনা পরিষ্কার করি, যাতে আমার এ

সময়টাও বেকার নষ্ট না হয়। উপরন্তু আমার পরে যে ব্যক্তি টয়লেটে আসবে, সে যেন এতে আত্মতৃপ্তি লাভ করে এবং এটি ব্যবহারে কোনো রকম সংকোচের শিকার না হয়।[১৪৮]

১৩. ইমাম শামসুদ্দীন মাহমুদ বিন আব্দুর রহমান ইস্পাহানী রহ. [৬৭৪ - ৭৪৯ হি.] কম আহার করতেন, যেন পানি পান করার প্রয়োজন না হয়, তাহলে শৌচাগারে প্রবেশ করার প্রয়োজন হবে, আর তাতে সময় নষ্ট হবে।

১৪. হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. [৭৭৩ - ৮৫২ হি.] একবার 'মাহমুদিয়া মাদরাসা'য় গেলেন। ভুলে বাড়িতে চাবি রেখে আসলেন। তখন পুনরায় বাড়ি গিয়ে চাবি আনার পরিবর্তে দরজা খোলার জন্য একজন মিস্ত্রি ডাকলেন। তারপর দরজা খোলার আগ পর্যন্ত নামায পড়তে থাকলেন। তাঁকে বলা হলো, যদি কাউকে পাঠিয়ে বাড়ি থেকে চাবিটি নিয়ে আসতেন, তাহলে কষ্ট কম হতো এবং খরচও হতো না। তিনি বললেন, এভাবে করাতে কাজটা জলদি হলো [এবং সময়ও কিছু বাঁচল]।

তিনি যখন শায়খ গারসুদ্দীন খলীল হোসাইনী রহ.-এর পাশে তারাবীর নামায পড়তেন, তখন চার রাকাতের পরবর্তী বৈঠকগুলোতে তাঁকে কুরআন পাকের 'মুতাশাবিহ্' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন, যেন এ সময়গুলোও নিরর্থক না কাটে।

মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা. লিখেছেন– হাফেজ ইবনে হাজর আসকালানী রহ.-এর কলমের নিব যখন লিখতে লিখতে নষ্ট হয়ে যেত, তখন তিনি নিজেই চাকু দিয়ে নিব তৈরি করতেন। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, নিব তৈরির এই সামান্য সময়টুকুও তিনি আল্লাহর ইবাদতশূণ্য ছেড়ে দিতেন না। এ ধরনের সময়গুলোতে তিনি আল্লাহর জিকির করতেন।[১৪৯]

---

১৪৮. "জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ" পৃ. ১৫

১৪৯. "জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ" পৃ. ১৪

সর্বদা প্রাণবন্ত ও হাস্যোজ্জ্বল থাকবে

তবে সময়ের সদ্ব্যবহারকারী ও সময়নিষ্ঠ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, পুরো সময়কে গাম্ভীর্যপূর্ণ কাজ দ্বারা পূর্ণ করে রাখবে। কোনো ধরনের হাসি-তামাশা ও রঙ্গ-রসিকতা থাকবে না। কিছু লোক আছে হাসতে পারে না; সব সময় মুখ মলিন করে রাখে। দুঃখিত ও ভারাক্রান্ত থাকে। তাদের মনে কোনো আনন্দ নেই। মানুষ তাদেরকে সর্বদা চিন্তিত দেখে, যেন তারা কোনো জানাযা থেকে ফিরছে। না, এমন হওয়া উচিত নয়। সব সময় হাস্যোজ্জ্বল ও হাসিমাখা থাকবে, সজীব ও প্রাণবন্ত থাকবে। হাসি মানসিক ক্লান্তি দূর করে। হাসি কষ্ট সহ্য করার সর্বোত্তম সহায়ক।

প্রাণ খুলে হাসবে। মন থেকে হাসি না আসলে কৃত্রিমভাবে হাসবে। তাতেও লাভ হবে। হাসি শুধু অন্যদের মন জয় করার জন্য নয়। জনপ্রিয়তা অর্জনের তুচ্ছ স্বার্থে নয়। হাসি প্রত্যেকের নিজের প্রয়োজন। লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য তুমি যে কঠোর অধ্যবসায় করে যাচ্ছ, তা অব্যাহত রাখতে হাসি তোমাকে সহায়তা করবে। চামড়ার উপর আলতোভাবে স্পর্শ করে আদর করলে শিশুরা শান্ত হয়ে যায়। আবার চামড়ায় চিমটি কেটে সহজেই একজনকে উত্তেজিত করা যায়। অনুরূপভাবে হাসি দ্বারাও মনের কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা বাড়ানো যায়।

পরবর্তীকালের সুফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আনন্দ-ফুর্তি

আলামা আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. [মৃ. ৯৭৩ হি.]-এর تَنْبِيْهُ الْمُغْتَرِّيْنَ নামে একটি কিতাব আছে। আমার শায়খ ও মুর্শিদ মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন দা. বা. কিতাবটি বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। বাংলা অনুবাদের নাম 'সীরাতুল আউলিয়া/মহান আউলিয়া চরিত'। বইটির শুরুতে তিনি বইটি পড়ার পূর্বে জ্ঞাতব্য কয়েকটি মূলনীতি উল্লেখ করেছেন। তাতে এক পর্যায়ে আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ. [মৃ. ১৪৩৪ হি.]-এর এই বাণী উল্লেখ করেছেন– 'যেহেতু বর্তমান যুগের লোকজন ব্যাপকভাবে হার্টডিজিক, টেনশন, ডিপ্রেশন এবং বিভিন্ন প্রকারের স্নায়ু-রোগ ও মানসিক রোগে আক্রান্ত, আর হাসি-ফুর্তি-আনন্দ বর্জনের অভ্যাসের পরিণতিতে এই সব রোগের জন্ম হয়, অথবা রোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, অথচ 'আফিয়ত' বা সুস্থতা কামনাই শ্রেষ্ঠতম সুন্নত, অতএব পূর্ববর্তী যমানায় হাসি-আনন্দের ক্ষেত্রে যেরূপ

কঠোরতা আরোপ করা হত, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রয়োজনে সেই কঠোরতা এখন পরিত্যাজ্য। তবে সেই কঠোরতার মূল লক্ষ্যকে অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। অর্থাৎ গাফলত বর্জন ও গুনাহ বর্জন করা, আল্লাহ পাকের যিকির-এর প্রতি সজাগ ও সচেতন থাকা। এ নীতিটি হযরত থানবী রহ.-এর তা'লীমেও বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে বর্ণিত রয়েছে। হযরত খাজা ছাহেব রহ.ও তা বর্ণনা করেছেন।'

যে বলে– 'আমি তো হাসতে পারি না'

কেউ বলতে পার– আমার তো হাসি আসে না। জানালার কাছে বসে কিতাব পড়ছ? কিতাব বন্ধ করো। বাইরের গাছটার দিকে তাকাও। কাঠঠোকরা যে গর্ত করছে, সেই দৃশ্যে মনোযোগ দাও। চড়ুই পাখির কিচিরমিচির উপভোগ করো। পিঠা তৈরির ব্যাপারে টুনটুনি দম্পতির শলাপরামর্শ খেয়াল করে শোনো। নীড়ে ফিরে বাচ্চাদের মুখে পাখিদের খাবার তুলে দেওয়ার দৃশ্য দেখো।

কি বললে? তোমার জানালা দিয়ে এসবের কিছুই দেখা যাচ্ছেনা। ঠিক আছে। সমস্যা নেই। দক্ষিণের ছাত্রাবাসের দক্ষিণ পার্শ্বের লেকের পরেই তো ঢাকা-চট্টগ্রাম বিশ্বরোড।[১৫০] তিনতলায় হেফজখানার বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখো না সড়কে জীবনের গতি। প্রতিমিনিটে দূরপাল্লার ও নিকটপাল্লার ছোট-বড় কত গাড়ি দৌড়াচ্ছে। কে কার আগে যাবে, সে জন্য কি প্রতিযোগিতাই না গাড়িগুলো করছে! বেঁকে বসে বলতে পার– কই, রাস্তায় তো কোনো গাড়িই নেই। কারণ, আজ যে হরতাল। ঠিক আছে, বাদ দাও রাস্তা। আকাশের দিকে তাকাও। বর্ষাকাল। মেঘ ভেসে যাচ্ছে। তো প্রতিটি মেঘখণ্ডের একটি চেহারা, হাত, পা কল্পনা করো। তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দাও। তার সঙ্গে কথা বলো। আনন্দে এক সময় নিজের অজান্তেই হেসে উঠবে।

মোট কথা, ইচ্ছা করলেই উপলক্ষ্য তৈরি করে প্রফুল্ল থাকতে পার। আশেপাশে এমন লোক অবশ্যই পাবে, যাদের অবস্থা তোমার চেয়ে করুণ।

---

১৫০. দারুল উলূম মাদানীনগর মাদরাসার [ঢাকা] দক্ষিণের ছাত্রাবাসের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি লেক আছে। লেকের পরেই ঢাকা-চট্টগ্রাম বিশ্বরোড।

প্রয়োজনে হাসপাতালে গিয়ে মানুষের দুরাবস্থা দেখে আসতে পার। এতে শোকরের মনোভাব জাগ্রত হবে। শিক্ষাবিদ ও গবেষক, লেখক ও সাংবাদিক, বীর ও বিচক্ষণ সেনাপতি, প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও সংস্কারক, জনদরদী সেবক, অন্তরালোকসম্পন্ন মুসলিহ ও মুমারী এবং খাওফে ইলাহির তাড়নায় প্রকম্পিত বান্দা হওয়ার মতো সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যসমূহ যাদের জীবনের, তাদের সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত থাকতে হবে। হাস্যোজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত না থাকলে মানসিক চাপ সহ্য করা কঠিন হবে।

সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা একটি দায়েমী সুন্নত

হাস্যোজ্জ্বল থাকা ও পরিমিত কৌতুক করা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দায়েমী সুন্নত। তিনি সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকতেন। মাঝে মধ্যে রসিকতাও করতেন। 'শামায়েলে তিরমিযী'তে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিস রা. বলেছেন–

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ تَبَسُّمًا مِّنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

অর্থ. আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক মুচকি হাসতে আমি কাউকে দেখিনি।

হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেছেন–

مَا حَجَبَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِيْ إِلَّا ضَحِكَ.

অর্থ. ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে [তাঁর মজলিসে] প্রবেশে বাধা দেননি। আর তিনি যখনই আমাকে দেখেছেন, হেসেছেন।

হযরত হাসান বসরী রহ. বর্ণনা করেছেন– জনৈকা বৃদ্ধা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করল– হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর নিকট দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। তখন রাসূল বললেন– হে অমুকের মা! বৃদ্ধা মহিলারা জান্নাতে যাবে না। ঐ মহিলা কেঁদে কেঁদে ফিরে যেতে লাগল। তখন রাসূল [সাহাবীদেরকে] বললেন– তোমরা তাকে জানিয়ে দাও– সে বৃদ্ধা অবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا [অর্থ. আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করেছি। তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।]

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেছেন– এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সওয়ারী প্রার্থনা করল। তখন রাসূল বললেন– আমি তোমাকে একটি উটনীর বাচ্চার উপর আরোহন করাব। সে বলল– হে আল্লাহর রাসূল! আমি উটনীর বাচ্চা দিয়ে কি করব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– উটনীই তো উট জন্ম দেয়। [অর্থাৎ প্রত্যেক উট কোনো না কোনো উটনীর বাচ্চাই তো!]

মোটকথা, আমাদের হাস্যোজ্জ্বল থাকতে হবে। তাতে একদিকে যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দায়েমী সুন্নত যিন্দা হবে, তদ্রূপ আমাদের মানসিক ক্লান্তিও দূর হবে।

সময় সংরক্ষণে সহায়ক কিছু দিকনির্দেশনা

পূর্বের আলোচনায় আমরা বুঝতে পারলাম, আমাদের পূর্বসূরীগণ সময় দ্বারা সর্বোচ্চ উপকৃত হতে সচেষ্ট থাকতেন। আমরা একথাও অনুধাবন করলাম, জীবনে বড় কিছু হতে হলে অবশ্যই সময়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। তাই আশাকরি আমরা সকলেই পণ করে নিয়েছি, আজ থেকে আমাদের সামান্য সময়ও বৃথা যেতে দেব না। সুবর্ণ সুযোগ মনে করে প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাব। এখন আমি শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. [১৩৩৬ - ১৪১৭ হি.]-এর এমন কিছু দিকনির্দেশনা উল্লেখ করব, যেগুলো সময় দ্বারা অধিক উপকৃত হতে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। সেগুলো হলো–

১. প্রতিটি কাজ রুটিনমাফিক করা।
২. অনর্থক ও অনুপকারী মজলিসসমূহ থেকে বিরত থাকা।
৩. সকল ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করা।
৪. বিচক্ষণ, মেধাবী, সময়ের ব্যাপারে সজাগ ও পরিশ্রমী ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকা।
৫. বিশিষ্ট মনীষীদের উদ্দীপক ও প্রেরণাসৃষ্টিকারী ঘটনাবলী অধ্যয়ন করা।
৬. সময় বের করে ও বাচিয়ে ইলমী কাজ সম্পাদন করার মিষ্টতার স্বাদ গ্রহণ করা।
৭. অধ্যয়ন-উপভোগ, জ্ঞান ও অবগতির পরিধি সম্প্রসারণ এবং অর্জিত তথ্যসমূহের পরিমার্জনে নিমগ্ন হওয়া।[১৫১]

---

১৫১. قِيْمَةُ الزَّمَنِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ পৃ. ২২৯

নিম্নের দিকগুলোর প্রতি লক্ষ রাখাও সময় দ্বারা অধিক উপকৃত হতে সহায়ক–

১. তাকওয়ার পরিপন্থী সকল বিষয় থেকে দূরে থাকা।

২. مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيْهِ [নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কাজ বর্জন করা ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত] হাদীসের উপর আমল করা।

৩. নিজের প্রতিটি কাজে ও কথায় মুরাকাবা [পর্যবেক্ষণ] করা, অর্থাৎ কাজ করা ও কথা বলার সময় লক্ষ রাখা– আমি কী করছি ও কী বলছি। তারপর দিনের শেষে দিনটি কীভাবে কাটল তার মুহাসাবা [আত্মপর্যালোচনা] করা।

৪. প্রত্যেক কাজে লৌকিকতা বর্জন করা।

৫. দ্রুত খাওয়া, দ্রুত হাঁটা, দ্রুত পড়া ও দ্রুত লেখা।

৬. সবসময় কাগজ ও কলম সঙ্গে রাখা।

উপযুক্ত সময়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. বলেছেন– সময় ব্যয়ের ক্ষেত্রে এ দিকে দৃষ্টি দেয়া বিশেষভাবে প্রয়োজন যে, ইলমী কাজগুলোকে সেগুলোর গুরুত্ব ও মর্যাদা হিসেবে উপযোগী সময়ে সম্পাদন করার চেষ্টা করা। কিছু ইলমী কাজ এমন আছে, যেগুলো যেকোনো সময় ও যেকোনো পরিস্থিতিতে সম্পাদন করা যায়। যেমন কোনো লেখার অনুলিপি তৈরি করা কিংবা সাধারণ অধ্যয়ন। এ ধরনের কাজের জন্য মস্তিষ্কের স্বচ্ছতা, পূর্ণ সতর্কতা এবং গভীর ও সূক্ষ্ম চিন্তার প্রয়োজন হয় না।

পক্ষান্তরে এমন কিছু ইলমী কাজ রয়েছে যেগুলো শুধু এমন সময়ই পূর্ণরূপে সম্পাদন করা যায়, যখন মস্তিষ্ক স্বচ্ছ থাকে, বোধশক্তি প্রখর থাকে, মন-মানসিকতা প্রফুল্ল থাকে, মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত হয় এবং আসমান থেকে বরকত নাযিল হয়। যেমন রাতের নির্জনতা, রাতের শেষ প্রহর, ভোর, সকাল, তৃপ্তিকর ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর এবং পূর্ণ নির্জন স্থান।[১৫২]

---

[১৫২]. قِيْمَةُ الزَّمَنِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ পৃ. ১৮১ - ১৮২

এখন তোমার কর্তব্য হলো, উস্তাদের দিকনির্দেশনা গ্রহণ করে নিজের করণীয় কাজগুলোর তালিকা তৈরি করা। তারপর গুরুত্ব ও মর্যাদা হিসেবে সেগুলোর জন্য উপযোগী সময় নির্ধারণ করা এবং যথাসময়ে প্রতিটি কাজ সম্পাদনের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার উপায়

অনেক সময় পড়তে পড়তে ক্লান্তি আসে, ঝিমুনি আসে, অলসতা অনুভব হয়, দেহ-মনে উদ্যম থাকে না। এ সকল পরিস্থিতি জয় করার জন্য শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. অত্যন্ত উপকারী দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন। তিনি লিখেছেন–

যখন ঝিমুনি আসে এবং অবসাদ তোমাকে 'কাতুকুতু' দেয়, তখন ঝিমুনি ও অবসাদকে স্বাগত জানিয়ে তৎক্ষণাৎ ঘুমের বিছানায় চলে যেও না, কিংবা যেখানে আছো সেখানেই গা এলিয়ে দিয়ো না। বরং ঝিমুনি ও অবসাদের মুকাবিলা করো। অন্য কোনো কাজে মগ্ন হয়ে পড়ো। তাহলে অবসাদ ও ঝিমুনি দূর হয়ে যাবে এবং দেহ-মনে উদ্যম ফিরে আসবে।

উদাহরণস্বরূপ চুয়িংগাম জাতীয় কিছু চিবাও। অথবা ছাদের নীচ থেকে খোলা আকাশের নিচে ও উন্মুক্ত স্থানে বের হও। অথবা এক কামরা থেকে অন্য কামরায় পায়চারি করো। অথবা বসে থাকলে দাঁড়িয়ে যাও। শুয়ে থাকলে বসে যাও। হেলান দিয়ে থাকলে সোজা হয়ে বসো। অথবা ঠাণ্ডা পানি কিংবা গরম পানিতে গোসল করো। অথবা [চা, কফি ও ফলের জুস জাতীয়] কোনো কোমল পানীয় পান করো। অথবা কোনো হালকা খাবার খাও। অথবা কোনো বন্ধু বা সহপাঠীর সাথে কিছুক্ষণ কথা বলো। অথবা উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করো বা কোনো কবিতা আবৃত্তি করো। অথবা বসার ধরণ পরিবর্তন করো। অথবা একটু উঠবস করো। অথবা উঁচু স্থানে আরোহন করো।[১৫৩] অথবা পঠিত কিতাব বা পঠিত বিষয় পরিবর্তন করে অন্য কোনো কিতাব বা অন্য কোনো বিষয় পড়ো।

---

১৫৩. অথবা দম চর্চা করো। এ পুস্তকের ৪৪৭ নং পৃষ্ঠায় 'দম চর্চা'র পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অথবা ৮/১০ বার বুক ডাউন দাও।

মনে রেখো, একদিন যদি তন্দ্রার আহ্বানে সাড়া দাও এবং ঝিমুনি আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়, তাহলে পরের দিন ও তার পরের দিনও সেসময় তোমার ঝিমুনি আসবে। এক পর্যায়ে তা তোমার সুদৃঢ় অভ্যাসে পরিণত হবে এবং তুমি প্রতিদিন সে সময় ঘুমের ঘোরে লুটিয়ে পড়বে।[১৫৪]

প্রবল তাড়না সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা

বইয়ের শুরু থেকে এ পর্যন্ত আমরা যেসমস্ত আলোচনা করলাম তার সারসংক্ষেপ হলো, আত্মপরিচয় লাভ করবে, নেতিবাচক মানসিকতা পরিহার করে জীবনের জন্য সুদূরপ্রসারী কতগুলো লক্ষ্য নির্ধারণ করবে, তারপর সময়কে কাজে লাগিয়ে পরিশ্রম ও সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে। যদি তুমি এই নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করো, তাহলে তোমার জীবনে সফলতা আসবেই ইনশাআল্লাহ। কিন্তু বাস্তবতা হলো, জীবন কুসুমাস্তীর্ণ নয়। জীবন বড়ই কন্টকাকীর্ণ। জীবনে অনেক বাধা-প্রতিবন্ধকতা থাকে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত আসে। অনেকে তখন দিশেহারা হয়ে যায়। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে। জীবনের লক্ষ্য ভুলে যায় এবং সম্ভাবনাময় একটি জীবন মাটি হয়ে যায়।

তাই সবসময় জীবনের লক্ষ্যগুলো স্মরণ রাখতে হবে এবং সেগুলো অর্জন করার জন্য নিজের মধ্যে প্রবল তাড়না ও জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে হবে। তাহলে ঘাত-প্রতিঘাত মুকাবিলা করা সহজ হবে এবং এ পথের সমস্ত কষ্ট-ক্লেশ হাসি মুখে বরণ করা সম্ভব হবে।

এখন আমি প্রবল তাড়না সৃষ্টি করার পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব। তবে তার আগে প্রবল তাড়নার একটি উদাহরণ পেশ করব।

প্রবল তাড়না ও জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষার একটি উদাহরণ

কথিত আছে, এক তরুণ গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিসকে (سُقْرَاط) জিজ্ঞাসা করেছিল– সাফল্য লাভের রহস্য কি? সক্রেটিস তাকে পরের দিন নদীর পাড়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বললেন। পরের দিন দেখা হওয়ার পর সক্রেটিস তাকে নিয়ে সোজা পানিতে নামলেন এবং গলা পানিতে গিয়ে

---

[১৫৪]. قِيْمَةُ الزَّمَنِ عِنْدَ العُلَمَاءِ পৃ. ১৯০ - ১৯১

দাঁড়ালেন। কিছু না বলে সক্রেটিস হঠাৎ ছেলেটির ঘাড় ধরে পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। উপরে মাথা তোলার জন্যে ছেলেটি যতই চেষ্টা করে, সক্রেটিস ততই তাকে শক্ত হাতে পানির নীচে ডুবিয়ে রাখেন। বাতাসের অভাবে ছেলেটির মুখ নীল হয়ে গেল। তখন তিনি তাকে ছাড়লেন। ছেলেটি হাঁসফাস করে বুক ভরে শ্বাস নিল। সক্রেটিস তখন তাকে বললেন– পানির নীচে থাকা অবস্থায় তুমি যে ধরনের আকুলভাবে বাতাস চেয়েছিলে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য তোমার মধ্যে যদি সে ধরনের প্রবল তাড়না ও জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা থাকে, তবেই তুমি সফল হবে।

প্রতিদিন কয়েকবার নিজের লক্ষ্যগুলো আওড়াবে

এবার প্রবল তাড়না ও জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির পদ্ধতি শোনো– আমরা প্রত্যেকেই কমবেশী নিজের সাথে কথা বলি। মনে মনে বিভিন্ন কথা আওড়িয়ে থাকি। মনে মনে বলা হোক আর আওয়াজ করে বলা হোক, এসব কথা মনের উপর প্রভাব ফেলে। একটি কথা বারবার বলা হলে –তা ভালো হোক বা মন্দ হোক– মনে তা বসে যায়। মন তা গ্রহণ করে নেয়। ফলে বাস্তবে তেমন হওয়ার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করার জন্য মনে প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

সুতরাং আজ থেকেই চর্চা শুরু করে দাও। দিনে-রাতে, সকালে-বিকালে যখনই সুযোগ হয়, আওয়াজ করে বা মনে মনে কয়েকবার তোমার লক্ষ্যসমূহ আওড়াতে থাকো। বিভিন্ন সময় আন্তরিকভাবে বলতে থাকো–

'শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে আমি হব একজন ধীমান ও বিদগ্ধ গবেষক। রচনা ও সাংবাদিকতার অঙ্গনে একজন শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক। যুদ্ধের ময়দানে একজন বীর ও বিচক্ষণ সেনাপতি। রাজনীতি ও সমাজ সংস্কারের প্রাঙ্গনে একজন প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও সংস্কারক। সেবার ক্ষেত্রে জনদরদী সেবক। ইহসান ও তাযকিয়ার মহলে অন্তরালোকসম্পন্ন মুসলিহ ও মুযাক্কি। ইনাবত ইলাল্লার ক্ষেত্রে সবিনয় দোআকারী। আর খাওফে ইলাহীর তাড়নায় প্রকম্পিত এক বান্দা।"

দেখবে, তোমার মধ্যে পরিবর্তন আসছে। লক্ষ্য অর্জনের প্রতি অদম্য স্পৃহা জাগ্রত হচ্ছে। তোমার জীবনধারা পাল্টে যাচ্ছে। জানো? নিজের সাথে নিজে ইতিবাচক কথা বলে মানুষ বহু জটিল রোগ থেকেও মুক্তি লাভ করে।

মনে মনে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার কল্পনা করবে

এমনিভাবে মনে মনে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার কল্পনাও করবে। আমরা প্রত্যেকেই চোখ বন্ধ করে মনে মনে অনেক জিনিস কল্পনা করি। লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে মনের এভাবে কল্পনা করার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। একটি ভালো কাজ করার কথা মাত্র এক সপ্তাহ প্রতিদিন আন্তরিকভাবে তিনবার নিজে নিজে বলো এবং 'ধীমান ও বিদগ্ধ গবেষক, শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক, বীর ও বিচক্ষণ সেনাপতি, প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও সংস্কারক, জনদরদী সেবক, অন্তরালোকসম্পন্ন মুসলিহ ও মুযাক্কী এবং সবিনয় দোআকারী ও আল্লাহর ভয়ে সদা প্রকম্পিত বান্দা' হওয়ার কল্পনা মাত্র এক সপ্তাহ প্রতিদিন আন্তরিকভাবে তিনবার করো, তারপর নিজেই দেখো– তোমার মনে সেই কাজ করার প্রতি এবং 'ধীমান ও বিদগ্ধ গবেষক, শক্তিশালী লেখক ও সাংবাদিক, বীর ও বিচক্ষণ সেনাপতি, প্রাজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও সংস্কারক, জনদরদী সেবক, অন্তরালোকসম্পন্ন মুসলিহ ও মুযাক্কী এবং সবিনয় দোআকারী ও আল্লাহর ভয়ে সদা প্রকম্পিত বান্দা' হওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হচ্ছে কি-না।

তুমি দীর্ঘ সময় নিয়ে এভাবে কথা বল আর না-ই বল, তদ্রূপ দীর্ঘ সময় নিয়ে এভাবে কল্পনা কর আর না-ই কর, পদ্ধতিদু'টি কতটুকু বাস্তবধর্মী, শুধু এই অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য কমপক্ষে এক সপ্তাহ এমন করে দেখ না!

মোটকথা, প্রতিদিন কয়েকবার নিজের লক্ষ্যগুলো আওড়াও এবং লক্ষ্যগুলো অর্জিত হওয়ার কল্পনা করো। লক্ষ্যগুলো বাস্তাবয়ন করার প্রতি মনে ধীরে ধীরে প্রবল তাড়না ও জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবে ইনশাআল্লাহ।

মানসিক রোগসমূহ দূর করার জন্যেও মনে মনে সুস্থতার কল্পনা করাকে সম্প্রতি মনোবিজ্ঞানীগণ খুবই উপকারী বলে উল্লেখ করেছেন।

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. তাঁর تاریخ دعوت وعزیمت কিতাবে ইসলামের তাজদীদ ও পুনরুজ্জীবন এবং সংস্কার ও বিপ্লবের ইতিহাস তুলে ধরেছেন। এর জন্য তিনি যেসকল মনীষীদের আলোচনা করেছেন তাঁরা হলেন– হযরত ওমর বিন আব্দুল আযীয রহ. [৬১ - ১০১ হি.], হযরত হাসান বসরী রহ. [২১ - ১১০ হি.], ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহ. [১৬৪ - ২৪১], ইমাম আবুল হাসান আশআরী রহ. [২৬০ - ৩২৪ হি.], ইমাম গাযালী রহ. [৪৫০ - ৫০৫ হি.], শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী রহ. [৪৭০ -

৫৬১ হি.], আল্লামা ইবনুল জাওযী রহ. [৫০৮ - ৫৯৭ হি.], সুলতান নুরুদ্দীন যঙ্গী রহ. [৫১৩ - ৫৬৯ হি.], সুলতান সালাহউদ্দীন আয়্যুবী রহ. [৫৩২ - ৫৮৯ হি.], শায়খুল ইসলাম ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম রহ. [৫৭৮ - ৬৬০ হি.], মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহ. [৬০৪ - ৬৭২ হি.], সুলতানুল মাশায়িখ হযরত নিজামুদ্দীন রহ. [৬৩৬ - ৭২৫ হি.], শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে তায়মিয়া রহ. [৬৬১ - ৭২৮ হি.], মাখদুমুল মুলক হযরত শায়খ শারফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মুনায়রী রহ. [৬৬১ - ৭৮২ হি.], হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ. [৯৭১ - ১০৩৪ হি.], হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. [১১১৪ - ১১৭৬ হি.]। চলো, আমরা এ কিতাবটি ভালোভাবে পড়ি। তারপর তাঁদের মধ্য থেকে যার জীবন যাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে, সে তাঁর মতো হওয়ার কল্পনা করি। অসম্ভব নয় যে, এই কল্পনা বাস্তবে আমাদের মনে তাঁদের মতো হওয়ার আগ্রহ সৃষ্টি করবে।

আমরা কল্পনা করার জন্য তাঁদের সঙ্গে আরো কয়েকজন মনীষীর নাম যুক্ত করতে পারি। যেমন– হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. [১২৮০ - ১৩৬২ হি.], শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. [১২৯৬ - ১৩৭৭ হি.], দাঈ ইলাল্লাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস রহ. [১৩০৩ - ১৩৬৫ হি.] এবং সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. [১৩৩৩ - ১৪২০ হি.]।[১৫৫]

আচ্ছা, বড় বড় কয়েকজন মনীষীর এখানে যে তালিকাটি দেওয়া হলো, তাঁদের মর্যাদা কল্পনা করে তালিকাটি দু'বার পুনরাবৃত্তি করো তো। দেখো, বিশেষ কোনো শিহরণ মনে অনুভব কর কি-না। সুযোগ করে জন্ম-মৃত্যু তারিখসহ তালিকাটি মুখস্থ করে নিও। তারপর পারস্পরিক বিভিন্ন আলাপচারিতায় ও বক্তৃতায় নামগুলো ধারাবাহিক উল্লেখ করবে; নিজেও অনেক চেতনা লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

হযরত নাদাবী রহ.-এর আলোচ্য কিতাবটি বাংলা ভাষায়ও অনুবাদ হয়েছে। বাংলা অনুবাদটি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছে 'ইসলামী রেঁনেসার অগ্রপথিক' নামে। পরবর্তীতে প্রকাশিত হয়েছে 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' নামে পাঁচ খণ্ডে। গ্রন্থটি আরবী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে رِجَالٌ

---

১৫৫. টীকাটি ১৯৫ - ১৯৭ নং পৃষ্ঠায় পড়ো।

الفِكْرِ والدَّعْوَةِ فِي الإِسْلَامِ নামে পাঁচ খণ্ডে। মূল উর্দু কিতাবটিও পাঁচ খণ্ডে। লক্ষ্য অর্জনের প্রতি প্রবল তাড়না ও জ্বলন্ত আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির জন্য এতক্ষণ যে দু'টি পদ্ধতির আলোচনা হলো, সেগুলো যেকোনো লক্ষ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে সমানভাবে প্রযোজ্য। এখন আমরা সুনির্দিষ্টভাবে ইলমী লক্ষ্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির সহায়ক কিছু কথা বলব।

লেখাপড়ার উদ্দীপক ও চালিকাশক্তি

আগ্রহ ও উদ্যমের অবদান

ফলদায়ক লেখাপড়ার জন্য শিক্ষাবিদগণ যে সকল উপদেশ দেন, সেগুলোর তুলনায় অধিক সুফলদায়ক হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্দীপনা ও আগ্রহ বিদ্যমান থাকা। আগ্রহ ও উদ্যম হলো পড়ালেখার উদ্দীপক ও চালিকাশক্তি। পড়াশুনার উদ্ভাবক ও পরিকল্পক। হ্যাঁ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা হলো লেখাপড়ার প্রথম শর্ত। উদ্যম ও আগ্রহ হলো পড়ালেখার মূল ভিত্তি। চেষ্টা ও প্রচেষ্টা হলো সাফল্যের চাবিকাঠি। অতএব, সর্বপ্রথম তোমার মধ্যে এই অনুভূতি সৃষ্টি করো যে, তুমি তোমার পড়াগুলো আয়ত্ত করতে আগ্রহী এবং তুমি অবশ্যই সেগুলো আয়ত্ত করতে সক্ষম।

ইলমের মহব্বত বৃদ্ধির ১২ টি উপায়

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দা. বা. মাসিক 'আলকাউসারে' প্রকাশিত তাঁর এক প্রবন্ধে লেখাপড়ার ১২ টি উদ্দীপক উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

প্রশ্ন হলো, ইলমের মহব্বত কীভাবে পয়দা হবে? নিজের মধ্যে ইলমের অনির্বাণ তৃষ্ণা কীভাবে সৃষ্টি হবে এবং কীভাবে ইলমের তৃপ্তি উপলব্ধি করা যাবে? উত্তর হলো, এর জন্য নিম্নের কাজগুলোর ব্যাপারে যত্নশীল হোন; ইনশাআল্লাহ উদ্দেশ্য হাসিল হবে।

১. আল্লাহ তা'আলার প্রতি রুজু হওয়া এবং তাকওয়া ও খোদাভীতির ব্যাপারে যত্নবান হওয়া। গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। কখনো স্খলন হয়ে গেলে তাওবা করতে দেরি না করা। অধিক পরিমাণে দুআ করা– হে আল্লাহ! আমার অন্তরে ইলমের মহব্বত পয়দা করে দাও; আমার অন্তরে ইলমের অনির্বাণ তৃষ্ণা সৃষ্টি করে দাও; আমাকে ইলমের স্বাদ লাভ করার তাওফীক দাও; আামাকে দ্বীনের সঠিক 'সমঝ' দান করো;

আমাকে ইলমের দৃঢ়তার স্তর দান করো। 'সালাতুল হাজত' পড়ে রাব্বুল আলামীনের দরবারে রোনাজারি করা উচিত। ইলম সম্পর্কে [কুরআন পাকের رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا সহ] হাদীসে বর্ণিত দুআসমূহ বেশি বেশি করা উচিত।

২. ইলমের হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা করা; ইলম কাকে বলে, আমরা যে ইলম অন্বেষণ করি তা কোন জিনিসের ইলম; এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী; এই ইলম আল্লাহ তা'আলার মা'রেফাত ও তাঁর গুণাবলীর ইলম, আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধসমূহের ইলম, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহীর বিধানাবলীর ইলম; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত মুবারক ও সুন্নতের ইলম; এই ইলম কুরআন ও হাদীসের ইলম। এই ইলমের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যও হলো আল্লাহ তা'আলাকে জানা, তাঁর রাসূলকে জানা, আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর নির্দেশিত সহজ-সরল পথকে জানা, যা মুক্তি ও নাজাতের একমাত্র পথ। আমরা এসবের বিশ্লেষণধর্মী ও দলীলপূর্ণ ইলমের তালেব।

আমার ধারণা, যদি কোনো তালেবে ইলম ইখলাস ও নিষ্ঠার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলাকে হাযের-নাযের জেনে ইলমের হাকীকত ও স্বরূপ সম্পর্কে চিন্তা করে, তাহলে এটা অসম্ভব যে, তার মধ্যে ইলমের মহব্বত পয়দা হবে না; যে ইলমের মাধ্যমে একজন মানুষের সরাসরি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যায়; যে ইলমের মাধ্যমে একজন মানুষ ওহীর ধারক-বাহকে পরিণত হয় সেই ইলমের সঙ্গে মহব্বত পয়দা হওয়ার জন্যে এই বাস্তবতা সম্পর্কে চিন্তা করার চেয়ে আর কিসের প্রয়োজন বাকি থাকে?

৩. এ ব্যাপারে চিন্তা করা যে, ইলমের মান কী? ইলম মূলত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের মিরাস, আর একজন আলেম –শরীয়ত ও ফিকহের পরিভাষায় আলেম– আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের ওয়ারিশ। আর এ কথা স্পষ্ট যে, দুনিয়াতে এ পদমর্যাদার চেয়ে উর্ধ্বের কোনো পদমর্যাদা নেই।

এখন চিন্তা করে দেখুন, আমি ইলমে নবুওয়তের তালেব হলাম, কিন্তু এই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার স্পৃহা আমার মধ্যে নেই, তাহলে আমি কেমন তালেবে ইলম হলাম?

৪. ইলম সম্পর্কে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ফযীলতসমূহে চিন্তা-ফিকির করুন; নিশ্চয়ই এটাও ইলমের প্রতি উৎসাহ যোগাবে এবং অন্তরে ইলমের মুহাব্বত পয়দা করতে সহযোগিতা করবে।

৫. উলামায়ে সালাফের জীবনচরিত মুতালাআ করুন; বিশেষত তাঁদের তলবে ইলমের যুগের ঘটনাবলী বারবার পড়ুন। তাঁরা ইলমের জন্য কত নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন এবং কীভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের মূল্যায়ন করেছেন; ইলম ও আমলের পেছনে কীভাবে তাঁদের জীবনকে বিলীন করে দিয়েছেন। এ উদ্দেশ্যে আকাবিরের জীবনী সম্বলিত বিভিন্ন গ্রন্থ ছাড়াও নিচের এক বা একাধিক গ্রন্থের অধ্যয়ন যথেষ্ট উপকার দিবে–

ক. علماءِ سَلَف, মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শেরওয়ানী রহ. [মৃ. ১৩৭০ হি.]

খ. صَفَحَاتٌ مِّنْ صَبْرِ العُلَمَاءِ عَلَى شَدَائِدِ العلمِ والتحصيلِ, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. [মৃ. ১৪১৭ হি.]

গ. العُلَمَاءُ العُزَّابُ الَّذِيْنَ آثَرُوْا العِلْمَ عَلَى الزَّوَاجِ, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.।

ঘ. قِيْمَةُ الزَّمَنِ عِنْدَ العُلَمَاءِ, শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.।

ঙ. آپ بیتی, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া কান্দলভী রহ. [মৃ. ১৪০২ হি.]

চ. متاعِ وقت اور کاروانِ علم, মাওলানা ইবনুল হাসান আব্বাসী।

উলামায়ে সালাফের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা ইলমের মহব্বত, ইলমের জন্য বিলীন হওয়ার স্পৃহা জাগ্রত করার জন্য মহৌষধ। এ ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া উচিত। ভাবা উচিত যে, ইলমের জন্য বিলীন হওয়ার দ্বারা, ইলমের জন্য তাঁদের জান উৎসর্গ করার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে কত উঁচু মাকাম দান করেছেন। আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিজীবের অন্তরে তাঁদের কত মহব্বত ঢেলে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে কত মান-মর্যাদা ও শান-শওকত দান করেছেন। এ পর্যায়ের ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতার ভিত্তিতে যথার্থই বলা হয়েছে–

إِنَّ الْمُلُوْكَ يَحْكُمُوْنَ عَلَى الْوَرَى، وَعَلَى الْمُلُوْكِ لَتَحْكُمُ الْعُلَمَاءُ [নিশ্চয় রাজাগণ সৃষ্টিজগতের উপর শাসন করেন, আর রাজাগণের উপর শাসন করেন আলেমগণ।]

মুফতী নেযামুদ্দীন শামেযী রহ. বলতেন, 'অভিযোগ করা হয় যে, উলামায়ে কেরামের মর্যাদা দেওয়া হয় না; আমি বলি, আগে "আলেম" হও; দেখবে এখনো মর্যাদা দেওয়ার লোক আছে।' আর এ কথা স্পষ্ট যে, ইলমের জন্যে বিলীন হওয়া এবং ইলমের জন্যে জীবন উৎসর্গিত করা ছাড়া এরূপ আলেম হওয়া অসম্ভব।

৬. যেসব আলেম ও তালেবে ইলম নিজেকে বিলীন করে দিয়ে ইলমের মহব্বতে ডুবে আছে, তাঁদের সংশ্রবও ইলমের মহব্বত বৃদ্ধি করে, এটি একটি পরীক্ষিত বিষয়।

৭. উলামায়ে কেরামের ইলমী মুযাকারার মজলিসে অংশগ্রহণও ইলমের মহব্বত সৃষ্টির সহায়ক হিসেবে সুপ্রমাণিত। এটি এমন এক পরীক্ষিত বিষয়, যার প্রভাব আমীর-বাদশাহদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাস সাক্ষী, ইমাম তবারানী রহ. [২৬০ - ৩৬০ হি.] এবং ইমাম আবু বকর জিআবী রহ. [২৮৪ - ৩৫৫ হি.]-এর হাদীসের মুযাকারার একটি মাত্র মজলিস দেখে –যে মজলিসে তবারানীর পাল্লা ভারী ছিল– উযীর ইবনুল আমীদ এই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিল যে, 'আহা! যদি আমার উযীরীর পরিবর্তে এমন হত যে, আমি তবারানীর আসনে হতাম আর আমার সে আনন্দ অর্জিত হত যে আনন্দ তবারানীর হয়েছে।'[১৫৬]

খলীফা মামুনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আপনার এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা কি বাকি আছে যা পূর্ণ হয়নি? বললেন, একটি আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই বাকি আছে– যদি আমার আশপাশে হাদীসের তালাবা [শিক্ষার্থী] হত, তারা আমার কাছে হাদীস লিখতে চাইত, বলত– مَنْ ذَكَرَكَ، رَحِمَكُمُ اللهُ؟ [আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন, আপনি এটি কার থেকে

---

১৫৬. سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ ১৬ ঃ ১২৪

বর্ণনা করেছেন?] আর আমি তাদেরকে হাদীস লেখাতাম!![১৫৭]

ইলমের অবক্ষয় সত্ত্বেও কোথাও না কোথাও ইলমের মুযাকারা ও আলোচনার কম-বেশি ছোট-বড় মজলিস পাওয়া যাবেই। যদি না পাওয়া যায় তবে পূর্ববর্তীদের এ ধরনের মজলিসের ঘটনাবলী পড়ে নিন। ইনশাআল্লাহ এতেও অন্তরের সুপ্ত স্পৃহা অবশ্যই জাগ্রত হবে।

৮. অধিক পরিমাণে شَعَائِرُ الإِسْلَامِ [ইসলামের বিশেষ প্রতীকসমূহ]-এর আযমত ও মহব্বত অন্তরে বসানোর চেষ্টা করুন; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মহব্বত বাড়ানোর চেষ্টা করুন, ইলমের সম্পর্ক যেহেতু شَعَائِرُ الإِسْلَامِ-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় عِبَادَةُ اللهِ ও كَلَامُ اللهِ [আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর কালাম]-এর সঙ্গে, তাই এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খাঁটি মহব্বত অন্তরে থাকবে, ইসলামের শা'আয়েরের সত্যিকারের আযমত ও মহব্বত অন্তরে থাকবে, অথচ ইলমের মহব্বত পয়দা হবে না।

৯. অন্তঃকরণকে –যা ইলমের আধার– দুনিয়ার লোভ-লালসা, গাইরুল্লাহর মহব্বত এবং ইলমের অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে; ইলমের উপকরণ তথা জিহ্বা, কান ও চোখের হেফাযত করতে হবে। এটিও এই বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা, যা এমনিতেই ফরয এবং ইলমে নাফে'র জন্য শর্তও বটে। এ ব্যাপারে যত্নবান হলে অন্তরে এমনিতেই আগ্রহ সৃষ্টি হবে; যা ধীরে ধীরে ইলমের মহব্বত; এরপর ইলমের জন্য বিলীন হওয়ার স্তরে উন্নীত করবে।

১০. এ ব্যাপারে চিন্তা করুন যে, ইলমের মহব্বত ছাড়া ইলমে দৃঢ়তার স্তর অর্জিত হবে না। আর ইলমে দৃঢ়তা অর্জন না হলে শুধু গতানুগতিক আলেম হওয়া দ্বারা না আমি দ্বীনের কোনো কাজে আসব, না দুনিয়ার। তাই আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে আমি নিজে বা আমার অভিভাবকরা আমার জন্যে যে ময়দান নির্বাচন করেছেন, আমাকে তো ওই ময়দানেই কুরবান হয়ে যেতে হবে।

১১. এ কথা চিন্তা করুন, তালিবে ইলমের অভ্যাসই এমন হওয়া উচিত যে, গুরুত্বপূর্ণ কোনো কিতাব তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। সে

---

[১৫৭]. شَرَفُ أَصْحَابِ الحَدِيْثِ পৃ. ৯৮; المُحَدِّثُ الفَاصِلُ পৃ. ১৮০

তা পড়া শেষ করা ব্যতীত ছাড়তেই পারে না। ফকীহ ও বিজ্ঞ রচয়িতা তাকে এরূপ আকর্ষণ করে যে, সে এই রচয়িতার যা কিছু পায় সবই পড়ে ফেলে। ইলমী গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে, সে এ বিষয়ে যা কিছু পায় সবই সংগ্রহ করে এবং একে একে সব কিতাবের প্রতিটি লাইন পড়ে শেষ করে। যদি আমার অবস্থা এমন না হয়ে থাকে, তাহলে আমি নামে মাত্র তালেবে ইলম; আমি কেন এমন তালেবে ইলম হব না যে, ইলম, ইলমের ধারক-বাহক ব্যক্তিবর্গ এবং ইলমের উপকরণাদিই আমাকে মহব্বত করতে আরম্ভ করবে। এরপর উভয় দিকের আকর্ষণে আমি ইলমের পথে বিলীন হয়ে যাওয়ার স্তরে উন্নীত হব এবং দ্বীনের সঠিক সমঝ, ইলমের দৃঢ়তা, তাকওয়া ও খোদাভীতির আসনে সমাসীন হব।

১২. ইলমের মহব্বতের ধারাবাহিকতার সর্বশেষ কথা হলো, প্রতিটি তালেবে ইলমের মাঝেই আল্লাহ তা'আলা ইলমের মহব্বতের জাওহার গচ্ছিত রেখেছেন। যদি ইলমের মহব্বত কিছু না কিছু নাই থাকত, তাহলে সে ইলমের জন্য মাদরাসায় ভর্তি হত না। এখন আমাদের কর্তব্য হলো, এই সহজাত মহব্বতকে কাজে লাগানো। কষ্ট-মেহনত করে কিছু ইলম হাসিল করা এবং ইলমের হাকীকত ও গুঢ়তত্ত্বের অবগতি অর্জন করা। এতে অন্তরে এক বিশেষ প্রকার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। এরপর ধীরে ধীরে ইলমের মহব্বতের এই স্তর অর্জন হবে, যে স্তরে পৌঁছলে মানুষের কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার সবকিছু তুচ্ছ মনে হয়।

---

১৮৯ নং পৃষ্ঠার টীকা

এতক্ষণ নিজের লক্ষ্যসমূহ আন্তরিকভাবে বারবার আওড়ানোর ও সেগুলো অর্জিত হওয়ার কল্পনা করার যে কথা বলা হয়েছে, তা যদি ধ্যানাবস্থায় করা হয় তাহলে মনে অধিক রেখাপাত করবে। আর ধ্যানাবস্থা সৃষ্টির জন্য নিম্নে একটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হচ্ছে। কয়েকদিন অনুশীলন করে তা কতটুকু কার্যকর নিজেই তার বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করো। উপকারী মনে হলে অনুশীলনটি চালিয়ে যাবে।

পদ্ধতিটি হলো, যখন ঘুমিয়ে পড়ার তেমন আশংকা থাকে না –যেমন পর্যাপ্ত ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর– তখন একটি নিরিবিলি স্থানে হালকা আলোতে আরাম

করে বসো বা শুয়ে পড়ো। গায়ের পোশাক একটু ঢিল করে নাও। চোখ বন্ধ করো। নাক দিয়ে আস্তে আস্তে লম্বা দম নাও। দম নেওয়ার সময় ধীরে ধীরে পেটের উপরিভাগ ফুলবে। আস্তে আস্তে মুখ দিয়ে দম ছাড়ো। দম ছাড়ার সময় পেটের উপরিভাগ ধীরে ধীরে চুপসে যাবে। এভাবে ৬ থেকে ১০ বার দম নেওয়ার পর দম স্বাভাবিক করো। অর্থাৎ দম নাক দিয়ে নিয়ে নাক দিয়েই ছাড়তে থাকো।

এখন সামনের দিকনির্দেশনার আলোকে মাথার তালু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত সকল অঙ্গ কল্পনা করো। প্রথমে ১০ সেকেণ্ড মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করো মাথার তালুর পেশীগুলোতে। মনোযোগ দেওয়ার সাথে সাথে কল্পনা করো– তালুর পেশীগুলো ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। ভারী হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে পর্যায়ক্রমে কপাল, চোখ, ঠোঁট, মুখমণ্ডল, জিহ্বা, গলা, নাক, কাঁধ, ডান হাত, বাম হাত, বুক, পিঠ, মেরুদণ্ড, পেট, কোমর, নিতম্ব, উরু, হাঁটু, পা ও পায়ের পাতায় ১০ সেকেণ্ড করে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করো। কল্পনা করো– বরফ গলা পানি যেমন বরফের গা বেয়ে নিচের দিকে নামে, তেমনি প্রতিটি অঙ্গে মনোযোগ দেওয়ার সাথে সাথে শীতলতা তোমার গা বেয়ে মাথা থেকে পায়ের দিকে নেমে যাচ্ছে।

তারপর ১ থেকে ২ মিনিট নাকের ছিদ্র পথে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করো। মনের চোখে দেখো– বাতাস কীভাবে নাক দিয়ে প্রবেশ করে ফুসফুসের প্রতিটি কোষে যাচ্ছে আবার বেরিয়ে আসছে। ঠাণ্ডা বাতাস নাক দিয়ে শরীরে প্রবেশ করছে, আর গরম বাতাস নাক দিয়ে বাইরে আসছে। ১ থেকে ২ মিনিট এভাবে দম খেয়াল করলে অনুভব করবে, তোমার শরীর ভারী লাগতে শুরু করেছে।

তারপর ১৯ উচ্চারণ করো। মনে মনে বলো– আমি মনের গভীর স্তরে রওয়ানা করেছি। তারপর ১৮, ১৭, ১৬, ১৫, ১৪, ১৩, ১২, ১১ উচ্চারণ করো এবং মনে মনে বলো– আমি পৌঁছে যাচ্ছি মনের গভীর থেকে গভীরে। তারপর ১০, ৯, ৮, ৭, ৬ উচ্চারণ করো এবং মনে মনে বলো– আমি মনের আরও গভীরে পৌঁছে যাচ্ছি। তারপর ৫, ৪, ৩, ২, ১, ০ উচ্চারণ করো এবং মনে মনে বলো– আমি পৌঁছে গেছি মনের গভীর স্তরে। সবগুলো উচ্চারণ হবে মনে মনে।

ধ্যানের এই অবস্থা সৃষ্টি করার সময় যদি বাইরে কোনো অপ্রয়োজনীয় আওয়াজ হয়, তাহলে বিরক্ত হবে না। বরং শান্ত থাকবে। সেই আওয়াজকে পাত্তা দিবে না। অন্যথায় সময় ব্যয় করে যে অবস্থা সৃষ্টি করেছ, তা মুহূর্তেই শেষ হয়ে যাবে।

এখন তুমি মনের গভীরতার একটি বিশেষ স্তরে আছ। তোমার চোখ তো বন্ধ আছেই। এ অবস্থায় নিজের লক্ষ্যগুলো আওড়াও এবং লক্ষ্যগুলো অর্জিত হওয়ার কল্পনা কর,

উপরিউক্ত মনীষীদের মধ্য থেকে তুমি যার মতো হতে চাও, ইসলামের তাজদীদ ও পুনরুজ্জীবন এবং সংস্কার ও বিপ্লবের তাঁর ঘটনাবলী একটু সময় নিয়ে রোমন্থন করো।

এখনো চোখ খুলবে না। এবার বুক ফুলিয়ে নাক দিয়ে একবার লম্বা করে দম নাও এবং মুখ দিয়ে একবারে ছাড়ো। উচ্চারণ করো ০ [শূন্য]। আবার বুক ফুলিয়ে নাক নিয়ে একবার লম্বা করে দম নাও এবং মুখ দিয়ে একবারে ছাড়ো। উচ্চারণ করো ১, ২। এভাবে আবার লম্বা করে দম নাও এবং মুখ দিয়ে একবারে ছাড়ো। উচ্চারণ করো ৩, ৪। তারপর চোখ খোলো। আস্তে আস্তে মাথা ও ঘাড় নাড়ো। হাত ও পা টান টান করো। ধীরে ধীরে উঠে দাড়াও এবং জোরে বলো– 'বেশ ভালো লাগছে। দেহ ও মন পুরো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।' দেখবে, বাস্তবেই তোমার বেশ ভালো লাগবে এবং তোমার দেহ ও মন পুরো চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

এই ধ্যান করার সময় গড়ে ১৫ থেকে ২০ মিনিটের বেশী সময় দেওয়ার দরকার নেই। এই ধ্যান ভোর বেলা ঘুম ভাঙ্গার পর বিছানা ছেড়ে উঠার আগেও করতে পার। অথবা তোমার সুযোগ অনুযায়ী দিনে রাতে যেকোনো সময় করতে পার।

প্রসঙ্গত বিশ্রাম সম্পর্কে একটু কথা বলি। বিশ্রাম একটি অত্যন্ত উপকারী কাজ। লেখাপড়ার [বরং যেকোনো কাজের] ফাঁকে ফাঁকে যদি দেহে অবসাদ আসার আগেই সামান্য বিশ্রাম করে নেয়া যায়, তাহলে দীর্ঘ সময় উদ্যমের সাথে পড়ালেখা করা যায়। একটি বইয়ে পড়েছি– আমেরিকার একটি ইস্পাত কোম্পানী পরীক্ষা করে দেখেছে– তাদের শ্রমিকরা প্রতিদিন ১২ টন লোহা বোঝাই করতে পারে। অথচ তারাই আবার ৪৭ টন বোঝাই করতে পারে, যদি উপযুক্ত বিশ্রাম পায়।

বিশ্রাম করার একটি অতি উপকারী পদ্ধতি হলো, কয়েক মিনিট 'শবাসনে' শুয়ে নাক দিয়ে ধীরে ধীরে দম নিয়ে মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে দম ছাড়া এবং মনোযোগ নাকের ছিদ্র পথে নিবদ্ধ রাখা। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ো। পা দু'টি লম্বা করে দাও। দু'পায়ের মধ্যখানে এক ফুট থেকে দেড় ফুট ফাঁক থাকবে। পায়ের গোড়ালি ভেতর দিকে থাকবে। আঙ্গুলগুলো থাকবে বাইরের দিকে। হাত দু'টিও লম্বালম্বিভাবে সুবিধামত শরীরের দু'পাশে থাকবে। হাতের তালু থাকবে উপরের দিকে। ব্যস, এটাই হলো 'শবাসন'। অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির আসন। 'শব' অর্থ মৃতদেহ।

'দেহে অবসাদ আসার আগেই কাজ বন্ধ করে দেয়া' প্রসঙ্গে 'মাজালিসে হাকীমুল উম্মত' কিতাবে [পৃ. ১০৯ - ১১০] একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. বলেছেন– হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব ছাহেব

নানুতবী রহ. অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্র ও মুরীদদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন– ইলমী সবক পড়ার বিষয় হোক কিংবা জিকির ও তাসবীহ পাঠের বিষয় হোক, তার জন্য যতটুকু সময় নির্ধারণ করেছ তার একেবারে শেষ সময় পর্যন্ত সবক ও জিকির-তাসবীহ পড়বে না। বরং একটু আগেই বন্ধ করে দিবে। তার সুফল এই হবে যে, দ্বিতীয়বার আবার সেই আমল করার ক্ষেত্রে দ্রুত আগ্রহ সৃষ্টি হবে। পক্ষান্তরে যদি নির্ধারিত সময় পূর্ণ করে ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত হয়ে ক্ষান্ত কর, তবে দ্বিতীয়বার তার প্রতি দ্রুত আগ্রহ সৃষ্টি হবে না। যেমন চিকিৎসকগণ বলে থাকেন, খানা একেবারে পেট পুরে খাবে না। বরং কিছুটা ক্ষুধা ও খাবারের প্রতি চাহিদা বাকি থকতেই খাওয়া বন্ধ করে দেয়া উচিত। তাহলে পরের বেলা ভালোভাবে ক্ষুধা লাগবে।

হযরত থানবী রহ. আরো বলেছেন– তোমরা ছোটদের খেলনার চাক্কি ও চরকার মধ্যে এমন দেখে থাক যে, তা চালানোর সময় দু'এক প্যাঁচ বাকি থাকতে ছেড়ে দিলে ওটা পুনরায় সুন্দরভাবে ঘুরে আসে। কিন্তু যদি সুতার সকল প্যাচ খোলার পরে ছাড়া হয়, তাহলে পুনরায় উল্টা দিকে পেঁচিয়ে আনতে বেশ সময় লাগে।

পঞ্চম অধ্যায়

শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন'ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাঁদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা

সাহচর্য গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা

বইয়ের শুরু থেকে এ পর্যন্ত দেয়া দিকনির্দেশনা মোতাবেক কেউ যদি আত্মপরিচয় লাভ করে, ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে, সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে, লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে প্রবল তাড়না লালন করে, সময়ের সদ্ব্যবহারের পাশাপাশি পরিশ্রম-সাধনা অব্যাহত রাখে, তাহলে সে উল্লেখযোগ্য একটি গন্তব্যে অবশ্যই পৌঁছবে। কিন্তু চির বাস্তবতা ও শ্বাশত সত্য হলো, কেউ যদি এতটুকুকেই যথেষ্ট মনে করে, উস্তাদের তত্ত্বাবধান এবং শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন'ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণ না করে,[১৫৮] তাহলে তার অর্জন সঠিক হয় না; তার পরিশ্রম-সাধনা উপকারী হয় না; উপরন্তু উক্ত পরিশ্রম-সাধনা তার জন্য প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়; সে বাড়াবাড়ি ও প্রান্তিকতার শিকার হয়; সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়; অনেক ক্ষেত্রে অন্যরাও তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়।

এর দৃষ্টান্ত পূর্বেও ছিল, এখনো আছে। অতীতে যারা ইলমী অঙ্গনে বিচরণ করেও বিচ্যুত হয়েছে, তাদের জীবনচরিত দেখো, তাদের অনেক কিছুই ছিল, কিন্তু 'সাহচর্য' ছিল না।[১৫৯] এ যুগেও যারা ইলমী অঙ্গনে বিচরণ করা সত্ত্বেও বিচ্যুত হয়েছে, তাদেরও খোঁজখবর নাও, দেখবে, তাদেরও অনেক কিছুই আছে, কিন্তু 'সাহচর্য' নেই।[১৬০]

---

১৫৮. 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন' অর্থ হলো দ্বীন ও শরীয়তের গভীর ও পরিপক্ক জ্ঞান এবং মুফাক্কির ও দাঈ পর্যায়ের যোগ্যতা।

১৫৯. ইবনে হাযম যাহেরী রহ. সম্পর্কিত এ বইয়ের ২৪২ নং পৃষ্ঠার টীকা দ্রষ্টব্য। অনুরূপভাবে আবু জা'ফর আদ্দাউদী আলআসাদী রহ. সম্পর্কিত এ বইয়ের ২২৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত কাযী ইয়ায রহ.-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৬০. উদাহরণস্বরূপ 'তাফহীমুল কুরআনে'র লেখক, السِّلْسِلَةُ الصحيحةُ ও السِّلْسِلَةُ الضعيفةُ-এর লেখক এবং 'পিসটিভি'র ভাষ্যকারের কথা বলা যায়।

এ কারণেই সালাফে সালেহীন ও নির্ভরযোগ্য পূর্বসূরী মনীষীগণের অনুসৃত নীতি ছিল, ইলম অর্জনের মেহনতের পাশাপাশি শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন'ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণকে তাঁরা অপরিহার্য শর্ত গণ্য করতেন। 'সাহচর্য'গ্রহণের শর্ত পূরণ না করে কেউ কথা বলতে চাইলে তাঁরা তাকে এই বলে থামিয়ে দিতেন- اُسْكُتْ لا شَيْخَ لَكَ [চুপ করো, তোমার কোনো উস্তাদ নেই]। অনুরূপভাবে তাকে صَحَفِيّ [বই পড়ুয়া] আখ্যা দিয়ে তিরস্কার করে মানুষকে তার থেকে সতর্ক করতেন।[১৬১]

আর এ কারণেই তাঁরা কোনো ব্যক্তির مَنَاقِب [গুণ ও কৃতিত্ব] বর্ণনাকালে 'দীর্ঘ সাহচর্য'কে বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন। যেমন তাঁরা বলতেন-

لَازَمَه مُدَّةً طَوِيْلَةً، لَازَمَه مُلَازَمَةً طَوِيْلَةً، لَازَمَه مُدَّةَ دَهْرِه، لَازَمَه إلى مَوْتِه، لَمْ يُفَارِقْه حَتَّى مات.

এমনকি তাঁরা তালিবে ইলমের জন্য উস্তাদের মসজিদে নামায পড়াকে মুস্তাহাব বলেছেন, যেন এর ফলে উস্তাদের সোহবত ও সাহচর্যের পরিমাণ অধিক হয়।

এখন নিজে আর কথা না বাড়িয়ে 'শাস্ত্রজ্ঞ ও তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীনওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণ করা' প্রসঙ্গে খুবই সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ তিনটি আলোচনা তুলে ধরব। প্রথম আলোচনাটি হাকীমুল ইসলাম আল্লামা কারী মুহাম্মদ তাইয়িব ছাহেব রহ. [১৩১৫ - ১৪০৩ হি.]-এর। আলোচনাটি তাঁর علماءُ ديوبند : علماء دیوبند کا دینی رخ اور مسلکی مزاج কিতাবের আরবী অনুবাদ اِتِّجَاهُهُمُ الدِّيْنِيُّ ومِزَاجُهُمُ المَذْهَبِيُّ কিতাব থেকে নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয় আলোচনাটি শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা দা. বা.-এর। তিনি তাঁর أَدَبُ الاختلافِ في مَسَائِلِ العِلْمِ والدِّيْنِ কিতাবের ১৬১ থেকে ১৭৮ নং পৃষ্ঠায় مَنْهَجُهُمْ في التعلُّمِ শিরোনামে আলোচনাটি করেছেন। আর তৃতীয় আলোচনাটি উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালিক দা. বা.-এর। তাঁর আলোচনাটি 'মারকাযুদ্ দাওয়াহ্ আলইসলামিয়া ঢাকা'-এর মুখপত্র মাসিক 'আলকাউসারে' প্রকাশিত হয়েছে।

---

১৬১. «أَدَبُ الاختلافِ في مَسَائِلِ العلمِ والدِّينِ» للشيخ محمد عَوَّامَة ص. ১৬৪ এবং «الإسنادُ مِنَ الدِّينِ» للشيخ عبد الفَتَّاحِ أَبُوْ غُدَّة ص. ৪৩

হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তাইয়েব রহ.-এর আলোচনা

উলামায়ে দেওবন্দের চিন্তা-চেতনা বিষয়ে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রায় ৬০ বছরের[১৬২] মহাপরিচালক হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তাইয়েব রহ. [১৩১৫ - ১৪০৩ হি.]-এর একটি কিতাব আছে।[১৬৩] কিতাবটির নাম হলো– علماء دیوبند کا دینی رسوخ اور مسلکی حزن- কিতাবটি উর্দু ভাষা থেকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেছেন আমার হযরাতুল উস্তাদ মাওলানা নূর আলম খলীল আমীনী দা. বা.। আরবী অনুবাদটির শিরোনাম হলো– : عُلَمَاءُ دِيوبند اِتِّجَاهُهُمُ الدِّيْنِيُّ وَمِزَاجِهُمُ الْمَذْهَبِيُّ উক্ত কিতাবে তিনি উস্তাদ গ্রহণ ও সাহচর্যের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি প্রত্যেক তালিবে ইলমের জানা উচিত। আমি এখন আলোচনাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের আরবী থেকে অনুবাদ করে[১৬৪] তোমাদের সামনে তুলে ধরছি। তিনি লিখেন–

পৃথিবীতে যখনই আল্লাহর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে, তা এমন কোনো মানুষের মাধ্যমেই অবতীর্ণ হয়েছে, যাকে মানুষের নিকট তা পৌছানোর এবং মানুষকে তা পড়ে শোনানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কখনো কোনো পাহাড় বা পাথরের উপর আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়নি, যে শোনতে ও শোনাতে সমর্থ নয় এবং পড়তে ও পড়াতে সক্ষম নয়। এর দ্বারা অনুমিত হয়, কিতাবের ভাষা ও পরিভাষা এবং অর্থ ও মর্ম পৌছানোর ও বোঝানোর

---

১৬২. عُلَمَاءُ دِيوبند : اِتِّجَاهُهُمُ الدِّيْنِيُّ وَمِزَاجِهُمُ الْمَذْهَبِيُّ পৃ. ৩১ দ্বিতীয় সংস্করণ।

১৬৩. কিতাবটি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা. কিতাবের ভূমিকায় লিখেছেন– আমি গুরুত্বের সাথে বলছি, কোনো শিক্ষিত মুসলমান বিশেষত ইসলামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কোনো শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের কিতাবটি অধ্যয়ন করা থেকে বঞ্চিত থাকা অনুচিত। বরং কিতাবটির পাঠদান বা তার স্বাধীন পঠন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর পাঠ্য তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত।

১৬৪. আলোচনাটি আরবী অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণে ৯৭ নং পৃষ্ঠা থেকে ১১৫ নং পর্যন্ত পৃষ্ঠাগুলোতে স্থান পেয়েছে।

ক্ষেত্রে কিতাব ও কিতাবের লেখা যতটা ভূমিকা পালন করে, কিতাবের শিক্ষকের ভূমিকা তার চেয়ে বেশি।

কিতাবের পাশাপাশি কিতাবের শিক্ষকের প্রয়োজন অধিক হওয়ার অন্য একটি কারণ হলো, কিতাবের ভাষার এমন অনেক বৈশিষ্ট্য থাকে যেগুলো বক্তার উচ্চারণ-পদ্ধতি, বাচন-ভঙ্গি, উপস্থাপন-শৈলী, বোঝানোর ধরন প্রভৃতি ছাড়া বোঝা যায় না। আর উচ্চারণ-পদ্ধতি, বাচন-ভঙ্গি, উপস্থাপন-শৈলী, বোঝানোর ধরন ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থা, কাগজ ও কাগজের নকশায় অঙ্কিত হওয়া সম্ভব হয় না। এক কথায় কাগজ ও কাগজের লেখা দ্বারা কথার মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয় না।

তাছাড়া কথার উৎস হলো ভাব ও চেতনা যা ব্যক্ত করার জন্য ভাষা ও পরিভাষা ব্যবহার করা হয় এবং বক্তা যে কারণে বিশেষ উচ্চারণ-পদ্ধতি ও বাচন-ভঙ্গি গ্রহণ করেন। তাইতো একটি কথাই যখন রাগতস্বরে ও চোখ বড় বড় ও লাল লাল করে ব্যক্ত করা হয়, কথার শব্দাবলি যতই কোমল ও শালীন হোক, কথাটি তখন ধমক ও তিরস্কারের অর্থ প্রদান করে। অনুরূপভাবে কোনো কথা যখন পূর্ণ কোমলতা ও নম্রতার সাথে এবং চোখ নিচু করে ব্যক্ত করা হয়, কথার শব্দাবলি যতই কর্কশ ও শুকনো হোক, কথাটি তখন স্নেহ ও উদারতার অর্থ প্রদান করে। তদ্রূপ বিস্ময়ের ধ্বনি যখন বিস্ময়প্রকাশক ভঙ্গিতে প্রকাশ করা হয়, তখন তা আশ্চর্য ও বিস্ময়ের অর্থ প্রকাশ করে। যখন তা কর্তৃত্ব ও দাপটের ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়, তখন তা আঘাত ও শাস্তিপ্রদানের অর্থ প্রকাশ করে। যখন ভালোবাসার ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়, তখন ভালোবাসা ও মমতার ভাব প্রকাশ করে। যখন জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ব্যক্ত করা হয়, তখন প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার অর্থ প্রকাশ করে। তো কথার উৎস যখন আভ্যন্তরীণ ভাব ও ভাবনা, তখন সেই ভাবনাগুলো কাগজ ও কাগজের লেখার মধ্যে প্রকাশ না হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। সেগুলো বরং প্রকাশ হবে বক্তার আচরণ ও উচ্চারণে।

মোটকথা, শব্দ বিভিন্ন স্থানে যতই এক ও অভিন্ন হয়, তা বক্তার মনের সেই আভ্যন্তরীণ অবস্থা দ্বারা বিধৌত হয়েই প্রকাশ পায় যা তার উচ্চারণ, প্রকাশভঙ্গি ও কথার ধরন দ্বারা বোঝা যায়। বক্তার কথার ধরন ও উচ্চারণ-ভঙ্গি যদি ভিন্ন হয়, তাহলে অর্থ ও উদ্দেশ্যই ভিন্ন হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, উচ্চারণ, কথার ধরন, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা, দু'চোখ থেকে টপকে পড়া লজ্জা,

ধ্বনিতরঙ্গ, আবেগ ও মনের বিভিন্ন অবস্থার অপ্রকাশ্য চিত্র, এসব কিছু কাগজ ও হরফে অঙ্কিত হওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়। এগুলো বক্তার সত্তা ও ব্যক্তিত্ব থেকেই বোঝা সম্ভব। তাই শুধু শব্দ নয়, অর্থ বোঝার জন্যও উস্তাদের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ফার্সী কবি বলেছেন– 'চিত্রশিল্পী যখন ঘাতক প্রেমাস্পদের ছবি আঁকার চেষ্টা করে, তবে আমি হতভম্ব হয়ে পড়ি এই ভেবে যে, তার প্রণয়লীলার ভান ও মনভোলানো আচরণের ছবি আঁকা শিল্পীর পক্ষে কী করে সম্ভব হবে?'

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলার বাণীতে অদৃশ্য বাস্তবতার এক বিশাল ভাণ্ডার লুকায়িত থাকে। সেগুলোর উদ্দেশ্য হয় পাঠক ও শ্রোতাকে লক্ষ্যের গভীরতায় পৌঁছানো এবং তার জ্ঞানে ব্যাপকতা ও গভীরতা সৃষ্টি করা। আরো অগ্রসর হয়ে কথা হলো, সেসব বাস্তবতায় এমন অনেক অবস্থা ও স্তর থাকে যেগুলো মনে তখন উদয় হয়, মন যখন সেসব বাস্তবতাকে চুষে নেয়। আর উদ্দেশ্য হলো, পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়কে সেসকল অবস্থা ও স্তর যেমন– ভালোবাসা, বন্ধুত্ব, আগ্রহ, কামনা, আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, হকের প্রতি আগ্রহ ও সে বিষয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন, তার বিপরীতে বাতিলকে পরিহার করা, তা থেকে দূরত্ব বজায় রাখা, তার দাবিসমূহ থেকে বিরত থাকা, তার নিকটবর্তী হওয়াকেও ভয় করা, তার মন্দত্বের আবেগকে লালন করা এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠা প্রভৃতির রঙ্গে রঙ্গিন করা। মোটকথা এ সকল অবস্থা ও স্তর শ্রোতা ও পাঠকের মনে এমনভাবে স্থাপন হওয়া যে, এগুলো উক্তির (اَلْقَالُ) স্তরে থাকবে না, বরং অবস্থার (اَلْحَالُ) স্তরে পরিবর্তিত হবে এবং তা ব্যক্তির স্বভাবে রূপান্তরিত হবে ও তার আত্মার 'সঙ্গী'তে পরিণত হবে।

এ কথা স্পষ্ট যে, এ সকল বিষয় কাগজের পাতায় আসা এবং বক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি বা যারা তাঁদের হাতে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন তাঁদের মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি হৃদয়ে পৌঁছা, মোটেই সম্ভব নয়। অন্য ভাষায়, শ্রোতা ও পাঠকের হৃদয়কে কাগজ ও কাগজে লেখা হরফের মাধ্যমে কোনো ছাঁচে গড়ে তোলা কখনো সম্ভব নয়, যতক্ষণ না বক্তা তার আভ্যন্তরীণ শক্তির মাধ্যমে তাদের হৃদয়ে প্রভাব সৃষ্টি না করবেন।

যখন মানব-মেধা বক্তব্যের শব্দাবলির উদ্দেশ্য আয়ত্ত করতে সক্ষম হয় না এমন কোনো ব্যক্তির মাধ্যম ব্যতীত যে তাকে বুঝিয়ে দেবে, অথচ

উদ্দেশ্যপ্রকাশক শব্দ তার সামনে আছে, এমতাবস্থায় কাগজ ও কাগজের হরফের পক্ষে কি করে সম্ভব হবে যে, সে কাউকে আল্লাহর কালামের সেসকল আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও সূক্ষ্ম 'হাল' বোঝাবে? অবস্থাগুলো কারো হৃদয়ে প্রতিস্থাপন হওয়া তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এমন কোনো শিক্ষক ব্যতীত কখনো সম্ভব হয় না, শিক্ষক পরম্পরায় যার প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যুক্ত। তাহলে এসকল বাস্তবতায় রঙ্গিন হওয়া ও আল্লাহর রঙ ধারণ করা এমন শিক্ষক ব্যতীত কি করে সম্ভব?

তাছাড়া একটি অনস্বীকার্য কথা হলো, আল্লাহ তা'আলার হুকুমের লক্ষ্য হলো সে অনুযায়ী আমল করা। আমলের উপর মানুষের সৌভাগ্য নির্ভরশীল। আর হুকুমের ভাষা যতই যথাযথ ও বাগ্মিতাপূর্ণ হোক, শুধু তা দ্বারা বক্তব্যের উদ্দেশ্য বোঝা যায় না। শুধু শব্দ ও হরফের কথা তো বলাই বাহুল্য, বক্তার বক্তব্যের শক্তি দ্বারাও আমলের কাঙ্ক্ষিত রূপ পরিষ্কার বুঝে আসে না। আমলের কাঙ্ক্ষিত বরং রূপ তখনই স্পষ্ট হয়, যখন আমল করার মাধ্যমে বক্তা তা স্পষ্ট করেন। এ কারণেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তা'আলার হুকুম صَلُّوا [তোমরা নামায পড়ো] শুনিয়ে ক্ষান্ত হন নি। বরং صَلُّوا-এর পর كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي [যেভাবে আমাকে নামায পড়তে দেখেছ][১৬৫] যুক্ত করে নামাযের কাঙ্ক্ষিত রূপ পরিষ্কার করেছেন।

এর দ্বারা এ কথাই প্রকাশ পায় যে, নামায শব্দের অর্থ জানার পাশাপাশি আল্লাহর নিকট তার গ্রহণযোগ্য রূপ কী, তা জানাও জরুরী। আর তা জানা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানানো ছাড়া সম্ভব নয়। কথা ও লেখার মাধ্যমে তার প্রকৃত রূপ তুলে ধরা সম্ভব নয়। এ কারণেই হযরত জিবরীল আলাইহিস্ সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের আদেশ পৌঁছানোর পাশাপাশি নিজে পড়ে নামায শিখিয়েছেন এবং নিজের আমল দ্বারা নামাযের সময় নির্ধারণ করেছেন।

---

১৬৫. সহীহ বুখারী ১ ঃ ১৯৪, হাদীস নং ৬৩১, بَابُ الْأَذَانِ

একটি স্পষ্ট কথা হলো, বইয়ের শুধু কালো হরফগুলো দেখে বোঝা যায় না সেগুলো কিভাবে উচ্চারণ করতে হয়[১৬৬], সেগুলোর বাচনভঙ্গি কেমন, সেগুলো অনুযায়ী আমল করার ধরণ কেমন, সেগুলোর আভ্যন্তরীণ অবস্থা কেমন। অনুরূপভাবে বইয়ের কালো হরফ দ্বারা লেখকের হৃদয়ের উষ্ণতা এবং তাঁর অনুভূতি ও উপলব্ধিও বোঝা যায় না। এমতাবস্থায় আল্লাহর হুকুম অবতীর্ণ হওয়ার পর কোনো মূর্খ বা একগুঁয়ে যদি শুধু কিতাবের কালো হরফগুলোর উপর নির্ভর করে এবং যে শিক্ষক উক্ত বিধান শেখানোর জন্য আগমন করেছেন তাঁর থেকে বিমুখ থাকে, তাহলে সে বক্তব্যের এমন উদ্দেশ্যই বোঝবে যা তার নিজের অবস্থার অনুরূপ।[১৬৭] তা আল্লাহ

---

১৬৬. এ সম্পর্কে শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা দা. বা.-এর أَثَرُ الحَدِيثِ الشَرِيفِ فِي اخْتِلافِ الأَئِمَّةِ الفُقَهَاءِ رضي الله عنهم কিতাবে [পৃ. ৫১; ষষ্ঠ সংস্করণ] একটি চমৎকার ঘটনা আছে। শায়খের উস্তাদ কারী, মুফাস্সির, ফকীহ, বুযুর্গ শায়খ আব্দুল আযীয রহ. [১৩৩৫ - ১৩৯৯ হি.] বলেছেন, আমি মসজিদে ছিলাম। যোহরের আযানের পূর্ব মুহূর্তে একজন লোক মসজিদে প্রবেশ করল। আমি তাকে চিনি না। লোকেরা আমাকে বলল, তার নাম নাসির উদ্দীন আলবানী। তিনি আযানের অপেক্ষা করতে থাকলেন। মুআয্যিন যখন [اَللهُ أَكْبَرَ اللهُ أَكْبَرُ হরফে যবর দিয়ে] উচ্চারণ করলেন, লোকটি তখন নিজকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে রাগতস্বরে বললেন, এটি ভুল, এটি বিদ'আত। আমি বললাম, ভুল ও বিদ'আত কোন্ কাজটা? তিনি বললেন, এটি সহীহ মুসলিমের হাদীসের পরিপন্থী। আমি তাকে কয়েকবার বললাম, সহীহ মুসলিমে কী আছে? তিনি বললেন, সহীহ মুসলিমে [اَللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ হরফে পেশসহ] আছে। আমি তাকে আদবের সাথে বললাম, আপনি কি সহীহ মুসলিম কোনো উস্তাদ থেকে শুনেছেন? এভাবে উস্তাদ পরম্পরায় ইমাম মুসলিম রহ. থেকে এ হাদীসের رَ হরফটি কি পেশসহ বর্ণিত আছে? নাকি কিতাবে رَ হরফটিতে পেশ থাকা মুদ্রণজনিত। তিনি তখন চুপ হয়ে গেলেন। আমিও চুপ থাকলাম। নামায পড়ে তিনি চলে গেলেন। অতএব জ্ঞানীরা যেন শিক্ষাগ্রহণ করে!

১৬৭. যেমন কারো মানসিকতা রাজনীতিপ্রবণ। তো সে যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাঁদের হাতে দীক্ষিত তাবেঈগণ থেকে বর্ণিত কুরআনের তাফসীর হতে বিমুখ থাকে, তাহলে সে কুরআন পাকের প্রত্যেক আয়াতের এমন উদ্দেশ্যই

তা'আলার উদ্দেশ্য হবে না। আর তা ঐ ব্যক্তির শুধু 'ভুল বুঝ'ই হবে না, উপরন্তু তা একটা জঘন্য 'অর্থ-বিকৃতি'ও হবে। এমন লোক তার কুপ্রবৃত্তি যেমন চায়, কুরআনের শব্দাবলির তেমন অর্থ করবে। এ কারণে প্রয়োজন ছিল আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বিধানের পাশাপাশি শিক্ষাদানকারী ব্যক্তিও আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হউক এবং প্রত্যেক যুগে এমন লোকের বিদ্যমানতা অব্যাহত থাকুক, যারা পূর্ববর্তীদের সাহচর্যে থেকে কিতাব শিক্ষাগ্রহণ করে সাহচর্যদানের মাধ্যমে পরবর্তীদেরকে শিক্ষাদান করবে। অন্যথায় আসমানী কিতাব অবতীর্ণ করার পাশাপাশি নবী-রাসূল প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না।

মূলত কিতাব অবতীর্ণ হয় উপদেশ গ্রহণের জন্য। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

অর্থ. আমি উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআন সহজ করলাম, আছে কি কোনো উপদেশগ্রহণকারী?[১৬৮]

আর শিক্ষক প্রেরণ করা হয় যেন তাঁর ব্যাখ্যার মাধ্যমে মানুষের সামনে কিতাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের নেপথ্যে লুকায়িত তত্ত্ব ও রহস্যসমূহ তুলে ধরা হয়। এ সব কারণেই আল্লাহ তা'আলা উপদেশ তথা কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করাকেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম কাজ সাব্যস্ত করেছেন। ইরশাদ করেছেন–

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ. আর তোমার প্রতি উপদেশ অবতীর্ণ করেছি যেন তুমি সেসকল বিষয় মানুষের নিকট স্পষ্ট কর যা তাদের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, এবং আশা করা যায় তারা চিন্তা করবে।[১৬৯]

এখানে লক্ষণীয় একটি বিষয় হলো, আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ [যেন তুমি মানুষের নিকট স্পষ্ট কর] অংশকে لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

বোঝবে যা তার নিজের অবস্থার অনুরূপ। অর্থাৎ যা দ্বারা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমর্থন লাভ হয়।

১৬৮. সূরা কামার, আয়াত নং ১৭

১৬৯. সূরা নাহ্‌ল, আয়াত নং ৪৪

[এবং আশা করা যায় তারা চিন্তা করবে]-এর পূর্বে উল্লেখ করেছেন। প্রথম অংশটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। এর দ্বারা বুঝা যায়, উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা যা উস্তাদের কাজ, তা চিন্তা-ভাবনা করার পূর্বের কাজ। চিন্তা-ভাবনা হলো বুদ্ধি ও বিবেকের কাজ। এর মূল কথা হলো চিন্তা-ভাবনা করতে হবে উদ্দেশ্যের সীমার ভিতরে থেকে। এই না যে, চিন্তা-ভাবনা করে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হবে।[১৭০] অন্যথায় তা আল্লাহর উদ্দেশ্য হবে না। হবে নিজের উদ্দেশ্য।

অতএব এ কথা পরিষ্কার যে, কুরআন পাকের আয়াতের উদ্দেশ্য শ্রুতনির্ভর। আল্লাহ তা'আলা আয়াতের উদ্দেশ্য বুঝানোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্ব নিরূপণ করেছেন। কুরআন পাকের আয়াতের উদ্দেশ্য যুক্তিনির্ভর নয়। অতএব বিবেক ও যুক্তি দ্বারা আয়াতের উদ্দেশ্য নিরূপণ করার সুযোগ নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত উদ্দেশ্যের নিরাপদ সীমায় আবদ্ধ থেকে বিবেক ও বুদ্ধিকে সেই উদ্দেশ্যের মধ্যে চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে মাত্র। উপরন্তু বিবেক ও বুদ্ধির পরিচর্যার দায়িত্বও দেয়া হয়েছে নবী-রাসূলগণকে। কেননা বুদ্ধির স্খলন অনুভূতির স্খলনের তুলনায় গুরুতর। দার্শনিকদের পরস্পরবিরোধী বিভিন্ন বক্তব্য দ্বারা তা বুঝে আসে।

---

১৭০. চিন্তা করে দেখো তো, উসূলে ফিকহের কিতাবে তুমি যে পড়েছ– কিয়াস مُثْبِت للحكم [হুকুম সাব্যস্তকারী] নয়, বরং مُظْهِر للحكم [হুকুম প্রকাশকারী], আলোচ্য আলোচনার সাথে তোমার উক্ত পড়ার কোনো মিল খোঁজে পাও কি-না। অর্থাৎ কিয়াস لَعَلَّهُمْ يتفكرون [আশা করা যায় তারা চিন্তা করবে]-এর উপর আমল করার জন্য। تَبْيِيْنُ مُرَادَاتِ كلامِ اللهِ تعالى [আল্লাহর কালামের উদ্দেশ্য নির্ণয়]-এর জন্য নয়। উল্লেখ্য, উদ্দেশ্যের সীমার ভিতরে থেকে চিন্তা না করে নিজে চিন্তা করে নসের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করাকেই উসূলে তাফসীরের পরিভাষায় تفسير بالرأي বলা হয়। পূর্বে কেউ বলেনি এমন ব্যাখ্যা মাত্রই নিষিদ্ধ নয়। শরীয়ত-প্রবর্তকের বর্ণিত উদ্দেশ্যের সীমার ভিতরে আবদ্ধ থেকে উক্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়, নসের এমন নতুন কোনো ব্যাখ্যা করার অবশ্যই সুযোগ আছে।

এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্যের সুগভীর তত্ত্বগুলোকেই 'হেকমত' বলা হয়। পক্ষান্তরে নিজের পক্ষ হতে উৎঘাটন করা উদ্দেশ্য থেকে বিভিন্ন সূক্ষ্ম বিষয় আবিষ্কার করা হলো দর্শন। 'হেকমতে'র সাথে দর্শনের কোনো সম্পর্ক নেই।

এ কারণেই কোনো পাঠকের উঁচু স্তরের ও নিচু স্তরের বা মধ্যম স্তরের হওয়ার মানদণ্ড এই নির্ধারণ করা হয়নি যে, কোনো কিতাবের কাগজ যদি উন্নত মানের হয়, তার ছাপা যদি উজ্জ্বল ও ঝকঝকে হয় এবং কিতাবটির সাইজ যদি মাননসই হয়, তাহলে তার পাঠক বড় আলেম গণ্য হবে; পক্ষান্তরে কোনো কিতাবের ছাপার মান যদি মন্দ হয়, তাহলে তার পাঠক নিম্নস্তরের আলেম বলে গণ্য হবে। বরং কোনো ব্যক্তির বড় বা ছোট আলেম হওয়ার ভিত্তি হলো তার উস্তাদ ও শিক্ষকমণ্ডলী এবং তাদের তাকওয়া-তাহারাত। যদি তাদের কোনো সনদই না থাকে, কিংবা সনদ থাকে কিন্তু তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহ পর্যন্ত যুক্ত নয়; তাহলে তারা 'তথাকথিত আলেম' বলে গণ্য হবে, যাদের কাছে কিছু লেখাপড়া ও ব্যক্তিগত অধ্যয়ন ব্যতীত কোনো পুঁজি নেই। তাদের কাছে যেহেতু সনদ নেই এবং তারা দীক্ষাপ্রাপ্ত নয়, তাই তাদেরকে আলেম বলাটা হবে আলেম শব্দের একটা অপপ্রয়োগ। ধর্মীয় বিষয়সমূহে তাদের কর্ম ও উক্তি প্রমাণ নয়। তারা ভ্রুক্ষেপযোগ্য নয়।

তাই কোনো আলেমকে যাচাই করার জন্য সর্বপ্রথম তার সনদ দেখা হয়। সনদ দ্বারা তার উস্তাদ ও মুরুব্বীদের পরিচয় পাওয়া যায়। পঠিত কিতাব ও সেসকল কিতাবের কাগজ ও ছাপার মান দ্বারা কাউকে যাচাই করা হয় না। কোথাও কোনো কিতাবের নাম উল্লেখ করা হলেও তা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা হয়। স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয় না। অন্যথায় বর্তমান যুগে অনুবাদ দেখে দেখে বা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে কিছুটা সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে কিংবা অধ্যয়ন-শক্তি ও ব্যক্তিগত মেধা ও ধীশক্তির ভিত্তিতে ইলমের অনেক দাবিদার আত্মপ্রকাশ লাভ করছে। তাদের আশেপাশে অজ্ঞ লোকদের বা 'অজ্ঞ জ্ঞানী' অনেক লোকও সমবেত হয়ে যায়। কিন্তু অবিচ্ছিন্ন সনদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণে প্রকৃতপক্ষে তারা ইলমী বিরাছাত থেকে বঞ্চিত থাকে। নিজেদেরকে আলেম দাবি করার তাদের অধিকার থাকে না। একারণেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে ইলম চলে যাওয়াকে হক্কানী আলেমদের চলে যাওয়ার ফলাফল গণ্য করেছেন।

কিতাব হারিয়ে যাওয়ার ফল গণ্য করেন নি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إن الله لا يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُه مِنَ النَاسِ، ولكنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إذا لَمْ يَتْرُكْ عالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً، فسُئِلُوْا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فضَلُّوْا وأَضَلُّوْا.

অর্থ. আল্লাহ তা'আলা মানুষ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম উঠাবেন না। তিনি ইলম উঠাবেন আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে। অবশেষে যখন কোনো আলেম রাখবেন না, তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নিজেদের নেতা বানিয়ে নিবে। অতঃপর তাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। তখন তারা না জেনেই ফতোয়া দিবে। এভাবে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে।[১৭১]

এর দ্বারা বুঝা গেল, ইলম শুধু পড়ালেখা করার নাম নয়। বরং ইলম হলো নির্ভরযোগ্য আলেমগণ থেকে অবিচ্ছিন্ন সনদের মাধ্যমে শেখার এবং দীক্ষা লাভ করে সুস্থ রুচির অধিকারী হওয়ার নাম। এ ব্যাপারে আসল কথা হলো, ইলম মূলত নবুয়তের উত্তরাধিকার। আর নবুয়তের উত্তরাধিকারের উপযুক্ত সে-ই হবে, যার আত্মিক বংশ-লতিকা নবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সংযুক্ত থাকবে। এর উদাহরণ ঠিক এমনই, যেভাবে আর্থিক উত্তরাধিকার লাভ নির্ভর করে পিতার সঙ্গে সম্পর্ক প্রমাণিত হওয়ার উপর। পিতার সঙ্গে সম্পর্কই যদি প্রমাণিত না হয়, তাহলে যেমন ব্যক্তি উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে, তেমনি নববী ইলমের উত্তরাধিকারের ভিত্তিই হলো সনদ ও নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকার উপর। একে 'আত্মিক বংশলতিকা' বলা উচিত। যেমন স্বয়ং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الوَالِدِ.

---

[১৭১]. সহীহ বুখারী, হাদীস নং– ১০০ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং– ২৬৭৩

অর্থ. আমি তোমাদের জন্য পিতার স্থলে রয়েছি।[১৭২]

অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য আত্মিক পিতা। অতএব শিক্ষা ও দীক্ষার এই সনদ ও ধারাবাহিকতা যদি উস্তাদ পরম্পরায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত না পৌঁছে, তাহলে ঐ ব্যক্তি নববী ইলমের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত থাকবে। তার জ্ঞান হবে কতগুলো শব্দের সমষ্টি এবং হবে তার ব্যক্তিগত ভাব ও আবেগ সৃষ্ট। এমন জ্ঞান ধর্মীয় বিষয়ে গ্রহণযোগ্য নয়। এমন জ্ঞান হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী ছড়াবে।

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেল যে, ইলম হারিয়ে যাওয়ার কারণ কিতাব হারিয়ে যাওয়া নয়। বরং ইলম হারিয়ে যাওয়ার কারণ হবে আলেমদের হারিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ তাঁদের মৃত্যুবরণ। আর ইলম বিভিন্ন স্তরের হওয়া নির্ভর করে ইলমের নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন স্তরের হওয়ার উপর। কিতাবের ভালো-মন্দ হওয়ার উপর তা নির্ভর করে না। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা সত্য ধর্মের জন্য আল্লাহর কিতাবের পাশাপাশি আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তিবর্গের অনুসরণ জরুরি সাব্যস্ত করেছেন। শিক্ষক ও কিতাব উভয়ের একত্র-উপস্থিতি ব্যতীত কিতাবের উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যের অনুকূল ইলমের আকৃতি নির্ধারিত হওয়া এবং সেই ইলম ও আমলের ফলাফল তথা ভয়, তাকওয়া, আশা, আশঙ্কা, সত্যের প্রতি অনুরাগ ও মিথ্যার প্রতি বিদ্বেষ প্রভৃতি বিদ্যমান থাকা সাধারণত সম্ভব ছিল না।

এখানে এ বিষয়টিও স্মরণ রাখা জরুরি যে, কিতাব ও কিতাবের শিক্ষকের সমন্বয় শুধু জ্ঞান, উদ্দেশ্য অনুধাবন ও অবস্থা-অনুভূতির স্তর পর্যন্তই প্রয়োজন নয়, বরং আখলাক-চরিত্রের স্তর পর্যন্তও প্রয়োজন। কারণ, আখলাকই মূলত ইলমের উৎস এবং আমলের বীজ। অনুরূপভাবে আমলের আভ্যন্তরীণ অবস্থাও আখলাকের ফলাফল হয়ে থাকে। অর্থাৎ আমরা যদি কিতাব আঁকড়ে ধরে শিক্ষক থেকে বিমুখ হই কিংবা শিক্ষককে আঁকড়ে ধরে কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, তাহলে আমরা কিতাবের উদ্দেশ্য বুঝতেই শুধু ভুল করব না, উপরন্তু আখলাক-চরিত্রের ক্ষেত্রেও ভুল করব। তখন আমরা চারিত্রিক সীমালঙ্ঘন, শিথিলতা ও ভারসাম্যহীনতার শিকার হব।

---

[১৭২]. সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ, সুনানে ইবনে মাজা।

এর মূল কারণ হলো ইলম মানুষের নিজস্ব গুণ নয়। ইলম মূলত আল্লাহ তা'আলার গুণ। তাই স্বত্তাগতভাবেই ইলম উঁচু মাকাম ও মর্যাদার অধিকারী। ইলম কখনো হীনতা ও লাঞ্ছনা মেনে নিতে পারে না। ফলে ইলমের ধারক বাহকও স্বভাবতই লাঞ্ছনা ও নিচুতা সহ্য করতে পারে না। তাই ইলমের উঁচু মর্যাদার পথ ধরে আলেমের মধ্যে অহঙ্কার, আত্মগরিমা, আত্মমুগ্ধতা, আমিত্ব প্রভৃতি অনুভূতি জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা ছিল। এমতাবস্থায় তাকে আলেমও গণ্য করা হবে না। কারণ ইলমের প্রতিক্রিয়া তথা আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া তার মধ্যে বিদ্যমান নেই। আবার সে নিজের দৃষ্টিতে এমন জাহেলও নয় যে, অকপটে নিজের জাহালাত ও মূর্খতা স্বীকার করবে। এমন লোক যদি অন্যদেরকে শিক্ষাদান করে, তার শিক্ষাদান কোনো উপকারে আসবে না। শিক্ষার্থী ও ছাত্রদের মধ্যে তার কিছু জ্ঞান স্থানান্তর হলেও সঙ্গে তার আভ্যন্তরীণ ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলোও স্থানান্তর হবে। তাই নিজের মধ্যে বিনয়, নম্রতা, আত্মবিলুপ্তি প্রভৃতি গুণ সৃষ্টি করা নিতান্ত প্রয়োজন। আর এসব গুণ পূর্ণ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সাথে কোনো আল্লাহওয়ালা উস্তাদ ও শিক্ষকের সামনে নিজকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করা দ্বারাই শুধু অর্জন হয়। কিতাব ও কিতাবের হরফের সামনে নত ও লাঞ্ছিত হওয়া দ্বারা এসব গুণ অর্জন হয় না।

দেখুন কুরআন পাক তাকওয়া অবলম্বনের আদেশ করার পাশাপাশি মুত্তাকীদের সোহবত ও সাহচর্য অবলম্বনেরও আদেশ করেছে। ইরশাদ হয়েছে– يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ.

অর্থ. হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।[১৭৩]

সূরা ফাতেহা-য় আল্লাহ তা'আলা যেখানে মানুষকে اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন] বলে আল্লাহর নিকট 'সরল পথ' প্রার্থনা করা শিক্ষা দিয়েছেন, সেখানে এই 'পথ'কে ব্যাখা না করে এমনিতেই রেখে দেননি যে, যাকে তোমরা নিজেদের বিবেক দ্বারা 'সরল

---

[১৭৩]. টীকাটি ২২১ নং পৃষ্ঠায় পড়ো।

পথ' মনে কর, তাকেই গ্রহণ করো। বরং তার পর صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ [তাদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ] উল্লেখ করে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, 'অনুগ্রহপ্রাপ্ত' তথা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের পথই হলো 'সরল পথ'।[১৭৪] আর তা তাঁদের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। এর অর্থ তো এটাই যে, 'সরল পথে'র সঙ্গে এ সকল মহান ব্যক্তিদেরকেও গ্রহণ করো, তাঁরা তোমাদেরকে 'সরল পথে' দীক্ষিত করতে পারবে এবং 'সরল পথে' পরিচালিত করতে সক্ষম হবে।

তো কুরআন পাকের শুরুতেই 'সরল পথ' প্রার্থনার পাশাপাশি 'সরল পথ' প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের কথা উল্লেখ করে তাঁদের সোহবত ও সাহচর্যের প্রার্থনা করাও প্রকারান্তরে শিক্ষা দিলেন। এটি মহান ব্যক্তিবর্গের শিক্ষাদীক্ষা ও সাহচর্য প্রয়োজন হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ।

ভেবে দেখুন, এই নববী সোহবত ও সাহচর্যই সাহাবায়ে কেরামের পুরো উম্মতের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ও উত্তম হওয়ার কারণ। কেননা নববী সোহবত ও সাহচর্যই তাঁদের শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি। 'সাহাবী' শব্দের অর্থই হলো সোহবতপ্রাপ্ত। শুধু শিক্ষাপ্রাপ্ত 'সাহাবী' শব্দের অর্থ নয়। তাই স্থানে স্থানে এই সাহচর্যকেই তাঁদের মহান কৃতিত্ব সাব্যস্ত করা হয়েছে। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে–

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۭ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّاۗءُ عَلَي الْكُفَّارِ رُحَمَاۗءُ بَيْنَهُمْ

অর্থ. মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। আর যারা তাঁর সাহচর্যপ্রাপ্ত তারা কাফেরদের বিরুদ্ধে কঠোর আর পরস্পর দয়ালু।[১৭৫]

এক স্থানে তাহাজ্জুদ নামায প্রসঙ্গে وَطَاۗىِٕفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ [এবং তোমার সঙ্গীদের মধ্যে কতক লোক] বলা হয়েছে।[১৭৬]

অন্য আয়াতে 'অনুগ্রহপ্রাপ্ত'দের আলোচনা করে তাঁদের অনুসারীদের জন্য সাহচর্যকে বিশেষ নেয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

---

১৭৪. সূরা নিসা-র ৬৯ নং আয়াতে 'অনুগ্রহপ্রাপ্ত'দের ব্যাখ্যায় নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেমনটি একটু পরেই আসছে।

১৭৫. সূরা ফাত্হ, আয়াত নং ২৯

১৭৬. সূরা মুয্যাম্মিল, আয়াত নং ২০

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.

অর্থ. ওরা [যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুসরণকারী] তাঁদের সঙ্গে থাকবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। অর্থাৎ নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও নেককারগণ। আর ওরা উত্তম সঙ্গী।[১৭৭]

এ ভিত্তিতেই পূর্বসূরী আলেমগণ থেকে যারা উপকৃত হতেন তাঁদেরকে 'ছাত্র' বা 'শিষ্য' উপাধিতে স্মরণ করা হত না। বরং 'আসহাব' [সঙ্গীগণ] শব্দ ব্যবহার করে তাঁদের পরিচয় দেয়া হতো। যেমন বলা হতো– 'আসহাবু আবী হানীফা রহ.'। আর তা ছিল হাদীস পাকের অনুসরণে। ইমাম মালেক রহ.-এর 'মুয়াত্তা' কিতাবে আছে, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপকৃত হয়েছেন, রাসূল তাঁদেরকে 'আসহাব' বলেছেন। ইরশাদ করেছেন– بَلْ أَنْتُمْ أَصْحَابِيْ

অর্থ. বরং তোমার আমার 'আসহাব'/ 'সঙ্গী'।[১৭৮]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর উক্তি দ্বারাও এর সমর্থন হয়। তিনি এক প্রসঙ্গে বলেছেন– أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

অর্থ. ওরা হলো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'সাহাবী' / 'সঙ্গী'।[১৭৯]

মোটকথা, বাস্তবার্থে আসলাফ ও পূর্বসূরী আলেমসমাজের অনুসরণ ও তাঁদের রঙ্গে রঙ্গীন হওয়া তাঁদের সোহবত, সাহচর্য ও দীর্ঘ সংশ্রব ব্যতীত সম্ভবই ছিল না। তাই বিভিন্ন শিরোনামে তাঁদের অনুসরণ করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কোথাও ইরশাদ হয়েছে–

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ

অর্থ. এবং তাঁদের পথ অনুসরণ করো যারা আমার অভিমুখী হয়েছে।[১৮০]

---

১৭৭. সূরা নিসা, আয়াত নং ৬৯

১৭৮. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও মুআত্তা মালেক।

১৭৯. রাযীন, মিশকাত।

১৮০. সূরা লুকমান, আয়ত নং ১৫

কখনো নবীগণকে পর্যন্ত আল্লাহর সৃষ্টিকুলের সংশোধনের আদেশ প্রদান করার পাশাপাশি এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা যেন কখনো বিশৃঙ্খলাকারীদের অনুসরণ না করেন। দেখুন হযরত মুসা আলাইহিস্ সালাম তুর পাহাড়ে চল্লিশ দিন অবস্থানের উদ্দেশ্যে যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত হারুন আলাইহিস্ সালামকে এ আদেশেই করেছিলেন–

اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ.

অর্থ. আমার গোত্রে আমার স্থলাভিষিক্ত থেকো, [তাদের] সংশোধন করতে থেকো এবং বিশৃঙ্খলাকারীদের পথের অনুসরণ করো না।[১৮১]

বলাবাহুল্য, এখানে বিশৃঙ্খলাকারীদের সাহচর্য ও তাদের অনুসরণের নিষেধাজ্ঞার ভেতরে নেককারদের অনুসরণ করার আদেশ লুকায়িত আছে। কেননা নেককারদের সাহচর্য ব্যতীত বিশৃঙ্খলাকারীদের পথ থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তা'আলা হযরত মুসা ও হযরত হারুন আলাইহিমাস্ সালামকে লক্ষ করে বলেছেন–

قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

অর্থ. তোমাদের দোয়া কবুল করা হলো। অতএব তোমরা দৃঢ় থেকো এবং অজ্ঞদের পথ অনুসরণ করো না।[১৮২]

বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, অজ্ঞদের পথ অনুসরণ না করার অর্থই হলো বিজ্ঞদের পথ অনুসরণ করা। কারণ কোনো জিনিস থেকে নিষেধ করার অর্থ তার বিপরীত জিনিসের আদেশ করা।

এ কারণেই মুহাদ্দিসগণ ঐ বর্ণনাকারীর হাদীস অধিক নির্ভরযোগ্য গণ্য করেছেন, উস্তাদগণের সঙ্গে সাক্ষাতের পাশাপাশি যিনি তাঁদের সোহবত ও সাহচর্যে অধিক কাল থেকেছেন। বেশি থেকে বেশি তাঁদের খেদমতে অবস্থান করে তাঁদেরকে দেখেছেন এবং মুখাপেক্ষিতার ভঙ্গিতে তাঁদের অনুগত্য করে তাঁদের মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতি অনুধাবন করার সুযোগ লাভ করেছেন। হযরত আলী রা. শিক্ষকের আনুগত্য ও মুরব্বীর অনুসরণ করা

---

১৮১. সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৪২

১৮২. সূরা ইউনুস, আয়াত নং ৮৯

প্রসঙ্গে এমন একটি উক্তি উচ্চারণ করেছেন, যা উস্তাদ ও মুরুব্বীর সামনে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের সকল ভাষা ও ভঙ্গিকে ছাড়িয়ে গেছে। তিনি বলেছেন–

أَنَا عَبْدُ مَنْ عَلَّمَنِيْ حَرْفًا واحِدًا : إِنْ شَاءَ بَاعَ، وإِنْ شاءَ اسْتَرَقَّ، وإِنْ شاءَ أَعْتَقَ.[১৮২]

অর্থ. যিনি আমাকে একটি হরফও শিখিয়েছেন আমি তাঁর গোলাম : তিনি চাইলে আমাকে বিক্রি করে দিতে পারেন, চাইলে তাঁর গোলাম বানিয়ে রাখতে পারেন এবং চাইলে আযাদ করে দিতে পারেন।

মোটকথা, কুরআন পাকের দিকনির্দেশনা এবং কুরআন পাক সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের উক্তি ও বর্ণনা দ্বারা এ কথা দিবালোকের ন্যায় প্রতিভাত হয় যে, কোনো আলেম ততক্ষণ পর্যন্ত আমিত্ব ও ইলমী বড়ত্বভাব প্রভৃতি মন্দ চরিত্র থেকে মুক্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার পূর্বের আল্লাহ অভিমুখী, সততা ও তাকওয়ার অধিকারী, সরল পথ অনুসরণকারী ও আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুগ্রহপ্রাপ্ত কোনো আলেমের সোহবত ও সাহচর্য গ্রহণ না করবে। আর বিনয়, নম্রতা, ভগ্ন হৃদয় ও আত্মবিস্মৃতি ইত্যাদি গুণে গুণী হওয়া ব্যতীত কোনো আলেম আল্লাহর মাখলুকের সংশোধন করার যোগ্য হয় না। বরং অহংকার ও আত্মগর্বের কারণে মাখলুকের জন্য সে আরও জঘণ্য ফেতনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যই কিতাবের ইলমের পাশাপাশি কিতাবের শিক্ষক ও নফসের সংশোধনকারী মুরশিদের সোহবত ও সাহচর্যের শর্ত লাগানো হয়েছে, যেন নিজে নেক ও সৎ হয়ে সঠিক অর্থে অন্যদেরকে নেককার ও সৎ বানাতে সক্ষম হয়। অন্যথায় নিজকে সংশোধন

---

১৮২. হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর উক্তির এ ভাষাটি আমি নিয়েছি সালাহ মুহাম্মদ আল-খায়মী ও নাযীর হামদান কর্তৃক তাহকীককৃত এবং দারুল উলুম দেওবন্দের আমার উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা নূর আলম খলীল আমীনী দা. বা. কর্তৃক সংশোধিত ইমাম বুরহানুদ্দীন যারনূজী রহ.-এর تعليمُ المتعلمِ কিতাব [পৃ. ৪৩] থেকে। উক্তিটি হযরত কারী মুহাম্মদ তাইয়েব রহ. নকল করেছেন এই ভাষায়– أَنَا عَبْدُ مَنْ عَلَّمَنِي حَرْفًا : إن شاء باعَ وإن شاء أَعْتَقَ

না করে যে ব্যক্তি অন্যের সংশোধনে ব্রতী হয়, সে পরিণতিতে ফ্যাসাদসৃষ্টির কারণে পর্যবসিত হবে।

যারা নিজেদেরকে সংশোধন না করে অন্যদের সংশোধনে ব্রতি হয় এবং নিজেদেরকে দীক্ষিত না করে অন্যদের দীক্ষাদানে লিপ্ত হয়, দেখুন হিদায়া কিতাবের লেখক ইমাম বুরহানুদ্দীন মিরগিনানী রহ. কেমন বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষায় তাদের ফিতনা হওয়ার চিত্রাঙ্কন করেছেন–

فَسَادٌ كبيرٌ عالِمٌ مُتَهَتِّكٌ وأَكْبَرُ مِنْهُ جاهِلٌ مُتَنَسِّكٌ

هُمَا فِتْنَةٌ فِي العالَمِيْنَ كبيرةٌ لِمَنْ بِهِمَا فِي دِيْنِه يَتَمَسَّكُ

অর্থ. নীতিভ্রষ্ট আলেম এক বড় ফেসাদ। তার চেয়ে বড় ফেসাদ হলো অজ্ঞ দরবেশ। [অর্থাৎ যে ব্যক্তি মূর্খতাপূর্ণ অবস্থায় ইবাদতে লেগে আছে। যার মধ্যে শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসরণ এবং দ্বীনের সঠিক রুচি অনুপস্থিত।] যেসকল লোক তাদেরকে ধর্মীয় বিষয়ে অনুসরণ করবে তাদের জন্য তারা এক বড় ফিতনা।[১৮৪]

তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণ লোকদের কারণে উম্মতের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করেন নি। বরং সেসকল বিশেষ লোকদের কারণে উম্মতের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা করেছেন, যারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নি। তিনি ইরশাদ করেছেন–

وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

অর্থ. আমি আমার উম্মতের ব্যাপারে পথভ্রষ্টকারী নেতৃবৃন্দের আশঙ্কা করি। আমার উম্মতের মধ্যে যখন তরবারি রাখা হবে, তখন কেয়ামত পর্যন্ত তা আর উঠবে না।[১৮৫]

পথভ্রষ্ট এসব লোকেরা দু' শ্রেণীতেই বিভক্ত : এক. সনদহীন আলেম, দুই. মূর্খ আবেদ। এ কারণেই আলেমগণ উভয় শ্রেণী থেকে দূরে থাকার

---

১৮৪. تعليمُ المتعلِّم পৃ. ৩২

১৮৫. আবু দাউদ, হাদীস নং ৪২৫৪; ইবনে মাজা, হাদীস নং ৩৯৫২

উপদেশ দিয়েছেন। পূর্ব যুগে আলেমগণের মুখে এ উক্তি ব্যাপক ছিল–

اِحْذَرُوْا من الناسِ صِنْفَيْنِ : عَالِمٌ قَدْ فَتَنَه هَوَاهُ، وعابِدٌ قَدْ أَعْمَتْه دُنْيَاه.[১৮৬]

অর্থ. দু' প্রকার মানুষ থেকে সতর্ক থেকো– এক. ঐ আলেম থেকে যাকে তার নফসের চাহিদা ফেতনায় নিক্ষেপ করেছে। [যা কিছুই বলে বা করে, তা নফসের চাহিদা ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যেই বলে ও করে।] দুই. ঐ আবেদ ও দরবেশ যাকে তার পার্থিব কামনা অন্ধ করে রেখেছে। [তার কথায় কথায় পার্থিব কামনা লুকিয়ে আছে।]

এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইলম অর্জনের পাশাপাশি একজন আলেম যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নেককার ও তারবিয়ত-বিশেষজ্ঞ আলেমের সাহচর্যে থেকে নিজের ইলম ও আখলাককে সরল না বানাবেন, বরং তাঁর কঠোরতা ও চাপাকলে পিষ্ট না হবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি নির্ভরযোগ্য তথা সংস্কারক আলেম হতে পারবেন না, যদিও প্রচুর সংখ্যক লোক তাকে আলেম বলে এবং তার অনুসরণ করে।

একটি স্পষ্ট বাস্তবতা হলো, চরিত্র সংশোধন ও আত্মার পরিশুদ্ধি কিতাব ও কিতাবের হরফ দ্বারা হয় না। বরং তা হয় সংশোধন-বিশেষজ্ঞ কোনো মহান মনীষী দ্বারা। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, ইলম শেখা ও কিতাবের উদ্দেশ্য বুঝার জন্যই শুধু নেককার ও তারবিয়ত-বিশেষজ্ঞ উস্তাদের সোহবত, সাহচর্য ও আনুগত্য প্রয়োজন নয়। উপরন্তু চরিত্রের সংশোধনের জন্যও তা আবশ্যক। কারণ, কারো ইলম নির্ভরযোগ্য হওয়া তার চারিত্রিক নিষ্কলুষতার উপর নির্ভরশীল।

হযরত কারী মুহাম্মদ তাইয়েব রহ. উক্ত কিতাবের[১৮৭] ১২৬ থেকে ১২৯ নং পৃষ্ঠায় ইলম অর্জনে উস্তাদ গ্রহণ না করার মন্দ প্রভাবের উদাহরণ

---

১৮৬ মুহাম্মদ বিন সাঈদ আল-কাহ্তানী-র الوَلاَء والبراء في الإسلام কিতাবে ইবনে তাইমিয়া রহ.-এর الصِّرَاط المستقيم কিতাবের [পৃ. ২৫] ও ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর إعلامُ المُوَقِّعِيْنَ কিতাবের [১ ঃ ১৩৬] উদ্ধৃতিতে উক্তিটি আমি এই ভাষায় পেয়েছি–

احذروا من الناس صنفين : صاحبِ هَوًى فَتَنه هَوَاه وصاحبِ دنيا أَعْجَبَتْه دنياه.

১৮৭. অর্থাৎ আরবী অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণের।

দিয়েছেন। তিনি এ পর্যায়ে ইহুদীদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন এবং উস্তাদ গ্রহণ না করার তাদের ৮ টি পরিণতি তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন–

ইহুদীরা ছিল জ্ঞানী জাতি। তাওরাত কিতাব অবতীর্ণ করে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সম্মানিত করেছেন। তাতে তাদের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের বিবরণ ছিল। ফলে তারা ছিল সম্মান ও মর্যাদার বিচারে সমকালীন পৃথিবীর সকলের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ইলমী অহঙ্কারবশত কিছুদিন যেতে না যেতেই তারা শিক্ষক গ্রহণ করা বর্জন করল। তারা ভাবল, আমাদের নিকট তো কিতাব আছে। চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্ক আছে। বোঝার মত মেধাও আছে। অতএব কিতাব বোঝার জন্য কোনো ব্যক্তির অনুসরণ করার এবং তার মানসিক দাসত্ব গ্রহণ করার আমাদের কী প্রয়োজন? তারা তাদের মস্তিষ্কের ত্রুটিবশত মনে করল, ব্যক্তির অনুসরণ করার মানে হয় তার দাস হওয়া। কিন্তু তারা এ কথা বুঝতে ব্যর্থ হলো যে, আত্মমুগ্ধতা নবীর ব্যক্তিত্বের প্রতি মুগ্ধ হওয়ার তুলনায় বড় ব্যাধি।

প্রথম পরিণতি ঃ তো ইহুদীদের জীবনে আত্মমুগ্ধতা ও উস্তাদের শিক্ষা-দীক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হওয়ার প্রথম পরিণতি এই হয়েছে যে, তারা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ও আনুগত্য করা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত থেকেছে। কুরআন পাকে তাদের এ অবস্থাটি তুলে ধরে বলা হয়েছে– وَيَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا [তারা বলে, আমরা শোনলাম ও অমান্য করলাম][১৮৮]

দ্বিতীয় পরিণতি ঃ উস্তাদের শিক্ষা-দীক্ষাগ্রহণ না করার দ্বিতীয় পরিণতি এই হয়েছে যে, উস্তাদের স্থলবর্তী হয়েছে নফসের চাহিদা, আর আনুগত্যের স্থলবর্তী হয়েছে অবাধ্যতা। তাই যখনই তাদের নিকট তাদের প্রবৃত্তির চাহিদার বিপরীত কোনো বিধান এসেছে, তারা আল্লাহর কিতাবের উক্ত বিধান প্রত্যাখ্যান করেছে। কুরআন পাকে তাদেরকে লক্ষ করে বলা হয়েছে–

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ بِمَا لَا تَهْوٰى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ

অর্থ. তবে কি যখনই আসবেন কোনো রাসূল তোমাদের নিকট এমন বিষয় নিয়ে যা তোমাদের মন চাইবে না, তোমরা অহংকার করবে?[১৮৯]

---

১৮৮. সূরা বাকারা, আয়াত নং ৯৩

১৮৯. সূরা বাকারা, আয়াত নং ৮৭

তৃতীয় পরিণতি ঃ নফসের ইসলাহ ও আত্মশুদ্ধি না হওয়ার কারণে তাদের এমন এক অবস্থা হয়েছে যে, তাদের বুঝ-বুদ্ধিই উল্টো হয়ে গেছে। তারা সত্যকে মিথ্যা মনে করে প্রত্যাখ্যান করতে এবং মিথ্যাকে সত্য মনে করে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এর শাস্তিস্বরূপ আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুদরতের নিদর্শনসমূহ দেখার তাওফীক থেকে তাদেরকে দূরে রেখেছেন এবং সত্যগ্রহণ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত রেখেছেন। কুরআন পাকে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِيْنَ يَتَكَبَّرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.

অর্থ. আমি এমন লোকদেরকে আমার নির্দেশাবলি থেকে বিমুখই রাখব যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে অহংকার করে। তারা যদি সমস্ত নিদর্শনও দেখে নেয়, তবু তারা সেগুলোর প্রতি ঈমান আনবে না। যদি হেদায়েতের পথ দেখতেও পায়, তবু তাকে নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করবে না। আর যদি গোমরাহীর পথ দেখতে পায়, তবে তাকে নিজেদের পথরূপে গ্রহণ করে। তা এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং সেগুলো থেকে উদাসীন থেকেছে।[১৯০]

চতুর্থ পরিণতি ঃ যখন তাদের মধ্যে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার যোগ্যতা থাকল না, তখন আল্লাহর আয়াতসমূহ স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করতে তারা দ্বিধা করল না। নির্বুদ্ধিতা, বোকামি, উদাসীনতা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি স্বভাবগুলো বিবেক, নির্ভুল চিন্তা ও সঠিক সিদ্ধান্ত ইত্যাদির স্থলবর্তী হয়েছে। কুরআন পাক তাদের বিবরণ তুলে ধরেছে এই ভাষায়–

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ.

অর্থ. তা এ কারণে যে, তারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছে এবং সেগুলো থেকে উদাসীন রয়েছে।[১৯১]

---

১৯০. সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৪৬

১৯১. সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৪৬

এর থেকে জন্ম নিয়েছে পঞ্চম পরিণতি।

পঞ্চম পরিণতি ঃ তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ক্ষান্ত হয়নি। উপরন্তু সেগুলোকে বিকৃতি ও পরিবর্তন করারও দুঃসাহস করেছে। এই পরিণতি সম্পর্কে কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে–

يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهٖ وَنَسُوْا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوْا بِهٖ

অর্থ. তারা কালামকে [তাওরাত] পরিবর্তন করে দেয় তার স্থানসমূহ থেকে এবং যা কিছু নসীহত করা হয়েছে তারা তা থেকে এক বড় অংশকে হারিয়ে বসেছে।[১৯২]

ষষ্ঠ পরিণতি ঃ পূর্বের পরিণতি থেকে সৃষ্ট পরিণতি হলো তারা নবীগণকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করেই এবং তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই ক্ষান্ত হয়নি। নবীগণের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে শত্রুতামূলক আচরণ করাকেও তারা নিজেদের অন্যতম কাজ বানিয়েছে। তারা নবীগণকে হত্যা করারও স্পর্ধা দেখিয়েছে। কালাম পাকে ইরশাদ হয়েছে–

فَفَرِيْقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ.

অর্থ. ফলে একদলকে মিথ্যুক প্রতিপন্ন করেছ, আর একদলকে হত্যা করছ।[১৯৩]

সপ্তম পরিণতি ঃ হৃদয়ের নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তা ঃ

মোটকথা, আল্লাহর কিতাব ও সত্য বিধান থেকে এই বিমুখতা, তারপর কুপ্রবৃত্তি থেকে জন্ম নেয়া অহংকার, তারপর মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ, তারপর বিকৃতকরণ, তারপর স্পষ্ট অস্বীকৃতি, তারপর সত্যের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা, তারপর নিষ্ঠুরতা ও নবীহত্যার মত দুঃসাহস– এ সবই ছিল আত্মমুগ্ধতা, বড়াই ও অহংকারের ফলাফল, যে অহংকার তাদের মনে শিকড় গেড়ে বসেছে শিক্ষক থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিণতিতে, তাই তারা তরবিয়ত ও দীক্ষাহীন অবস্থায় বেড়ে উঠেছে। ফলে তাদের হৃদয়ে নম্রতা, নমনীয়তা ও কোমলতা বলতে কিছু ছিল না, যা কাউকে সত্যগ্রহণ, আনুগত্য, বশ্যতা ও বিনয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। কুরআন পাক

---

১৯২. সূরা মায়িদা, আয়াত নং ১৩

১৯৩. সূরা বাকারা, আয়াত নং ৮৭

একে তাদের 'হৃদয়ের নির্দয়তা' বলে ব্যক্ত করেছে। ইরশাদ হয়েছে–

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوْبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً

অর্থ. এমন ঘটনার পর তোমাদের হৃদয় তবু শক্তই রয়ে গেল। সেগুলো পাথরের মতো বা আরও বেশি কঠিন।[১৯৪]

অষ্টম পরিণতি ঃ আমরা যদি উপদেশগ্রহণের উদ্দেশ্যে তাকাই, তাহলে লক্ষ করব, এগুলো আল্লাহর কিতাব থেকে ইহুদীদের বিমুখ থাকারই পরিণতি। তবে পরিণতিগুলো প্রকাশ পেয়েছে শিক্ষকদের ব্যক্তিত্ব থেকে তাদের বিমুখ থাকা ও তাঁদের শিক্ষাদীক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকার ফলে। বিষয়টা তাদেরকে ধর্মের সকল বরকত থেকে রিক্তহস্ত করে ছেড়েছে এবং প্রজন্ম পরম্পরায় তাদেরকে লাঞ্ছনা, অবমাননা ও আল্লাহর ক্রোধের পাত্রে পরিণত করেছে। এটা হলো তাদের অষ্টম পরিণতি যা দুনিয়া থেকে আখেরাত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ

অর্থ. আর স্থায়ী হলো তাদের উপর লাঞ্ছনা ও অধঃপতন, আর যোগ্য হয়ে পড়ল তারা আল্লাহর গযবের।[১৯৫]

[হযরত কারী মুহাম্মদ তাইয়েব রহ.-এর আলোচনা শেষ হলো।]

২১১ নং পৃষ্ঠার টীকা

সূরা তাওবা, আয়াত ১১৯। মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী দা. বা. বলেছেন, আমার সম্মানিত পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. বলেছেন– মিয়া! মানুষ বলে, বর্তমানে 'সত্যবাদী' কোথায় তালাশ করব? সব জায়গায় ধোঁকা আর প্রতারণা চলছে। আসল কথা হলো, এ যুগটি নকলের মিশেলের যুগ। সব জিনিসের মধ্যেই ভেজাল। ঘিতে ভেজাল, চিনিতে ভেজাল, আটায় ভেজাল, দুনিয়ার সব জিনিসের মধ্যে ভেজাল। এমনকি বলা হয়, বিষেও ভেজাল। কেউ একটা খোশগল্প শোনাল যে, এক ব্যক্তি সব জিনিসের মধ্যে ভেজাল দেখে বলল

---

১৯৪. সূরা বাকারা, আয়াত নং ৭৪

১৯৫. সূরা বাকারা, আয়াত নং ৬১

যে, কোনো কিছুই তো খাঁটি পাওয়া যায় না। অপারগ হয়ে সে চিন্তা করল যে, আত্মহত্যা করবে। এ দুনিয়াতে বেঁচে থাকা অনর্থক। যেখানে কোনো জিনিস খাঁটি পাওয়া যায় না। না আটা খাঁটি, না চিনি, না ঘি, কিছুই খাঁটি নেই। তাই চিন্তা করল যে, আত্মহত্যা করা উচিত এবং দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া বাঞ্ছনীয়। তখন সে বাজার থেকে বিষ ক্রয় করে বিষ পান করল। বিষ পান করে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে যে, একটু পরেই হয়ত মৃত্যু চলে আসবে। কিন্তু মৃত্যু আসেনি। পরে জানতে পারল, বিষও খাঁটি ছিল না।

বুঝা গেল, দুনিয়ার কোনো জিনিস খাঁটি নয়। ভেজালমুক্ত নয়। প্রত্যেক বস্তুতে ভেজাল। আমার পিতা বলেন, সব জিনিসই ভেজালযুক্ত। তাহলে কি আটায় ভেজাল থাকার কারণে কেউ এ কথা বলে আটা খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে যে, ভাই! খাঁটি আটা পাওয়া যায় না। তাই চলো আজ থেকে আটা খাওয়া বন্ধ করে দেই। এখন থেকে ভূসি খাব। অনুরূপভাবে ঘি খাঁটি পাওয়া যায় না। তাই চলো আজ থেকে ঘি খাওয়া বন্ধ করে দেই। ঘি-এর পরিবর্তে কেরোসিন ব্যবহার করব। নকলের সংমিশ্রণ থাকা সত্ত্বেও কেউ আটা খাওয়া ছাড়েনি, ঘি খাওয়াও ছাড়েনি। বরং খোঁজ নিতে থাকে যে, কোন্ এলাকায় ভাল ঘি পাওয়া যায়, কোন দোকানে ভাল আটা পাওয়া যায়। লোক পাঠিয়ে সেখান থেকে কিনে নিয়ে আসে। মিষ্টি কোন দোকানী ভাল তৈরি করেন। সেখানে গিয়ে খোঁজ নিয়ে ভালটা বের করে নিয়ে আসে এবং তা আহার করে।

তিনি বলেন, নিঃসন্দেহে আটা, ঘি, চিনি কোনোটাই ভেজালমুক্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু তালাশকারী আজও পাওয়া যায়। এমনিভাবে মৌলভী খাঁটি পাওয়া যায় না। কিন্তু তালাশকারী আজও আছে। যদি কোনো বান্দা তালাশ করতে থাকে, অনুসন্ধান চালিয়ে যায়, তাহলে আজও ভাল আল্লাহওয়ালা পাবে। এ কথা বলা শয়তানের ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, বর্তমান যুগে 'সত্যবাদী' নেই। আরে ভাই! যখন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, "তোমরা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক", এ আদেশ কি তাহলে শুধু সাহাবীদের যুগের সাথে নির্দিষ্ট ছিল যে, সাহাবীগণই এর উপর আমল করতে পারবেন; বিংশ শতাব্দীর মানুষ এ আয়াতের উপর আমল করতে পারবে না?

বাহ্যত কুরআন পাকের প্রতিটি আদেশের উপর কেয়ামত পর্যন্ত, যতদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে মুসলমান থাকবে, আমল চলতে থাকবে। তাহলে এই অর্থ বের করে নিতে হবে যে, 'সত্যবাদী' এখনও বিদ্যমান আছেন। হ্যাঁ, তালাশ করতে হবে।

এমনটি নয় যে, আল্লাহওয়ালা পাওয়া যায় না। তাই বসে থাকলাম। খোঁজা নেবে ও অনুসন্ধান চালিয়ে যাবে, পেয়ে যাবে।

আব্বাজান রহ. বলতেন, বর্তমানে মানুষের অবস্থা হলো– নিজের অবস্থা যাই হোক অন্যায়, অপরাধ, কবীরা গুনাহ ও অশ্লীল কাজে লিপ্ত রয়েছে, কিন্তু নিজের জন্য যখন 'সত্যবাদী' তালাশ করবে, তখন মাপকাঠি স্থির করবে জুনায়েদ বাগদাদীর, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানীর ও বায়েজীদ বোস্তামীর মত বড় বড় ওলী-আউলিয়াগণকে। যাদের নাম শুনেছে এবং বলে যে, হযরত! আমার সংশোধনের জন্য তো তাঁদের মতো এমন একজন 'সত্যবাদী' দরকার যিনি জুনায়েদ বাগদাদী ছিলেন, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী ছিলেন। অথচ মূলনীতি হলো, "যেমন রূহ তেমন ফেরেশতা"। তুমি যে স্তরের হবে, তোমার সংশোধনকারীও ঐ স্তরেরই। তুমি যে স্তরের তোমার জন্য এমন লোকই যথেষ্ট। জুনায়েদ, শিবলী বা এ ধরনের 'সত্যবাদী' যদি না পাওয়া যায়, তাহলে তোমার জন্য এঁরাই যথেষ্ট [যারা জুনায়েদ বাগদাদী ও শিবলীর মতো নন]।

বরং আমার মরহুম পিতা [আল্লাহ তা'আলা তাঁর কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন] বলতেন, আমি শপথ করে বলতে পারি যে, যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার তালাশে নিজ মসজিদের অশিক্ষিত মুয়াজ্জিনের সংশ্রবে গিয়ে বসে যায়, তাহলে তাঁর সংশ্রব দ্বারাও তাঁর উপকার হবে। এ কারণে যে, ঐ মুয়াজ্জিন কমপক্ষে দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ তা'আলার নাম উঁচু আওয়াজে ঘোষণা করে। তাঁর সংশ্রবে গিয়ে বসো, তাহলেও তোমার লাভ হবে।

এটাই শয়তানের ধোঁকা যে, আমার তো সেই স্তরের বুযুর্গ ও ওই স্তরের সংশোধনকারী দরকার। এটা মানুষকে ধোঁকা দেয়ার একটি পথ। বাস্তবে তোমার নিজের সংশোধনের জন্য তোমার স্তরের সংশোধনকারী আজও বিদ্যমান আছেন। ['ইসলামী জীবনব্যবস্থা' ১ ঃ ৭৮ - ৮০]

শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা দা. বা.-এর আলোচনা

পূর্বেই বলা হয়েছে, শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা দা. বা.-এর আলোচনাটি আমি অনুবাদ করেছি তাঁর রচিত أَدَبُ الاختلافِ في مسائلِ العلمِ والدِّينِ কিতাব থেকে। উক্ত কিতাবে আলোচনাটি এসেছে مَنْهَجُهُمْ في التعلُّمِ [সালাফের শিক্ষাগ্রহণের পদ্ধতি][১৯৬] শিরোনামের অধীনে। তিনি লিখেছেন–

ইলম হাসিল করার ক্ষেত্রে সালাফের[১৯৭] অনুসৃত পদ্ধতি প্রসঙ্গে ইমাম শাফেয়ী [১৫০ - ২০৪হি.]-এর দিকে সম্বন্ধকৃত দু'টি কবিতা-পঙ্‌ক্তি রয়েছে। পঙ্‌ক্তিদু'টি মূলত ইমামুল হারামাইন জুওয়াইনী শাফেয়ী [৪১৯ - ৪৭৮ হি.] রহ.-এর।[১৯৮] তিনি বলেছেন–

أَخِيْ لَنْ تَنَالَ العِلْمَ إلا بِسِتَّةٍ سَأُنْبِيْكَ عَنْ تفصيلِها بِبَيَانِ

ذَكَاءٍ، وَحِرْصٍ، وَافْتِقَارٍ وَغُرْبَةٍ وَتَلْقِيْنِ أُسْتَاذٍ وَطُوْلِ زَمَانِ

অর্থাৎ ছয়টি গুণ ছাড়া কখনো ইলম অর্জন করা সম্ভব নয়– মেধা, আগ্রহ, মুখাপেক্ষিতা, প্রবাসজীবন, উস্তাদের শিক্ষাদান ও সুদীর্ঘ সময়।

---

[১৯৬]. শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা দা. বা. তাঁর উক্ত কিতাবে আলোচ্য আলোচনার পর مَنْهَجُهُمْ في العَمَلِ ও مَنْهَجُهُمْ في التعليمِ শিরোনামদ্বয়ে সালাফের শিক্ষাপ্রদান ও আমল করার পদ্ধতি বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন। উক্ত আলোচনাদুটিও গুরুত্বের সাথে পড়া এবং আমলে আনা দরকার। তাহলে দুঃখজনকভাবে বিশেষত ইসলামী শিক্ষাঙ্গনে বর্তমানে যে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি বিরাজমান আছে, তা থেকে সংশ্লিষ্টগণ মুক্তি লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন!

[১৯৭]. অর্থাৎ পূর্বসূরী নির্ভরযোগ্য আলেমগণের।

[১৯৮] أسندهما إليه الحافظ ابن النجار رحمه الله في «ذيل تاريخ بغداد» ١ : ٨٩، مع مغايرة يسيرة، وبمثل لفظ ابن النجار ذَكَرَهما السُّبْكِيُّ في «طَبَقاته» ٥ : ٢٠٨

উল্লেখিত শর্তগুলোর মধ্যে 'উস্তাদ থেকে গ্রহণ' ও 'সুদীর্ঘ সময় ব্যয়' হলো এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয়।

উস্তাদ থেকে শিক্ষাগ্রহণ দ্বারা শিক্ষার্থী দু'টো কল্যাণ লাভ করে–

১. স্বচ্ছ ও সুনিশ্চিত ইলম।

২. আলেম ও জ্ঞানীগুণীদের সঙ্গে আচার-আচরণের আদব।

কারণ, উস্তাদ থেকে শিক্ষাগ্রহণ করলে শিক্ষার্থী অবশ্যই উস্তাদের সঙ্গে আদব রক্ষা করে চলবে। তাঁর থেকে জানবে আলেমদের মর্যাদা এবং জানবে কীভাবে তাঁদের সঙ্গে আদব বজায় রাখার ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা যায়। শিক্ষার্থী যখন তার উস্তাদের সঙ্গে আদব রক্ষা করবে, তখন স্বভাবতই উস্তাদের উস্তাদের সঙ্গে এবং তাঁদের পূর্ববর্তীদের সঙ্গে এবং তাঁদের পূর্ববর্তীদের সঙ্গে অধিক আদব রক্ষা করবে। কারণ সে তাদেরই ইলম ও আদবের উত্তরসূরী হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর জন্য উস্তাদগণ হলেন তার পিতা ও পূর্বপুরুষ। যে ব্যক্তির কোনো উস্তাদ নেই, সে যদি ইলমের দাবি করে এবং কোনো ইলমী বিষয়ে কথা বলে, তাহলে সে বংশ-পরিচয়হীন এবং ইলমের এক মিথ্যা দাবিদার।

ইমাম নববী রহ. تهذيبُ الأسماءِ واللُّغاتِ কিতাবের ভূমিকায়[১৯৯] আলেমদের জীবনী-গ্রন্থের গুরুত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন– 'তাঁরা আমাদের ইমাম ও পূর্বসূরী। তাঁরা আমাদের পিতামাতার মতো।'

তিনি উক্ত কিতাবে[২০০] মুসলিম বিন খালেদ আয্যানজী রহ.-এর জীবনীতে লিখেছেন– 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত ফিকহের সনদে মুসলিম রহ. আমাদের পিতামহদের একজন।'

তিনি তাঁর অপর মৌলিক ও সমৃদ্ধ গ্রন্থ المَجمُوع কিতাবে[২০১] ইমাম আবুল আব্বাস বিন সুরাইজ রহ.-এর জীবনীতে লিখেছেন– 'তিনি ফিকহের সনদে আমাদের একজন পিতামহ।'

---

১৯৯. ১ ঃ ১১

২০০. ৩ ঃ ৯৩

২০১. ১ ঃ ২১৪

যার উস্তাদ থাকত না, পূর্বসূরী আলেমগণ তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না; তাকে গুরুত্ব দিতেন না এবং তার সঙ্গে কথা বলার জন্য তাকে যোগ্য মনে করতেন না। কারণ সে বাচাল ও ভুল পথের পথিক।

কাযী ইয়ায রহ.-এর "الإلماع" ও তাঁর শাগরিদ ইবনে বাশকুয়াল রহ.-এর "الصلة"[২০২] কিতাবে আছে, ইমাম আহমদ রহ. বলেছেন, 'যারা حَدَّثَنَا ও أَخْبَرَنَا বলেন, তাঁরাই মানুষ। অন্যদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই।' একবার খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহ ইমাম আহমদকে বললেন, ইবনে আবী দু'আদের সঙ্গে কথা বলুন। ইমাম আহমদ তখন তার থেকে চেহারা ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, 'যাকে কোনো দিন কোনো আলেমের দরজায় দেখিনি, তার সঙ্গে কি করে কথা বলব?'

কাযী ইয়ায রহ. ترتيب المدارك কিতাবে[২০৪] আবু জা'ফর আদ্দাউদী আলআসাদী [মৃ ৪০২ হি.]-এর জীবনীতে লিখেছেন, আবু জা'ফরের সমকালীন 'কায়রোয়ান' শহরের আলেমগণ বনী উবায়দদের দেশে বসবাস করতেন। আমার নিকট এই মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আবু জা'ফর তা অপছন্দ করতেন। তাই তিনি এ বিষয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখেন। তাঁরা উত্তরে লিখেন– 'চুপ করো, তোমার কোনো উস্তাদ নেই।' তাঁদের এ উত্তর দেয়ার কারণ হলো, আবু জা'ফর পড়াশোনা নিজে নিজে করেছেন, তার অধিকাংশ পড়াশোনা কোনো প্রসিদ্ধ ইমামের নিকট হয়নি। তিনি যে মত গ্রহণ করেছেন, তা ছিল তার ব্যক্তিগত বুঝনির্ভর। তার যদি কোনো উস্তাদ থাকত যিনি তাকে যথাযথ ফিক্হ শেখাবেন, তাহলে তিনি বুঝতে পারতেন যে, বনী উবায়দদের দেশে আলেমদের অবস্থান করাটা ছিল ইসলামের উপর সেখানকার সাধারণ মুসলমানদের স্থির থাকার সহায়ক।

উপরিউক্ত উত্তরের মূল ভাবটি পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল আলেমের অন্তরে বিদ্যমান ছিল। ইমাম আবু হানিফা রহ. ছিলেন তাঁদের অন্যতম। খতীব

---

২০২. পৃ. ২৮
২০৩. ১ ঃ ২৫৫
২০৪. ৪ ঃ ৬২৩

বাগদাদী রহ. الفقيه والمتفقه কিতাবে[২০৫] লিখেছেন, ইমাম আবু হানীফা রহ. কে বলা হলো, মসজিদে কিছু লোক ফিক্হ চর্চা করছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাদের কোনো উস্তাদ আছে?' বলা হলো, না। তিনি বললেন, 'তাহলে এরা কখনো ফকীহ হতে পারবে না।'

আল্লামা সুয়ূতী রহ.-এর إسعاف المبطأ কিতাবে[২০৬] আছে, ইসহাক বিন মুহাম্মদ আলফার্বী রহ. বলেছেন, ইমাম মালেক রহ.কে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে ব্যক্তি কোনো আলেমের নিকট শিখেনি এবং কোনো আলেমের সাহচর্য গ্রহণ করেনি, তার থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবে কি-না? তিনি বলেছেন, না। জিজ্ঞাসা করা হলো, যে ব্যক্তি ব্যক্তিগতভাবে ভালো, তবে তিনি স্মরণ রাখতে পারেন না এবং বোঝেন না, তার থেকে ইলম গ্রহণ করা যাবে কি-না? তিনি বলেছেন, ইলম শুধু এমন ব্যক্তি থেকেই গ্রহণ করা যাবে, যে তা স্মরণ রাখতে পারে এবং সে এমন হয় যে, আলেমদের সাহচর্য গ্রহণ করে ইলম শিখেছে, বুঝেছে, আমল করেছে এবং সে মুত্তাকী। এ কারণেই যারা আলেমদের সাহচর্য গ্রহণ না করে শুধু কিতাব পড়ে ইলম অর্জন করে, তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করে।

ইবনে হাজার মক্কী রহ.-এর الفتاوى الحديثية কিতাবে[২০৭] আছে, ইমাম নববী রহ. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উদাহরণস্বরূপ দশটি কিতাবে কোনো মাসআলা দেখল, তার জন্য উক্ত বিষয়ে ফতোয়া দেয়া জায়েজ হবে না। কারণ, হতে পারে উক্ত কিতাবগুলোর বক্তব্য কোনো অনির্ভরযোগ্য উক্তির উপর ভিত্তি করে অথবা কোনো অনির্ভরযোগ্য সনদের উপর ভিত্তি করে লেখা হয়েছে।'

এর দ্বারা পাঠক ঐ ব্যক্তির অবস্থান আন্দাজ করতে পারেন, যে এই বলে গর্ব করে যে, তার উস্তাদ মাত্র একজন। তা-ও এই অর্থে যে, উক্ত উস্তাদ তাকে হাদীস বর্ণনার অনুমতি দিয়েছেন। এ অর্থে নয় যে, সে উক্ত উস্তাদ থেকে হাদীস গ্রহণ করেছে! সে-ই ঐ ব্যক্তি, যে ইলমের তালেব ও যুব

---

২০৫. ২ঃ ৮৩
২০৬. পৃ. ১৮০
২০৭. পৃ. ২৭

সমাজকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে।। তারপর কুরআন-হাদীসের উপর আমল করার এবং সহীহ হাদীস থেকে যয়ীফ হাদীস পৃথক করার বাহানায় হাদীসের কিতাবগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে।।।[২০৮]

কোনো কোনো ইমাম তো কিতাবে ইলম সংকলিত হওয়ার কারণে আক্ষেপও করেছেন। কারণ তা উস্তাদ থেকে ইলম গ্রহণ করার ধারাবাহিকতাকে দুর্বল করে দেয়ার কারণ হবে। সুনানে দারেমীর মুকাদ্দিমায়[২০৯] এবং ইমাম বায়হাকী রহ.-এর اَلْمَدْخَل কিতাবে[২১০] আওযায়ী রহ. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ইলম দুর্লভ ছিল। লোকেরা তা উস্তাদ থেকে শিখত। তারপর একসময় তা কিতাবে সংকলিত হল। তখন অনুপযুক্ত লোকেরা [অর্থাৎ যারা উস্তাদ থেকে ইলম শিখেনি] তাতে অনুপ্রবেশ করল।

উস্তাদ থেকে ইলম গ্রহণ করার পাশাপাশি প্রচণ্ড মনোযোগ, তীব্র ব্যাকুলতা ও আগে আগে থাকার মানসিকতাও থাকতে হবে। কখনো এই গুণগুলোকে اَلْمُزَاحَمَةُ بِالرُّكَبِ [হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগিয়ে বসা] বলেও ব্যক্ত করা হয়।

ইবনে আব্দুল বার রহ.-এর جَامِعُ بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ কিতাবে[২১১] আছে- ইমাম মালেক, সুলাইমান তাইমী ও সুলাইমান বিন হাবীব আলমুহারিবী রহ. নকল করেছেন, হযরত লোকমান হাকীম রহ. নিজ পুত্রকে এই অসিয়ত

---

২০৮. এখানে শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা اَلسِّلْسِلَةُ الضَّعِيْفَةُ ও اَلسِّلْسِلَةُ الصَّحِيْحَةُ-এর লেখকের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তিনি সুনানে নাসাঈ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে صحيح النسائي، ضعيف النسائي، صحيح أبي داود، ضعيف أبي داود، صحيح الترمذي، ضعيف الترمذي، صحيح ابن ماجة، ضعيف ابن ماجة জন্ম দিয়েছেন। 'হযরত' হাদীসের আরও কয়েকটি কিতাবের এই দশা করেছেন।

২০৯. ১ ঃ ১৩২৬

২১০. পৃ. ৪১০

২১১. ১ ঃ ১০৬

করেছেন– হে প্রিয় পুত্র! আলেমদের সাহচর্য গ্রহণ করো এবং তাঁদের হাঁটুর সঙ্গে হাঁটু লাগিয়ে বসো, কারণ আল্লাহ তা'আলা হেকমত দ্বারা অন্তর জীবিত করেন, যেমন আকাশের বৃষ্টি দ্বারা নির্জীব ভূমিকে সজীব করেন।

[তারপর শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা মুদ্দাজিলুহু 'দরসে আগে আগে উপস্থিত হওয়ার মানসিকতা ও উস্তাদের কাছাকাছি বসা' বিষয়ে ইমাম আবু আলী কালী রহ.-এর ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা আমি এ পুস্তকের ১৬৬ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছি।]

ইমাম আবু আলী আলকালী রহ.-এর শিষ্য আবু নাস্‌র হারুন বিন মূসা বিন জানদাল আন্‌নাহ্‌বী রহ. বলেছেন, আমি আমার উস্তাদ আবু আলী আলকালীর নিকট নিয়মিত আসা-যাওয়া করতাম। তিনি মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিনি।

এভাবে তিনি যখন উপযুক্ত হলেন, তখন তাঁর উস্তাদগণ তাঁকে পাঠদান, লেখালেখি, ফতোয়াদান প্রভৃতি কাজের অনুমতি প্রদান করলেন। তাঁর বয়স ও বিদ্যা যতই বাড়তে থাকল, উস্তাদগণের সাহচর্য ও তাঁদের থেকে উপকৃত হওয়ার পরিমাণও তাঁর ততই বাড়তে থাকল। শুরুতে উল্লেখিত ইমামুল হারামাইনের কবিতা-পঙ্‌ক্তিতে طُوْلِ زَمَانٍ [সুদীর্ঘ সময়]-এর যে শর্ত বলা হয়েছে, তার দ্বারা উস্তাদের এই দীর্ঘ সাহচর্য ও দীর্ঘ শিক্ষাজীবন এবং অব্যাহত সাহচর্য ও শিক্ষাগ্রহণই উদ্দেশ্য।

এই ইলমী স্বভাবটি আমাদের হানাফী ফকীহদের উল্লেখ করা ফিক্‌হের একটি হুকুমের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে। الدُّرُّ الْمُخْتَارُ কিতাবে আছে–[২১২]

أَفْضَلُ المساجِدِ مكة، ثم المدينة، ثم القُدْس، ثم قباء، ثم الأَقْدَم، ثم الأَعْظَم، ثم الأَقْرَب، ومسجدُ أستاذه لِدَرْسِه أو لِسَمَاعِ الأخبارِ أَفْضَلُ اتِّفَاقًا.

অর্থাৎ সর্বোত্তম মসজিদ হলো মসজিদে হারাম, তারপর মসজিদে নববী, তারপর বাইতুল মুকাদ্দাস, তারপর প্রাচীনতম মসজিদ, তারপর বৃহত্তম মসজিদ, তারপর নিকটতর। আর পাঠ গ্রহণ বা উপদেশ শ্রবণের উদ্দেশ্যে উস্তাদের মসজিদে নামায পড়া প্রাচীনতম মসজিদ, বৃহত্তম মসজিদ ও

---

২১২. হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীনসহ সংস্করণে ১ঃ৪৪৩

নিকটতর মসজিদে নামায পড়া থেকে সর্বসম্মতিক্রমে উত্তম। কারণ, উস্তাদ কখনো এমন কোনো কথা বলেন, শ্রেণিকক্ষে যা বলার উপলক্ষ থাকে না। এমনটি অনেক হয়ে থাকে। আর এ ধরনের ইলমী বিষয় এমন ছাত্রই অনুভব করতে পারবে, যে উস্তাদের সাহচর্য গ্রহণে অভ্যস্ত।

আমার নিজের এমন একটি ঘটনা হলো, আমি একবার মদীনা মুনাওয়ারার কুবা মসজিদে তারাবীর নামাযে আমার মহান উস্তাদ আল্লামা শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর সঙ্গে ছিলাম। নামাযের ইকামতের অপেক্ষার সময়টি আমি শায়খের সঙ্গে ফকীহ্গণের এই উক্তিটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম- مَذْهَبُنَا صَوَابٌ يَحْتَمِلُ الخَطَأَ، وَمَذْهَبُ غَيْرِنَا خَطَأٌ يَحْتَمِلُ الصَّوَابَ- তখন শায়খ আমাকে সতর্ক করে বললেন, এ ক্ষেত্রে উত্তম হলো এই বলা- مَذْهَبُنَا صَوَابٌ وَيَحْتَمِلُ الخَطَأَ، وَمَذْهَبُ غَيْرِنَا خَطَأٌ وَيَحْتَمِلُ الصَّوَابَ- শায়খের এই সতর্কীকরণের কারণে আমি আনন্দিত হলাম এবং বারবার শায়েখের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম। তখন শায়েখ আমাকে বললেন, এ কারণেই ফকীহগণ وَمَسْجِدُ أُسْتَاذِهِ বলেছেন।[২১৩]

হযরত ইবনে আব্বাস রা. আদব রক্ষা করে পূর্ণ সাহচর্য গ্রহণের অন্যতম আদর্শ ছিলেন। যে সাহাবী থেকে তিনি কোনো বিষয় শোনতে চাইতেন,

---

২১৩. শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা أَدَبُ الاختلافِ فِي مَسَائِلِ العِلْمِ وَالدِّيْنِ কিতাবেই ১৪৪ নং পৃষ্ঠার টীকায় يَحتمل-এর পূর্বে و বৃদ্ধি করা উত্তম হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন এই ভাষায়-

إذ إن العبارة بِدُونها تُفيد التسويةَ بَيْنَ صواب المذهب واحتمالِ خَطَئِه، وكذلك في الحكم على مذاهب الآخِرين بالخطأ واحتمالِ صوابها، مع أنه لا بد من الترجيح في نفس المجتهد للمذهب الذي اختاره، ولولا هذا الترجيح لما اختار ما اختار، وتَرْكُه للمذهب الآخَر يجعله مرجوحا، واحتمالُ الصواب فيه : ضعيفٌ خفيف لا يصح معه أن يتساوَيا في الحكم عليه بالخطأ واحتمالِ الصواب. (فؤاد)

সেই সাহাবীর দরজায় বসে থাকতেন। তিনি বের হলে তাঁর সঙ্গে চলতেন এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা করতেন। তিনি যার নিকট শেখার জন্য যেতেন তাঁর দরজার কড়া নাড়তেন না, এই আশঙ্কায় যে, হয়ত তিনি তখন আরাম করছেন বা বিশেষ কোনো প্রয়োজনে আছেন।

ইমাম মালেক রহ.-এর সবচে' বড় শিষ্য ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত ইমাম আব্দুর রহমান ইবনুল কাসেম আল'উতাকী রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর এ আদবটি অনুসরণ করে চলতেন। ترتيب المدارك কিতাবে[২১৪] তাঁর জীবনীতে আছে, তিনি বলেছেন, আমি শেষ রাতের অন্ধকারের সময় ইমাম মালেকের নিকট উপস্থিত হতাম এবং তাঁকে দু'টো বা তিনটে বা চারটে মাসআলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম। আমি সেসময় তাঁর মনের প্রফুল্লতা অনুভব করতাম। তাই আমি প্রতিদিন তখন তাঁর নিকট যেতাম। একদিন তাঁর ঘরের চৌকাঠে মাথা রেখে শুইলাম। চোখে ঘুম এসে গেল। ইমাম মালেক ঘর থেকে মসজিদে বের হলেন। আমি টের পেলাম না। তখন তাঁর এক কালো দাসী আমাকে পায়ে লাথি মেরে বলল, তোমার মনিব বের হয়ে গেছেন, তিনি তোমার মতো উদাসীন নন। এখন তাঁর বয়স ঊনচল্লিশ বছর। তিনি ইশার অযু দিয়েই ফজর নামায পড়ে আসছেন।

ইবনুল কাসেম বহ. ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট অধিক পরিমাণে যাওয়া-আসার কারণে দাসী তাকে তাঁর দাস মনে করেছিল। তাছাড়া এভাবে রাতে কারো দরজায় বসে থাকা দাসদেরই নিয়ম ছিল।

এক বা দু'বছর কোনো উস্তাদ থেকে ইলম অর্জন করে নিজকে স্বনির্ভর মনে করা এবং শুধু কিতাব থেকে শিখতে থাকা যেমনটা আমাদের যুগের লোকদের অবস্থা, তো এ পদ্ধতি কখনও কোনো উপকার বয়ে আনেনি এবং আনবেও না। একটি আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই নিন্দনীয় অবস্থাটাই কারো

---

২১৪. ২ ঃ ৪৩৮

কারো নিকট গর্বের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[২১৫]

ইবনে আব্দুল বার রহ. جَامِعُ بَيَانِ العِلْمِ وَفَضْلِهِ কিতাবে[২১৬] 'হাকীমুল উম্মাহ' হযরত আবুদ্ দারদা রা. থেকে নকল করেছেন, তিনি বলেছেন, 'একজন ব্যক্তির বুঝ ও বুদ্ধির নিদর্শন হলো আলেমদের সঙ্গে সে হাঁটা-চলা করে, কোথাও প্রবেশ করলে তাঁদের সঙ্গে প্রবেশ করে এবং কোথাও বের হলে তাঁদের সঙ্গে বের হয়।'

পূর্বসূরী মনীষীগণের একটি বিশেষ উপদেশ হলো, 'তুমি যেখানেই থাক কোনো ফকীহের নিকটে থাকো।'

এ উপদেশসংশ্লিষ্ট একটি ঘটনা আছে। ঘটনাটি এখানে উল্লেখ করা উপকারী হবে, যদিও তা আমাদের মূল বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। ইবনে আবী খাইসামা রহ.-এর التَارِيخُ الكَبِيرُ কিতাবে আছে[২১৭], আব্দুল্লাহ বিন আবু মুসা তুস্তারী রহ. বলেছেন, আমাকে বলা হলো, 'তুমি যেখানেই থাক কোনো ফকীহের নিকটে থাকো।' আমি বৈরুতে আওযায়ী রহ.-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে আমার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করলেন। আমার পিতা জীবিত আছেন কি-না, তা-ও জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম, হাঁ, তিনি জীবিত আছেন। তিনি ইরাকে আছেন। তিনি অগ্নিপূজক। আওযায়ী রহ. বললেন, তুমি কি তোমার পিতার নিকট ফিরে যাবে? হয়ত আল্লাহ তাকে তোমার হাতে হেদায়েত দান করবেন। আমি বললাম, আপনার মত কি তা-ই? তিনি হাঁ বললেন। তারপর আমি পিতার নিকট গেলাম। তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, হে প্রিয় পুত্র!

---

[২১৫]. كما تجده في ترجمة بعضهم للإمام ابن عبد الهادي صاحب «مختصَر طبَقات علماء الحديث»، وكما تجده في ترجمة الشيخ عبد القادر بدران التي أَفرَدها فيه بعضُ مَنْ لم يَذُق حلاوة الصُّحْبة والتلقي.

[২১৬]. ১ঃ১২৭

[২১৭]. مِنَ القطعة المخطوطة المحفوظة في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ورقة ١٧/آ. وذكرتُ هذه القصة أيضا في كتابي «المُختَار من فرائد النُّقُول» القسم الأول ص ٥٤.

তুমি কোন্ ধর্মের উপর আছো? আমি বললাম, আমি ইসলাম ধর্মের উপর আছি। তিনি বললেন, আমার সামনে ইসলাম পেশ করো। আমি তাঁকে ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে অবগত করলাম। তিনি বললেন, আমি তোমাকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি মুসলমান হয়ে গেলাম। পিতা তাঁর সেই অসুস্থতায় মৃত্যুবরণ করলেন। আমি তাঁকে দাফন করে আওযায়ীর নিকট ফিরে আসলাম এবং তাঁকে বিষয়টি অবগত করলাম।

লক্ষ করেছো? কোনো আলেমের নিকটবর্তী থাকার উপকারিতা কী হয়েছে!

ইবনে হিব্বান রহ. তাঁর الثِّقَات কিতাবে[২১৮] নির্ভরযোগ্য তাবেয়ী নু'আইম বিন আব্দুল্লাহ আলমুজ্‌মির রহ.-এর জীবনীতে উল্লেখ করেছেন, ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, নু'আইম আলমুজ্‌মির রহ. হযরত আবু হুরায়রা রা.-এর বিশ বছর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন।

অন্যতম নির্ভরযোগ্য হাফেজে হাদীস হামেদ বিন ইয়াহইয়া আলবালখী রহ.-এর জীবনীতে ইবনে হিব্বান রহ.[২১৯] লিখেছেন, তিনি তাঁর পুরো জীবন ইবনে 'উয়াইনা রহ.-এর সাহচর্যে কাটিয়েছেন।

السِّيَر[২২০]সহ বিভিন্ন কিতাবে মহান তাবেয়ী সাবেত আলবুনানী রহ.-এর জীবনীতে আছে, তিনি চল্লিশ বছর হযরত আনাস বিন মালেক রা.-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন।

আবু নু'আঈম রহ.-এর الحِلْيَة কিতাবে[২২১] আছে, ইমাম মালেক রহ. বলেছেন, শাগরিদ উস্তাদের সাহচর্যে ৩০ বছর আসা-যাওয়া করতেন এবং ইলম অর্জন করতেন। [শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা বলেন,] এ কথা বলে তিনি যেন নিজেকেই বুঝিয়েছেন।

আবু নু'আইম রহ. এ ঘটনার পর ইমাম মালেক রহ.-এর অন্যতম শাগরিদ নাফে' বিন আব্দুল্লাহ রহ.-এর এই উক্তি উল্লেখ করেছেন– আমি ইমাম

---

২১৮. ৫ঃ ৪৭৬
২১৯. ৮ ঃ ২১৮
২২০. ৫ ঃ ২২২
২২১. ৬ ঃ ৩২০

মালেক-এর ৪০ বা ৩৫ বছর সাহচর্য গ্রহণ করেছি। প্রতিদিন সকালে যেতাম, দুপুরে যেতাম এবং বিকালে যেতাম।

ইলম অর্জনের এই আদব পূর্ববর্তী আলেমগণের পর পরবর্তী আলেমগণের চিন্তা-চেতনায় মিশে গিয়েছিল। তাই তো আল্লামা ফকীহ ইবনে নুজাইম রহ. [মৃ.৯৭০হি.] বলেছেন[২২২]– এভাবে সাহচর্যগ্রহণ করে তাঁরা বুঝিয়েছেন যে, اَلْمُزَاحَمَةُ بِالرُّكَبِ [হাঁটুর সাথে হাঁটু লাগিয়ে বসা] ছাড়া ইলমের দাবি করা যায় না। অধিক পরিমাণে পুনরাবৃত্তি, গভীরভাবে নিরীক্ষণ ও উস্তাদ থেকে গ্রহণ করা না হলে ইলম হাসিল হয় না।

যে ব্যক্তি আলেমদের থেকে ইলম গ্রহণ করেনি, দীর্ঘ সময় তাঁদের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়নি এবং তাঁদের আদব ও আখলাকে সজ্জিত হয়নি, তার পক্ষে তাঁদের মর্যাদা অবগত হওয়া কি করে সম্ভব? এমন ব্যক্তির মুখ ও কলম যদি তাঁদের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য দেখায় এবং সে মতানৈক্যের আদব রক্ষা না করে, তাহলে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।[২২৩] যে ব্যক্তি আমলওয়ালা আলেমদের সঙ্গে ওঠাবসা করবে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক সে তাঁদের সঙ্গে আদব রক্ষা করবেই, এমনকি ঐ ব্যক্তি তাঁদের মত অবলম্বলকারী না হলেও। এমনটি হয় আল্লাহর কাছে তাঁদের মর্যাদার কারণে। তাহলে তাঁদের সঙ্গে ওঠাবসাকারী ব্যক্তি যদি তাঁদেরকে মহব্বতকারী হয়, তাঁদের মতাবলম্বী হয়, এবং তাঁদের থেকে গ্রহণকারী ও তাঁদের কাছে পথ নির্দেশনা প্রার্থনাকারী হয়, তাহলে সে কেমন আদব রক্ষা করবে?

আবু মুহাম্মদ আল-হারেসী রহ. ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর এই উক্তি উল্লেখ করেছেন যে, 'সম্মান প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে আমি আমার উস্তাদ হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান-এর ঘরের দিকে পা লম্বা করেনি। তাঁর ও

---

২২২. উক্তিটি ইবনে নুজাইম রহ.-এর কিতাব اَلْبَحْرُ الرَّائِق থেকে ইবনে আবেদীন শামী রহ. তাঁর হাশিয়ায় [১ ঃ ৩০৩] নকল করেছেন।

২২৩. পূর্ব যুগের ইবনে হায্ম জাহেরী-র অবস্থায় অন্যদের জন্য শিক্ষা আছে। একটু পরেই তার ব্যাপারে আল্লামা শাতেবী-র উক্তি উল্লেখ করা হবে।

আমার ঘরের মাঝে সাতটি গলি ছিল।'[২২৪]

ইমাম বাইহাকী রহ. مناقبُ الشافعي কিতাবে[২২৫] উল্লেখ করেছেন, ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন– 'আমি মদীনায় পৌঁছে ইমাম মালেক রহ.-এর মর্যাদা ও ইলমের প্রতি তাঁর সম্মান প্রদর্শন প্রত্যক্ষ করলাম। এতে আমার আদব বৃদ্ধি পেল। এমনকি তাঁর মজলিসে কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টানোর প্রয়োজন হলে তাঁর প্রতি সম্মান প্রকাশ করতে গিয়ে আমি এমনভাবে পৃষ্ঠা উল্টাতাম, যেন এর আওয়াজ তাঁর কানে না পৌঁছে।'

তারপর ইমাম বাইহাকী রহ. আর-রবী' বিন সুলাইমান রহ.-এর উক্তি উল্লেখ করেছেন– 'আল্লাহর শপথ, ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আমার দিকে তাঁর তাকানো অবস্থায় আমি পানি পান করার সাহস করিনি।'[২২৬]

'আলেমদের থেকে ইলম শেখার গুরুত্ব ও আদর্শ আলেমদের গুণাবলি' প্রসঙ্গে الموافقات কিতাবে ইমাম আবু ইসহাক শাতেবী রহ.-এর একটি মূল্যবান আলোচনা আছে। তিনি উক্ত কিতাবে এক পর্যায়ে লিখেছেন[২২৭]– চূড়ান্ত তাহকীকপূর্ণ ইলম অর্জনের অন্যতম উপকারী একটি মাধ্যম হলো পরিপূর্ণ মুহাক্কিক আলেমদের থেকে ইলম অর্জন করা।[২২৮]

এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে যে, উস্তাদ ব্যতীত ইলম অর্জন করা সম্ভব কি-না। হ্যাঁ, সম্ভব। তবে বাস্তবতা হলো উস্তাদ লাগবে। উস্তাদের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সকলেই মোটামুটি একমত। যদিও কিছু কিছু ব্যাখ্য-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে গবেষকদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে ঐক্যমত্য ও চলমান নিয়মের ভিত্তিতে এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উস্তাদ লাগবে।

---

২২৪. «عُقود الجمان في مناقب أبي حنيفة النعمان» للعلامة الصالحي পৃ. ২৯৩ দ্রষ্টব্য।

২২৫. ২ : ১৪৪

২২৬. المناقب ২ : ১৪৫, المدخل পৃ. ৩৯০

২২৭. ১ : ৯১ - ৯৯

২২৮. মুহাক্কিক আলেমদের লক্ষণ অচিরেই বর্ণনা করা হবে।

গবেষকগণ বলেছেন, 'ইলম আলেমদের বুকে ছিল। তারপর কিতাবের পৃষ্ঠায় স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে ইলমের চাবিগুলো আলেমদের হাতে রয়ে গেছে।'[২২৯] তাঁদের এই উক্তি এ বার্তা বহন করে যে, ইলম শিখতে হলে উস্তাদ লাগবেই। কারণ, এই দু'জিনিসের[২৩০] বাহিরে ইলম অর্জনের অন্য কোনো মাধ্যম নেই।

উপরিউক্ত বক্তব্যের উৎস হলো এই হাদীস– 'আল্লাহ তা'আলা মানুষদের থেকে ছিনিয়ে ইলম উঠান না। তিনি ইলম উঠান আলেমদেরকে উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে।' অতএব এ কথা সন্দেহাতীত যে, আলেমগণই হলেন ইলমের চাবি।

যেকোনো বিষয়ের মুহাক্কিক আলেমের চারটি শর্ত–

১. তিনি উক্ত বিষয়ের মূলনীতিসমূহ ও ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে অবগত থাকবেন।

২. তিনি তার বিষয়টি ব্যক্ত করার যোগ্যতাসম্পন্ন হবেন।

৩. সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো সম্পর্কেও অবগত থাকবেন।

৪. উক্ত বিষয়ে যেসকল সন্দেহ সৃষ্টি হয় সেগুলো দূর করতে সক্ষম হবেন।[২৩১]

আমরা যদি তাঁদের শর্তগুলো লক্ষ করি এবং পূর্বসূরী আলেমগণকে সেগুলোর আলোকে যাচাই করি, তাহলে দেখব, এসব শর্তে তাঁরা পুরোপুরি উত্তীর্ণ ছিলেন।

---

২২৯. «المقدّمات الممهّدات» [১ : ৪৯] কিতাবে পিতামহ ইবনে রুশদ রহ.-এর ভাষা হলো– প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে ইলম ছিল আলেমদের বুকে। তারপর মেষ ও ভেড়ার চামড়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে। তবে তার চাবিগুলো আলেমদের বুকেই রয়ে গেছে। অতএব শিক্ষার্থীর জন্য এমন শিক্ষক অবশ্যই লাগবে, যিনি তার জন্য ইলমের দরজাগুলো খুলে দিবেন।

২৩০. কিতাব ও উস্তাদ।

২৩১. ইমাম শাতেবী রহ.-এরই রচিত الإفادات والإنشادات কিতাবের ২৭ নং ফায়দা দ্রষ্টব্য। পৃ. ১০৭

তবে মুহাক্কিক আলেম হওয়ার জন্য ভুল থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকা শর্ত নয়। ভুল হলে তাঁর আলেম না হওয়া সাব্যস্ত হবে না। ভুল হওয়া সত্ত্বেও তিনি আদর্শ ইমাম হিসেবে বিবেচিত হবেন। তাঁর মধ্যে যদি শর্ত পূরণে ত্রুটি থাকে, তাহলে যে পরিমাণ ত্রুটি থাকবে, পূর্ণতার স্তর থেকে তিনি সে পরিমাণ নীচু থাকবেন।

মুহাক্কিক আলেমের নিদর্শন :

মুহাক্কিক আলেমের নিদর্শন তিনটি–

১. তিনি তাঁর ইলম অনুযায়ী আমলকারী হবেন। তাঁর কথা ও কাজ একরকম হবে। তাঁর কথা যদি কাজের বিপরীত হয়, তাহলে তিনি তাঁর থেকে শেখার যোগ্য থাকবেন না এবং ইলমের ক্ষেত্রে আদর্শ হবেন না।

২. তিনি তাঁর বিষয়ে বড়দের তারবিয়তপ্রাপ্ত হবেন। তিনি বড়দের থেকে ইলম গ্রহণ করবেন এবং তাঁদের সাহচর্য লাভে ধন্য হবেন। বড়দের থেকে গ্রহণ করলেই এবং তাঁদের সাহচর্য লাভে ধন্য হলেই কেউ সেসব গুণে গুণী হবে, বড়রা যেসব গুণে গুণী ছিলেন। পূর্বসূরী নির্ভরযোগ্য আলেমগণ এমনই ছিলেন।

   দেখুন সাহাবায়ে কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য গ্রহণ করেছেন। তাঁরা রাসূলের বাণী ও কর্মকে আদর্শ বানিয়েছেন। যা কিছু রাসূল থেকে বর্ণিত এবং যেভাবে বর্ণিত, তার উপরই তাঁরা নির্ভর করতেন।

   হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে হযরত ওমর রা. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন– 'আমরা কি সত্যের উপর নই, আর তারা মিথ্যার উপর?'

   হযরত সাহ্ল বিন হুনাইফ রা. সিফ্ফীনের দিন বলেছেন– 'হে লোকসকল! নিজেদের মতসমূহকে দোষারোপ করো। আল্লাহর শপথ, আমার পক্ষে সম্ভব হলে 'আবু জান্দালের দিন' [হুদাইবিয়ার দিন] আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করতাম।'[২৩২]

---

[২৩২]. টীকাটি ২৪১ - ২৪২ নং পৃষ্ঠায় পড়ো।

তাঁরা কথা দু'টো এ জন্য বলেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে দিনের আচরণটি সাহাবায়ে কেরামের কাছে অস্পষ্ট ঠেকে ছিল। কিন্তু তাঁরা রাসূলের আদেশ মান্য করেছেন এবং নিজেদের মত বিসর্জন দিয়েছেন। অবশেষে হুদাইবিয়ার এ সন্ধিকে কুরআন 'স্পষ্ট বিজয়' ঘোষণা করেছে। তখন সকল অস্পষ্টতা দূর হয়েছে।

এই হলো সাহচর্যের উপকারিতা এবং অস্পষ্ট স্থানগুলোতে আলেমদের আনুগত্য করার ও তাতে ধৈর্যধারণের লাভ।[২৩৩]

সাহাবায়ে কেরামের এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য আদর্শে পরিণত হয়েছে। সাহাবীগণ যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য অবলম্বন করেছেন, তাবেঈগণও সেভাবে সাহাবীগণের সাহচর্য অবলম্বন করেছেন। এভাবে এক পর্যায়ে তাঁরা দ্বীনের সমঝ হাসিল করেছেন এবং ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণতার চূড়ান্ত স্তর অর্জন করেছেন।

মুহাক্কিক আলেম হওয়ার আলোচ্য নিদর্শনটির যথার্থতা বোঝার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আপনার সময়ে যে আলেম থেকে মানুষের ইলম গ্রহণ করা প্রসিদ্ধ লাভ করেছে, আপনি লক্ষ করবেন, তিনি তাঁর বিষয়ে বড়দের তারবিয়তপ্রাপ্ত। বড়দের থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন এবং তাঁদের সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছেন। সীরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত যে দল বা ব্যক্তিকেই দেখবেন, লক্ষ করবেন, তাদের মধ্যে এ গুণটি অনুপস্থিত।

এ কারণেই ইবনে হায্‌ম যাহেরী রহ.-এর নিন্দা করা হয়েছে। তিনি তাঁর উস্তাদদের সাহচর্য গ্রহণ করেননি এবং তাঁদের আদব ও আখলাকে সজ্জিত হননি।[২৩৪] গভীর জ্ঞানের অধিকারী আলেমগণ এর বিপরীত ছিলেন। যেমন চার ইমাম ও তাঁদের অনুরূপ ইমামগণ।

৩. যার থেকে ইলম হাসিল করেছেন তিনি তাঁর অনুসরণকারী হবেন এবং তাঁর আদব ও আখলাকে সজ্জিত হবেন। যেভাবে সাহাবীগণ নবী

---

২৩৩. الْمُوَافَقَات কিতাবে [৪ ঃ ৩২১] উল্লেখিত আল্লামা শাতেবী রহ.-এর সেই পরিচ্ছেদটি পড়ুন, যার প্রথমাংশ হলো تَرْكُ الاعتراضِ عَلَى الْكُبَرَاءِ محمودٌ

২৩৪. টীকাটি ২৪২ নং পৃষ্ঠায় পড়ো।

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করেছেন, তাবেঈগণ সাহাবীদের অনুসরণ করেছেন এবং প্রত্যেক যুগে পরবর্তীগণ পূর্ববর্তীগণের অনুসরণ করেছেন।

এই অনুসরণের আধিক্যের কারণেই ইমাম মালেক রহ. তাঁর সমশ্রেণীদের থেকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। যারা দ্বীনী নেতৃত্ব প্রদান করেছেন, তাঁদের সকলের মধ্যেই নিজেদের উস্তাদগণকে অনুসরণ করার আলোচ্য গুণটি বিদ্যমান ছিল। তবে ইমাম মালেক রহ. এ ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

যখন একথা প্রমাণিত হলো যে, ইলম উস্তাদ থেকে গ্রহণ করতে হবে, তখন এর দু'টো পদ্ধতি রয়েছে–

১. মৌখিকভাবে। পদ্ধতি দু'টোর মধ্যে এটি অধিক উপকারী ও অধিক নিরাপদ। এর দু'টিকারণ আছে।[২৩৫]

ক. একটি বৈশিষ্ট্য যা আল্লাহ তা'আলা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে রেখেছেন। ইলম চর্চায় নিয়োজিত ও আলেমদের সঙ্গে উঠাবসাকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই তা বোঝেন। তাহলো, কত বিষয় এমন আছে শিক্ষার্থী যা কোনো কিতাবে পড়ে, তারপর মুখস্থ করে ও পুনরাবৃত্তি করে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বোঝে না। তারপর যখন হঠাৎ তা শিক্ষকের সামনে পেশ করে, তখন তৎক্ষণাৎ বুঝে এসে যায় ... কারণ শিক্ষকের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীর এমন বিষয় বুঝে এসে যায়, যা তাঁর অনুপস্থিতিতে বুঝে আসে না। এই আলো শিক্ষার্থীদের সামনে ততক্ষণ বিদ্যমান থাকে, যতক্ষণ তারা শিক্ষকের অনুসরণ করে, তাঁর সঙ্গে আদব বজায় রাখে এবং তাঁর আনুগত্য করে। সহীহ মুসলিমে উল্লেখিত[২৩৬] حَنْظَلَةُ نَافِقَ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাহু ইরশাদ করেছেন–

لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلَى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِي وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الملائكةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ.

অর্থ. আমার কাছে এবং জিকিরের সময় তোমাদের যে অবস্থা থাকে,

---

২৩৫. তিনি শুধু একটি 'কারণ' উল্লেখ করেছেন।

২৩৬. ৪ ঃ ২১০৬ (১২)

যদি তোমরা সেভাবে সবসময় থাক, তাহলে ফিরিশতারা তোমাদের সাথে বিছানায় ও পথঘাটে মুসাফাহা করবে।[২৩৭]

২. লেখকদের রচনাসম্ভার ও সংকলকদের সংকলনসমগ্র অধ্যয়ন করা। এটিও উপকারী, তবে দু'টি শর্তের সাথে–

ক. সেই কাঙ্ক্ষিত ইলমের 'মাকাসিদ' ও পরিভাষাসমূহ এ পরিমাণ জানা ও বোঝা যে, তার উপর ভিত্তি করে কিতাবটি গভীরভাবে দেখা সম্ভব হবে। আর তা প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ আলেমদের থেকে মৌখিকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে অর্জন হবে। অথবা অন্য এমন কোনো মাধ্যমে যা মৌখিকভাবে গ্রহণ করারই নামান্তর। শুধু কিতাব শিক্ষার্থীর জন্য মোটেই উপকারী হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত আলেমগণ তা[২৩৮] ব্যাখ্যা না করেন। এটি একটি স্পষ্ট ও পরীক্ষিত কথা। [তো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথা সেই প্রথমটিই হলো।]

খ. উদ্দিষ্ট ইলমের পূর্ববর্তী আলেমদের কিতাব অধ্যয়ন করা। কারণ তাঁরা পরবর্তী আলেমগণের তুলনায় অধিক পাকাপোক্ত।[২৩৯] এর ভিত্তি অভিজ্ঞতা ও হাদীস।

অভিজ্ঞতা হলো, এটি প্রত্যেক ইলমের ক্ষেত্রে একটি দৃশ্যমান বিষয়। পরবর্তী ব্যক্তি কোনো ইলমের পারদর্শিতার সে স্তরে পৌছেন না, পূর্ববর্তী ব্যক্তি যে স্তরে পৌছেন। শরীয়তের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের অবগতি লাভের স্তর তাবেঈদের অবগতি লাভের মতো নয়।

---

২৩৭. তোমাদের স্মরণ থাকার কথা, ইলম সরাসরি উস্তাদের মুখ থেকে গ্রহণ করা শুধু কিতাব থেকে গ্রহণ করার তুলনায় অধিক নিরাপদ হওয়া সংশ্লিষ্ট যথেষ্ট আলোচনা, হাকীমুল ইসলাম কারী মুহাম্মদ তাইয়েব রহ.-এর আলোচনায় অতিবাহিত হয়েছে। [ফুআদ]

২৩৮. নিজেদের আচরণ ও উচ্চারণ দ্বারা। এখানে ব্যাখ্যাগ্রন্থের ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য নয়। [ফুআদ]

২৩৯. হাফেজ ইবনে হাজর لِسَانُ الْمِيْزَانِ কিতাবে [৩ ঃ ৩১৬] খালেদ বিন আনাস-এর জীবনীতে বলেছেন– "মন পূর্ববর্তীদের কথার দিকে অধিক ধাবিত হয় এবং বেশি ঝুঁকে।" কিতাবে উক্তিটির আগ-পিছ দেখুন, মনে এর ক্রিয়া অধিক হবে।

অদ্রূপ তাবেঈদের অবগতি লাভের স্তর তাবে' তাবেঈদের অবগতি লাভের মতো নয়। এভাবে অদ্যাবধি। যে ব্যক্তি তাঁদের জীবনচরিত, বাণী ও ঘটনাবলী অধ্যয়ন করবে, সে এ বিষয়ে বিস্ময়কর বহু কিছু দেখবে।

আর হাদীস হলো–

خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، ثم الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

[অর্থ. সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ। তারপর যারা তাদের পরবর্তী হয়। তারপর যারা তাদের পরবর্তী হয়।]

এ হাদীসে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, প্রত্যেক যুগ তার পরবর্তী যুগের তুলনায় উত্তম হয়। [আল্লামা শাতেবী রহ. এখানে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। তারপর বলেছেন–] তাই পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসম্ভার, বাণী ও জীবনচরিত তাদের জন্য অধিক উপকারী, যারা জ্ঞানের যে কোনো শাখায় সতর্কতা অবলম্বন করতে চায়। বিশেষত শরীয়তের ইলমের ক্ষেত্রে, যা হলো দৃঢ়তর হাতল ও সর্বাধিক নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাওফীক দানকারী আল্লাহ তা'আলাই।

আল্লামা শাতেবী রহ.-এর বক্তব্য উল্লেখ করা সমাপ্ত হয়েছে।

লক্ষ করুন, এমন মুহাক্কিক আলেম থেকে ইলম গ্রহণ করা যিনি তাঁর পূর্ববর্তী মুহাক্কিক আলেম থেকে ইলম গ্রহণ করেছেন, শাতেবী রহ. এর উপর কতটা গুরুত্ব দিয়েছেন! যেন প্রত্যেক প্রজন্ম পূর্ববর্তী প্রজন্মের সাথে যুক্ত থাকে এবং একে অপর থেকে গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

[শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা মুদ্দাজিলুহুর আলোচনা শেষ হয়েছে।]

---

২৩৭ নং পৃষ্ঠার টীকা

শায়খুত্ তাফসীর হযরত মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী রহ. লিখেন– সন্ধিপত্র লেখা হচ্ছিল। তখন সুহাইল ইবনে আমরের পুত্র আবু জান্দাল রা. পায়ে বেড়ি পড়া অবস্থায় উপস্থিত হলেন। তিনি পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তাই কাফেরদের পক্ষ থেকে তাঁকে নানা অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হচ্ছিল। সুহাইল বলল, এ হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি যাকে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এখনো তো চুক্তিনামা লেখা সম্পন্ন

হয়নি। লেখা সম্পন্ন হওয়ার পর তাতে উভয় পক্ষের দস্তখত হলে তারপর থেকে চুক্তি কার্যকর হবে। রাসূল সুহাইলকে বারবার অনুরোধ করলেন, আবু জান্দাল আমাদের কাছে থাকুক। কিন্তু সুহাইল তা মানল না। অবশেষে আবু জান্দালকে সুহাইলের হাতে তুলে দিলেন।

মক্কার কাফেররা আবু জান্দাল রা. কে তখন পর্যন্ত নানাভাবে নির্যাতন করে এসেছে। তাই আবার তাঁকে কাফেরদের মাঝে ফেরত প্রদানে আবু জান্দাল খুব আফসোসভরা কণ্ঠে বলে উঠলেন– আফসোস, হে মুসলমানেরা! আমাকে আবার কাফেরদের হাতে তুলে দিচ্ছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, হে আবু জান্দাল! সবর করো। আল্লাহর কাছে বিনিময়ের প্রত্যাশা রাখো। আমরা তো বিশ্বাসভঙ্গের কোনো কাজ করতে পারি না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমার মুক্তির কোনো ব্যবস্থা করবেন।

কিন্তু সাধারণ মুসলমানগণ বিষয়টি মেনে নিতে পারছিলেন না। হযরত ওমর রা. তো বলেই ফেললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আল্লাহর সত্য নবী নন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। হযরত ওমর রা. বললেন, আমরা সত্যের উপর আর তারা মিথ্যার উপর নয় কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, অবশ্যই। হযরত ওমর রা. বললেন, তাহলে এই অপমান ও লাঞ্ছনা কেন সহ্য করে নিব? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ও সত্য নবী। আমি আল্লাহর আদেশের বিপরীত কোনো কাজ করতে পারিনা। তিনিই আমার সাহায্যকারী। ... [সূত্র, 'সীরাতে মুস্তফা' ২ ঃ ৪২৪ - ৪২৫]

২৩৮ নং পৃষ্ঠার টীকা

শাতেবী রহ.-এর ভাষা লক্ষ করুন। তিনি ইবনে হায্‌ম যাহেরী রহ. সম্পর্কে বলেছেন– 'তিনি তাঁর উস্তাদদের সাহচর্য গ্রহণ করেন নি এবং তাঁদের আদব ও আখলাকে সজ্জিত হন নি।' এই বলেন নি যে, তাঁর উস্তাদ নেই। অবশ্যই তাঁর উস্তাদ আছেন এবং প্রচুর সংখ্যায় আছেন। তাঁর المُحَلَّى ও অন্যান্য কিতাব দেখলে তা বুঝে আসে। উস্তাদ থেকে বর্ণনা করা ও উস্তাদের সাহচর্য গ্রহণ করা দু'টো ভিন্ন জিনিস। সাহচর্য দ্বারা সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকা বোঝায়। পক্ষান্তরে বর্ণনা করা দ্বারা সঙ্গে স্থায়ীভাবে থাকা বোঝায় না। উস্তাদের বর্ণনার কোনো মজলিসে উপস্থিত থাকলেই উস্তাদ থেকে বর্ণনা করা যায়। অথবা উদাহরণস্বরূপ উস্তাদ

যদি কোনো কিতাব থেকে বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করেন, তাহলেও উস্তাদ থেকে বর্ণনা করার কথা বলা যায়।

শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা দা. বা.-এর টীকা শেষ হলো। এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। তাহলো, আমরা কোন্ উস্তাদের সাহচর্য গ্রহণ করব? কাকে নিজের তত্ত্বাবধায়ক ও পথনির্দেশক বানাব? হ্যাঁ, সাহচর্য তো আমরা শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ফিদ্দীন'ওয়ালা কোনো মনীষীরই গ্রহণ করব। তাঁদের একজনকেই নিজের তত্ত্বাবধায়ক ও পথনির্দেশকরূপে বানাব। কিন্তু এমন কারো সোহবতে যথাযথ থাকার এবং তাঁকে নিজের তত্ত্বাবধায়ক ও পথনির্দেশকরূপে গ্রহণ করার সুযোগ সাধারণত দাওরা ফারেগ হওয়ার পূর্বে সম্ভব হয় না। তো যদি তোমার অবস্থা এমনই হয়, তাহলে কমপক্ষে এমন কাউকে গ্রহণ করো, যিনি নিজেও তাফাক্কুহ ফিদ্দীন অর্জনের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত, এই তাড়নায় উজ্জীবিত এবং লক্ষ্যে পৌছার পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে মোটামুটি অবহিত। তিনি কোনো কামেল শায়খের তরবিয়তপ্রাপ্ত। আকাবিরের অনুসরণ করেন। নিজের রায় বা খামখেয়ালী মোতাবেক চলেন না। উপরন্তু তোমার উপযোগী দিক-নির্দেশনা প্রদান করতে সক্ষম। এমন উস্তাদও যদি না পাও, তবে কোন্ কোন্ প্রয়োজনে কার কার শরণাপন্ন হওয়া উচিত– এই দিক-নির্দেশনা যিনি প্রদান করতে পারেন এবং প্রয়োজনে অন্যদের নিকট পাঠানোর মতো তাঁর মনের প্রশস্ততাও আছে, তাহলে এমন উস্তাদের গুরুত্বও কম নয়। فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا [তারপর পানি না পেলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।]

এখানে এ কথাটিও স্মরণ রাখা জরুরি যে, তাকলীদ যেমন নির্দিষ্টভাবে একজন ইমামের করতে হয়, তালিবে ইলম নিজের তত্ত্বাবধায়ক ও পথনির্দেশকরূপেও এভাবে সুনির্দিষ্টভাবে মাত্র একজনকে গ্রহণ করবে। অন্য সকল উস্তাদের প্রতি স্বাভাবিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা থাকবে। সকলের সাথে যথাযথ আদব বজায় রেখে চলবে। একাধিক ইমামের তাকলীদে যেসকল সমস্যা আছে, একাধিকজনকে আদর্শ ও পরামর্শদাতারূপে গ্রহণ করলেও সেসকল সমস্যা হবে।

২৪৬ নং পৃষ্ঠার ২৪০ নং টীকা

একজন শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরে হুজুর লিখেছেন– 'কিতাবী ইস্তিদাদ'-এর সম্পর্ক প্রথমত نَحْو, صَرْف, لُغَة ও আরবী আদবের সঙ্গে। এ বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জিত হলে এরপর দু'টো জিনিস বাকি থাকে–

ক. মুসান্নিফের উপস্থাপনভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এ বিষয়টি সে কিতাবের কিছু অংশ মনোযোগ দিয়ে অধ্যয়ন করলে হাসিল হবে। দরসের মাধ্যমে তো বটেই।

খ. কিতাবটি যে ফন বা শাস্ত্রের তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এই পরিচিতি ফনের প্রথম কিতাবটি থেকেই আরম্ভ হবে এবং ধীরে ধীরে বাড়তে থাকবে। ['তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' পৃ. ৪৩৬]

হুজুরের বক্তব্য শেষ হয়েছে। এখন আমি এর সঙ্গে সংযোজন করে বলছি- আরবী ভাষা শিখতে হবে نَحْو ও صَرْف শেখার পূর্বে। الطَّرِيقُ إلى العربيَّة، التمرينُ الكتابِيُّ عَلَى «الطريق إلى العربيَّة»، قَصَصُ النَّبِيِّيْن، القراءةُ الراشِدَة প্রভৃতি কিতাব যথানিয়মে পড়ে ও সেগুলোর অনুশীলন করে প্রথমে আরবী ভাষা শিখতে হবে। তারপর অনুশীলনভিত্তিক نَحْو ও صَرْف-এর কোনো কিতাব [যেমন الطريق إلى الصرف والطريقُ إلى النحو] পড়লে তখন কাঙ্ক্ষিত ফলাফল সহজে সামনে আসবে ইনশাআল্লাহ। অন্যথায় স্বাভাবিক অবস্থায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল আসতে অনেক বিলম্ব হবে এবং হতাশা ও নৈরাশ্য ঘণীভূত হবে।

نَحْوِيগণ বলেছেন- اَلنَّحْوُ فِي الكلامِ كالمِلْحِ فِي الطَّعَام [খাবারে লবণ যেমন ভাষায় ব্যাকরণ তেমন]। 'ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা' থেকে প্রকাশিত شَرْحُ الجَامِي ও هدايةُ النَّحْو কিতাবদ্বয়ের কভার পৃষ্ঠায় আমি এর সঙ্গে যুক্ত করে লিখেছি- وَمَنْ لَيْسَ عِنْدَه الطَّعَامُ (الكلامُ) لا يَنْفَعُه المِلْحُ (النَّحْوُ) অর্থাৎ যার কাছে খাবার নেই শুধু লবণ থাকা দ্বারা তার যেমন কোনো লাভ নেই, তদ্রূপ যে ব্যক্তি ভাষা জানে না শুধু ব্যাকরণ জেনে তার কোনো লাভ নেই। মোটকথা, আরবী ভাষা শিখতে হবে প্রথমে। তারপর হলো نَحْو - صَرْف শেখা। এটিই হলো স্বাভাবিক কথা। আমার تمرينات সহ প্রকাশিত القراءةُ الرَّاشِدَة কিতাবের প্রথম খণ্ডের শেষে أَثَرُ المُحَاكَاةِ فِي تعلُّمِ اللغةِ وطريقتُها / 'ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অনুকরণের প্রভাব ও পদ্ধতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটি পড়া এ ক্ষেত্রে উপকারী হবে ইনশাআল্লাহ।

نَحْو - صَرْف পড়তে হবে অনুশীলনভিত্তিক نَحْو - صَرْف-এর কোনো কিতাব থেকে। তখনই কাঙ্ক্ষিত ফায়দা অল্প মেহনতে অর্জন হবে ইনশাআল্লাহ। نَحْو - صَرْف-এর শুধু قواعد-এর কিতাব পড়া ও মুখস্থ করা দ্বারা কাঙ্ক্ষিত ফায়দা সহজে অর্জন হবে না।

২৪৬ নং পৃষ্ঠার ২৪১ নং টীকা

অপর একজন শিক্ষার্থীর প্রশ্নের উত্তরে হুজুর লিখেছেন– যেকোনো বিষয়ে ফন্নী ইস্তে'দাদ ও ইখতেসাস অর্জনের জন্য কয়েকটি বিষয় জরুরী। যথা ঃ

ক. ফনের মাহের কোনো উস্তাদের বিশেষ ও দীর্ঘ সোহবত।

খ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মুহাক্কিক ও মুতকিন আহলে ফনের তাসনীফ মুতালাআ অব্যাহত রাখা। বিশেষত মুতাকাদ্দিমীন আহলে ফনের তাসনীফ মুতালাআ করা। এই মুতালা'আ হতে হবে তাময়ীয, নাবাহাত ও বসীরতের সাথে। অন্যথায় কেবল মা'লুমাত বৃদ্ধি পাবে, কিন্তু ফনের ফাকাহাত পয়দা হবে না।

গ. উপরোক্ত বিষয়দু'টো ছিল কাসবী তথা চেষ্টা ও মেহনতের মাধ্যমে অর্জিতব্য বিষয়। এর সাথে যোগ হতে হবে ওহাবী ইলম। এর জন্য প্রয়োজন তাকওয়া-তাহারাত এবং রুজূ' ইলাল্লাহ। ...

স্মরণ রাখতে হবে, ফন্নী ইস্তে'দাদ ও ইখতেসাসের বিভিন্ন মরতবা ও স্তর রয়েছে। এর একটি স্তর হচ্ছে আহলে ফনের আলোচনা-পর্যালোচনা শরহে সদরের সাথে বুঝতে পারা। ফন্নী ইখতেসাসের বড় একটি আলামত হচ্ছে, ফনের কোনো বিষয়ে শক, শুবাহ ও ইশকাল দেখা দিলে তার কাবেলে ইতমিনান ও প্রশান্তিদায়ক জবাব দিতে পারা। এছাড়াও এ বিষয়ে আহলে ফন আলেমদের শাহাদাতও বড় প্রমাণ ও সনদ হিসেবে বিবেচ্য। [সূত্র, মাসিক 'আলকাউসার' এপ্রিল ২০১৪ ঈ. –শিক্ষা পরামর্শ]

আমাকে দেয়া একটি চিরকুটে হুজুর আরো লিখেছেন–

ঘ. সংশ্লিষ্ট ফনের জটিল ও স্পষ্টযোগ্য মাসআলাসমূহে তাহকীকী দৃষ্টি থাকা।

২৪৬ নং পৃষ্ঠার ২৪২ নং টীকা

تَفَقُّه فِي الدِّيْن ও رُسُوْخ فِي العِلْم অর্জন করার পদ্ধতি সম্পর্কে আমার অনুরোধে আমাকে দেয়া একটি চিরকুটে হুজুর লিখেছেন– [তারিখ ৩০. ৫. ১৪৩৫ হি./১. ৪. ২০১৪ ঈ. মঙ্গলবার]

ক. الفقهُ العامُّ للدِّين-এর ইখতেসাস ও বিশেষজ্ঞতার স্তর অর্জন করা।

খ. গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী বিষয়াদিতে [কুরআন-হাদীস-ফিক্হ প্রভৃতি] ফন্নী দক্ষতা অর্জন করা।

গ. আহলে ফিক্হ ও আহলে দিল আলেমদের সোহবত ও তত্ত্বাবধান গ্রহণ করা।

ঘ. দ্বীনের সামগ্রিক মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে অবগতি লাভ। [এটি ক ও গ দ্বারা অর্জন হয়ে যাবে।]

ঙ. প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ফনের [কুরআন-হাদীস-ফিক্হ প্রভৃতি] জটিল ও অস্পষ্ট দিকসমূহ স্পষ্ট করা।

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দা. বা.-এর আলোচনা

মাদরাসাগুলোতে ইলমের অধঃপতনের একটা বড় কারণ হলো উস্তাদ ও ছাত্রের সম্পর্ক ক্রমেই সাময়িক ও নিয়মসর্বস্ব হয়ে পড়ছে। সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষাদীক্ষা যখন প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হয়েছে, তখন থেকেই ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীদের সম্পর্ক উস্তাদের সঙ্গে হওয়ার স্থলে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হতে শুরু করেছে। এখন ছাত্ররা উস্তাদগণের সোহবত গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানের। ফলে উস্তাদগণের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক এখন নিয়ম রক্ষার সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। আর এর ফলাফলও চোখের সামনেই দেখা যাচ্ছে– নেছাব সমাপনকারী ছাত্রদের মধ্যে 'কিতাবী ইসতিদাদ'[২৪০] অর্জন করেছে এমন ছাত্র শতকরা একজনও পাওয়া যাবে না। আর 'ফন্নী ইসতিদাদ'[২৪১] বা শাস্ত্রীয় বুৎপত্তিসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা তো আরো নগণ্য। এরপর 'রুসুখ ফিল ইলম' ও 'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন'[২৪২]-এর যোগ্যতার অধিকারী অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গ তো 'আনকা' পাখির ন্যায় দুষ্প্রাপ্য।

বলাবাহুল্য, কোনো তালিবে ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত অনুসরণীয় আলেম হতে পারে না, যতক্ষণ না আহলে ফন- শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বন করে গুরুত্বপূর্ণ শরয়ী ইলম ও ফন সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করবে এবং সজাগ সচেতন আহলে ফিক্হ-এর সাহচর্যের মাধ্যমে সচেতনতা, প্রাজ্ঞতা, চিন্তা ও কর্মে ভারসাম্য, আদাবুল মুআশারা তথা সমষ্টিগত জীবনের রীতিনীতির জ্ঞান ও অনুশীলন ইত্যাদি অর্জন করবে। সর্বোপরি আহলে দিলের সোহবত গ্রহণ করে তাকওয়া ও অন্তরের পরিচ্ছন্নতা অর্জন করাও অপরিহার্য।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সমাজে উল্লেখযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য অবদান রাখতে তারাই সক্ষম হন, যারা নিজেদেরকে উস্তাদের সঙ্গে যুক্ত রাখেন এবং উস্তাদগণের ছায়া ত্যাগ করেন না। আর এর প্রাথমিক বিষয়টি অর্থাৎ উস্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং তাঁদের মহব্বত লাভ করা বস্তুত বিশেষ সোহবতের উপরই নির্ভরশীল।

---

২৪০. টীকাটি ২৪৩ - ২৪৪ নং পৃষ্ঠায় পড়ো।

২৪১. টীকাটি ২৪৫ নং পৃষ্ঠায় পড়ো।

২৪২. টীকাটি ২৪৬ নং পৃষ্ঠায় পড়ো।

উস্তাদ-শাগরিদ সম্পর্ক

আমাদের পূর্বসূরী আকাবির যেসব বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ছিলেন, কিন্তু আমরা তা থেকে বঞ্চিত, তার একটি হলো এ বিষয়টি, অর্থাৎ ছাত্রের প্রতি উস্তাদের মুহব্বত এবং উস্তাদের সঙ্গে ছাত্রের দৃঢ় ও স্থায়ী সম্পর্ক। দৃঢ় সম্পর্কের অর্থ হলো, সম্পর্কটি নিরস নিয়মের সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠাননির্ভর সম্পর্ক না হওয়া; বরং শ্রদ্ধা ও মুহব্বত এবং গ্রহণ ও অর্জনের সম্পর্ক হওয়া। আর স্থায়ী সম্পর্কের অর্থ হলো, সম্পর্কটি কেবল শ্রেণীকক্ষের সম্পর্ক না হওয়া। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত ফার্সী পঙ্‌ক্তিটি খুবই প্রসিদ্ধ–

شاگرد ایں زمانہ وقت سبق یگانہ　　چوں شد سبق میسر آرند صد بہانہ

এমন না হওয়া উচিত। সম্পর্কের দৃঢ়তা চাই এবং স্থায়িত্ব চাই। উস্তাদের নিকট থেকে চলে আসার পরও তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, নির্দেশনা গ্রহণ করা, ইলমী সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য তাঁর শরণাপন্ন হওয়া এবং দুআ লাভ করা ইত্যাদি বিষয়ে একজন তালিবে ইলমকে সবসময়ই সজাগ-সচেতন থাকা উচিত।

এই সম্পর্কের চেয়ে যে জিনিসটি বেশি প্রয়োজন অথচ বেশি অবহেলিত, তা হলো উস্তাদের দীর্ঘ ও বিশেষ সোহবত। আর এটি দুই পর্যায়ে জরুরি। প্রথমত প্রচলিত পরিভাষায় 'মাওলানা' হওয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয়ত 'মাওলানা' হওয়ার পর রুসুখ ফিল ইলম, তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ও খোদাভীতিসম্পন্ন আলেম হওয়ার জন্য। [এখানে হুজুর উস্তাদের সোহবতে থাকার সালাফের যুগের কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। এ জাতীয় বেশ কিছু দৃষ্টান্ত যেহেতু শায়খ মুহাম্মদ আওয়ামা দা. বা.-এর আলোচনায় এসেছে, তাই দৃষ্টান্তগুলো এখানে আর উল্লেখ করলাম না।]

এ যুগের কিছু নমুনা

কোনো কোনো বন্ধুর মনে হয়ত এই প্রশ্ন এসে থাকবে যে, আপনি আমাদের হাজার বছর আগের কথা শোনাচ্ছেন। সে সময়ের 'মুদ্রা' এখন চলবে কেন? এ জাতীয় কথা যদিও হিলা-বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয়, তবুও এর উত্তরে শুধু এটুকু আরজ করাই যথেষ্ট যে, نُزْهَةُ الْخَوَاطِرِ -এর

সর্বশেষ ও অষ্টম খণ্ডটি হাতে নিন। এ খণ্ডটিতে শুধু এই উপমহাদেশ ও তার আশেপাশের অঞ্চলগুলোর উলামা-মাশায়েখ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আলোচনা রয়েছে এবং শেষ খণ্ডটিতে শুধু চতুর্দশ হিজরী শতাব্দীর ব্যক্তিবর্গের আলোচনাই স্থান পেয়েছে, যে শতাব্দীর পর মাত্র ২৫/২৬ বছরই অতিবাহিত হয়েছে। এই খণ্ডটি থেকে উদাহরণস্বরূপ শুধু নিম্নোক্ত পৃষ্ঠাগুলো অধ্যয়ন করুন– ২০, ৩৬, ৫৭, ৬১, ৬২, ৭৮, ১০৪, ১১০, ১২৬, ১৩৭, ১৪৬, ১৬০, ১৬৯, ১৭১, ১৭৭, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৮। এ পৃষ্ঠাগুলোতে নিকট অতীতের আকাবিরের ব্যাপারেই পেয়ে যাবেন لازَمَه مُدَّةً طَوِيْلَةً، لازَمَه مُلازَمَةً طَوِيْلَةً، لازَمَه مُدَّةَ دَهْرِه، لازَمَه إلى مَوْتِه ইত্যাদি বা তার সমার্থক শব্দাবলী।

শিক্ষাদীক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক রূপ লাভের পরও আকাবিরের যুগে এই রীতির বিলুপ্তি ঘটেনি। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. ও হযরত সাহারানপূরী রহ. উভয়ে হয়রত গঙ্গুহী রহ.-এর এবং হযরত শাহ ছাহেব রহ. হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন নিজেদের প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক ব্যস্ততার সময়েও। মাওলানা বদরে আলম মীরাঠী, মাওলানা আহমদ রেযা বিজনূরী, মাওলানা ইউসুফ বানূরী প্রমুখ তাঁদের ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পর কর্মজীবনেও শাহ ছাহেবের বিশেষ সাহচর্য গ্রহণ করেছেন। মাওলানা যফর আহমদ উসমানী ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পরেই হযরত থানবী রহ.-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। তদ্রূপ হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. হযরত মাওলানা মুফতী আযীযুর রহমান রহ.-এর, শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্দলভী রহ. হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপূরী রহ.-এর, মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. ডাক্তার আব্দুল আলী নাদাবী রহ.-এর এবং মাওলানা আব্দুর রশীদ নোমানী রহ. হযরত মাওলানা হায়দার হাসান খান টুংকী ও হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান টুংকী রহ.-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন।

সিরিয়ার হলব শহরের গত শতাব্দীর বিখ্যাত আলেম শায়খ আহমদ যারকা রহ. [১২৩৫ - ১৩৫৭ হি.] ছাত্রজীবন শেষ হওয়ার পর প্রায় ত্রিশ বছর তাঁর পিতা শায়খ মুহাম্মদ যারকা রহ.-এর সাহচর্যে ছিলেন এবং ফতোয়ায়ে শামী ও বাদায়েউস সানায়ে-এর মতো সুদীর্ঘ ও সুকঠিন একাধিক কিতাব আদ্যোপান্ত তাহকীকের সাথে পড়েছেন।

এ যুগের আকাবিরের মধ্যে মাওলানা সলীমুল্লাহ খান ছাহেব হযরত মাওলানা মসীহুল্লাহ খান জালালাবাদী রহ.-এর, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী ছাহেব হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর, মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপূরী ছাহেব হযরত মাওলানা মুফতী মাহদী হাসান শাহজাহানপূরী রহ.ও আল্লামা বিলয়াবী রহ.-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন।

আপনি যদি নিকট অতীতের আকাবিরীনের ইতিহাস ও জীবনী অধ্যয়ন করেন কিংবা বর্তমানের আকাবিরের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করেন তবে দেখবেন, যারা জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন এবং মানসম্মত খেদমতের ব্যাপারে বিশেষ মাকাম অর্জন করেছেন, তাঁরা কোনো না কোনো শাস্ত্রাভিজ্ঞ মেহেরবান উস্তাদের সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। শুধু নিয়মের সম্পর্ক ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সম্পর্কের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।

এই সুন্নত আবারও যিন্দা করতে হবে

لَنْ يَّصْلُحَ آخِرُ هذه الأُمَّةِ إلاَّ بِمَا صَلَحَ بِه أَوَّلُهَا-এর নীতি অনুযায়ী এই সুন্নতকেই আবার যিন্দা করতে হবে। এর বিকল্প নেই। যোগ্যতাসম্পন্ন ছাত্রদের প্রথম কর্তব্য হলো, এ ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এরপর তার অভিভাবকদের দায়িত্ব হলো, এই বিশেষ সোহবত গ্রহণে সামর্থ্য অনুযায়ী সহযোগিতা প্রদান করা। আর যে উস্তাদগণকে আল্লাহ তা'আলা 'মানুষ গড়া'র যোগ্যতা দান করেছেন, তাঁদেরও বদান্যতা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে হবে। যদি এই তিন শ্রেণী সম্মিলিতভাবে মনোযোগী হন, তাহলে এ যুগেও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করে নিজেকে আল্লাহ ও আল্লাহর দ্বীনের জন্য তৈরি করা অসম্ভব কিছু নয়।

যে সব মাদরাসা ও প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা ভাল সেগুলোতে মুখলিস, মেধাবী ও ওয়াফাদার দু'চারজন তালেবে ইলমকে সুযোগ দেয়া উচিত, তারা যেন কোনো বিশিষ্ট উস্তাদের সাহচর্য গ্রহণ করতে পারে এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজ করে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।

تَخَصُّص-এর ধারাবাহিকতাও মূলত হকদার তালেবে ইলমদেরকে 'আহলে ফন' ও 'আহলে ফিকহ' ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সাহচর্য প্রদানের জন্যই শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন এ বিভাগটিতেও 'ঘুন' ধরেছে এবং যে নিয়মসর্বস্বতা ও অগভীরতার চিকিসৎসার জন্য এর সূচনা হয়েছিল, সে নিজেই এখন তার শিকার হয়ে পড়েছে। (عَافَاهُ اللهُ تعالى وشَفَاهُ)

এখন যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হলো, দাওরায়ে হাদীস ও তাখাস্সুখ সমাপনকারীদের মধ্য থেকে যোগ্য, মেধাবী, ওয়াফাদার এবং পূর্ণ মনোযোগ ও অভিনিবেশসম্পন্ন কিছু তালেবে ইলমকে বাছাই করে তাদেরকে আহলে ফনের সাহচর্য লাভের ব্যবস্থা করে দেয়া। সেটা সকল দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেও হতে পারে; কিংবা অল্প-স্বল্প পাঠদানের দায়িত্বের সঙ্গেও হতে পারে। প্রয়োজনাদি পূরণের ইন্তেজাম তালেবে ইলম নিজেও করতে পারে, বা তার অভিভাবক করতে পারেন, অথবা মাদরাসার দায়িত্বশীলগণ, কিংবা যে উস্তাদের তত্ত্বাবধানে থাকবে তিনিও করতে পারেন। মোটকথা নিয়ত ও হিম্মত থাকলে ক্লোনো না কোনো ইন্তেজাম অবশ্যই হয়ে যাবে।

অহেতুক কিছু অজুহাত

তবে আমাদের একটা দুঃখজনক অভ্যাস এই হয়ে গেছে যে, যে কোনো ভাল ও জরুরি পদক্ষেপের পরামর্শ দেয়া হলে তাকে কীভাবে বাস্তবায়িত করা যায় এই চিন্তা করার আগেই নির্ধারিত কিছু বাক্যের মাধ্যমে একে প্রত্যাখ্যান করা হয়। যেমন বলা হয়, 'আমাদের এখানে এগুলো বাস্তবায়নের পরিবেশ নেই।' 'এ দেশে তা সম্ভব নয়।' 'এ যুগে এগুলোর কল্পনাও করা যায় না।' ইত্যাদি। কিন্তু সত্য কথা হলো, এ ধরনের কথাবার্তাকে অনেক সময়ই শুধু 'অনিচ্ছুকের বাহানা' ছাড়া আর কিছু বলার থাকে না। আমাদের আশেপাশে কি এমন দৃষ্টান্ত কম রয়েছে যে, যোগ্যতাসম্পন্ন তালেবে ইলম নিসাবের পড়াশোনা শেষ করার পর কোথাও ইমামত কিংবা খিতাবাত-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এ ছাড়া তার অন্য কোনো কাজ নেই। কিংবা থাকলেও তা হলো, কোনো মাদরাসায় দু' একটি সবক পড়ানো। এমন বন্ধুদের পক্ষে কোনো উস্তাদ কিংবা বিশেষজ্ঞ কোনো আলেমের তত্ত্বাবধানে থেকে কিছু কিছু ইলমী ও গবেষণামূলক কাজ করা এবং ধীরে ধীরে নিজেকে গড়ে তোলা খুবই সহজ। কিন্তু আমাদের অবস্থা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই বাণীরই বাস্তব প্রতিচ্ছবি–

نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ والفَرَاغُ.

অর্থাৎ বিপুল সংখ্যক মানুষ দু'টি নেয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন। নেয়ামত দু'টি হলো, সুস্থতা ও অবসর।[২৪৩]

---

[২৪৩]. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪১২

আল্লাহ তা'আলা আমাদের হেফাযত করুন এবং আমলের তাওফীক দান করুন। আমীন!

অনেক যোগ্যতাসম্পন্ন তরুণ আলেম আছেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কর্মজীবনেও বিশেষজ্ঞ উস্তাদের সঙ্গে কিংবা কোনো অভিজ্ঞ মুরুব্বী আলেমের সঙ্গে কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন, কিন্তু এই সুযোগ থেকেও তারা উপকৃত হন না।

যাক, আলোচনা নেছাব সমাপনকারী ভাইদের দিকে চলে গেছে। ছাত্রজীবনে যখন আমরা উস্তাদগণের ছায়াতলে থাকি, তখনও কি দু'একজন বিশেষজ্ঞ উস্তাদের বিশেষ সোহবত গ্রহণ করি? তাহলে বোঝা গেল, সকল দোষ শুধু 'পরিবেশে'র উপর চাপিয়ে দেয়া মোটেই উচিত নয়। বরং অনেক 'অপরাধ' আছে যার কারণ হলো আমাদের নিজেদের ভীরুতা ও উদাসীনতা। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে উচ্চ হিম্মত, 'দিলে দরদমান্দ', 'ফিকরে আরজুমন্দ' ও 'যবানে হুশমন্দ' নসীব করুন। আমীন!

[মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালিক দা. বা.-এর আলোচনা শেষ হয়েছে।]

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. বলেছেন– একজন তালিবে ইলমের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য একান্ত অপরিহার্য হলো মাহির ও প্রাজ্ঞ উস্তাদের সোহবত ও সান্নিধ্য গ্রহণ করা। যে ফন ও শাস্ত্রের প্রতি শিক্ষার্থীর সহজাত অনুরাগ ও মায়লান রয়েছে, তার কর্তব্য হলো সেই ফন ও শাস্ত্রের মাহির ও বিশেষজ্ঞ উস্তাদের সোহবতে পড়ে থেকে যোগ্যতা অনুযায়ী তা আত্মস্থ করার সাধনায় লেগে থাকা। উস্তাদের সঙ্গে এমন অন্তরঙ্গ সংযোগ ছাড়া কখনই কাঙ্ক্ষিত ফায়দা হাসিল হতে পারে না।[২৪৪]

তিনি আরও বলেছেন– কোনো জ্ঞান ও শাস্ত্রের সহজাত রুচি তখনই সৃষ্টি হয়, যখন জ্ঞানী ও গুণীদের মজলিসে আসা যাওয়া হয় এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়। এরপর মানুষ খুব সামান্য জ্ঞান দ্বারাও অনেক বেশি কাজ নিতে পারে।[২৪৫]

---

২৪৪. অনুবাদ, 'জীবন পথের পাথেয়' পৃ. ২৭; মূল, پاجا سراغ زندگی পৃ. ৩৪

২৪৫. অনুবাদ, 'জীবন পথের পাথেয়' পৃ. ৬৫; মূল, پاجا سراغ زندگی পৃ. ৬৮

জীবনচরিত অধ্যয়ন করার প্রয়োজনীয়তা

এতক্ষণ আমরা আল্লাহ তা'আলার তাওফীকে শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন'ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করলাম। আশাকরি বিষয়টি সকলের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। এর পাশাপাশি আমাদেরকে অতীব জরুরী আরেকটি কাজও করতে হবে। তাহলো সুযোগ্য ও সমাদৃত আদর্শ মুখলিস মনীষীদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা। হযরত হাকীমুল উম্মত শাহ্ আশরাফ আলী থানবী রহ. তাঁর 'হায়াতুল মুসলিমীন' কিতাবে[২৪৬] এর প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে লিখেন–

এখন যেসমস্ত নেককার লোক অতিবাহিত হয়েছেন, বই-পুস্তক পড়ে তাঁদের অবস্থা জানার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হচ্ছে। কেননা এর দ্বারাও এমনই উপকার হয়, যেমন তাঁদের নিকট বসলে উপকার হয়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ.

অর্থ. এবং নবীগণের ঘটনাসমূহ থেকে এসব [নবীর] ঘটনা [হযরত নূহ আ. প্রমুখ নবীদের ঘটনা] আপনার নিকট এজন্য বর্ণনা করছি, যেন তা দ্বারা আপনার দিলকে মজবুত করতে পারি।[২৪৭]

ফায়দা : নেককারদের ঘটনা বর্ণনা করার এটিও একটি ফায়দা যে, এর দ্বারা মন শক্তিশালী হয় এবং সান্ত্বনা লাভ হয় যে, তাঁরা যেভাবে হকের উপর অবিচল থেকেছেন, আমাদেরকেও সেভাবে অবিচল থাকতে হবে এবং যেভাবে এ অবিচলতার বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সাহায্য করেছেন, একইভাবে এই অবিচলতা দ্বারা আমাদের উপরও সাহায্য আসবে। বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা অপর একটি আয়াতে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, 'আমি আমার রাসূলগণকে এবং ঈমানদারদেরকে পার্থিব জীবনেও সাহায্য করি এবং সেদিনেও [কিয়ামতের দিন], যেদিন সাক্ষ্যদাতা [ফেরেশতা]গণ দণ্ডায়মান হবে।'[২৪৮]

---

২৪৬. পৃ. ৯৩ - ৯৫

২৪৭. সূরা হুদ, আয়াত নং ১২০

২৪৮. সূরা গাফির, আয়াত নং ৫১

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন–

«مَنْ كَانَ مُسْتَنًّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنْ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ الْحَيَّ لا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ» (وفي آخر الحديث:) «وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ».

অর্থ. যে ব্যক্তি কোনো পন্থা অবলম্বন করতে চায়, তার উচিত ঐ সমস্ত লোকের পন্থা অবলম্বন করা যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন। কারণ জীবিত মানুষের তো বিপদগামী হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে। ওরা হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী। [হাদীসের শেষাংশে রয়েছে–] আর যতদূর সম্ভব তাদের নীতি ও অভ্যাসকে আঁকড়ে ধরো।[২৪৯]

ফায়দা : একথা পরিষ্কার যে, সাহাবায়ে কেরামের নীতি-অভ্যাস তখনই অবলম্বন করা সম্ভব, যখন তাঁদের ঘটনাবলী জানা থাকবে। তাই এ জাতীয় বই-পুস্তক পড়া ও শ্রবণ করা জরুরী।

যেভাবে পূর্ববর্তী নবী, আলেম ও অলীগণের ঘটনাবলি পবিত্র কুরআনে তাঁদের অনুসরণের উদ্দেশ্যে উল্লেখিত হয়েছে, [যার নির্দেশ এ আয়াতে রয়েছে– فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ / তাদের পথ অনুসরণ করো।[২৫০]] তেমনিভাবে হাদীস শরীফেও তাঁদের ঘটনা বহুল পরিমাণে উল্লেখিত হয়েছে। এর দ্বারাও এ জাতীয় ঘটনা উপকারী হওয়া এবং সেগুলো পড়া ও সে অনুযায়ী আমল করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত হয়। এ কারণেই বুযুর্গগণ সর্বদা এ জাতীয় ঘটনামূলক গ্রন্থ লেখার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। [হযরত থানবী রহ.-এর আলোচনা শেষ হয়েছে।]

আলহারিস আলমুহাসিবী রহ. [১৬৫ - ২৪৩ হি.]-এর রচিত رسالةُ المسترشدين কিতাবের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. নিম্নের উক্তিগুলো উল্লেখ করেছেন–[২৫১]

---

২৪৯. رَوَاه رَزِيْن، كما في «جمع الفوائد»

২৫০. সূরা আন'আম, আয়াত নং ৯০

২৫১. শায়খ উক্তিগুলো নিম্নের কিতাবগুলো থেকে নকল করেছেন–

ক. হাফেজ ইবনে আব্দুল বার রহ.-এর جامعُ بيانِ العلمِ وفضله ১ ঃ ১২৭;

খ. কাযী ইয়ায রহ.-এর ترتيبُ المَدَارِكِ ১ ঃ ২৩;

১. হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. বলেছেন, ঘটনাবলি আল্লাহ তা'আলার এক সৈন্যবাহিনী, আল্লাহ তা'আলা সেগুলো দ্বারা তাঁর অলীদের অন্তরসমূহ সবল করেন। প্রশ্ন করা হলো– এর কোনো প্রমাণ আছে কি? তিনি বললেন, এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার এই বাণী– وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ [অর্থ. আর আমি রাসূলগণের ঘটনাবলি থেকে এই ঘটনাগুলো তোমার নিকট বর্ণনা করছি, যা দ্বারা আমি তোমার অন্তরকে সবল করি।][২৫২]

২. ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেছেন, আলেমদের ঘটনাবলি ও তাঁদের উত্তম গুণাবলি আমার নিকট অনেক ফিক্হ থেকে অধিক প্রিয়। কেননা সেগুলো মনীষীদের আদব ও আখলাক। এর প্রমাণ হলো আল্লাহ তা'আলার এই বাণী– أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ [অর্থ. ওদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুপথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব তাঁদের পথই তুমি অনুসরণ করো।][২৫৩] এবং আল্লাহ তা'আলার এই বাণী– لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ [অর্থ. অবশ্যই তাঁদের ঘটনাবলিতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।][২৫৪]

৩. মুহাম্মদ বিন ইউনুস রহ. বলেছেন– নেককারদের আলোচনার তুলনায় অন্তরের জন্য অধিক উপকারী কোনো জিনিস আছে বলে আমি মনে করি না।

৪. মালিক বিন দীনার রহ. বলেছেন– ঘটনাবলি বেহেশতের উপঢৌকন।

গ. হাফেজ সাখাবী রহ.-এর الإعلانُ بالتوبيخ لمَنْ ذَمَّ أهلَ التوريخ পৃ. ২০ দ্বিতীয় সংস্করণে পৃ. ৪১;

ঘ. ঐতিহাসিক মাক্কারী রহ.-এর أزهارُ الرِّيَاضِ ১ ঃ ২১ - ২২;

ঙ. ইবনুল জাওযী রহ.-এর صِفَةُ الصَّفْوَةِ-এর ভূমিকা ১ ঃ ৪৫ ও

চ. ইবনুল জাওযী রহ.-এর اللُّقَطُ فِي حكاياتِ الصالحينَ-এর ভূমিকা।

২৫২. সূরা হুদ, আয়াত নং ১২০

২৫৩. সূরা আন'আম, আয়াত নং ৯০

২৫৪. সূরা ইউসুফ, আয়াত নং ১১১

৫. সুফয়ান বিন 'উআইনা রহ. বলেছেন– নেককার লোকদের আলোচনার সময় রহমত বর্ষণ হয়।

৬. ইমাম বারাকী রহ. বলেছেন– ঘটনাবলি হলো দানা যা দ্বারা অন্তর শিকার করা হয়।

[শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর বর্ণনা শেষ হয়েছে।]

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. এ বিষয়ে লিখেন– আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে শুধু আদেশ-নিষেধ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং ঘটনাবলিও শুনিয়েছেন। এমনকি নবীদের ঘটনাবলির পাশাপাশি ওলীদের কথাও বর্ণনা করেছেন। হযরত লুকমানের উপদেশ উল্লেখ করেছেন। ফিরআউন পরিবারের ঈমানদার ব্যক্তির উপদেশ উল্লেখ করেছেন। কুরআনে এসব ঘটনা ও উপদেশ উল্লেখ করার কী প্রয়োজন ছিল? কেউ হয়তো বলবে, কুরআনে যেসব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে সেগুলোই যথেষ্ট। অন্য কোনো ঘটনা বর্ণনার প্রয়োজন নেই। তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহীহ বুখারীসহ হাদীসের অন্যান্য কিতাবে বনী ইসরাঈলের ঘটনা কেন উল্লেখ করলেন? كان رجل فيمن كان قبلكم এসব ঘটনা বর্ণনার কী প্রয়োজন ছিল? কুরআনের এত আলোচনার পর ও হাদীসের এত বিবরণের পর এতসব তিনি কেন শোনালেন? এরপর আবার সাহাবায়ে কেরামকে বলে গেলেন– حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج আর সাহাবায়ে কেরামও বনী ইসরাঈলের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আকাবিরের মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতি জানার প্রয়োজনীয়তা

তিনি আরও লিখেছেন– আকাবিরের নক্‌শে কদম থেকে দূরে সরে যাওয়া ঠিক নয়। যে অঞ্চলে যাদের মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার-প্রসার হয়েছে, তাঁরাই সে অঞ্চলের আকাবির। তবে শর্ত হলো তাঁদেরকে হতে হবে 'আল্লাহ অভিমুখী'। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

অর্থ. এবং তাঁদের পথ অনুসরণ করো যারা আমার অভিমুখী হয়েছে।[২৫৫]

---

২৫৫. সূরা লুকমান, আয়াত নং ১৫

আল্লাহ তা'আলা আরও ইরশাদ করেছেন–

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

অর্থ. ওদেরকে আল্লাহ তা'আলা সুপথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব তাঁদের পথই তুমি অনুসরণ করো।[২৫৬]

কারো অনুসরণের জন্য শরীয়তে যে মাপকাঠি নির্ধারিত আছে, তার উপস্থিতির পর নতুন কোনো শর্ত আরোপ করা ঠিক নয়।

ভারত উপমহাদেশে 'আল্লাহ অভিমুখী' হলেন আকাবিরে দেওবন্দ। শুধুই তাঁরা নন। বরং আরো অনেকে। তবে তাঁদের ত্যাগ ও সাধনা এ অঞ্চলে অনেক বেশী এবং তাঁদের সময়ে তাঁদের খেদমতই অধিক বিস্তৃত। তাছাড়া আমাদের প্রতি তাঁদের অনুগ্রহ অনেক। একদিকে তাঁদের অনুগ্রহ, অন্যদিকে এ এলাকায় তাঁদের শিক্ষাদীক্ষার চর্চা। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমরা তাঁদের অনুসরণ করি। তবে সর্বপ্রথম আমরা দেখে নিয়েছি যে, তাঁদের মধ্যে শরীয়তের মানদণ্ড বিদ্যমান আছে কি-না। তা আছে। কারণ যেভাবে তাঁরা 'আল্লাহ অভিমুখী', তেমনি তাঁরা আল্লাহ তা'আলার প্রদর্শিত সুপথের উপর প্রতিষ্ঠিত আছেন।

আর অনুসরণের ক্ষেত্রে 'স্খলন' সবসময়ই ব্যতিক্রম থাকে। স্খলনের অনুসরণ করা হয় না। অতএব যখন শরীয়তের মানদণ্ড বিদ্যমান আছে, ওদিকে স্খলন ব্যতিক্রম, তখন কেউ নজদের নাকি অন্য কোনো অঞ্চলের, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই। নজদওয়ালারা নজদী শায়খের অনুসরণ করুক। আর আমাদের অঞ্চলে যাদের শিক্ষাদীক্ষা পরিচিত ও প্রচলিত এবং আমাদের মায়েদের কোল থেকেই যাদের ধর্মীয় তত্ত্বাবধান আমরা পেয়ে এসেছি, আমরা তাঁদের অনুসরণ করব। এটাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতা থেকে আমরা সরে আসতাম যদি তাঁদের মধ্যে শরীয়তের মাপকাঠি বিদ্যমান না থাকত। ...

ধীরে ধীরে কেবলই আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। পূর্বসূরীদের জীবনচরিত ও বাণীসমগ্র অধ্যয়ন করা বন্ধ করে দিচ্ছি। ফলে এখন আমাদের তালিবুল ইলম ভাইয়েরা

---

[২৫৬]. সূরা আন'আম, আয়াত নং ৯০

আকাবিরের কে কোন্ যুগের, সে কথাই বলতে পারে না। অথচ আমাদের কর্তব্য ছিল অন্তত সনদের সকলের জীবনী অধ্যয়ন করা এবং তাঁদের জন্ম-মৃত্যু সন মুখস্থ রাখা। সাহাবায়ে কেরাম থেকে নিয়ে 'খায়রুল কুরূনে'র তিন 'কুরূন' এবং আমাদের নিকট অতীতের আকাবির উলামায়ে কেরামের জীবনী অধ্যয়ন করা এবং তাঁদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া। তাসাওউফ বা সুলূক ও ইহসানের সবক যাদের থেকে গ্রহণ করেছি, ইলমে তাফসীর, ইলমে হাদীস, ইলমে ফিক্হ এবং এ সমস্ত ইলমের সহযোগী অন্যান্য ইলম যাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি, তাঁদের জীবনী পড়া থাকা জরুরী। তাঁদের বাণীসমগ্র ও পত্রসমগ্র অধ্যয়নে থাকা অত্যাবশ্যক।

কিছু জীবনচরিত-এর তালিকা

তারপর তিনি লিখেন– যদি সকলের জীবনী বিস্তারিতভাবে অধ্যয়ন করার সুযোগ না হয়, তাহলে কমপক্ষে এ বিষয়ের যেসকল সমগ্র পাওয়া যায়, সেগুলো অধ্যয়ন করা আবশ্যক। যেমন–

١. تاریخ دعوت وعزیمت

٢. علماء ہند کا شاندار ماضی

٣. علماء حق

এমনিভাবে আরবীতে نُزْهَةُ الخواطِر বা الإعْلامُ بِمَنْ في الْهِنْدِ مِنَ الأَعْلامِ و رِجَالُ الهِنْدِ والسِّنْدِ

আরেকটি হলো স্বতন্ত্র জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন করা। যেমন–

١. سَوَانح قاسمی

٢. تذكرةُ الرَّشِيدِ

٣. تذكرةُ الخليلِ

٤. اشْرَفُ السَّوَانِح

٥. نَقْشِ حیات

٦. نَفْحَةُ العَنْبَرِ في سِيْرَةِ الشيخ أَنْوَر

٧. آپ بیتی

তেমনি বড়দের কারো বিষয়ে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা। যেমন-

১. البلاغ، مفتی اعظم نمبر

২. البلاغ، عارفی نمبر

৩. بینات، یوسف بنوری نمبر

৪. بینات، شہید (یوسف لدھیانوی) نمبر

৫. بینات جمیل خان

৬. الحق، عبدالحق نمبر

৭. الفرقان، شاہ ولی اللہ نمبر

৮. الفرقان، مجدد الف ثانی نمبر

৯. الفرقان، شیخ الحدیث زکریا نمبر

১০. الفرقان، حضرتجی یوسف نمبر

আর احوال وآثار নামে নুরুল হাসান রাশেদ কান্ধলবী দা. বা. যে পত্রিকা বের করেন, তারও তো অনেক সংখ্যা বের হয়ে গেছে। হযরত নানূনবী সম্পর্কে, হযরত গাঙ্গুহী সম্পর্কে, শাহ ইসমাঈল শহীদ সম্পর্কে, এনামুল হাসান কান্ধলবী সম্পর্কে, আর হযরত শায়খুল হিন্দ সম্পর্কে সামনে আসছে।

سوانح حضرت شیخ الحدیث زکریا

حضرت مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت

سوانح حضرت مولانا یوسف کاندھلوی

এ সব জীবনচরিতের সবই হেদায়েত ও নূর। কারণ এ সব তাঁদের জীবনীচরিত, যারা সুন্নাহর আলোকে নিজেদের জীবনকে আলোকিত করেছেন।

তো আপনার পড়ার একটি বিষয় হতে হবে আকাবিরের জীবনচরিত, বক্তৃতাসমগ্র, বাণীসমগ্র ও পত্রসমগ্র। এভাবে আপনি আকাবিরের মানসিকতা পাবেন। আর তা ঐ মানসিকতা, যা প্রত্যেক যুগের আল্লাহ অভিমুখী বান্দাদের মানসিকতা। ...

হাঁ, এসব বিষয় অধ্যয়ন করতে হবে রুটিন তৈরি করে। নিজের অধ্যয়নের

তালিকায় হাদীস যেমন থাকবে, সাহাবা ও তাবেঈদের জীবনচরিতও তেমনি থাকবে। এরপর দ্বীনের মৌলিক বিষয়ের অধ্যয়নও থাকবে। এমন মানসিকতা রাখা যাবে না যে, কেবল এগুলোই অধ্যয়নের বিষয়। তেলাওয়াত ও যিকির-আযকারের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। দিনরাত শুধু জীবনচরিত অধ্যয়নের মধ্যেই থাকবে। না, বরং ওগুলো মূল। এগুলো সেগুলোর সহায়ক। এগুলো বাদও দেয়া যাবে না। আবার একেবারে মূলও বানিয়ে ফেলা যাবে না।

জীবনচরিত অধ্যয়নের মূলনীতি

তিনি আরো লিখেছেন– আকাবিরের জীবনচরিত অধ্যয়নের কিছু মূলনীতি আছে। সেসব জানার জন্য অধ্যয়ন করা যায় مجالس مفتی اعظم নামে মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর যে মজলিস তাঁর খলীফা মুফতী আব্দুর রউফ ছাহেব সংকলন করেছেন, তার শুরুতে লেখা তাকী ছাহেব হুজুরের ভূমিকা। অনুরূপভাবে اشرف السوانح-এর শুরুতে হযরত থানবী রহ.-এর ভূমিকা এবং مجالس حکیم الامت-এর শুরুতে মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ.-এর ভূমিকাগুলো।

জীবনচরিত, বক্তৃতাসমগ্র, বাণীসমগ্র ও পত্রসমগ্র অধ্যয়নের ক্ষেত্রে একটি মৌলিক লক্ষণীয় দিক হলো, এসব কিতাবে অনিচ্ছাকৃতভাবেই কিছু শিথিলতা থাকে। যেহেতু এসব হাদীস, ফিকহ বা তাফসীরের কিতাব নয়, তাই অনেক সময় এগুলোতে অজান্তেই কিছু শিথিলতা থেকে যায়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এগুলো যার জীবনচরিত, এগুলোকে তাঁর রচনার মান দেয়া যাবে না। তাছাড়া শিথিলতা, উদাসীনতা ও স্খলনের কথা তো এমনিতেই ভিন্ন। এসবের অনুসরণ করার কোনো সুযোগ নেই।

আরেকটি কথা হলো এসব কিতাবে আকাবিরের লালিত চিন্তা, ইলমী অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আদব ও আখলাকের অনেক আদর্শ যেমন আপনি পাবেন, তেমনি ব্যক্তিগত কিছু রুচিও পাবেন। তো সেই রুচিগুলোকে রুচির মানেই রাখতে হবে। তার উপরে উঠানো যাবে না এবং অন্যের উপরও সেগুলো চাপানো যাবে না। আর কীভাবেই বা চাপাবেন, দশজন আকাবিরের জীবনচরিত অধ্যয়ন করলে কোনো বিষয়ে দশ রকমের স্বভাবগত রুচিও পেতে পারেন। সেক্ষেত্রে কারটা কার উপর চাপাবেন?

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো, আকাবিরের অনুসরণ ও আলোচনার ক্ষেত্রে

'স্বদলপ্রীতি'-র পিছনে পড়া যাবে না। প্রথম কথা যখন এটাই যে, তাঁরা সকলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত, এরপর মানুষ হিসাবে প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন রং ও ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব থাকতেই পারে। এখন আপনার কাছে কারো রুচি ও স্বভাব ভালো লাগল এবং লাগতেই পারে। এগুলো স্বভাবগত বিষয়। স্বভাবসংশ্লিষ্ট বৈধ বিষয়। এখানে কারো স্বভাব কারো কাছে ভালো লাগা দোষের কিছু নয়। কিন্তু তাই বলে আপনি সেই রুচিকে অন্য সকলের রুচির উপর প্রাধান্য দিবেন এবং এমনভাবে প্রাধান্য দিবেন যে, অন্যদের ত্রুটি সাব্যস্ত হয়, তা ঠিক নয়।

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ যখন একটি বাস্তবতা, তখন একজনকে অন্যজনের উপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে এমন রীতি অবলম্বন করার সুযোগ নেই, যা দ্বারা অন্য কারো ত্রুটির ধারণা হয়। এটা বলা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে, যেখানে কারো অধিক উত্তম হওয়ার সরাসরি প্রমাণ বিদ্যমান আছে। তাহলে যেখানে অধিক উত্তম কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নেই সেখানে?

কারো অধিক উত্তম হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যখন এমন সতর্ক প্রকাশভঙ্গিতে তা প্রকাশ করতে হয় যাতে অন্যদের ত্রুটির ধারণা না হয়, তখন যার উত্তম হওয়ার কোনো প্রমাণ বিদ্যমান নেই, সেখানে তাঁর প্রতি মুগ্ধতা কীভাবে বর্ণনা করতে হবে?

এখন দেখুন, আকাবিরের কে কার থেকে অধিক উত্তম সে বিষয়ে কোনো প্রমাণ আপনার কাছে কি না। এক তো হলো- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, তা অদৃশ্যের বিষয়। কারণ, তাকওয়ার যেসব গোপন দিক রয়েছে তা সম্পূর্ণই অদৃশ্য। আর বাহ্যিক যেসব দিক আছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে কি আপনি কারো চব্বিশ ঘণ্টা সময়ের পুরোটাই দেখেন? তাঁর সব অবস্থাই কি আপনার সামনে থাকে? তাঁর বাহ্যিক দিকগুলোও তো আপনার সামনে নেই। এমতাবস্থায় আপনি কোন্ নিশ্চিত প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিবেন? তাঁকে অন্যের উপর প্রাধান্য দিবেন?

বাকি থাকল কারো জ্ঞান ও গুণের বিষয়, তো কতজনের অবস্থা আপনি অধ্যয়ন করতে পারবেন? আপনার নিজের খোঁজখবরই কী আপনি ঠিক মতো রাখতে পারেন? আপনি কি জানেন আপনার চৌহদ্দি কী?

কারো জীবনীতে তাঁর কোনো গুণ ও রুচি আমার ভালো লাগল, আর সেই ভালো লাগাটাই মানদণ্ড হয়ে গেল, তাই আমি তাঁকে অন্যের উপর প্রাধান্য দেব, সেই প্রাধান্যদানের উপর পীড়াপীড়ি করব, অন্যদের সমালোচনা করব, সেগুলো নিয়ে অন্যদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ করব, এই 'স্বদলপ্রীতি' জায়েজ নেই।

যিনি আমার পছন্দের তাঁর কোনো স্খলন আমার কাছে স্খলন নয়, কেউ যদি সেই স্খলনের জন্য আদবের সাথে সতর্ক করেন সেটা আমি পছন্দ করি না, এটা স্বদলপ্রীতি। প্রমাণ ব্যতীত প্রাধান্যদান বা ধারণার ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে প্রাধান্যদান সবই স্বদলপ্রীতি। একজনের রুচিকে অন্যের উপর চাপানো স্বদলপ্রীতি। একজনের ইজতিহাদকে অন্যজনের ইজতিহাদের খণ্ডন হিসাবে পেশ করা এবং একজনের ইজতিহাদকে জোরপূর্বক অন্যজনের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করা স্বদলপ্রীতি। যেসকল বিষয়ে আকাবিরগণের মতপার্থক্য রয়েছে, সেসকল ক্ষেত্রে কোনো একদিকে ধাবিত হয়ে অন্যদিকের বুযুর্গদের ব্যাপারে কটূক্তি করা, এমনকি কুধারণায় লিপ্ত হওয়াও স্বদলপ্রীতি। এক্ষেত্রে অনুসরণীয় পথ সেটিই, যা শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ. তাঁর تَكْمِلَةُ الاعتدالِ এবং الاعتدالُ فِي مَرَاتِبِ الرجال উল্লেখ করেছেন।

কেউ আমার পছন্দের, তাই অন্যের গীবত করব, তার সাথে যার শত্রুতা আমার সাথেও তার শত্রুতা হয়ে যাবে, এসব স্বদলপ্রীতি।

স্বদলপ্রীতি খুবই গোপন ব্যাধি। অনেক সময় অনুভূতিই থাকেনা যে, আমার মাঝে স্বদলপ্রীতি আছে। প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার স্বদলপ্রীতি থেকেই আমাদেরকে বাঁচতে হবে।

তো মূল কথা ছিল, আকাবিরের মানসিকতা ও কর্মপদ্ধতি থেকে আমরা দূরে সরে যাচ্ছি। তাই তাঁদের জীবনচরিতের অধ্যয়ন আমাদের বাড়াতে হবে এবং বাড়াবাড়ি, শিথিলতা ও সব ধরনের স্বদলপ্রীতি হতে মুক্ত হয়ে তাঁদের জীবনচরিত থেকে আমাদের উপকৃত হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে পূর্ণ তাওফীক দান করুন! আমীন!![২৫৭]

---

[২৫৭]. মাসিক "আলকাউসার" জুমাদাল উলা ১৪৩৫ হি. / মার্চ ২০১৪ ঈ. পৃ. ৩৭ - ৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাকওয়া-তা'আল্লুক মা'আল্লাহ, তাওবা-ইস্তেগফার, দু'আ-মুনাজাত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ইলম হলো এক নূর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব হলো এক মহান পদমর্যাদা। একজন মাদরাসা-শিক্ষার্থী সেই নূর অর্জন করার চেষ্টা করে এবং সেই পদমর্যাদা লাভের জন্য পরিশ্রম করে। তাই তাকে এ বাস্তবতাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, ইলমের নূর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদমর্যাদা লাভের জন্য মেহনত ও পরিশ্রম ছাড়াও আরেকটি অপরিহার্য শর্ত আছে। তাহলো, তা'আল্লুক মা'আল্লাহ ও তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক ও তাকওয়া ছাড়া ইলমের নূর লাভ করা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্বের পদমর্যাদা অর্জন করা সম্ভব নয়।

তাকে গুনাহের খাবাছাত ও গান্দেগি থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। তাকওয়া ও তা'আল্লুক মা'আল্লাহর পরিপন্থি সকল চিন্তাচেতনা ও কাজ-কর্ম থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। কিন্তু নফসের ধোঁকা ও শয়তানের প্রতারণার কারণে অনেক সময় মানুষ খাবাছাত ও গান্দেগির শিকার হয়ে পড়ে এবং তাকওয়া ও তা'আল্লুক মা'আল্লাহর পরিপন্থি কল্পনা ও কাজে জড়িয়ে যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা 'তাওবা-ইস্তেগফার'রের দরজা খোলা রেখেছেন। বান্দার জন্য গুনাহ ও গান্দেগি থেকে পাক-সাফ হওয়ার এবং পুনরায় তাকওয়া ও তা'আল্লুক মা'আল্লাহভিত্তিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগ রেখেছেন। আল্লাহ মানুষকে তাঁর দয়া ও ক্ষমা থেকে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন।

একজন শিক্ষার্থীর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা আবশ্যক এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গুণাবলিতে শিক্ষার্থীর বিশেষ অংশ থাকা জরুরি। হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী রহ. বলেছেন, 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচে' প্রবল গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর দু'আ-মুনাজাত। পৃথিবীতে কেউ আল্লাহর নিকট এত বেশি চায় নি, যে পরিমাণ তিনি চেয়েছেন। তিনি যে

ধরনের হৃদয়োত্তাপ ও কোমলতার সাথে এবং অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতার ভঙ্গিতে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ-মুনাজাত করেছেন, সেভাবে কেউ দু'আ-মুনাজাত করেনি। হাদীসের কিতাবসমূহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে শত শত দু'আ বর্ণিত আছে সেগুলো চিন্তা করে পড়লে অনুমান করা যাবে, তাঁর প্রতিটি দু'আ কী পরিমাণ আত্মনিবেদেন ও আবদিয়াতের প্রাণরসে পূর্ণ। এই দু'আগুলো তাঁর অতি বিশেষ উত্তরাধিকার সম্পদ।' অতএব প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য হাদীসে বর্ণিত দু'আ-মুনাজাতের প্রতিও বিশেষ মনোযোগী হওয়া অতি আবশ্যক।

বইয়ের শুরুতে 'আত্মপরিচয় লাভ' শিরোনামের অধীনে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী রহ.-এর যে ভাষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ উল্লেখ করা হয়েছে, উক্ত ভাষণে তিনি তাকওয়া ও তা'আল্লুক মা'আল্লাহ এবং তাওবা-ইস্তেগফার ও দু'আ-মুনাজাত প্রসঙ্গেও দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। আলোচ্য শিরোনামের অধীনে আমি হযরতের উক্ত আলোচনা উর্দূ থেকে অনুবাদ করে হুবহু তুলে ধরা উপযোগী মনে করছি। এতক্ষণ ভূমিকাস্বরূপ যে কথাগুলো লিখলাম, উক্ত কথাগুলোও হযরতের আলোচ্য বক্তব্যের ছায়া অবলম্বনে লিখেছি। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে যথাযথ উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন! আমীন!! তিনি বলেন–

তাকওয়া ও তা'আল্লুক মা'আল্লাহ

এরপর আমার ভাইদের প্রতি আমার তৃতীয় উপদেশ বা পরামর্শ এই যে, এই ইলম হলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ উত্তরাধিকার সম্পদ। আর নববী দায়িত্ব সম্পাদনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব করা হলো আল্লাহ তা'আলার অতি বিশেষ নেয়ামত। এই নেয়ামত শুধু মেহনত ও পরিশ্রম দ্বারা কিছুতেই হাসিল করা সম্ভব নয়। পৃথিবীর অন্যান্য জ্ঞান যথা চিকিৎসা, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে দক্ষতা ও পূর্ণতা অর্জন করা মেধা ও মেহনত দ্বারা হতে পারে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ইলম হলো এক নূর এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব হলো এক মহান পদমর্যাদা। এই নূর ও পদমর্যাদা লাভের জন্য মেহনত ও পরিশ্রম ছাড়াও আরেকটি অপরিহার্য শর্ত আছে। তাহলো, তা'আল্লুক মা'আল্লাহ ও তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক ও তাকওয়া ছাড়া ইলমের

নূর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্বের পদমর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়।

তাই আমি পূর্ণ আন্তরিকতা ও মহব্বতের সাথে তোমাদেরকে বলছি, নিজেদের জীবনকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কওয়ালা ও তাকওয়াওয়ালা জীবন বানাও। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের বিশেষ মাধ্যম হলো নামায, তেলাওয়াত, যিকির প্রভৃতি ইবাদত। তবে শর্ত হলো নামায, তেলাওয়াত ও যিকিরের শুধু ছূরত যেন না হয়। বরং সেগুলো যেন হাকীকী ও জানদার হয়।[২৫৮]

আমার এই বিশ্বাস আছে যে, তোমরা সকলে নামায পড় ও তেলাওয়াত কর। আমি কয়েকদিন ধরে গুজরাটের মাদরাসাগুলোতেই সফর করছি। আমি যেখানেই রাত্রিযাপন করেছি, প্রায় প্রত্যেক স্থানে ও প্রত্যেক মাদরাসায় লক্ষ করেছি, আমাদের ছাত্ররা ফজর নামাযের পর কুরআন তেলাওয়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ দৃশ্য দেখে আমি অনেক আনন্দিত হয়েছি। কিন্তু এ বিষয়টি স্বয়ং তোমাদের ভেবে দেখার বিষয় যে, হাদীস ও তাফসীরের ছাত্রদের নামায ও তেলাওয়াত যেমন হওয়া উচিত, তোমাদের নামায ও তেলাওয়াত কি তেমন হয়? যদি তেমনই হয়, তাহলে তো অনেক সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমার ধারণা ও অভিজ্ঞতা হলো, সাধারণভাবে আমাদের ছাত্রদের নামায ও তেলাওয়াত তেমনই হয়, যেমন আমাদের সেসকল সাধারণ মুসলমানদের হয় যারা সূরা-কেরাতের অর্থ জানে না এবং ছানা-তাছবীহ ও তাকবীরের মর্ম বোঝে না।

---

[২৫৮]. হযরত নো'মানী রহ.-এর আলোচ্য ভাষণের অনুবাদে আদীব হুজুর লিখেছেন– ছূরত এক জিনিস, হাকীকত অন্য জিনিস। রন্ধন-প্রণালী শিক্ষার বই দেখেছি, সেখানে বিভিন্ন খাবারের সাজানো ডিসের ছবি আছে, কিন্তু তাতে কি স্বাদ আছে? তাতে কি ক্ষুধা দূর হয়? হয় না, কারণ এগুলো খাদ্য নয়, খাদ্যের ছবি মাত্র। আসল খাদ্য যখন তোমার সামনে রাখা হবে, তখন তার ঘ্রাণেও স্বাদ, মুখে দিলেও স্বাদ, আবার তা ক্ষুধাও দূর করবে। ছূরত ও হাকীকতের এই হলো পার্থক্য। তো আমাদের ইবাদত যেন রসমের ইবাদত না হয়, শুধু বাহ্যিক আকার-আকৃতির ইবাদত না হয়। তাতে যেন রূহ ও হাকীকত থাকে। তাহলেই ইবাদত দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সম্পর্ক ও ভালোবাসা সৃষ্টি হবে, খালেকের সঙ্গে মাখলুকের তা'আল্লুক ও মুহাব্বত পয়দা হবে।

কেমন হওয়া উচিত তালিবানে ইলমের নামায ও তেলাওয়াত?

আমার ভাইয়েরা! তোমরা হয়ত মিশকাত শরীফে এই হাদীসটি পড়েছ- إِنَّهُ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ অর্থাৎ আল্লাহর কোনো বান্দা যখন নামাযের জন্য দণ্ডায়মান হয় এবং নামায পড়ে, তখন সে আল্লাহর দরবারে থাকে, তাঁর সঙ্গে কথা বলে এবং তাঁকে নিজের মনের কথা বলে।

অনুরূপভাবে হয়ত তোমরা সেই হাদীসটিও পড়েছ যাতে বলা হয়েছে, নামাযে বান্দা যখন সূরা ফাতেহা পড়ে, তখন প্রতিটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তর দেন। বান্দা যখন اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ। [সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর উপযোগী যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রতিপালক] বলে, তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন- حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ [আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে]। বান্দা যখন বলে- اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ। [যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়], তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন- أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ [আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে]। বান্দা যখন বলে- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ [যিনি প্রতিফল দিবসের মালিক], তখন আল্লাহ তা'আলা বলেন- مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ [আমার বান্দা আমাকে মহিমান্বিত করেছে]। পরবর্তী পুরো হাদীস তোমাদের আশাকরি স্মরণ আছে।

আল্লাহর ওয়াস্তে ভেবে দেখো, যেসকল ভাইয়েরা এই হাদীস পড়েছে এবং তারা লেখাপড়ার এই স্তরে পৌঁছে গেছে যে, নামাযে যা যা পড়া হয় তারা সেগুলোর অর্থ ও উদ্দেশ্য বোঝে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা যদি সাধারণ মুসলমানদের মতো –যারা এক আয়াতের অর্থও বোঝে না– আল্লাহর দিকে মনোযোগ এবং অর্থ ও উদ্দেশ্যের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে নামায পড়ে, তাহলে তা তাদের জন্য কত বড় ক্ষতির কথা! তারা নিজেদের প্রতি কত বড় অবিচার করছে! এর উদাহরণ সম্পূর্ণ ঐ ব্যক্তির মতো, যার পকেটে আছে হাজার-হাজার বা লাখ-লাখ টাকা, অথচ সে সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় কাগজ মনে করে সেগুলো দ্বারা উপকৃত হয় না।

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এমন ইলম দান করেছেন যে, যখন তোমরা নামাযের জন্য আল্লাহর দরবারে দণ্ডায়মান হবে,

তখন إِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ [সে তার প্রতিপালকের সঙ্গে গোপনকথা বলে]-এর অবস্থার সঙ্গে নামায পড়তে পার। যখন মুখে الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ বলবে, তখন তোমাদের মন আল্লাহর পক্ষ থেকে حَمِدَنِيْ عَبْدِيْ-এর আওয়াজ শোনবে। অনুরূপভাবে যখন مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ও الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বলবে, তখন তোমাদের মন مَجَّدَنِيْ عَبْدِيْ ও أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِيْ-এর আওয়াজ শোনবে। যখন إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ বলবে, তখন هٰذَا بَيْنِيْ وَبَيْنَ عَبْدِيْ، وَلِعَبْدِيْ مَا سَأَلَ [এটা আমার ও আমার বান্দার একান্ত বিষয়। আমার বান্দা যা চেয়েছে আমি তা তাকে অবশ্যই দিব]-এর সুসংবাদ শোনবে।

তদ্রূপ যখন তোমরা তেলাওয়াত করবে, তখন তোমাদের ধ্যান হবে যে, আল্লাহ আমাকে দেখছেন এবং আমার তেলাওয়াত শোনছেন। বোঝার চেষ্টা করো, আল্লাহ কী বলছেন। তারপর যখন সেসকল আয়াত আসে যেগুলোতে আল্লাহ তা'আলার দয়া ও রহমত বা জান্নাতের আলোচনা আছে, তখন আল্লাহর নিকট সেগুলো পাওয়ার জন্য দু'আ করো। আর যেখানে আল্লাহ তা'আলার আযাব-গযব ও জাহান্নামের আলোচনা আসে, সেখানে আল্লাহ তা'আলার নিকট পানাহ চাও। হাদীস ও সীরাতের কিতাবে তোমরা পড়ে থাকবে– এমনই ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায ও তেলাওয়াত।

তো ভাইয়েরা! তোমরা যদি শুধু এতটুকু কর যে, সেভাবে নামায পড় যেভাবে তোমাদের নামায পড়া উচিত এবং সেভাবে তেলাওয়াত কর যেভাবে তোমাদের তেলাওয়াত করা উচিত, তাহলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি হওয়ার জন্য ইনশাআল্লাহ এতটুকুই যথেষ্ট। আর যদি তার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ যিকির ও তাসবীহের অভ্যাসও করে নাও, তাহলে তো ইনশাআল্লাহ নূরই নূর। আল্লাহর ওয়াস্তে এ পথে চলে দেখো, আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের সঙ্গে কী আচরণ করা হয়। আমার ভাইয়েরা! এটাই ওলী হওয়ার পথ। আর এ পথে চলা অন্যদের তুলনায় তোমাদের জন্য অনেক সহজ।

ছাত্র জীবনে বাইআত হওয়া না হওয়া

তোমরা হয়ত উস্তাদবৃন্দ ও বড়দের থেকে শুনেছ যে, হযরত গঙ্গুহী রহ. ও অন্যান্য আকাবিরগণ ছাত্রদেরকে বাইআত করতেন না। 'শিক্ষাজীবন' সমাপ্ত করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা ছাত্রদেরকে তাসাওউফের যিকির-শোগল থেকে বিরত রাখতেন। হযরত থানবী রহ. স্বয়ং নিজের ঘটনা লিখেছেন– ছাত্রজীবনে আমি হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর নিকট বাইআতের দরখাস্ত করেছি। তিনি দরখাস্ত কবুল না করে বললেন, এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের ইলমের ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা থেকে সরিয়ে শয়তান অন্য একটি কাজে লাগিয়ে দিতে চায়, যেন কুরআন-হাদীসের ইলম অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আসল কথা হলো, তখন আমাদের ইলমী অঙ্গনে যে বাইআতের প্রচলন ছিল তা এখনকার মতো ছিল না। এখন লোকজন বুযুর্গদের হাতে বাইআত হয়ে যায়। তারপর কাজের কাজ কিছুই করে না। কিন্তু তখন বাইআত হওয়ার পর মুরিদ সুলূক ও আধ্যাত্মিকতার দীর্ঘ সাধনা শুরু করে দিত। এ অবস্থায় হযরত থানবী রহ.-এর মতো হযরতগণ যদি ছাত্রজীবনে বাইআত হয়ে যেতেন, তাহলে যিকির-শোগলের ধারবাহিকাও শুরু হয়ে যেত। তখন যিকিরের প্রতিক্রিয়া ও নূর এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন অবস্থার ধারাবাহিকতাও শুরু হয়ে যেত। এর অনিবার্য ফল হিসেবে ইলমের প্রতি মনোযোগ হ্রাস পেয়ে যেত। কারণ, যে ব্যক্তি যিকিরের স্বাদ পেয়ে যায়, তার কাছে যিকিরের তুলনায় তৃপ্তিকর ও অধিক স্বাদের কোনো জিনিস থাকে না। সে তখন শুধু যিকিরের লোক হয়ে যায়। তখন হেদায়া, তাওযীহ, তালবীহ, বায়যাবী, উমূরে আম্মাহ ও খায়ালী-এর মতো জটিল ও রসহীন কিতাবে মন দিতে পারে না। সে তখন অন্য জগতের হয়ে যায়।

তো হযরত থানবী রহ. যদি ছাত্রজীবনেই বাইআত হয়ে তাসাওউফের যিকির-শোগলে লেগে যেতেন, তাহলে শুধু একজন বুযুর্গই হতেন। ইলমের সেই স্তর কিছুতেই অর্জন করতে পারতেন না, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন। তিনি হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদে মিল্লাত হতেন না। তাঁর কলমে অসংখ্য সংশোধনমূলক কিতাব উম্মত লাভ করত না, যেগুলো ইনশাআল্লাহ বহু যুগ পর্যন্ত সরল পথের দিশা দান করতে থাকবে।

তো আমার ভাইয়েরা! হযরত গঙ্গুহী রহ. প্রমুখ আমাদের আকাবিরগণ ছাত্রদেরকে এ জন্য বাইআত করতেন না, যাতে তারা যিকির-শোগলে নিমগ্ন হয়ে ইলম থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। এর অর্থ কিছুতেই এই ছিল না যে, ছাত্রদের জন্য তা'আল্লুক মা'আল্লাহ এবং তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া তখনকার যুগে বর্তমানের মতো এতো অধিক পরিমাণে মাদরাসা ছিল না। তখন তো দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরেরও শুরু যুগ ছিল। আর আমরা আমাদের বড়দের কাছে শুনেছি, তখন অবস্থা এই ছিল যে, দারুল উলূম দেওবন্দের পাহারাদারও ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ হতেন। সেখানের পুরো পরিবেশ ছিল তা'আল্লুক মা'আল্লাহ ও তাকওয়ার পরিবেশ। ছাত্রজীবনে যে পরিমাণ তা'আল্লুক মা'আল্লাহ, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন, মাদরাসার পরিবেশে থাকা দ্বারা ততটুকু এমনিতেই অর্জন হয়ে যেত।

হযরত মাওলানা করীম বখ্শ সাম্ভলী রহ. আমার উস্তাদ ছিলেন। এ দিক থেকে তিনি আমার প্রতি সবচে' অনুগ্রহশীল ছিলেন যে, অধিকাংশ দরসী কিতাব আমি তাঁর কাছেই পড়েছি। তিনি আমার তা'লীমী মুরুব্বী ও শিক্ষা-অভিভাবকও ছিলেন। আমার আব্বাজান রহ. আমাকে তাঁর হাতে সোপর্দ করে দিয়েছিলেন। আমি চার বছর তাঁর নিকট পড়েছি। তাঁর কামরাতেই আমি থাকতাম ও ঘুমাতাম। তিনি শুধু শেষ দু'বছর দারুল উলূম দেওবন্দে পড়েছেন। তিনি মাওলানা সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. ও মাওলানা মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রহ.-এর সহপাঠীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর যুগও পেয়েছিলেন। কিন্তু আমার জানা নেই, কী কারণে তিনি সুলূক ও যিকির-শোগলের দিকে মোটেই মনোনিবেশ করেন নি। তিনি কোনো বুযুর্গের হাতে বাইআত হন নি। কিন্তু শুধু দারুল উলূম দেওবন্দে পড়া এবং হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. প্রমুখ উস্তাদবৃন্দের ছোহবত ও মহব্বতের ফলে তাঁর এমন তাকওয়া অর্জন হয়েছিল যে, আমার যদি ততটুকু অর্জন হয়ে যেত তাহলে মনে করতাম, আমার সবকিছু অর্জন হয়ে গেছে।

কিন্তু এখন আমাদের মাদরাসাগুলোতে সেই পরিবেশ আর নেই। তাকওয়া ও সংশোধন এবং তা'আল্লুক মা'আল্লাহর জন্য মাদরাসায় থাকা ও লেখাপড়া করা এখন যথেষ্ট নয়। বর্তমানে মাদরাসাগুলোর পরিবেশ তো আমার-

তোমার সামনেই রয়েছে। এ কারণে স্বয়ং হযরত পঞ্জুহী রহ.-এর খলীফাগণ ও তাঁদের খলীফাগণ নিজেদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করেছেন এবং ছাত্রদেরও বাইআত গ্রহণ করা শুরু করেছেন।

তাই তোমাদেরকে আন্তরিকতার সাথে গুরুত্ব দিয়ে আমি এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, তোমরা এই ছাত্রজীবনেই কোনো ছাহেবে নিসবত বুযুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক করে কমপক্ষে নামায, তেলাওয়াত ও অল্প পরিমাণ যিকিরের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাও। যদি তোমরা এ ব্যাপারে উদাসীন হও, তাহলে বুখারী, মুসলিম, জালালাইন, বাইযাবী পড়লেও শয়তান তোমাদেরকে তার নিজের বানিয়ে ফেলবে।

আমার ভাইয়েরা! তোমাদেরকে একটি প্রয়োজনীয় কথা বলছি– আলেম-উলামা ও তালেবে ইলম নামে আমাদের যে সম্প্রদায়, আমাদের সামনে দু'টি মাত্র পথ আছে– হয় আমরা আল্লাহওয়ালা হব, নচেৎ আল্লাহ না করুন, শয়তানের হব। আমাদের জন্য মধ্যবর্তী কোনো পথ নেই। তাই আমি বলছি, এখন থেকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো। অর্থাৎ যেসকল জিনিসকে আল্লাহ তা'আলা মন্দ ও গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন, সেগুলো থেকে নিজকে নিরাপদ রাখতে চেষ্টা করো। আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার জন্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্য এটি অপরিহার্য শর্ত।

আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধের অধিকারী। কেউ যদি সেসকল আচরণ ও উচ্চারণ থেকে আত্মরক্ষা করার চিন্তা না করে যেগুলো আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ, তাহলে সে নিজের জন্য আল্লাহর রহমত লাভের ও তাঁর নিকট মাকবুল হওয়ার দরজা বন্ধ করে দিল।

আমার ভাইয়েরা! তোমাদের পদমর্যাদা হলো নবুয়তের উত্তরাধিকার ও প্রতিনিধিত্বের পদমর্যাদা। এর জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে। এর জন্য শর্ত হলো নোংরা ও হারাম জিনিসসমূহ থেকে নিজেদের জীবনকে যথাসম্ভব পবিত্র রাখা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ [পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারবে না।][২৫৯]

তাওবা ও ইস্তেগফার

এখানে এ বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করা উচিত যে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার সাচ্চা নিয়ত করা সত্ত্বেও নফসের ধোঁকা ও শয়তানের প্ররোচনায় মানুষ কখনো কখনো গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহর তাওফীকে নিজের ভুলের অনুভূতি আসলে আল্লাহর সামনে কাঁদে এবং তাওবা-ইস্তিগফার করে। কারো অবস্থা এমন হলে তা ইনশাআল্লাহ মোটেই ক্ষতিকর নয়। এমন গুনাহের ঘটনা জীবনে বারবার হলেও তা ক্ষতিকর নয়।[২৬০] তবে শর্ত হলো তাওবা-ইস্তিগফার হতে হবে খাঁটি মনে। আল্লাহ্

---

২৫৯. আদীব হুজুর লিখেছেন– যদিও এর বাহ্যিক অর্থ এই যে, অযু-গোসলের তাহারাত ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা যাবে না। তবে এর অন্তর্নিহিত মর্ম এটাও যে, যারা গুনাহের খাবাছাত ও গান্দেগি থেকে পবিত্র নয়, তারা কুরআনের ইলম ও নূরানিয়াতের ধারেকাছেও আসতে পারবে না। তারা কিছুতেই কুরআনের ধারক-বাহক হতে পারবে না। সারা জীবন তারা মাদরাসায় পড়ে থাকুক, সারা জীবন তারা কিতাব পড়তে ও পড়াতে থাকুক, আল্লাহর নযরে তো তারা অপবিত্র, গান্দা, খাবীছ; সুতরাং কুরআনের ধারক ও বাহক হওয়ার মর্যাদা তারা কিছুতেই অর্জন করতে পারবে না। সুতরাং গুনাহ থেকে, খাবাছাত ও গান্দেগি থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতেই হবে।

২৬০. আদীব হুজুর লিখেছেন– নিরাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া মুমিনের কাজ নয়। শয়তান তো এটাই চায় যে, বান্দা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে বরবাদির চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যাক, যেখান থেকে ফেরার কোনো রাস্তা নেই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বান্দাকে অভয় বাণী শুনিয়েছেন– لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ (তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না) [আল্লাহ তা'আলা আরো শুনিয়েছেন– وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّوْنَ অর্থ. পথভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া আর কে আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়?]

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা তো এতদূর বলেছেন, বান্দা যদি গুনাহ ও গান্দেগি দ্বারা আসমান-যমিন ভরে ফেলে, আল্লাহ তা'আলা মাগফিরাত

তা'আলা মনের অবস্থা জানেন। তাঁদের সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰى مَا فَعَلُوْا وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ. তারা যখন কোনো অশ্লীল কাজ করে কিংবা নিজেদের প্রতি অবিচার করে, তখন আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেদের গুনাহসমূহের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে। আর আল্লাহ ছাড়া আছেই বা কে, যে গুনাহসমূহ ক্ষমা করবে? আর তারা তাদের কৃতকর্মের উপর অনড় থাকে না। এবং তারা জানে [যে, বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ তাওবা কবুল করেন]।[২৬১]

পরবর্তী আয়াতে এমন বান্দাদেরকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ক্ষমা ও জান্নাতের সুসংবাদ শোনানো হয়েছে।

বরং ইমামে রব্বানী হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী রহ. তাঁর এক পত্রে এতদূর পর্যন্ত লিখেছেন– 'কোনো কোনো বান্দার উন্নতি ও অগ্রগতি এ পথেই হয় যে, তাদের দ্বারা গুনাহ হয়ে যায়। তারপর এর দুঃখ ও অনুতাপে তাদের মন ফেটে যায় এবং তারা আল্লাহ তা'আলার দরবারে খুব কাঁদে ও তাওবা করে। তখন তাদের এতো উন্নতি হয় যা তাদের পক্ষে ইবাদত দ্বারা সম্ভব ছিল না।'

এর দ্বারা বোঝা গেল, কারো অবস্থা যদি এমন হয় যে, গুনাহ থেকে বাঁচার

দ্বারা আসমান-যমিন ভরে ফেলবেন, কোনা পরোয়া করবেন না। আল্লাহ আবার কার পরোয়া করবেন? কে আছে, যে আল্লাহর মাগফিরাতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে!

[এর বেশ কিছুদূর পর হুজুর লিখেছেন–] তারপর দেখুন আল্লাহ তা'আলা আপনাদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেন! আল্লাহর ওয়াদা তো এই যে, বান্দা যদি আল্লাহর দিকে এক বিঘত আগে বাড়ে, আল্লাহ বান্দার দিকে একহাত আগে বাড়েন; আর বান্দা যদি আল্লাহর দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হয়, আল্লাহ তা'আলা বান্দার দিকে দৌড়ে অগ্রসর হন। আল্লাহর ওয়াদা চিরসত্য।

২৬১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত নং ১৩৫

ইচ্ছা ও প্রতিজ্ঞা করার পরও নফসের ধোঁকা ও শয়তানের প্ররোচনায় তার দ্বারা গুনাহ হয়ে যায়, এরপর গুনাহের কারণে তার দুঃখ ও অনুতাপ হয় এবং খাঁটি মনে তাওবা-ইস্তিগফার করে, তাহলে এ অবস্থা ক্ষতিকর নয়। এমনকি বুযুর্গির পরিপন্থি নয়। নিষ্পাপ তো শুধু আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম ও ফেরেশতাগণ। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি, রহমত ও করুণা থেকে বঞ্চিতকারী গুনাহ হলো ঐ গুনাহ, যা মানুষ নিশ্চিন্ত মনে ও নির্ভয়ে করতে থাকে এবং গুনাহ করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়।[২৬২]

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! আল্লাহর ওয়াস্তে তোমরা নিজেদের সাথে পরিচিত হও। তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ। তোমরা তাঁর সৈন্যবাহিনীর সদস্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

২৬২. আমার শায়েখ ও মুর্শিদ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন দা. বা. হযরত থানবী রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ইমাম গাযযালী রহ.-এর উস্তাদ ইমাম আবু ইসহাক ইসফারায়েনী রহ. বলতেন, হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি শুধু এটাই চাই যে, আমার দ্বারা যেন কোনো গুনাহ না হয়। তোমার কাছে আমি আর কিছুই চাই না। মাঝে-মধ্যে কিছু ভুল হয়ে যেত। তখন তিনি খুব কান্নাকাটি ও রোনাযারি করতেন এবং পুনরায় তাকওয়ার জীবন যাপন শুরু করতেন। এভাবে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দীর্ঘ ৩০ বছরের মাথায় একদিন কিছু ত্রুটি হয়ে গেল। সেদিন খুব কাঁদলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! আমি তো বলছি, তোমার কাছে আমি শুধু এটুকুই চাই যে, আমার দ্বারা যেন কোনো গুনাহ না হয়। আর কিছুই চাই না। তা সত্ত্বেও আমার গুনাহ হয়ে গেল। হে আল্লাহ! এটা যে আমার জন্য অসহনীয় ও অবর্ণনীয় কষ্টকর। তখন আসমান থেকে থেকে আওয়াজ আসল– হে আবু ইসহাক! গুনাহ না হওয়া দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য তো এটিই যে, তুমি যেন আমার সন্তুষ্টি অর্জন কর ও জান্নাত লাভ কর। আবু ইসহাক! জান্নাত লাভ করার ও আমার সন্তুষ্টি অর্জন করার রাস্তা দুটো ঃ তাকওয়া ও তাওবা। কেউ তাকওয়ার রাস্তায় আল্লাহওয়ালা হয়, আবার কেউ আল্লাহওয়ালা হয় তাওবার রাস্তায়। তোমাকে কোন্ পথে আমার বানাব ও জান্নাতে প্রবেশ করাব, তা আমার এখতিয়ার। তা তোমার এখতিয়ার নয়। তুমি চেষ্টা করো তাকওয়ার পথ দিয়ে আসার জন্য। সে পথে সম্ভব না হলে তাওবার পথও খোলা আছে। অতএব তাকওয়ার পথে পূর্ণভাবে না আসতে পারলে তাওবার পথেই আসো।

আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব ও উত্তরাধিকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিচ্ছ। এ অবস্থায় তোমরাও যদি দুনিয়ার সাধারণ পথভ্রষ্ট মানুষের মতো গুনাহ ও পাপাচারের প্রতি আসক্ত থাক, তোমরাও যদি কুদৃষ্টি ও কুসম্পর্কে জড়িয়ে পড়, তাহলে মাফ করবে, তোমাদের উদাহরণ হবে ঐ রাজপুত্রের মতো, যে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কোনো পাগল, মেথর ও চামারের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক স্থাপন করে। আল্লাহ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে অন্তর্দৃষ্টি দান করলে বোঝতে পারবে, এমন খাবাছাত ও নোংরামী সঙ্গে নিয়ে যারা কুরআন-হাদীস পড়ে, তারা যেন কুরআন পাক ও বুখারী শরীফকে নাপাক গিলাফ দ্বারা জড়িয়ে রাখে। আমি আবারও বলছি, নিজেদের সঙ্গে পরিচিত হও এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্ক সঠিক করো।

সংশোধনের সময় এখনই

অনেক ছাত্র এভাবে চিন্তা করে অথবা শয়তান তাদের মনে এই কুচিন্তা সৃষ্টি করে যে, এখন আমাদের বয়সই বা কত! খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তির বয়স তো এটাই, এখন তো মোটে ছাত্র। ভবিষ্যতে আমরাও আমাদের বুযুর্গদের মতো জীবন যাপন করব।

তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো, এটা তোমাদের নিজেদের প্রতি কত বড় অবিচার! আমার প্রিয় ভাইয়েরা! উদাহরণটা ভালো নয়, কিন্তু কথা সম্পূর্ণ সত্য, শুনেছি, বৃদ্ধা বয়সে বেশ্যা নারীরাও তাওবা করে তাসবীহ হাতে নিয়ে নেয়।

তোমরা তো সেই হাদীস পড়েছ বা শোনেছ, যেখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– আল্লাহ তা'আলা কেয়ামতের দিন সাত প্রকার মানুষকে আরশের ছায়ায় স্থান দান করবেন, যেদিন আরশের ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া থাকবে না। তাদের মধ্যে একজন হলো, شَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ অর্থ. এমন যুবক যে আল্লাহর ইবাদতের উপর বেড়ে ওঠেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুরু থেকেই ইবাদত ও তাকওয়াভিত্তিক জীবন গ্রহণ করেছে।

অতএব এতদিন পর্যন্ত যদি তোমরা সচেতন না হয়ে থাক, তাহলে অন্তত এখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনে নিজেদেরকে

এমনভাবে তৈরি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে নাও এবং আল্লাহ তা'আলার আরশ পাকের ছায়া লাভ করার যোগ্যতা অর্জন করো। এটি এমন এক নেয়ামত যা তোমরা এক মুহূর্তের সিদ্ধান্তে অর্জন করতে পার। আমি এখন চাইলেও তা অর্জন করতে পারব না। কেননা আমার বয়স এখন সত্তরের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রিয় ভাইদেরকে এই তরুণ বয়সে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেসকল সৌভাগ্যমানদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন, যারা কেয়ামতের সেই কঠিন দিন আল্লাহ তা'আলার আরশের ছায়ায় স্থান লাভ করবে।

দু'আ ও মুনাজাত

এখন সবশেষে তোমাদের খেদমতে আরেকটি বিষয় আরয করতে চাই। আল্লাহর তাওফীকে তোমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্বকারী ও উত্তরাধিকারী হবে এবং তাঁর কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। এর জন্য তাঁর সঙ্গে তোমাদের বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন হওয়া এবং তাঁর বৈশিষ্ট্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত গুণাবলিতে তোমাদের অংশ থাকা জরুরি। আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাক সত্তায় কোন গুণের প্রাবল্য ছিল। এমনিতে তো আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সকল কামাল ও পূর্ণতা দান করেছেন। কবির ভাষায় –

آنچہ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری

[সকলে মিলে যত গুণ ও সৌন্দর্য ধারণ করেছে, আপনি একাই তা ধারণ করেছেন।]

কিন্তু তাঁর জীবন ও অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করলে এ বিষয়টি উজ্জ্বল হয়ে সামনে আসে যে, তাঁর সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সবচে' প্রবল গুণ ও বৈশিষ্ট্য হলো দু'আ-মুনাজাত। পৃথিবীতে কেউ আল্লাহর নিকট এত বেশি চায় নি, যে পরিমাণ তিনি চেয়েছেন। তিনি যে ধরনের হৃদয়োত্তাপ ও কোমলতার সাথে এবং অক্ষমতা ও মুখাপেক্ষিতার ভঙ্গিতে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ-মুনাজাত করেছেন, সেভাবে কেউ দু'আ-মুনাজাত করেনি। হাদীসের কিতাবসমূহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে শত শত দো'আ বর্ণিত আছে, তোমরা সেগুলো চিন্তা করে পড়ো, তাহলে

বুঝতে পারবে, প্রতিটি দু'আ কী পরিমাণ আত্মনিবেদন ও আবদিয়াতের প্রাণরসে পূর্ণ। এই দু'আগুলো তাঁর অতি বিশেষ উত্তরাধিকার সম্পদ।[২৬৩]

তো তোমাদের প্রতি আমার শেষ পরামর্শ ও উপদেশ এই যে, এই দু'আ-মুনাজাতগুলোর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তোলো। এ বিষয়টিও স্মরণ রাখো যে, যে জিনিসের জন্য দু'আ করবে তার প্রতি মনে যখন তড়প ও তলব থাকে যেভাবে পিপাসার্ত ব্যক্তির থাকে পানির চাহাত ও চাহিদা, তাহলেই তা হবে প্রকৃত দু'আ-মুনাজাত। আল্লাহর বদান্যতার উপর ভরসা করে এই একীন ও বিশ্বাস নিয়ে দু'আ করবে যে, আমি যা চাচ্ছি তা শুধু তাঁর খাযানা ও কোষাগারে এবং তাঁর কুদরত ও কবজায় আছে। আর তিনি নিজ অনুগ্রহে আমি অভাবীকে তা দান করবেন।

দু'আ যদি মন থেকে না হয়, শুধু মুখের উচ্চারণ ও হাতের উত্তোলন হয়, তাহলে তা দু'আ নয়। দু'আ শুধু সেটাই যা হৃদয় থেকে বের হয়। দু'আ মূলত দিলের আমল ও মনের কাজ। মুখের ভাষায় সেই ভাবের প্রকাশ ঘটে মাত্র। অথবা এভাবে বলো, হাতের উত্তোলন ও মুখের শব্দাবলি উচ্চারণ হলো দু'আর আকৃতি ও তার বাহ্যিক রূপ। দু'আর হাকীকত হলো মনোযোগের সাথে মনের মিনতি এবং আল্লাহর দরবারে হৃদয়ের আকুতি। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষ দুঃখভারাক্রান্ত হলে কাঁদে, মুখ থেকে তখন কান্নার আওয়াজ বের হয় এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হয়। কিন্তু কান্নার এই শব্দ ও চোখের এই অশ্রু মনের ব্যথা-বেদনার প্রকৃত রূপ নয়। বরং তা হলো হৃদয়ের দুঃখ-কষ্টের বাহ্যিক রূপ ও দৃশ্যমান ছূরত। চোখে ও মুখে সেই ব্যথা ও কষ্টের প্রকাশ হয় মাত্র।

আজ আমাদের সাধারণ অবস্থা হলো আমরা সাধারণত ফরয নামাযের পর দু'আ করি, দীর্ঘ দু'আও হয় কখনো কখনো। কিন্তু এই দু'আ হয় শুধু মুখের ও হাতের। থাকে না মনের মিনতি ও হৃদয়ের উত্তাপ। কখনো আমার অবস্থাও এমনটাই হয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের অবস্থা সংশোধন করে দিন। এটি মূলত দু'আ নয়, দুআ'র বাহ্যিক রূপ মাত্র।

---

২৬৩. مَعَارِفُ الحَدِيثِ নামে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী রহ.-এর ৮ খণ্ডে হাদীসের একটি সংকলন ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ আছে। পঞ্চম খণ্ডটি যিকির ও দু'আ সম্বলিত। 'এমদাদিয়া লাইব্রেরী চকবাজার ঢাকা' থেকে গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

তোমরা এখন থেকেই এই অভ্যাস গড়ে তোলো, তোমাদের দু'আ যেন আসল দু'আ হয়, শুধু বাহ্যিক আকৃতি ও দৃশ্যমান রূপ যেন না হয়। তোমাদের দু'আয় যেন থাকে নূর ও নূরানিয়াত এবং রূহ ও রূহানিয়াত। বিশেষভাবে নির্জনে মনের পূর্ণ মনোযোগের সাথে আল্লাহ তা'আলার নিকট ভিক্ষা চাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলো। আল্লাহর নিকট ঈমানের হাকীকত ভিক্ষা চাও; ইলম ও মারেফাত চাও; নামাযের হাকীকত ও তাকওয়া চাও; দ্বীনের খেদমত করার তাওফীক চাও; নির্জনে কেঁদে কেঁদে ও ব্যথা-ব্যাকুলতার সাথে দু'আ করো। তারপর দেখো, আল্লাহর কী অনুগ্রহ হয়! তিনি কত দান করেন!

বিশেষ করে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে যেসকল দু'আ করেছেন সেগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করো। হাদীসের প্রত্যেক কিতাবে রয়েছে 'দু'আ অধ্যায়'। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন উপলক্ষে যেসকল দু'আ করেছেন, এমন শত শত দু'আ উক্ত অধ্যায়ে একত্র করা হয়েছে। এই দু'আগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি বিশেষ উত্তরাধিকার সম্পদ ও মহামূল্যমান খাযানা। এ সকল খাযানা ও কোষাগারের চাবি আমাদেরই হাতে রয়েছে যারা মাদরাসায় হাদীসের কিতাবসমূহ পড়ি ও পড়াই। আফসোস! আমাদের মধ্যে এ সকল খাযানার রত্নসমূহের কদর নেই। যদি এমন কোনো পরিমাপ-যন্ত্র থাকত, যা দ্বারা আখেরাতের হিসেবে বিভিন্ন জিনিসের মান ও মূল্য যাচাই করা সম্ভব হত, তাহলে জানা সম্ভব হত যে, প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছোট ছোট দু'আগুলো দুনিয়া ও দুনিয়ার সকল ধনসম্পদের তুলনায় কত অধিক মূল্যবান! আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন, আমরা যেন এই নেয়ামতের কদর করতে পারি এবং এর শোকর আদায় করতে পারি যে, এ সকল মাদরাসায় আরবী ভাষা ও ইলমে দ্বীন হাসিল করার বরকতে তিনি আমাদের জন্য নবীজির দু'আ-মুনাজাতের রত্নভাণ্ডারের দরজা খুলে দিয়েছেন।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই দু'আগুলোর বিষয়বস্তুতে একটু চিন্তা করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি প্রসিদ্ধ ছোট্ট দু'আ হলো–

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ أَخْشَاكَ كَأَنِّيْ أَرَاكَ أَبَدًا حَتَّى أَلْقَاكَ، وَأَسْعِدْنِيْ بِتَقْوَاكَ، وَلَا تُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَتِكَ.

অর্থ. হে আল্লাহ! আমাকে এমন বানিয়ে দাও যেন সর্বদা তোমাকে দেখার মতো ভয় করি যতক্ষণ না তোমার দীদার লাভ হয়। তোমার তাকওয়া দ্বারা আমাকে সৌভাগ্যবান করো এবং তোমার অবাধ্যতা দ্বারা আমাকে হতভাগ্য করো না।

এ ধরনের আরেকটি দু'আ হলো–

اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِيْ لِذِكْرِكَ، وَارْزُقْنِيْ طَاعَتَكَ وَطَاعَةَ رَسُوْلِكَ وَعَمَلاً بِكِتَابِكَ.

অর্থ. হে আল্লাহ! তোমাকে স্মরণ করার জন্য আমার হৃদয়ের কানগুলো খুলে দাও। আর আমাকে দান করো তোমার আনুগত্য, তোমার রাসূলের আনুগত্য ও তোমার কিতাব অনুযায়ী আমল।

আরেকটি দু'আ দেখো–

اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا خَاشِعًا، وَأَسْأَلُكَ إِيْمَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ دِيْنًا قَيِّمًا، وَأَسْأَلُكَ العَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ، وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ العَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ الشُّكْرَ عَلَى العَافِيَةِ، وَأَسْأَلُكَ الغِنَى عَنِ النَّاسِ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ.

অর্থ. হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই স্থায়ী ঈমান; তোমার কাছে চাই বিনম্র হৃদয়; তোমার কাছে চাই সত্য ঈমান; তোমার কাছে চাই সরল দ্বীন; তোমার কাছে চাই প্রত্যেক বিপদ থেকে মুক্তি; তোমার কাছে চাই স্থায়ী সুস্থতা; তোমার কাছে চাই মুক্তি ও সুস্থতার জন্য শোকর করার তাওফীক; তোমার কাছে চাই মানুষের প্রতি নির্মুখাপেক্ষিতা। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া না আছে ক্ষমতা এবং না আছে সামর্থ্য।

এই দু'আগুলোর বিষয়বস্তুতে একটু চিন্তা করো। দু'আগুলোতে কী কী চাওয়া হয়েছে এবং দু'আগুলো কেমন প্রাণরসে পূর্ণ।[২৬৪] হাদীসের কিতাবে দু'আগুলো পড়ার পর আমরা যদি সেগুলোকে নিজের দু'আ না বানাই, তাহলে আমাদের দুর্ভাগ্যের কোনো সীমা থাকবে না।

---

২৬৪. টীকাটি ২৮০ - ২৮২ নং পৃষ্ঠায় পড়ো।

তো আমার ভাইয়েরা! তোমাদের প্রতি আমার শেষ উপদেশ ও পরামর্শ এই যে, বিনয়-কাতরতার সাথে দু'আ-মুনাজাত যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অতি বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্য, তাকে নিজেদের অভ্যাসে পরিণত করো। মনের পূর্ণ মনোযোগের সাথে ও আল্লাহর বদান্যতার উপর ভরসা করে তাঁর নিকট নিজেদের সকল প্রকার প্রয়োজনের ভিক্ষা চাও। দুনিয়ার প্রয়োজনও প্রার্থনা করো, আখেরাতের প্রয়োজনও প্রার্থনা করো। তাঁর নিকট প্রার্থনা করো ঈমান ও তাকওয়া এবং যিকির ও ইবাদতের হাকীকত; নববী ইলমের দৌলত; আল্লাহ ও তাঁর পাক রাসূলের মুহাব্বত। আল্লাহ তা'আলা সর্বদাতা। তিনি কোনো বড় থেকে বড় কামাল ও পূর্ণতার উপরও মোহর লাগিয়ে দেন নি যে, তা আর কাউকে দান করবেন না। তিনি এমন কোনো সিদ্ধান্ত করেন নি যে, পূর্ববর্তীদেরকে যা দান করেছেন তা আর পরবর্তীদেরকে দান করবেন না।[২৬৫]

ইমাম রাযী ও ইমাম গায্যালী আমাদের মাথার মুকুট। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মোটেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি যে, যে স্তরের ইলম আল্লাহ তাঁদেরকে দান করেছেন, তা এখন কাউকে দান করা হবে না। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী কালের সকল আউলিয়ায়ে কেরাম আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরী, আমরা তাঁদের পদধূলিরও সমান নই। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মোটেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি যে, বুযুর্গীর যে মাকাম তাঁদেরকে দান করা হয়েছে তা এখন আর কাউকে দান করা হবে না। বরং যে কেউ কোনো পূর্ণতা ও স্তর অর্জন করার জন্য ইখলাসের সঙ্গে মেহনত করবে, পূর্ণতা ও স্তর

---

২৬৫. আদীব হুজুর লিখেছেন– এমন কোনো ফয়সালা করা হয়নি যে, আমাদের পূর্ববর্তীদের যা কিছু দান করা হয়েছে তা আর কাউকে দান করা হবে না। ইলমের যে স্তরে তাঁরা ছিলেন, রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার যে মাকামে তাঁরা ছিলেন, তা তাঁদের যুগেই শেষ হয়ে গেছে। না, তা নয়। আল্লাহর দান তখনকার জন্য যেমন ছিল, এখনকার জন্য তেমনি আছে। তখনো মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়েছে, এখনো হয়; তখনো গাছে ফুল ফুটেছে, এখনো ফোটে; তখনো চাঁদের জোসনা ছিল, এখনো আছে; তখনো ভোরে সবুজ ঘাসের উপর শিশির ঝরেছে, এখনো ঝরে। ইলমের সাধনা তখন যেমন ছিল এখনো যদি তেমন থাকে, তাহলে কেন আমার কলবের গুলবাগে ফোটবে না ইলমের গোলাব!

অর্জনের শর্তসমূহ পূর্ণ করবে এবং আল্লাহর কাছে চাওয়ার মতো চাইবে, আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ যুগেও দান করবেন।[২৬৬]

আমার প্রিয় ভাইয়েরা! তোমরা সবকিছুই হতে পার এবং আল্লাহ তা'আলার কাছ থেকে ঐসব কিছুই নিতে পার, যা তিনি আমাদের আকাবির ও আসলাফকে দান করেছেন। শর্ত একটাই– তোমাদেরও হতে হবে তাঁদের পথের পথিক।

এতক্ষণ যা কিছু আমি তোমাদেরকে বললাম, এগুলো আমার নিজের জন্যও আমার উপদেশ। কথাগুলোর উপর আল্লাহ তা'আলা আমাকেও এবং তোমাদের সকলকেও আমল করার তাওফীক দান করুন, আমীন! কেয়ামতের দিন এ কারণে যেন আমার পাকড়াও না হয় যে, অন্যদেরকে তো ভালো ভালো কথা বলতে, কিন্তু নিজে আমল করতে না। তোমাদেরকেও যেন এ কারণে পাকড়াও করা না হয় যে, তোমরা সবকিছু শুনেও আমল করনি।

---

২৬৬. আদীব হুজুর লিখেছেন– আল্লাহর দানে কোনো কুণ্ঠা নেই, বান্দার গ্রহণে যদি কার্পণ্য না থাকে। হাদীস শরীফে তো এমন মাযমূনও এসেছে যে, এই উম্মত হলো বৃষ্টির মতো। কেউ বলতে পারে না যে, তার শুরুতে বেশী কল্যাণ, না শেষে! অর্থাৎ সাধারণ অবস্থা তো এটাই যে, বিগত যুগ নবুয়তের দিকে নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে অধিকতর কল্যাণপূর্ণ, তবে খাছ খাছভাবে পরবর্তী যুগের কল্যাণ পূর্ববর্তী যুগের সমান, এমনকি বেশীও হতে পারে। দাতা যখন দান করেন, বাধা দেয়ার কেউ নেই। আবার দাতা যদি না দেন, তাহলে পাওয়ার কোনো উপায় নেই। তবে সে যুগে যেমন প্রত্যেক রাত্রের আসমান থেকে নেদা দেয়া হতো– "আছে কি কোনো মাগফেরাত তলবকারী, যাকে আমি মাফ করব?" তখন যারা মুসল্লায় দাঁড়িয়েছেন এবং কাঙ্গাল ও ভিখারী সেজে প্রার্থনা করেছেন, তারা মাগফেরাত পেয়েছেন এবং আঁচল ভরে দান পেয়েছেন। এ যুগেও প্রতি রাত্রের শেষভাগে একইভাবে আসমানের ঘোষণা জারি আছে। এখনো যারা শেষ রাত্রে মুসল্লায় দাঁড়াবে, দু'হাত তুলে কাকুতি-মিনতি করে ফরিয়াদ জানাবে, তারা আল্লাহর পক্ষ হতে মাগফিরাত লাভ করবে, তাদের উপর একইভাবে এবং আরো প্রবলভাবে মুষলধারে আল্লাহর দান বর্ষিত হবে।

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ ۚ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰهُمُ اللّٰهُ ۖ وَاُولٰٓئِكَ هُمْ اُولُو الْاَلْبَابِ.

সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের সুসংবাদ দান করো যারা মনোযোগের সঙ্গে কথা শোনে, তারপর তার উত্তম অংশের অনুসরণ করে। আল্লাহ ওদেরকেই হেদায়াত দান করেছেন। আর ওরাই জ্ঞানী।[২৬৭]



---

২৭৭ নং পৃষ্ঠার টীকা

আদীব হুজুর লিখেছেন– এই যে প্রায় অলৌকিক সৌন্দর্যমণ্ডিত দু'আ, এগুলোর বিষয় ও ভাষ্য নিয়ে একটু চিন্তা করুন। অন্যরা না বুঝতে পারে, কারণ তরজমায় মূলের প্রাণরস কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, কিন্তু আপনারা তো আরবীভাষার অলঙ্কার ও সৌন্দর্য জানেন। দেখুন তো প্রতিটি শব্দ কী আশ্চর্য কোমলতা ও কাতরতার সঙ্গে অন্তরকে স্পর্শ করে এবং হৃদয়কে বিগলিত করে। প্রথম দু'আয় পাঁচটি পর্ব, প্রতিটি পর্বের শব্দগুচ্ছ যেন একটি করে মুক্তোগুচ্ছ। পর্বের পর পর্বের উচ্চারণে হৃদয়-বীণার তারে কী অপূর্ব ঝঙ্কার সৃষ্টি হয়!

আর বিষয়বস্তু! বলুন তো যদি আল্লাহকে সর্বক্ষণ দেখতে পাওয়ার মতো ভয় নসীব হয়ে যায়, তাহলে জীবনটা কেমন পূতপবিত্র ও শুচিশুভ্র হতে পারে! তাকওয়ার শুধু প্রার্থনাই করা হলো না, তাকওয়া যে-সকল সৌভাগ্যের আধার, স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার স্বীকৃতি প্রদান করে মিনতি নিবেদন করা হলো, আমাকে এ মহাসৌভাগ্য দান করুন। একইভাবে নাফরমানি থেকে পানাহ শুধু চাওয়াই হলো না, বরং তা যে সর্বপ্রকার বদনছীবির মূল, তা-ও সভয়ে স্বীকার করে নিয়ে কেমন কাতর প্রার্থনা করা হলো তা থেকে রক্ষা লাভের!

---

[২৬৭]. সূরা যুমার, আয়াত নং ১৭ - ১৮

মহান দাতার চিরকরুণার স্বরূপ কল্পনা করে এবং নিজের আবদিয়াত ও দীনতার অনুভূতি অন্তরে জাগ্রত রেখে, তারপর আরবীভাষার 'সৌন্দর্য-স্বাদ' উপভোগ করে এই দু'আটি একবার নিবেদন করুন আল্লাহর দরবারে এবং নিজের ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখুন তো কেমন আত্মিক শান্তি ও প্রশান্তি এসেছে সেখানে!

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ أَخْشَاكَ كَأَنِّيْ أَرَاكَ أَبَدًا حَتَّى أَلْقَاكَ، وَأَسْعِدْنِيْ بِتَقْوَاكَ، وَلاَ تُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَتِكَ.

দ্বিতীয় দু'আয় দেখুন; হৃদয়ের বদ্ধ দুয়ার খুলে দেয়ার কথা আমরা বলি এবং তার সৌন্দর্যেই মুগ্ধ হয়ে যাই। কিন্তু مَسَامِعُ الْقَلْبِ কী জিনিস, কীভাবে আপনি তা বোঝাবেন আপনার ভাষাভাষী মানুষকে। যে যিকির আমি কানে শুনি, তা যেন আমার কান পর্যন্তই না থাকে, হৃদয় যেন সেই যিকিরের আবেদন গ্রহণ করতে পারে। হৃদয়ের আবেদন গ্রহণ করার যোগ্যতা পরিস্ফুটিত করে দিন। এই সব কথা আছে اِفْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِيْ এই তিনটি মাত্র শব্দে!

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যই হলো মুমিনের আত্মার খোরাক' এই অনুভূতি আমরা লাভ করি اُرْزُقْنِيْ শব্দ থেকে, যার তরজমা আমাদের করতে হচ্ছে শুধু 'দান করুন' বলে।

ভাষাসৌন্দর্যও লক্ষ করুন, তিনটি পর্বে বিন্যস্ত করা হয়েছে দু'আটিকে। তিনটি كَافُ الْخِطَابِ সাকিন করে পড়ুন, আর দেখুন কেমন একটি সুরমূর্ছনা আপনার অন্তরকে মুগ্ধ অভিভূত করে রাখে!

তৃতীয় দু'আটির ভাষা-সৌন্দর্য ও মর্মগভীরতা কিছুটা অনুভব করা যেতে পারে, ভাষায় প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। أَسْأَلُكَ-এর বারংবার উচ্চারণে আল্লাহর কাছে বান্দার কাঙ্গালপনার যে পরম প্রকাশ ঘটেছে, বাংলা তরজমায় কোথায় তার কিঞ্চিৎ ছায়া, কিংবা সামান্য ছোঁয়া! যত বলছি أَسْأَلُكَ, ততবার যেন ভিতরে গিয়ে তা এই প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে– 'তোমার দুয়ারে হে দাতা! আমি কাঙ্গাল'।

যদি বলা হতো– إِيْمَانًا دَائِمًا صَادِقًا, তাহলে পুনরুক্তি দ্বারা ঈমানের যে আকুতি প্রকাশ পায় তা হারিয়ে যেত। ঈমানের বাসস্থান যে কলব, তার অনুভূতি আসে দুই إِيْمَانًا-এর মাঝে قَلْبًا خَاشِعًا-এর অবস্থান থেকে। পরপর দু'টি গুণ, প্রথমটি হলো ঈমানের ব্যাপ্তি, দ্বিতীয়টি ঈমানের গভীরতা। তার মাঝখানে قَلْبًا-এর صِفَة টি দ্বারা নিবেদন করা হয়েছে, আমাকে এমন কলব দান করুন যা ঈমানকে ধারণ করতে পারে। خَاشِعٌ শব্দটির কোনো প্রতিশব্দ কি আছে পৃথিবীর কোনো ভাষায়! যে কলবে ভয়-ভীতি আছে, বিনয় ও কাতরতা আছে, নিবেদন ও সমর্পণ আছে, একাগ্রতা ও নিমগ্নতা আছে, সেটাই হলো কালবে খাশি'।

[উর্দূ ভাষাকে আমার ঈর্ষা হয় যে-সব কারণে তার একটি এই যে, আরবী শব্দকে সে এমনভাবে নিজের আঁচলে তুলে নেয় যেমন আমরা কোঁচড়ে তুলে নেই বাগানে গাছের নিচে বিছিয়ে থাকা শিউলি ফুল! দেখুন না উর্দুতে قَلْبًا خَاشِعًا-এর তরজমা করা হচ্ছে– قلبِ خاشِعْ বলে এবং উর্দূভাষীরা তা বুঝেও নিচ্ছে স্বচ্ছন্দে! হে বাংলাদেশের আলিম-সমাজ, কবে তোমরা পারবে তা?]

মানবজীবনের সবচে' কাঙ্ক্ষিত বিষয় ধনসম্পদ নয়, যশ-খ্যাতি নয়, অন্য কিছুই নয়, অপ্রিয় সব কিছু থেকে নিরাপদ থাকাই হলো সবচে' কাঙ্ক্ষিত বিষয়। বারবার العافِيَة-এর তাকরার সেদিকেই নির্দেশ করে, আর এ জন্যই আলাদাভাবে العافِيَة-এর উপর শোকর আদায়ের তাওফীক চাওয়া!

তারপরই পানাহ চাওয়া হয়েছে জীবনের সবচে' কষ্টকর বিষয়টি থেকে, আর তা হলো কোনো কিছুতে কারো মুখাপেক্ষী এবং কারো উপর নির্ভরশীল হওয়া। একে একে এত কিছু চাওয়ার পর আত্মনিবেদনের চূড়ান্ত প্রকাশ করা হলো لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ বলে। চাইতে চাইতে, মাগঁতে মাগঁতে ভিখারী যেন হঠাৎ দাতার কুদরতি কদমে এসে লুটিয়ে পড়লো!

উপরের অনুভূতিগুলো অন্তরে ধারণ করে আবার নিবেদন করুন না দু'আটি পরম দয়ালু আল্লাহর দরবাবে!

হাদীসভাণ্ডারে সংরক্ষিত প্রতিটি দু'আ এভাবে হৃদয়ঙ্গম করে পড়ুন এবং মাওলার দরবারে নিবেদন করুন, তারপর দেখুন কী মহা ঐশ্বর্য আপনার হৃদয় অর্জন করে! কী সুকূন ও সাকীনাহ আপনার কলব হাসিল করে!

تَعَلَّمنا الإيمانَ ثُمَّ تَعَلَّمنا القرآن (جُنْدُب رضـ)

লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

যাঁরা আমাদের আদর্শ তাঁদের কয়েকজন হলেন– হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয [৬১ - ১০১ হি.], হযরত হাসান বসরী [২১ - ১১০ হি.], ইমাম আহমদ বিন হাম্বল [১৬৪ - ২৪১], ইমাম আবুল হাসান আশআরী [২৬০ - ৩২৪ হি.], ইমাম গায্যালী [৪৫০ - ৫০৫ হি.], শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী [৪৭০ - ৫৬১ হি.], আল্লামা ইবনুল জাওযী [৫০৮ - ৫৯৭ হি.], সুলতান নুরুদ্দীন যঙ্গী [৫১৩ - ৫৬৯ হি.], সুলতান সালাহউদ্দীন আয়্যুবী [৫৩২ - ৫৮৯ হি.], শায়খুল ইসলাম ইযযুদ্দীন বিন আব্দুস সালাম [৫৭৮ - ৬৬০ হি.], মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী [৬০৪ - ৬৭২ হি.], সুলতানুল মাশায়িখ হযরত নিজামুদ্দীন [৬৩৬ - ৭২৫ হি.], শায়খুল ইসলাম হাফেজ ইবনে তায়মিয়া [৬৬১ - ৭২৮ হি.], মাখদুমুল মুলক হযরত শায়খ শারফুদ্দীন আহমদ ইয়াহইয়া মুনায়রী [৬৬১ - ৭৮২ হি.], হযরত আহমদ সিরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী [৯৭১ - ১০৩৪ হি.], হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী [১১১৪ - ১১৭৬ হি.], হাকীমুল উম্মত শাহ আশরাফ আলী থানবী [১২৮০ - ১৩৬২ হি.], শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ হোসাইন আহমদ মাদানী [১২৯৬ - ১৩৭৭ হি.], দাঈ ইলাল্লাহ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলয়াস [১৩০৩ - ১৩৬৫ হি.] এবং সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী [১৩৩৩ - ১৪২০ হি.] রাহিমাহুমুল্লাহু তা'আলা।

সুযোগ হলেই আমরা তাঁদের জীবনীগ্রন্থ পাঠ করব; তাঁদের ব্যক্তিত্ব বিনির্মাণের উপাদানগুলো জানব এবং সেসমস্ত উপাদানের আলোকে নিজেদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাওফীক দান করুন। আমীন!

হযরত আলী মিয়াঁ নাদাবী রহ.-এর رِجَالُ / تاریخ دعوت وعزیمت / الفِكْرِ والدَّعْوَةُ فِي الإسلام / 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' গ্রন্থে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ. পর্যন্ত সকলের জীবনী একসঙ্গে আছে।

বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া বাংলাদেশ-এর মাননীয় মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার দা. বা.-এর

বাণী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَتَابِعِيهِمْ إِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ، وَبَعْدُ.

বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষারত কলিজার টুকরো লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর লেখাপড়ার পথে অনেক জটিলতার সম্মুখীন হয়। এসব সঙ্কটের শিকার হয়ে কতক তো পড়ালেখা থেকে সম্পূর্ণই বিচ্যুত হয়ে যায়। আর কতক শিক্ষার্থী পড়াশোনা চালিয়ে গেলেও তাদের গতি থাকে ধীর এবং শক্তি থাকে নিস্তেজ। এ পরিস্থিতির কারণ হলো, অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীই সঠিক পদ্ধতিতে লেখাপড়া করে। অধিকাংশই চলে দুর্গম গিরিপথে, আঁকাবাকা পাহাড়ি রাস্তায়, যেসব পথ-ঘাটে কষ্ট বেশী, কিন্তু প্রাপ্তি কম।

কতো তরুণ পড়াশোনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে! জীবনের জন্য নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। কতো শিক্ষার্থী বিরক্তির সাথে পড়ালেখা করছে! লেখাপড়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে। তারা যদি পড়ালেখার ফলদায়ক পথ ও সুফলদায়ক পদ্ধতি জানত এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ সচেতন দিক-নির্দেশনা লাভ করত, তাহলে যারা নিরাশ হয়েছে তারা নিরাশ হত না এবং জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলো মন-মরা, বিষণ্ন ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে কাটাত না।

এক সময় মানুষ বলত, লেখাপড়ার পথ সুগম নয়। কিন্তু শিক্ষাবিদগণ গবেষণা করে দেখিয়েছেন, উপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সহজে অনেক পড়ালেখা হয় এবং সফলতা মেধাবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

আলোচক মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ এ বইয়ে লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি তুলে ধরেছেন। আমি তাঁর আলোচনাগুলো সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা লাভ করেছি।

আলোচক ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দারুল উলূম মাদানীনগর মাদরাসায় ১২টি মজলিসে আলোচ্যমান আলোচনাগুলো করেছেন। তাঁর আলোচনার অন্যতম সহায়ক ছিল সিরিয়ার ডক্টর আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.-এর فَنُّ الدِّرَاسَةِ وَالْمُعَلِّمِ ও فَنُّ الْاِمْتِحَانَاتِ بَيْنَ الطَّالِبِ কিতাব দু'টি। বর্তমান বইটিতে উক্ত কিতাব দু'টির মূল বক্তব্যগুলোও এসে গেছে। এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এ পরিমাণ বিস্তারিত আলোচনা করা সত্যিই আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় তাওফীক। আল্লাহ তা'আলা ডক্টর রাফাত পাশা ও মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদকে নিজ শান অনুযায়ী উত্তম বিনিময় দান করুন এবং শিক্ষার্থীদেরকে বইটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

এ বইয়ের দিক-নির্দেশনাগুলোর আলোকে লেখাপড়া করলে শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিক চেষ্টা ব্যয় করেও আল্লাহ চাহে তো অস্বাভাবিক সাফল্য অর্জনে সমর্থ হবে। বইটি শিক্ষার্থীদের কঠিন বিষয়গুলোকে সহজ করবে; দূরবর্তী বিষয়গুলোকে নিকটবর্তী করবে এবং দুর্গম পথকে সুগম করবে। বইটি একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদেরকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতে শিক্ষকমণ্ডলীরও উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ।

তাই আমার প্রস্তাব হল, বইটি মুতাওয়াসসিতা [নিম্ন মাধ্যমিক], ছানাভী [উচ্চ মাধ্যমিক] ও ফযীলত [স্নাতক] সকল মারহালার প্রথম সাময়িক পরীক্ষার সিলেবাসভুক্ত করা হোক। শিক্ষার্থীরা বইটি নিজেরা অধ্যয়ন করবে এবং পরীক্ষা দিবে। আল্লাহ সকলকে সুবিবেচনার তাওফীক দান করুন! আমীন!!

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَه[১].

---

[১]. সূরা যুমার, আয়াত নং ১৭ - ১৮

বই পরিচিতি

-মাওলানা আব্দুল্লাহ সালমান[২]

পড়ালেখার প্রথম ভিত্তি হলো রুটিন। এ বই শিক্ষার্থীকে এমন একটি রুটিন তৈরিতে অবশ্যই সহায়তা করবে, যার মাধ্যমে সে নিজের জীবনকে সুবিন্যস্ত করতে পারবে; অপব্যয় থেকে সময়কে রক্ষা করতে পারবে; বৃথা যাওয়া থেকে চেষ্টাকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে; নিজের অস্তিত্বকে অর্থবহ করতে সমর্থ হবে এবং জীবনকে করতে পারবে সার্থক ইনশাআল্লাহ।

পড়াশুনার জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ও কঠোর অধ্যবসায়। কিন্তু চেষ্টা ও প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক হলে তাতে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকে। তাই মুহতারাম উস্তাদ রুটিনের পর স্বাভাবিক চেষ্টা ও অস্বাভাবিক চেষ্টার মধ্যকার পার্থক্য-রেখা স্পষ্ট করেছেন। পাশাপাশি সুস্বাস্থ্যের প্রাকৃতিক ভিত্তিসমূহের ব্যাপারেও স্পষ্ট আলোচনা করেছেন।

দরসের লেখাপড়ার তিনটি স্তর রয়েছে– ১. দরস-পূর্ববর্তী স্তর; এটি হলো প্রস্তুতি-পর্ব। ২. দরস চলাকালীন স্তর; এটি হলো মনোযোগসহকারে শোনার পর্ব। ৩. দরস-পরবর্তী স্তর; এটি হলো আয়ত্ত করার পর্ব।

যে দরস একজন মুদাররিস পূর্ণাঙ্গতর ও সহজতর পদ্ধতিতে উপস্থাপন করবেন, তালিবে ইলমের তা প্রস্তুত করে দরসগাহে বসার কী প্রয়োজন আছে? তালিবে ইলম দরসের প্রস্তুতি কীভাবে গ্রহণ করবে? কী ধরনের স্বেচ্ছামূলক শ্রবণকে 'মনোযোগসহকারে শ্রবণ' বলা হয়? ভালো মনোযোগসহকারে শ্রবণকারীর পরিচয় কী? প্রস্তুতি-পর্বের খাতা দরস চলাকালে কেন সঙ্গে রাখবে? দরসগাহের আদব কী? উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ দা. বা. ইত্যাদি বিষয়গুলো সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

উন্মুক্ত লেখাপড়ার পর্ব পাঁচটি। সেগুলো হলো যথাক্রমে– পৃষ্ঠা উল্টানো, প্রশ্ন করা, পাঠ করা, মনে রাখার চেষ্টা করা ও পুনরাবৃত্তি করা। পৃষ্ঠা উল্টানোর উদ্দেশ্য হলো মূল পড়ার এবং পড়ার গভীরে পৌঁছার পূর্বে বিষয় সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা। এ উদ্দেশ্য কীভাবে অর্জন হবে?

---

[২]. ইফতা বিভাগ, মারকাযুদ্দাওয়া আলইসলামিয়া ঢাকা।

এর জন্য কিতাবের ভূমিকা, মূল শিরোনাম, পার্শ্ব শিরোনাম, সার-সংক্ষেপ ইত্যাদি কীভাবে পড়বে? এর জন্য 'সমগ্র থেকে অংশে এবং অংশ থেকে ক্ষুদ্রাংশে স্থানান্তরিত হওয়া'র ব্যাখ্যা কী? এ বইয়ে এ সব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর দেয়া হয়েছে।

'প্রশ্ন করা'র মাধ্যমে মানুষ যা অর্জন করে, তা 'পড়া' ও 'মুখস্থ করা'র মাধ্যমে যা অর্জন করে তার তুলনায় বেশী স্মরণ থাকে। প্রশ্নের এ ভূমিকা কেন? 'যার কাছে প্রশ্ন আছে তার লক্ষ্য থাকে' এ উক্তির ব্যাখ্যা কী? প্রশ্ন তৈরি করার দক্ষতা অর্জনের পদ্ধতি কী? মুহতারাম উস্তাদ ইত্যাদি প্রশ্নগুলোর বিস্তারিতভাবে উত্তর দিয়েছেন।

'পাঠ করা'র লক্ষ্য কী? পাঠ করার লক্ষ্যসমূহ কখন অর্জিত হবে? প্রত্যেক পাঠযোগ্য অনুচ্ছেদ তিনটি উপাদানে গঠিত থাকে– ১. মৌলিক বক্তব্য। ২. মূল বক্তব্যকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা। ৩. বিষয়বস্তুর টীকা হিসেবে বেঁচে থাকে এমন কিছু গৌণ বা দ্বিতীয় স্তরের বিষয়। এগুলোর কোন্ উপাদানে কী পরিমাণ মনোযোগ দিবে? প্রতিটি উপাদান আয়ত্ত করার পদ্ধতি কী? কিতাব ও বইয়ের মূল পাঠে কখন এবং কোথায় রেখা টানবে? কিতাবে যদি ভাগ-বিভক্তি ও শাখা-প্রশাখা বেশী থাকে, তাহলে সেগুলো বিন্যস্ত করার পদ্ধতি কী? জটিল ও দুর্বোধ্য পড়া আয়ত্ত করার জন্য কী পরিমাণ সময় ব্যয় করবে? পড়ার সারাংশ কীভাবে লিখবে? এ বইয়ে ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী পড়া কীভাবে মনে রাখবে? নিজেকে নিজের পড়া শোনানোর সময় কী কী জিনিস নির্ণয় করবে? 'মনে রাখার মূলে রয়েছে মনোযোগ দান' এ উক্তির ব্যাখ্য কী? 'কান টানলে মাথা আসে' নামক পদ্ধতির ব্যাখ্যা কী? কুদৃষ্টি ও কুকল্পনা স্মরণশক্তির দুর্বলতার অন্যতম একটা কারণ। এ যুগে শিক্ষার্থীদেরও কেন কোনো আল্লাহওয়ালার সঙ্গে আত্মশুদ্ধির সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়োজন? স্মরণ রাখার জন্য কোন পদ্ধতিতে পড়বে? তাকরার ও মুজাকারার অবদান। পড়া স্মরণ রাখার কিছু সহজ কৌশল। এ ধরনের অনেক দিক আলোচনা হয়েছে এ বইয়ে।

পড়া আয়ত্ত করার জন্য পুনরাবৃত্তি ছাড়া কোনো উপায় নেই। এখন প্রশ্ন হলো, পুনরাবৃত্তি কখন করবে এবং কীভাবে করবে? এ বইয়ে পুনরাবৃত্তি করার উপকারিতা, সময় ও পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে বিশদভাবে।

অনেকে পরীক্ষার কথা শুনলেই ঘাবড়ে যায়। অথচ ভালভাবে পরীক্ষা দিতে হলে পরীক্ষাভীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয়। পরীক্ষাভীতি এটা মানসিক সমস্যা হলেও শরীরের উপরও তা অনেক প্রভাব ফেলে। এ বইয়ে উস্তাদে মুহতারাম পরীক্ষাভীতির বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করে সেগুলোর প্রতিকার উল্লেখ করেছেন। প্রসঙ্গত টেনশন থেকে সৃষ্ট রোগসমূহের মূল চিকিৎসা কী, তা-ও স্পষ্টভাবে আলোচনা করেছেন। পরীক্ষার প্রস্তুতি বিষয়ে তিনটি চমৎকার আলোচনা করেছেন এই তিন শিরোনামে– 'পরীক্ষার্থীদের জন্য আটটি উপদেশ', 'পরীক্ষা একটি মজার খেলা', 'কীভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে'

শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলে কখন প্রবেশ করবে এবং কীভাবে প্রবেশ করবে? পরীক্ষার পূর্ব মুহূর্তে শিক্ষার্থীর কী কী কাজ অবশ্যপরিত্যাজ্য এবং কেন? উত্তর লেখার জন্য কাগজ হাতে পাওয়ার পর শিক্ষার্থীর সর্বপ্রথম করণীয় কী? প্রশ্নপত্র কীভাবে পড়বে? উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে কী কী জিনিস লক্ষ রাখবে? ইত্যাদি বিষয়গুলো বইয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

শিক্ষকমণ্ডলী প্রশ্নে বিভিন্ন 'ভাষা' ব্যবহার করেন। যেমন– اُكْتُبِ التَّحْلِيْلَ اللَّفْظِيَّ لِلْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ [নিম্নলিখিত শব্দগুলোর তাহকীক লিখ।], وَازِنْ بَيْنَ كَذَا وَكَذَا [অমুক অমুক জিনিসের মধ্যে তুলনা করো], عَرِّفْ كَذَا [অমুক জিনিসের পরিচয় দাও], اُنْقُدْ كَذَا [অমুক জিনিসের সমালোচনা করো], صِفْ كَذَا [জিনিসটির বিবরণ দাও], وَضِّحْ كَذَا [জিনিসটি স্পষ্ট করো], لَخِّصْ كَذَا [সারাংশ লিখ], نَاقِشْ كَذَا [আলোচনা করো], عَدِّدْ حَالَاتِ كَذَا [অমুক জিনিসের অবস্থা বর্ণনা করো], تَتَبَّعْ كَذَا مِمَّا دَرَسْتَه [তোমার পঠিত অংশের অমুক জিনিসটি অনুসন্ধান করো]। তো এসব পরিভাষা দ্বারা শিক্ষকবৃন্দের উদ্দেশ্য কী কী হয়, এ বইয়ে সেগুলো ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থী কীভাবে উত্তরপত্র মানসম্মত করবে? কীভাবে পরীক্ষকের দৃষ্টি নিজের খাতার প্রতি আকর্ষণ করবে? এর জন্য অত্যন্ত বাস্তবসম্মত সাতটি উপদেশ উল্লেখ করা হয়েছে। 'পরীক্ষা সম্পর্কে শেষ কথা' শিরোনামে পরীক্ষা সম্পর্কে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। এ শিরোনামের অধীনে একটি বিশেষ আলোচনা হয়েছে 'পরীক্ষা লক্ষ্য না

উপলক্ষ্য' এ নিয়ে। শিক্ষার্থী যদি পরীক্ষাকে পড়া আয়ত্ত করার উপলক্ষ্য মনে কর, তাহলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরও বিভিন্ন সুযোগে পুনরাবৃত্তি করে পড়া স্মরণ রাখবে। পক্ষান্তরে পরীক্ষাকে যদি লেখাপড়া করার লক্ষ্য মনে করে, অর্থাৎ যদি শুধু পরীক্ষায় পাশ করার উদ্দেশ্যে লেখাপড়া করে, তাহলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর সে পড়া আর পুনরাবৃত্তি করবে না।

শ্রদ্ধেয় উস্তাদ সর্বশেষে আলোচনা করেছেন এ বিষয়ে যে, ফলদায়ক লেখাপড়ার জন্য শিক্ষাবিদগণ যেসকল উপদেশ দেন সেগুলোর তুলনায় অধিক সুফলদায়ক হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে উদ্দীপনা ও আগ্রহ বিদ্যমান থাকা। এরপর অনেকের পড়াতে মন না বসার ১৪ টা কারণ উল্লেখ করে বিস্তারিতভাবে সেগুলোর সমাধান পেশ করেছেন। তারপর দু'টি আশার বাণী শুনিয়ে 'শেষ কথা' শিরোনামে আলোচনার পটভূমি উল্লেখ করেছেন এবং বড় হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বক্তব্য সমাপ্ত করেছেন।

আমাদেরকে এমন একটি প্রয়োজনীয় বই উপহার দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা শ্রদ্ধাভাজন উস্তাদকে উপযুক্ত বিনিময় দান করুন, বইটিকে তাঁর সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবুল করুন এবং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আরো অনেক শূন্যতা পূরণের জন্য তাঁকে তাওফীক দিন! আমীন!!

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَعُلَمَاءِ اُمَّتِهٖ اَجْمَعِيْنَ، وَبَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي سُوْرَةِ الْحَجِّ : ﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾، وَقَالَ فِي سُوْرَةِ مَرْيَمَ : ﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا﴾، وَقَالَ فِي سُوْرَةِ صٓ عَلٰى لِسَانِ سَيِّدِنَا سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ : ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾. وَقَالَ الرَّسُوْلُ الْاَكْرَمُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ إِلٰى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ إِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا : «يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ، وَقَالَ اَيْضًا : «مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَه مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِه» أَخْرَجَه مُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوٗدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

সবাই ভালো আছো তো? ... আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে সুস্থ ও [৩]অবসর রাখুন। আমীন!

অবস্থা জানার জন্য প্রথমে জিজ্ঞাসা করি– 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইটি তোমাদের কার কার পড়া হয়েছে? যাদের পড়া হয়েছে তারা হাত তোলো। মাশাআল্লাহ, অধিকাংশের পড়া হয়েছে। যাদের পড়া হয়নি তারা সময় করে পড়ে নিবে।

সফলতার ভিত্তিসমূহ ও তার প্রাকৃতিক নিয়মাবলি

সফলতার প্রাকৃতিক সূত্র ও নিয়মগুলো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের নাগালে রেখেছেন। যারা উক্ত নিয়মগুলো অনুসরণ করে, মেধা-স্বাস্থ্য-পরিবেশ-সচ্ছলতা প্রভৃতি দিক তাদের প্রতিকূল হলেও, আলাহ তা'আলা তাদেরকে

---

[৩]. নিজের লক্ষ্যে পৌছাতে চেষ্টা অব্যাহত রাখার জন্য।

সাফল্য দান করেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ [যারা আমার পথে কষ্ট করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথসমূহ দেখাব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সঙ্গে রয়েছেন।] উল্লেখ্য, এখানে সাফল্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উত্তরোত্তর অগ্রগতি লাভ।

সাফল্য অর্জনের প্রাকৃতিক নিয়মগুলো হলো–

১. আত্মপরিচয় লাভ
২. ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি;
৩. সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য;
৪. পরিশ্রম-সাধনা, সময়ের সদ্ব্যবহার, লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে প্রবল তাড়না সৃষ্টি;
৫. শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন'ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাঁদের জীবনচরিত অধ্যয়ন করা;
৬. তাকওয়া-তা'আল্লুক মা'আল্লাহ, তাওবা-ইস্তেগফার ও দু'আ-মুনাজাত

আর এসবই প্রত্যেকের ইচ্ছাধীন বিষয়।

এগুলো سُنَّةَ اللهِ فِي الْأَرْضِ অর্থাৎ পৃথিবীর জন্য আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম। যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীকে স্থায়ী রাখা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা, ততদিন এসমস্ত নিয়মে কোনো ব্যত্যয় ঘটবে না। وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيْلًا [আর তোমরা কখনো আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।]

সফলতার উল্লেখিত ভিত্তিসমূহের ব্যাখ্যা জানার লক্ষ্যে 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইটি সকলে পড়বে। পূর্বে যাদের পড়া হয়েছে তারাও সুযোগ করে বিভিন্ন সময় বারবার পড়বে। প্রতিবারই নতুন প্রত্যয় ও নতুন উদ্যম পাবে ইনশাআল্লাহ।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, লেখাপড়া করার আদর্শ পদ্ধতি। তোমরা সবাই মাদরাসায় লেখাপড়া করার জন্য এসেছো। তো এ বিষয়টি তোমাদের জানতে হবে যে, পড়ালেখা করার আদর্শ পদ্ধতি কোনটি। কেউ যখন সরল পথে চলে, সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে, তখন সে সামান্য চেষ্টা

ব্যয় করেও অসামান্য ফল অর্জন করতে পারে। এই আলোচনায় আমি তোমাদের সামনে লেখাপড়ার পথ আলোকিত করার চেষ্টা করব। যেন পড়াশুনা ও লেখাপড়ার সরল ও সঠিক পথ গ্রহণ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে সমর্থ হও। আলোচনাগুলো দ্বারা আমি নিজেও যেন উপকৃত হই। আমীন!

পড়াশুনার পদ্ধতি বিষয়ে শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণ শুরু থেকেই গবেষণা করে আসছেন। এ বিষয়ে তাঁদের গবেষণামূলক অনেক বই-পুস্তক রয়েছে। অনেকে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ও সন্দর্ভও তৈরি করছেন। যেমন صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ، صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ التَّابِعِيْنَ، الطَّرِيْقُ إِلَى الْأَنْدَلُسِ نَحْوَ ও مَذْهَبٍ إِسلَامِيٍّ فِي الْأَدَبِ والنَّقْدِ প্রভৃতি সমৃদ্ধ কিতাবের স্বনামধন্য লেখক, আরব বিশ্বের বরেণ্য আলেমেদ্বীন, শিক্ষাবিশেষজ্ঞ, ডক্টর আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. فَنُّ الْاِمْتِحَانَاتِ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْمُعَلِّمِ ও فَنُّ الدِّرَاسَةِ নামে আলোচ্য বিষয়ে অতি মূল্যবান দু'টি পুস্তিকা রচনা করেছেন। আমি কয়েক মজলিসে তোমাদের সামনে এ বিষয়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা করেছি।[৪] আলোচ্য পুস্তিকা দু'টির মূলকথাগুলোও আমার আলোচনায় এসে যাবে ইনশাআল্লাহ। অবশ্য فَنُّ الْاِمْتِحَانَاتِ পুস্তিকার পরীক্ষাসংশ্লিষ্ট শুধু সেসব কথাই আলোচনায় আসবে, যেগুলো শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সম্পর্কিত। পুস্তিকাটির যেসব বক্তব্য শিক্ষকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সেগুলো আমার এখনকার আলোচনায় আসবে না।

---

৪. প্রথম মজলিস হয়েছে মাদরাসার মসজিদে ২৯ জিলহজ্ব ১৪৩১ হি. [০৬ ডিসেম্বর ২০১০ ঈ.] সোমবার বাদ জোহর। দ্বিতীয় মজলিস হয়েছে মাদরাসার মসজিদে ০৬ মহররম ১৪৩২ হি. [১৩ ডিসেম্বর ২০১০ ঈ.] সোমবার বাদ জোহর। তৃতীয় ও চতুর্থ মজলিস হয়েছে ০৯ সফর ১৪৩২ হি. [১৫ জানুয়ারি ২০১১ ঈ.] শনিবার। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম মজলিস হয়েছে ১১ সফর [১৭ জানুয়ারি] সোমবার। অষ্টম মজলিস হয়েছে ২৫ সফর [৩১ জানুয়ারি] সোমবার। নবম মজলিস হয়েছে ০১ রবিউল আউয়াল [০৫ ফেব্রুয়ারি] শনিবার। দশম ও একাদশ মজলিস হয়েছে যথাক্রমে ৫ ও ৬ রবিউল আউয়াল [০৯ ও ১০ ফেব্রুয়ারি] বুধ ও বৃহস্পতিবার। দ্বাদশ ও সর্বশেষ মজলিস হয়েছে ১৫ই রবিউল আউয়াল [১৯ ফেব্রুয়ারি] শনিবার।

শিক্ষার্থীদের কিছু সমস্যা

অনেকে এই অভিযোগ করে যে, সারাদিন ও রাতের বিরাট অংশ কিতাব নিয়ে বসে থাকি। কিন্তু ক্লান্তিকর চেষ্টার পরও অর্জনের পরিমাণ হয় অতি সামান্য। অনেকে তো এমনও বলে– পরিচ্ছেদের শেষ অংশ পড়ার আগেই শুরু অংশ ভুলতে আরম্ভ করি। অনেকে বলে– অলসতা তাড়িয়ে অধ্যয়ন করতে শুরু করি। কিন্তু স্থির হয়ে বসার আগেই ক্লান্তি ও অবসাদ আচ্ছন্ন করে নেয়। পড়াশুনা ও কিতাব থেকে মন উদাসীন হয়ে যায়। হাই নেওয়ার জন্য মুখ খুলে যায়। আড়মোড়া দেয়ার জন্য দুই বাহু ছড়িয়ে যায়।[৫] তারপর কিতাব বন্ধ করে ফেলি। কিন্তু আশ্চর্য! অন্য কাজ শুরু করলে আর অলসতা থাকে না।

সকলেই এ আলোচনায় আল্লাহ চাহে তো এমন কিছু দিক-নির্দেশনা পাবে, যা তাদেরকে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে সহায়তা করবে ইনশাআল্লাহ।

কতো তরুণ পড়াশুনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে! নিজেদের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে! কতো শিক্ষার্থী বিরক্তির সাথে পড়ালেখা করছে! লেখাপড়ার ব্যাপারে হতাশ হয়ে গেছে! তারা যদি পড়ালেখা করার ফলদায়ক পদ্ধতি জানত এবং এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরিমাণ সচেতন দিক-নির্দেশনা লাভ করত, তাহলে যারা নিরাশ হয়েছে নিরাশ হত না এবং জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলো মন-মরা, বিষণ্ন ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে কাটাত না।

---

৫. 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ে ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় অযৌক্তিক ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার অত্যন্ত ফলদায়ক কিছু দিকনির্দেশনা উল্লেখ করা হয়েছে।

লেখাপড়ার পরিকল্পনা

রুটিন কী?

শিক্ষাগ্রহণ মূলত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যবিশিষ্ট যুদ্ধের মতো একটি কর্ম। আন্তরিক লেখাপড়া হলো অলসতা, অরাজকতা, সময় নষ্ট এবং নফসের বিরুদ্ধে এক যুদ্ধ। আর যে কোনো যুদ্ধের জন্য চাই সুদৃঢ় সুপরিকল্পনা। পড়াশুনার সেই পরিকল্পনাকেই আমরা রুটিন বলি। আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. রুটিনের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ, উন্নত লেখাপড়ার জন্য রুটিন হলো প্রথম ভিত্তি।

রুটিনের প্রয়োজন বোঝার জন্য একটি কার্যকর উপদেশ

রুটিনের গুরুত্ব ও প্রয়োজন বোঝার জন্য রাফাত পাশা রহ. শিক্ষার্থীদেরকে উপদেশ দিয়েছেন, তারা যেন এই রাতে শোয়ার পূর্বে একটি কাগজ ও কলম হাতে নেয়। গত রাতে শোয়া থেকে শুরু করে এই রাতে শোয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুরো সময়কে বিশ্বস্ততা ও সততার সাথে পর্যবেক্ষণ করে। দিনের চব্বিশ ঘণ্টার প্রত্যেক ঘন্টার সামনে তখন যে কাজ করেছে তা লিখে।

প্রবল ধারণা হলো, অধিকাংশ শিক্ষার্থী এমন এক বেদনাদায়ক ফলাফলের সম্মুখীন হবে, যা তারা কখনো প্রত্যাশা করেনি। এই পর্যবেক্ষণে শিক্ষার্থীর যে অবস্থা ফুটে উঠবে, কেউ যদি তার সম্পর্কে সে অবস্থার অভিযোগ করত, তাহলে নিজের সম্পর্কে এমন অবমাননাকর অভিযোগ শুনে শিক্ষার্থী কখনো চুপ থাকত না। উপরন্তু প্রতিবাদ করত। তবে এই পর্যবেক্ষণের ফলাফল যেমনই হোক, তা শিক্ষার্থীকে এমন একটি রুটিন তৈরিতে অবশ্যই উদ্বুদ্ধ করবে, যার মাধ্যমে সে জীবনকে সুবিন্যস্ত করবে, অপব্যয় থেকে সময়কে রক্ষা করবে, বৃথা যাওয়া থেকে চেষ্টাকে সংরক্ষণ করবে, বিনষ্ট হওয়া থেকে সামর্থ্যের সুরক্ষা করবে, নিজের অস্তিত্বকে অর্থবহ করবে এবং জীবনকে করবে সার্থক।

নিজেদের সময় রুটিন অনুসারে ব্যয় করতে প্রস্তুত আছো তো? আচ্ছা তাহলে কীভাবে রুটিন তৈরি করবে সে কথা শোনো–

রুটিন মানেই পুরো সময়কে গাম্ভীর্যপূর্ণ কাজে ব্যস্ত রাখা নয়

দিনের প্রতিটি অংশে একটি নির্দিষ্ট কাজ রাখবে এবং প্রতিটি কাজের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করবে। এর অর্থ তোমার পুরো সময়কে বিরামহীনভাবে গুরুত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়ে রাখার পরামর্শ দেয়া নয়। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, তোমার নিদ্রা-জাগৃতি, গাম্ভীর্য-রসিকতা, হাসি-কৌতুক সবকিছুকে একটি রুটিনের অধীনে করা, যেন তুমি এ ব্যাপারে পুরো সচেতন থাক যে, তোমার জীবনকে কীভাবে নিঃশেষ করছ এবং তোমার যৌবনকে কীভাবে জীর্ণ করছ।

জীবনকে রুটিনের অন্তর্ভুক্ত করলে জীবনকে উপভোগ করা, বিভিন্ন ধরনের তৎপরতায় অংশগ্রহণ করা, সামাজিক বিভিন্ন দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া প্রভৃতি কাজ করার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ পাওয়া যায়। বরং রুটিনই উপভোগকে অর্থবহ করে এবং কম হওয়ার কলঙ্ক থেকে উপভোগকে নির্মল রাখে। তোমার বিনোদনটাও যখন পূর্বপরিকল্পিত হবে, তখন তাতে অতিরিক্ত সময় ব্যয় হবে না। আর যতটুকু সময় ব্যয় হবে, তার জন্য পরবর্তীতে আফসোস হবে না।

এই রুটিন তখনই যথাযথ হবে, যখন ভোরে ঘুম থেকে উঠার পর হতে শুরু করে রাতে শোয়ার পূর্ব পর্যন্ত পুরো সময়কে এর অধীন করবে এবং তোমার দিন, সপ্তাহ, মাস ও পুরো শিক্ষাবছরকেও সামনে রাখবে।

সপ্তাহের ভিত্তিতে রুটিন তৈরি ও তার পদ্ধতি

রুটিন তৈরির সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, সপ্তাহের ভিত্তিতে রুটিন তৈরি করা। অর্থাৎ এক সপ্তাহে কতটুকু অর্জন করতে চাও, তা সপ্তাহের শুরুতে নির্দিষ্ট করে নিবে, তারপর তা লিখে রাখবে।

প্রথমত দরসের সময় এবং নামায, খাবার, ঘুম ও অজু-এস্তেঞ্জার সময়গুলোকে নির্ধারণ করবে। এগুলো তোমার স্থায়ী কাজ। এগুলোতে হাত দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। তারপর অবশিষ্ট সময়ে পাঠ্য বিষয়গুলো আয়ত্ত করবে এবং ব্যক্তিগত প্রয়োজনসমূহ পূরণ করবে। প্রতিটি বিষয় ও প্রতিটি প্রয়োজনের জন্য যে পরিমাণ সময় দরকার হবে, তার আন্দাজ করবে এবং পরিমিত সময় নির্ধারণ করবে।

রুটিনে সিলেবাসবহির্ভূত কিতাব ও বইয়ের জন্যও সময় রাখবে

একজন শিক্ষার্থীর জন্য তার সিলেবাসভুক্ত কিতাব ও বইগুলো হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো আয়ত্ত করার প্রতিই তার সবচেয়ে বেশী মনোযোগী থাকা উচিত। তবে এ বাস্তবতাও স্মরণ রাখা জরুরি যে, সিলেবাসের কিতাব ও বইয়ে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের আলোচনা ঠেসে দেওয়া হয়নি। বহু প্রয়োজনীয় বিষয় এমন আছে, যেগুলো সিলেবাসের কিতাবগুলোতে অনুপস্থিত। অন্যান্য কিতাব ও বই পড়ে শিক্ষার্থীর সেগুলো জানতে হয়। সেগুলো শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। প্রাত্যহিক রুটিনে সেগুলোর জন্যও কিছু সময় বরাদ্দ রাখতে হবে।

রুটিন তৈরিতে বাস্তববাদী থাকবে

রুটিন তৈরির সময় বাস্তববাদী থাকবে। বাড়াবাড়ি করবে না। বাড়াবাড়ি হতাশা ডেকে আনে। আর হতাশার পরিণতি খুবই অশুভ। অনুরূপভাবে অবহেলাও করবে না। অবহেলার অশুভ পরিণতি বাড়াবাড়ির অশুভ পরিণতির চেয়ে কম নয়। বাড়াবাড়ি ও অবহেলার উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নিজের সম্পর্কে একজনের অভিজ্ঞতা হলো, এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করতে তার ১ ঘণ্টার সময়ের দরকার হয়। অন্যজনের মেধার অবস্থা হলো, সেই একই পৃষ্ঠা সে ১৫/২০ মিনিটের মধ্যে মুখস্থ করে ফেলতে পারে। তো প্রথমজন যদি এক পৃষ্ঠা মুখস্থ করার জন্য ১৫/২০ মিনিট বা আধ ঘণ্টা নির্ধারণ করে, তা হবে বাড়াবাড়ি। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়জন যদি ঐ পৃষ্ঠা মুখস্থ করার জন্য ১৫/২০ মিনিটের চেয়ে বেশী সময় বরাদ্দ রাখে, সেটা হবে তার জন্য সময় নষ্ট ও অবহেলা।

মোটকথা, প্রত্যেকে রুটিন তৈরি করবে নিজ সামর্থের দিকে লক্ষ রেখে। অন্যজনের রুটিন তোমার জন্য সম্পূর্ণ উপযোগী না-ও হতে পারে।

এখানে আমি এমনিতেই 'মুখস্থ' শব্দটা ব্যবহার করলাম। অন্যথায় এ আলোচনায় 'মুখস্থে'র পরিবর্তে 'মনে রাখা'র উপর জোর দেয়া হবে বেশী। মুখস্থ করা ও মনে রাখা এক জিনিস নয়।

অধিক কঠিন কিতাব ও পছন্দনীয় কিতাব পড়ার সময় নির্বাচনে তারতম্য

রুটিন তৈরির সময় অধিকতর কঠিন বিষয়ের জন্য সবচেয়ে ভালো সময় নির্বাচন করবে। সবচেয়ে ভালো সময় হলো সেটি, যখন মেধা অধিক সতেজ ও উদ্যম থাকে। পক্ষান্তরে যেসব বিষয় তুমি পছন্দ কর এবং যেগুলোর অধ্যয়নে তুমি তৃপ্তি পাও, সেগুলোর অধ্যয়ন শেষে অথবা দু'টি কঠিন বিষয়ের মধ্যখানে রাখবে।

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. তাঁর قيمةُ الزَّمَنِ عندَ العلماءِ কিতাবে[৬] খতীব বাদগাদী রহ.-এর الفقيهُ والمتفقِّهُ কিতাব থেকে[৭] নকল করেছেন, খতীব বাগদাদী রহ. লিখেছেন, মুখস্থ করার সর্বোত্তম সময় হলো শেষ রাত। তারপর দিনের মধ্যভাগ। তারপর সকাল। রাত মুখস্থ করার জন্য দিনের তুলনায় অধিক উপযোগী। অনুরূপভাবে ক্ষুধার সময় তৃপ্তির সময়ের তুলনায় অধিক উপযোগী। অতএব মুখস্থকারী ব্যক্তির জন্য ক্ষুধার সময়গুলোর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত। তবে ক্ষুধা বেশি হলে সামান্য খাবার গ্রহণ করে নিবে, পুরো ক্ষুধা দূর করবে না।

শায়খ উক্ত কিতাবে[৮] ইমাম ইবনে জামা'আ রহ.-এর تذكرةُ السامعِ والمتكلِّمِ কিতাব[৯] থেকে নকল করেছেন– মুখস্থ করার সর্বোত্তম সময় হলো শেষ রাত। আর গবেষণার জন্য সর্বোত্তম সময় হলো সকাল। লেখার উপযোগী সময় হলো দিনের মধ্যভাগ। পক্ষান্তরে মুতালাআ ও মুজাকারার উপযোগী সময় হলো রাত।

কঠিন পড়া সহজ করার পদ্ধতি

প্রসঙ্গত বলা যায়, অনেক ছাত্র-ছাত্রী 'কঠিন' শব্দটিকে 'অসম্ভব' শব্দের সমার্থক মনে করে। কোনো পড়া কঠিন হলে তারা মনে করে, তা শেখা সম্ভব নয়। দারুল উলুম দেওবন্দের আমাদের উস্তাদ মাওলানা নুর আলম খলীল আমীনী মুদ্দাজিলুহু কোনো পড়া তুলনামূলক কঠিন হওয়াকে স্বীকার

---

৬. পৃ. ১৮৪ [দারুস সালাম, কায়রো-এর দ্বিতীয় সংস্করণ]

৭. ২ ঃ ২০৭ - ২০৮

৮. পৃ. ১৮৫ - ১৮৬

৯. পৃ. ৭২

করতেন। তবে তিনি বলতেন– কঠিন হয়েছে তো কী হয়েছে? সহজ পড়া আয়ত্ত করার জন্য যদি তা ৫ বার পড়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে কঠিন পড়াটা ১৫ বার পড়ো। দেখবে, তা সহজ পড়ার চেয়েও সহজ মনে হবে।

এখানে স্মরণযোগ্য একটি সুন্দর কথা হলো, 'কঠিন' শব্দটা ব্যবহার না করা। কোনো পড়াকে কঠিন না বলে 'গুরুত্বপূর্ণ' বলবে। এর দ্বারা পড়াটি আয়ত্ত করা তুলনামূলক সহজ হবে।

ভাগ ভাগ করে পড়ার সুফল

সপ্তাহের ভিত্তিতে তৈরি রুটিন অনুযায়ী পড়ার ক্ষেত্রে কোনো কোনো বিষয় একটানা পড়ার পবিরর্তে ভাগ ভাগ করে পড়া ভালো হবে। উদাহরণস্বরূপ তুমি যদি تاريخ دعوت وعزيمت বা তার অনুবাদ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' বইটির জন্য এক সপ্তাহে ৭ ঘন্টা বরাদ্দ রাখ, তাহলে এক রাতে বা দু'রাতেই সাত ঘন্টা পড়ার পরিবর্তে সাত রাতে সাত ঘন্টা পড়বে। তাহলে মধ্যবর্তী বিরতিগুলোতে মস্তিষ্ক পঠিত তথ্যগুলো ভালোভাবে বিন্যস্ত ও আত্মস্থ করার সুযোগ পাবে।

দরসের পড়া আয়ত্ত করা শিক্ষার্থীর প্রধান কাজ

আমি শুধু উদাহরণ হিসেবেই 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' বইটির নাম নিলাম। তবে স্মরণ রাখবে– আসাতিযা কেরাম দরসগাহে [শ্রেণীকক্ষে] যে তা'লীম দান করেন, তা আত্মস্থ করাই একজন শিক্ষার্থীর প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং প্রথমেই তুমি দরসের পড়াগুলো পড়বে। পড়ার পাশাপাশি লিখতেও হবে। কথায় আছে– একবার লেখা দশবার পড়ার সমান। তারপর যে সময়টুকু অতিরিক্ত পাবে, জীবনের শুরুর দিকে সে সময়টুকু বিশেষ করে ভাষাদক্ষতা অর্জনে ব্যয় করবে। তাহলে অল্প সময়ে ও কম মেহনতে অনেক অগ্রসর হতে পারবে। ভাষাদক্ষতা অর্জনে মোটামুটি অগ্রসর হওয়ার পর, তার পাশাপাশি আকাবিরের জীবনীগ্রন্থ অধ্যয়ন করবে। সিলেবাসবহির্ভূত বিষয়ভিত্তিক অধ্যয়নে আকাবিরের জীবনচরিত, বাণীসমগ্র ও পত্রসমগ্র পড়াকে প্রাধান্য দিবে।

ছুটির দিনগুলোর রুটিন

ছুটির দিনগুলোতে আলাদা রুটিন থাকবে। এ পুস্তকের শেষে সংযুক্ত 'মুহাসাবা করি জীবন গড়ি' নামক পুস্তিকায় ছুটির দিনগুলোর জন্যও একটি আদর্শ রুটিন আছে। তার অনুসরণ করার চেষ্টা করবে।

অসমাপ্ত পড়া সমাপ্ত করার সময়

প্রতি রাতে আধ ঘন্টা সময় খালি রাখবে। এটি তোমার রিজার্ভ সময়। কারণ, বিভিন্ন বিষয়ের জন্য তুমি যে পরিমাণ সময় বরাদ্দ করেছ, সে সময়ের মধ্যে সেগুলো শেষ না-ও হতে পারে। এভাবে রিজার্ভ সময় রাখলে রুটিনে ফাটল পড়বে না এবং এক বিষয়ের কারণে অন্য বিষয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি হবে না।

তবে শুরু থেকেই চেষ্টা করবে, এই রিজার্ভ সময়টি তুমি শুধু সর্বোচ্চ প্রয়োজনের অবস্থায়ই ব্যবহার করবে। প্রতিটি বিষয় তার জন্য বরাদ্দ সময়ে সমাপ্ত করার চেষ্টা করবে। তাহলেই সে রাতে যা পড়েছ, রিজার্ভ সময়ে সেগুলোর মধ্যকার তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো পুনরাবৃত্তি করার সুযোগ পাবে।

তোমার রুটিনে যেন ফাটল না পড়ে, এর জন্য প্রতি সপ্তাহে কিছু সময় রিজার্ভ সময় রাখবে। তখন তুমি তোমার প্রয়োজনীয় বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করবে। যেমন জুমাবার সকাল ৯ টা থেকে সাড়ে ১০ টা পর্যন্ত জামা-কাপড় ধৌত করবে এবং সোমবার আছরের পর জরুরি কেনাকাটা করবে। তবে এ জাতীয় ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্য মাদরাসার পক্ষ থেকে যদি কোনো সময় নির্ধারণ করে দেয়া থাকে, তাহলে সে সকল সময়েই তোমার এ সকল কাজ সম্পাদন করবে।

সারা দিনে দরসের পড়া ও অন্যান্য পড়ার সময়

অনেক ছাত্র অভিযোগ করে, উস্তাদজী! দরসের পড়াতেই আমাদের পুরোদিন ব্যয় হয়ে যায়। দরসের দায়িত্বসমূহের পাশাপাশি অন্য যেসকল কাজের কথা বলেন, সেগুলো করার তো সময় পাই না। তাদেরকে বলব, ফজর থেকে এশা পর্যন্ত পুরো সময় তোমরা দরসের পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকো। কারণ দরসে সেসকল বিষয়ই পড়ানো হয়, যেগুলো একজন শিক্ষার্থীর সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। তাই সবচেয়ে বেশি মনোযোগ সেগুলোর প্রতি দেয়াটাই অধিক ন্যায়সঙ্গত। তোমরা শুধু এশা থেকে ঘুম [১০.৩০ / ১১টা] পর্যন্ত সময়টুকু ভাষা চর্চা, রোযনামচা লেখা ও কিছু সাধারণ অধ্যয়নে, বিশেষ করে আকাবিরের জীবনীগ্রন্থ-বাণীসমগ্র-পত্রসমগ্র ইত্যাদি পঠনে ব্যয় করো। রোযনামচা একদিন লিখবে বাংলায় একদিন

লিখবে আরবীতে। সাধারণ অধ্যয়নের জন্য উস্তাদের তত্ত্বাবধানে একটি সুপরিকল্পিত রুটিন তৈরি করে নিবে। তাহলে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি প্রয়োজন পরিমাণ ভাষাদক্ষতাও অর্জন হবে। জীবনের জন্য দিকনির্দেশনা ও চেতনাও লাভ করবে ইনশাআল্লাহ।

সফল লেখক হওয়ার অনুশীলনের রুটিন

সফল লেখক হওয়ার অনুশীলনের জন্য আমার 'আরবী ভাষা পাঠদান পদ্ধতি' বইয়ের পরিশিষ্টে আদীব হুজুর মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা.বা.-এর তৈরি একটি রুটিন উল্লেখ করেছি। প্রসঙ্গত তা-ও এখানে শোনো রাখো। হুজুর লিখেছেন–

"ক. নিয়মিত রোযনামচা লেখা।

খ. ছোট ও হালকা বিষয়ের উপর মাসে অন্তত তিন চারটে ছোট ছোট লেখার অনুশীলন করা।

গ. মাসে অন্তত একটি ভ্রমণকাহিনী লেখা।

ঘ. মাসে অন্তত একবার কোনো বিষয়ের উপর একটি দু'টি লেখা সামনে রেখে নিজের পক্ষ থেকে ঐ বিষয়ে একটি লেখা তৈরীর অনুশীলন করা।

ঙ. প্রতিদিন নিয়মিত কিছু সময় মানসম্মত সাহিত্য অধ্যয়ন করা।

চ. এবং জ্ঞান ও তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ের উপর নিয়মিত সাধারণ অধ্যয়ন চালিয়ে যাওয়া।

তাহলে একজন সফল লেখক তৈরী হওয়ার পথে ইনশাআল্লাহ আর কোনো বাধা থাকবে না।"

এ রুটিন বাংলা-আরবী সব ভাষার সাহিত্য চর্চার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য।

আর শোনো– বাংলা ভাষা চর্চার জন্য আপাতত আদীব হুজুরের 'পুষ্প' ও অন্যান্য লেখা পাঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকো। 'পুষ্পে'র দ্বিতীয় প্রকাশনার ১৯ নং সংখ্যার 'এসো কলম মেরামত করি' প্রবন্ধের এক পর্যায়ে আদীব হুজুর এই কথাটি লিখেছেন। সম্পূর্ণ যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য কথা–

"তবে আমার কাছে যারা জানতে চায় তাদের আমি 'আকুতি, কাকুতি, মিনতি' এবং আরো যা কিছু শব্দ আছে সব জড়ো করে বলবো– দোহাই আল্লাহর, সাহিত্যচর্চার নামে কোনো প্রকার বাবুরই [হিন্দু বাবু হোক আর

মুসলিম বাবু হোক] সংস্পর্শ গ্রহণ করতে যেয়ো না। তাতে সাহিত্যচর্চা যদিও বা কিছু হয়, ঈমান, আমল ও আখলাক এবং চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধ চর্চার অপমৃত্যু ঘটবে। আগে তো সেই মহামূল্যবান সম্পদ রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে, যার প্রচারের বাহনরূপে ভাষা ও সাহিত্যচর্চা তুমি করতে চাও। 'আত্মপ্রশংসা করছি' এ নিন্দার ভয়ে একটি প্রয়োজনীয় সত্য বলবো না, তা কি সঙ্গত? সুতরাং শোনো– যে বয়সে বিচার-পর্যালোচনার বোধ ও বুদ্ধি থাকে না, যে বয়সটা আপাতসুন্দর সবকিছুতে মুগ্ধ হওয়ার জন্য ভারি উপযুক্ত, সেই ঝুঁকিপূর্ণ বয়সে সাহিত্যচর্চা করার জন্য পুষ্পের কল্যাণে নিরাপদ আয়োজন এখন মোটামুটি সম্পন্ন হয়েছে। সুতরাং আমার ছাত্রদের অবশ্যই বলবো– নিরাপদ পরিমণ্ডলেই বাস করো এবং কাজ করো। তাতে যদ্দুর সাহিত্যচর্চা হয়, তারই উপর শোকর করো। এ বয়সে এর চেয়ে বেশীর সত্যি বলছি, প্রয়োজন নেই।"

তালিবে ইলমের দৈনন্দিন করণীয়

'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইয়ে 'তালিবে ইলমের দৈনন্দিন করণীয়' শিরোনামে কিছু দিকনির্দেশনা আছে। দিকনির্দেশনাগুলো উল্লেখ করার মাধ্যমে আলোচ্য আলোচনার ইতি টানার ইচ্ছা করছি–

'আগামী সবক মুতালা'আ, নিয়মিত দরসে উপস্থিতি, দরস সমাপ্ত হওয়ার পর তাকরার করা এবং উস্তাদে মুহতারামের দেওয়া কাজগুলো যত্নসহকারে করা ইত্যাদি একজন তালিবে ইলমের জরুরি দায়িত্ব। এসব কাজ ছাড়াও একজন উচ্চাভিলাষী সচেতন তালিবে ইলমকে আরো কিছু কাজ করতে হয়। যথা ঃ

১. নির্বাচিত শুরূহ ও হাওয়াশী মুতালা'আ করা।

২. নেসাবী কিতাবসমূহের গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ও মাবাহেসের উপর লিখিত স্বতন্ত্র ও মানসম্পন্ন রচনাবলীর সন্ধান নিয়ে তা অধ্যয়ন করা।

৩. গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী নোট করা।

৪. গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি তাকরার ও পারস্পরিক মুযাকারার মাধ্যমে আত্মস্থ করা।

৫. প্রবন্ধ-নিবন্ধ লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং হস্তলিপি স্পষ্ট ও সুন্দর করার চেষ্টা করা।

৬. পূর্ণ দ্বীনের সঠিক ধারণা লাভ করার জন্য এবং তারবিয়ত ও তাযকিয়ার জন্য আকাবির ও আসলাফের রচনাবলি পাঠ করা।

৭. নিয়মিত কুরআন তেলাওয়াত এবং কিছু কিছু নফল আমল ও যিকির-আযকারের অভ্যাস গড়ে তোলা।

৮. আদাবে মুআশারা [সামাজিক ও সমষ্টিগত জীবনের উসূল ও আদাব] সম্পর্কে সঠিকভাবে জেনে বাস্তব ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠোরভাবে তার অনুশীলন করা।'[১০]

রুটিনের প্রতি আকাবিরদের গুরুত্বারোপ

রুটিন সম্পর্কে এতক্ষণ যে সকল আলোচনা করা হলো তা তখনই সুফল বয়ে আনবে যখন কেউ সে অনুযায়ী চলার জন্য পূর্ণ বদ্ধপরিকর থাকে। পরিস্থিতি যেমনই হোক, নিজের রুটিনের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। আমাদের আকাবিরদের কাছে তাঁদের রুটিনের এমনই গুরুত্ব ছিল। তাঁদের বড় হওয়ার পেছনে রুটিনের প্রতি তাঁদের গুরুত্বারোপ মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। اشرف السوانح কিতাবে আছে,[১১] হযরত থানবী রহ. বলেছেন, সময়ের সুশৃঙ্খল নিয়ন্ত্রণ তখনই সম্ভব যখন মানুষ আখলাক ও ভদ্রতাবোধের কাছে পরাজিত হবে না এবং প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে ও যথাস্থানে করবে। নিম্নে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর 'আপবীতি' কিতাব থেকে এ সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করছি।

১. হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রহ. যিনি হযরত থানবী রহ.-এর উস্তাদ ছিলেন একবার হযরত থানবী রহ.-এর মেহমান হন। হযরত থানবী রহ. উস্তাদের আরামের সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর যখন তাঁর লেখালেখির সময় হলো, আদবের সাথে উস্তাদের নিকট আরজ করলেন, হযরত! আমি এই সময়ে সামান্য লেখালেখি করি, হযরতের অনুমতি হলে কিছু সময় লিখে চলে আসব। হযরত শায়খুল হিন্দ রহ. বললেন, অবশ্যই লিখবে। আমার কারণে তোমার কাজের

---

[১০]. 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' পৃ. ৩৩ - ৩৪

[১১]. ১ ঃ ২৭

ক্ষতি করবে না। সেদিন হযরত থানবী রহ. লেখায় মনোযোগ দিতে পারেননি, কিন্তু বেবরকতী যাতে না হয় এ জন্য সেদিনও লেখা বাদ দেননি; অল্প কিছু লিখেন। সামান্য লিখে হযরত শায়খুল হিন্দ রহ.-এর খেদমতে উপস্থিত হন।[১২]

২. تفويض حسن العزيز কিতাবে আছে,[১৩] হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.-এর নিকট কেউ বসা থাকলে আর চাশত বা ইশরাকের সময় হলে তিনি সোজা উঠে অজু করে নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন। কিছু বলতেন না এবং উঠার জন্য অনুমতিও নিতেন না। খাবারের সময় লাকড়ি নিয়ে উনুনের দিকে চলে যেতেন। নবাবের ছেলে বসা থাকলেও কোনো পরওয়া করতেন না। তাঁর খানকায় বাদশাহী শান-শওকত ছিল। এক তো অল্প কথা বলতেন। যদি কখনো কথা বলার প্রয়োজন হত সংক্ষেপে দ্রুত কথা শেষ করে তাসবীহ্ পাঠে নিমগ্ন হতেন। কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেন। না করলে কেউ যদি ঘণ্টার পর ঘণ্টাও বসে থাকত, তিনি ভ্রুক্ষেপ করতেন না।[১৪]

৩. حسن العزيز কিতাবে আছে,[১৫] হযরত মাওলানা মুযাফ্ফর হোসাইন কান্ধলভী রহ. নিজের মা'মূলাতের [প্রাত্যহিক কাজ] ব্যাপারে এতটাই যত্নশীল ছিলেন যে, এমনকি সফরেও তিনি তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। তখন ট্রেন ছিল না। গরুর গাড়িতে চড়ে মানুষ সফর করত। গরুর গাড়ি দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য লোকেরাও সাথে থাকত। তিনি পথিমধ্যে তাহাজ্জুদ পড়তেন। কিন্তু সাথীদের কষ্ট হবে ভেবে গাড়ি থামাতেন না। তাহাজ্জুদ এভাবে পড়তেন যে, গাড়ি থেকে নেমে সামনে অগ্রসর হতেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। আবার সামনে অগ্রসর হতেন এবং দুই রাকাত নামায আদায় করতেন। এভাবে তাহাজ্জুদ পূর্ণ করতেন।[১৬]

---

১২. 'আপবীতি' ২ ঃ ৭৮

১৩. ১ম খণ্ড, ৪৯৫ নং মালফূয।

১৪. 'আপবীতি' ২ ঃ ৮০

১৫. ৪ ঃ ২৩৮

১৬. 'আপবীতি' ২ ঃ ৮০

৪. 'আপবীতি'তে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. এক প্রসঙ্গে লিখেছেন–[১৭]

সে সময়কার একটি ঘটনা মনে পড়েছে। ঘটনাটি ঐ সময় লোকমুখে খুব ছড়িয়ে পড়েছিল। আমার মুখলিস বন্ধু হাকীম তাইয়্যিব ও মৌলভী আমের রায়পুরীর পিতা সে সময় আমার কাছে ঘন ঘন আসতেন। যেহেতু খুব অল্প সময়ের জন্য আসতেন এবং খুব সংক্ষেপে রাজনৈতিক খবরাখবর শুনিয়ে চলে যেতেন, এজন্য তাঁর আগমনের ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। একবার রমযানে সকাল আটটা কিংবা ন'টার সময় তিনি আসলেন। মৌলভী নাসিরকে বললেন, দরজা খুলে দাও। ও বলল, রমযান মাস, এখন খোলা যাবে না। তখন দরজায় তিনি নিজেই আওয়াজ দিতে চাইলেন। মৌলভী নাসির বাধা দিয়ে বলল, হয়ত তিনি শুয়ে আছেন। আর যদি উঠে থাকেন তাহলে নফল নামায আদায় করছেন। যতই ডাকাডাকি করেন এখন সাক্ষাৎ করা যাবে না। এতে তিনি রাগ করে মাদরাসায় চলে গেলেন।

রাস্তায় মাওলানা মনযূর আহমদ খান ছাহেবের সাথে দেখা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, হাকীমজী! কোথায় আসলেন? শায়খের তো এখন রমযান মাস। এ কথা শুনে তাঁর মাঝে কিছুটা ভাবনার উদয় হলো এবং নাসীরের প্রতি রাগ কমে গেল। এরপর তিনি হযরত নাযেম ছাহেব রহ.-এর নিকট গেলেন। তিনি তখন চিঠি লেখাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, হাকীমজী! কোথায় আসলেন? শায়খের তো এখন রমযান মাস। এরপর তিনি সেখান থেকে উঠে মুফতী মাহমুদ ছাহেবের কাছে গেলেন। মুফতী ছাহেব তখন মাদরাসায়ে কাদীমের এক কক্ষে থাকতেন। মুফতী ছাহেবও তাঁকে দেখে একই কথা বললেন। তখন হাকীমজী জিজ্ঞেস করলেন, তাহলে রমযান মাসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার নির্দিষ্ট কোনো সময় আছে কিনা? মুফতী

---

১৭. নিম্নের ঘটনাটি শায়খুল হাদীস রহ. 'আপবীতি'তে যে প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন, উক্ত প্রসঙ্গটি 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ১৩১ - ১৩২ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাহেব বললেন, তারাবীর পর আধা ঘণ্টা। হাকীমজী বললেন, আমাকে তো রামপুর যেতে হবে। অত রাতে সাক্ষাৎ করে রামপুর ফেরা তো সম্ভব নয়। মুফতী ছাহেব বললেন, যোহরের পনের মিনিট পূর্বে শায়খ মসজিদে আসবেন। তখন সাক্ষাৎ করে নিবেন। অথবা নামাযের পর বাড়ি যাওয়ার পথে দেখা করতে পারেন।

হাকীমজী যোহরের আগেই মসজিদে আসলেন। কিন্তু আমি তখন যোহরের সুন্নতে দাঁড়িয়ে গেছি। যোহরের ফরজ আদায় করে আবার সুন্নতের নিয়ত করলাম। অনেকক্ষণ বসে থেকে যখন তিনি দেখলেন যে, রুকূ'তে যাচ্ছি না; তখন যোহরের সুন্নতে এক পারা দু'বার তেলাওয়াত করার অভ্যাস ছিল, তখন তিনি বিলম্ব হবে মনে করে 'মটর গাশতে' চলে গেলেন। ফিরে এসে দেখলেল যে, আমি নামায শেষ করে ঘরে গিয়ে কুরআন শুনাতে ব্যস্ত হয়ে গেছি। তিনি ধুপধাপ করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলেন এবং অভিমানের সুরে বললেন, ভাইজী! আস্‌সালামু আলাইকুম। কথা বলবো না, শুধু একটি বাক্য বলে চলে যাচ্ছি– 'রমযান আল্লাহর রহমতে আমাদের কাছেও আসে কিন্তু এমন জ্বরাক্রান্ত অবস্থায় আসে না। আস্‌সালামু আলাইকুম, যাচ্ছি। ঈদের পর দেখা করব।' আমি বললাম, ওয়া আলাইকুমুস সালাম। এরপর আবার কুরআন শুনাতে ব্যস্ত হয়ে গেলাম।[১৮]

---

[১৮]. 'আপবীতি' ১ ঃ ৮০ - ৮১

কষ্ট-ক্লেশ ও স্বাস্থ্য

রুটিন তৈরির সময় স্বাস্থ্যের দিকও গুরুত্বের সাথে বিবেচনাযোগ্য

রুটিন তৈরি করতে হয় নিজের শক্তি ও সামর্থ্যের আলোকে। স্বভাবতই এ প্রসঙ্গে কষ্ট-ক্লেশ ও চেষ্টা-সাধনার আলোচনা আসে। লেখাপড়ার জন্য দেহ ও মস্তিষ্কের উপর অস্বাভাবিক চাপ দিলে যেহেতু স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকে, তাই রুটিন তৈরির সময় স্বাস্থ্যের দিকটিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখতে হয়। তবে এ সত্যও স্মরণ রাখতে হবে যে, কষ্ট-ক্লেশ ও চেষ্টা-সাধনা জীবনের জন্য অত্যাবশ্যক। যেকোনো ফলপ্রসূ কাজে কষ্ট-ক্লেশ থাকবেই। কষ্ট-ক্লেশ মানুষের অস্তিত্বের একটি অন্যতম প্রয়োজন। সফল জীবনের মৌলিক উপাদান।

ডক্টর আহমদ আমীনের এই অনুচ্ছেদটি 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়েও এসেছে–

إِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الشُّبَّانِ يَعْتَقِدُوْنَ أَنَّ هُنَاكَ مَنْ مُنِحُوْا قُدْرَةً عَلَى التَّفَوُّقِ مِنْ غَيْرِ جُهْدٍ، وَعَلَى الإِتْيَانِ بِالْعَجَائِبِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ، وَعَلَى قَلْبِ التُّرَابِ ذَهَبًا بِعَصًا سِحْرِيَّةٍ، وَلٰكِنَّ كُلَّ هٰذِهِ أَفْكَارٌ مُعَطِّلَةٌ عَنِ الْعَمَلِ وَعَنِ النَّجَاحِ.

অর্থ. অনেক তরুণ মনে করে, এমন কিছু লোক আছে যাদেরকে চেষ্টা ছাড়াই শ্রেষ্ঠত্বের স্বাক্ষর রাখার, কষ্ট ছাড়াই আশ্চর্যজনক অবদান রাখার এবং যাদুদণ্ড দ্বারা মাটিকে স্বর্ণে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা দান করা হয়েছে। এগুলো মূলত কাজ ও সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট করার চিন্তা।

দ্বীনি ইলম হাসিল করার একটি অপরিহার্য শর্ত

অবশ্য এখানে এ বাস্তবতাও ভুলে গেলে চলবে না, যা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী রহ. এ ভাষায় বলেছেন–

"পৃথিবীর অন্যান্য জ্ঞান যথা চিকিৎসা, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতিতে দক্ষতা ও পূর্ণতা অর্জন করা মেধা ও মেহনত দ্বারা হতে পারে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত ইলম হলো এক নূর এবং রাসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্ব হলো এক মহান পদমর্যাদা। এই নূর ও পদমর্যাদা লাভের জন্য মেহনত ও পরিশ্রম ছাড়াও আরেকটি অপরিহার্য শর্ত আছে। তাহলো, তা'আল্লুক মা'আল্লাহ ও তাকওয়া। আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে সঠিক সম্পর্ক ও তাকওয়া ছাড়া ইলমের নূর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিনিধিত্বের পদমর্যাদা লাভ করা সম্ভব নয়।" হযরত নো'মানী রহ.-এর বক্তব্যটি 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ে বিস্তারিতভাবে এসেছে।

যাই হোক, আমি বলছিলাম– কষ্ট-ক্লেশ সফল জীবনের অন্যতম মৌলিক উপাদান। ক্লান্তি ছাড়া কোনো লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব নয়।[১৯] যে বিষয়টা এখানে ঝুঁকিপূর্ণ তা হলো অস্বাভাবিক ক্লান্তি। স্বাভাবিক ক্লান্তি ঝুঁকি ও আশঙ্কার বিষয় নয়।

স্বাভাবিক ক্লান্তি ও অস্বাভাবিক ক্লান্তির মধ্যকার পার্থক্য-রেখা

আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. স্বাভাবিক ক্লান্তি ও অস্বাভাবিক ক্লান্তির মধ্যকার পার্থক্য-রেখা স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেছেন– কেউ যখন রাতে কোনো ক্লান্তিকর কাজ করে, তখন বলতে শুরু করে– আহ! আমার শক্তি শেষ হয়ে গেছে। তারপর শুয়ে পড়ে। পর্যাপ্ত শান্ত ঘুম ঘুমায়। প্রতিদিনের মতো সকালে ঘুম থেকে ওঠে। ফজর নামাজ পড়ে। প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত হয়। এর অর্থ হলো, তার রাতের ক্লান্তিটা স্বাভাবিক ছিল। কাজের প্রকৃতি যে পরিমাণ ক্লান্তির দাবিদার, সে তার চেয়ে বেশী ক্লান্ত হয়নি।

পক্ষান্তরে ঘুম যদি বিক্ষিপ্ত হয়, পরবর্তী সকালে যদি শক্তিহীন অবস্থায় ঘুম থেকে ওঠে এবং নিজের মধ্যে উদ্যমের ঘাটতি অনুভব করে, তখনই বলা হবে যে, রাতে সে অস্বাভাবিক কষ্ট করেছে। যে পরিমাণ কষ্ট করা স্বাভাবিক ছিল, তার কষ্টটা তার চেয়ে বেশী হয়ে গেছে।

---

[১৯]. 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ে "পরিশ্রম-সাধনা, সময়ের সদ্ব্যবহার, লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে প্রবল তাড়না সৃষ্টি" শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে।

রিজার্ভ শক্তি কী?

আমরা যখন স্বাভাবিক ক্লান্ত হই, তখন আমাদের পুরো শক্তি শেষ হয়ে যায় না। এমন কিছু শক্তি অবশ্যই অবশিষ্ট থাকে, যা আকস্মিক সঙ্কটের মোকাবিলা করার জন্য মজুদ রাখি। যখন কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় এবং হঠাৎ কোনো বিপদ এসে পড়ে, তখন এই বাড়তি শক্তির সাহায্য নেই এবং সঙ্কটের মোকাবিলায় তার উপর নির্ভর করি। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি স্পষ্ট করা যায়। তোমার রাতের শোয়ার সময় হয়ত রাত ১১ টা। প্রতিদিন ১১ টার মধ্যেই তুমি ঘুমিয়ে পড়। কিন্তু এমন কি কখনো হয় না যে, বিশেষ কোনো কারণে কখনো তোমার শোয়া হয়েছে ১১ টার পরিবর্তে ১ টায়? অবশ্যই এমন হয়। তো ১১ টায় ঘুমানোর স্বাভাবিক নিয়ম হওয়া সত্ত্বেও তুমি যে শক্তির বলে ১ টা পর্যন্ত থাকতে পেরেছ, সেই শক্তিকেই রিজার্ভ শক্তি বলে।

রিজার্ভ শক্তি কখন ব্যবহার করবে?

তবে চূড়ান্ত স্তরের প্রয়োজন না হলে রিজার্ভ শক্তি ব্যবহার করবে না। কারণ ক্লান্ত অবস্থায় কেউ যখন কোনো কাজ করে, তখন রিজার্ভ শক্তির কারণে কাজ ফলপ্রসূ হয় বটে। তবে অনেক ক্ষেত্রে অন্য সময় তার কয়েকগুণ মূল্য পরিশোধ করতে হয়।

রিজার্ভ শক্তি ব্যয়ের খেশারত দেয়ার উদাহরণ

আমি এর একটি বাস্তব উদাহরণ দিচ্ছি। বিশেষ করে পরীক্ষার পূর্ববর্তী দিনগুলোতে অনেককে গভীর রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করতে দেখা যায়। সকালেও উপুড় হয়ে কিতাব পড়তে থাকে। কিন্তু নিজেদের রিজার্ভ শক্তি ব্যয়ের মূল্য তাদের কারো কারো এভাবে পরিশোধ করতে হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাদের পরীক্ষাই দেয়া সম্ভব হয় না। মাথা চক্কর দিয়ে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। অথবা পরীক্ষার হলে টেবিলের উপর মাথা রেখে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে, নিজেরাও টের পায় না। কেউ কেউ পরীক্ষা দিতে পারলেও উদ্যমের সাথে ও প্রশান্ত মনে পরীক্ষা শেষ করতে সক্ষম থাকে না। আচ্ছা, যে শিক্ষার্থী সতেজ দেহে ও প্রফুল্ল মনে পরীক্ষা দিবে তার সৃজনশীলতা, আর যে শিক্ষার্থী নিস্তেজ দেহ ও মস্তিষ্কের চাপ নিয়ে পরীক্ষা দিবে, তার সৃজনশীলতা কি সমান হবে?

সামর্থ ভেদে শ্রম ও বিশ্রাম

স্বাভাবিক সহ্যসীমার বেশী মেহনত করবে না। এ ক্ষেত্রে কেউ কারো জন্য পুরোপুরি আদর্শ নন। কারো কারো জন্য রাতে ৩/৪ ঘন্টা ঘুম যথেষ্ট হতে পারে। তবে সুস্থ থাকার জন্য একজন মানুষের সাধারণত ৬ ঘন্টা ঘুমাতে হয়। কারো কারো ৬ ঘণ্টার বেশীও ঘুমানোর প্রয়োজন হতে পারে। আমার শায়খ ও মুর্শিদ হযরত আকদাছ মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন দা.বা. বলেছেন, মস্তিষ্ক ব্যবহার করে যাদের কাজ করতে হয়, হযরত থানবী রহ. তাদেরকে আট ঘণ্টা ঘুমানোর পরামর্শ দিয়েছেন। مَعَ النَّاسِ কিতাবের[২০] إِلَى الطُّلَّابِ প্রবন্ধে শায়খ আলী তানতাবী রহ.ও পরীক্ষার্থীদেরকে ৮ ঘন্টা ঘুমানোর পরামর্শ দিয়েছেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি পরীক্ষার রাতগুলোতে সম্ভব হলে ৯ বা ১০ ঘন্টা ঘুমাতে বলেছেন। তাঁর পুরো প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করে 'পরীক্ষার্থীদের জন্য আটটি উপদেশ' শিরোনামে এ বইয়ে ৩৮৪ - ৩৯০ পৃষ্ঠায় যুক্ত করা হয়েছে।

অবশ্য যতটুকু পরিশ্রম তোমার শরীর স্বাভাবিকভাবে সহ্য করতে পারে, ততটুকু পরিশ্রম করার ব্যাপারে অলসতাও করবে না। কারণ পরিশ্রম ছাড়া কিছু অর্জন হয় না। پاپا سراغ زندگی কিতাবে সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ. বলেছেন [অনুবাদ, 'জীবন পথের পাথেয়'। উক্তিদু'টি 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়েও উল্লেখ করেছি]– "যিনিই গড়ে উঠেছেন এবং আপন কীর্তি ও কর্মে প্রোজ্জ্বল হয়েছেন, নিজের চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের বিরাট বিনিয়োগের মাধ্যমেই হয়েছেন। অলস, কর্মবিমুখ ও নিশ্চেষ্ট মানুষের জন্য সাধনার এই পৃথিবীতে স্থান নেই।" তিনি আরো বলেছেন– "বস্তুত ত্যাগ ও কোরবানী এবং পণ ও প্রতিজ্ঞা এমনই মহাশক্তি যে, তা যদি ব্যক্তির মাঝে জাগ্রত হয়, তাহলে তাকে আকাশের উচ্চতায় পৌঁছে দেয়। যদি প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায়ের মাঝে সৃষ্টি হয়, তাহলে পৃথিবী তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়।"

---

[২০]. পৃ. ১৫৪ ও ১৫৭ অষ্টম সংস্করণ।

শায়খুল হাদীস হযরত যাকারিয়া কান্ধলভী রহ. 'আপবীতি' কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডের অষ্টম অধ্যায়ে 'আকাবিরদের মেহনত ও মুজাহাদা'র কিছু বিবরণ দিয়েছেন। নমুনাস্বরূপ শায়খুল ইসলাম হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. সম্পর্কে লেখা তাঁর ছোট্ট একটি অনুচ্ছেদ এখানে উল্লেখ করছি– "আমার মনে আছে, একবার হযরত হিজায থেকে ফিরে ভোর ছ'টায় দেওবন্দ পৌঁছলেন এবং সেদিনই সকাল সাতটায় বুখারী শরীফের সবক পড়াতে বসে গেলেন। সামান্য বিশ্রাম নেয়াও হলো না। নির্বাচনের সময় এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গাড়িতে দিল্লী পৌঁছলেন এবং রাত দশটায় আলীজান মরহুমের কুটিরে একটি মিটিংয়ে বসলেন। সেখানে দুই ঘন্টা ব্যস্ত ছিলেন। মিটিং শেষে নানুতায় চলে যান। সেখানে ফজরের নামায শেষে এক সভায় টানা দুই ঘণ্টা বক্তৃতা করেন। তারপর সাহারানপুর হয়ে সোজা সানসারপুর চলে যান। সেখানে এক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং জুমার নামায বাহাটে পৌঁছে আদায় করেন। জুমা শেষে এখানে দু' ঘণ্টা বয়ান করে পুনরায় সাহারানপুর পৌঁছেন। বাদ ইশা সাহারানপুরে এক সম্মেলনে বক্তৃতা করেন এবং শনিবার ভোরে যথাসময়ে দেওবন্দে পৌঁছে বুখারী শরীফের সবক পড়ান। হযরতের এরূপ ত্যাগ ও মুজাহাদার ফিরিস্তি অনেক দীর্ঘ। তাঁর ত্যাগ ও মুজাহাদার পরিধি এত বিস্তৃত যে, তাঁকে 'মুজাহিদে আযম' উপাধি দেয়া তাঁর কর্ম ও কীর্তিকে খাট করা বৈ কিছু নয়।"[২১]

আরেকটি কথা শোনো– সুস্বাস্থ্য ছাড়া কাঙ্ক্ষিত স্তরের লেখাপড়া করা সম্ভব নয়। তাই স্বাস্থ্যের প্রতি প্রত্যেক তালিবে ইলমের অবশ্যই যত্নবান থাকতে হবে।

---

২১. ২ঃ ১৪০

সুস্বাস্থ্য কী?

১. সুস্বাস্থ্য মূলত কর্মক্ষমতার নাম। শরীরের মাংশ বা পেশি সুস্বাস্থ্যের মানদণ্ড নয়।

২. শুধু সুস্থ থাকার নাম সুস্বাস্থ্য নয়। ভালো থাকার এমন এক অন্তর্গত অনুভূতিকে সুস্বাস্থ্য বলে, যা ব্যক্তিকে তার কর্মে সব সময় আনন্দিত রাখে।

৪৪১-৪৪৭ পৃষ্ঠায় 'সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা' শিরোনামে একটি আলোচনা আছে। সকলে আলোচনাটি পড়বে, অনেক উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

শোনো, গুরুত্ব ও যত্নের সাথে যে রুটিন তৈরি করেছ, তা মূল পড়াশুনা নয়। রুটিন কাগজে আঁকা পথের ছবি মাত্র। তার চেয়ে অতিরিক্ত কিছু নয়। সেই ছবি বাস্তব পথ নয়। যে ব্যক্তি কাগজে কোনো রাস্তার ছবি এঁকেছে, আর যে ব্যক্তি পায়ে হেঁটে সেই রাস্তায় চলেছে, তাদের মধ্যে কত ব্যবধান! তাহলে চলো, এখন আমরা আল্লাহর নামে নিয়ে ও তাঁর নিকট তাওফীক প্রার্থনা করে পথচলা শুরু করি।

দরসের লেখাপড়ার স্তরসমূহ

দরসের লেখাপড়ার স্তর তিনটি–

১. দরস-পূর্ববর্তী স্তর; এটি হলো প্রস্তুতি পর্ব।

২. দরস চলাকালীন স্তর; এটি হলো মনোযোগসহকারে শোনার পর্ব।

৩. দরস-পরবর্তী স্তর; এটি হলো আয়ত্ত করার পর্ব।

দরস পূর্ববর্তী স্তর [প্রস্তুতি পর্ব]

দরসের প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা

দরসগাহে [শ্রেণিকক্ষে] বসার পূর্বে দরসের প্রস্তুতি নিবে। আসাতিজা কেরাম যেসব দরস তোমার সামনে পেশ করবেন, সেগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে দরসগাহে বসবে। শুরুর দিকে মনে হতে পারে, এই প্রস্তুতির কোনো প্রয়োজন নেই এবং তোমাকে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলা উস্তাদগণের পক্ষ থেকে একটি ইলমী বিলাসিতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক শৌখিনতা ছাড়া কিছু নয়। কারণ, যে দরস একজন মুদাররিস পূর্ণাঙ্গতর ও সহজতর পদ্ধতিতে উপস্থাপন করবেন, শিক্ষার্থীর তা প্রস্তুত করে দরসগাহে বসার কী প্রয়োজন আছে?

কিন্তু অভিজ্ঞ শিক্ষাবিশারদগণের বক্তব্য হলো– উপকারী পড়াশুনা যে শিক্ষার্থীর কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য, পাঠ প্রস্তুত করে শ্রেণীকক্ষে বসা তার জন্য লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্রে অধিকতর সহায়ক। কারণ, এটিই স্বাভাবিক যে, আগত পাঠ সম্পর্কে তোমার জানার পরিমাণ যত বাড়বে, তা থেকে তোমার উপকৃত হওয়ার পরিমাণও তত বেশী হবে।

দরসের প্রস্তুতি গ্রহণের অর্থ

তাই আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. বলেন– প্রত্যেক তালিবে ইলমকে সময় নিয়ে সামনের দরস এমন সচেতনভাবে অবশ্যই অধ্যয়ন করতে হবে, যার ফলে সে দরসের প্রকৃত অবস্থাদি অবগত হবে; দরসের জটিল বিষয়সমূহের প্রতি মনোযোগী হবে এবং সূক্ষ্মভাবে নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে যে–

* সে কী বুঝেছে;
* কী বুঝেনি;
* এবং কী বোঝার ব্যাপারে তার দ্বিধা আছে?

দেখো, রাফাত পাশা রহ. তোমাকে আগামী দিনের পড়া সম্পূর্ণরূপে শিখে দরসে বসার আদেশ করেন নি। এমন আদেশ করলে তা পালন করা হয়ত অনেকের জন্য অসম্ভব বা কষ্টকর হতো। কারো কারো জন্য কষ্টসাধ্য না হলেও সময়সাপেক্ষ তো অবশ্যই হতো। তখন সময় না পাওয়ার অভিযোগ

করা সঙ্গত হতো। খেয়াল করে দেখো, আমি তোমাদেরকে যে কথাটা বারবার বলেছি, অর্থাৎ مَعْلُوْمَات [জানা বিষয়গুলো]কে مَجْهُوْلَات [অজানা বিষয়গুলো] থেকে পৃথক করে দরসে বসো, তিনি এ কথাটিই অন্য ভাষায় বললেন।

তো দরসে বসার পূর্বে দরসের প্রস্তুতি নিতে হবে। তখন তোমাকে তিনটি জিনিস যথাযথভাবে নির্ধারণ করতে হবে–

১. সামনের দরসের কী বুঝেছ;

২. কী বুঝনি;

৩. কী বোঝার ব্যাপারে তোমার দ্বিধা আছে। বুঝেছ কি বুঝনি, তা-ও বলতে পারছ না।

নিজের চেষ্টায় সামনের দরস বোঝার মেহনত

এ তিনটি জিনিস যথার্থরূপে নির্ধারণ করা দরস-পূর্ববর্তী স্তরের মৌলিক কাজ। দরসে বসার পূর্বে কমপক্ষে এই অর্থে مُطَالَعَه [অধ্যয়ন] অবশ্যই করতে হবে।

সামনের দরসের যেসব কথা তুমি বুঝনি, যদি নিজের চেষ্টায় সেসব কথা পুরোপুরি বা আংশিক বুঝে দরসে বস; অনুরূপভাবে যেসব কথা বোঝা না বোঝার ব্যাপারে তোমার দ্বিধা আছে, তুমি যদি حَوَاشِيْ, شُرُوْحَات ও قَوَامِيْس [টীকা, ব্যাখ্যাগ্রন্ত ও অভিধান] প্রভৃতির সহযোগিতা গ্রহণ করে সেসব দ্বিধা পুরোপুরি বা আংশিক দূর করে দরসে বসতে সক্ষম হও, তবে সেটা হবে তোমার প্রশংসনীয় অতিরিক্ত চেষ্টা। এর সুফল অনেক। তুমি তো আর সারাজীবন প্রচলিত অর্থে শিক্ষার্থী হয়ে লেখাপড়া করবে না। শিক্ষকের সহায়তা ছাড়াই সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ভবিষ্যতে [বিশেষ করে শিক্ষা 'সমাপ্ত' করার পরবর্তী জীবনে], তোমার অনেক কিতাব পড়তে হবে। সেসমস্ত কিতাব থেকে অনেক তথ্য আহরণ করতে হবে। তো তুমি যদি নিজের চেষ্টায় কিতাব বোঝার দক্ষতা অর্জন করতে না পার, তাহলে উস্ত াদের কাছে যেসব কিতাব পড়বে সেগুলোর বাইরের কোনো কিতাব থেকে উপকৃত হতে পারবে না।

হযরত গঙ্গুহী ও হযরত নানুতবীর মুতালা'আর অবস্থা

কুতবুল ইরশাদ হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. ও হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী রহ. যখন ছাত্র ছিলেন, তখন তাঁদের সামনের দরসের মুতালা'আ কেমন হত, শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর লিখিত آپ بیتی কিতাব থেকে[২২] তা শোনাচ্ছি– তাঁরা দরসে উস্তাদের সামনে میر زاہد، قاضی صدرہ، شمس بازغہ-এর মতো জটিল কিতাবগুলো এমনভাবে পড়তেন যেন হাফেজ সাহেব কুরআন পড়ছেন। কোথাও কোনো শব্দ জিজ্ঞাসা করার থাকলে উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করতেন। এ ছাড়া অর্থ পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করতেন না। উস্তাদ মাওলানা মামলুক আলীর অন্যান্য ছাত্রদের মনে হত, এরা না বুঝেই শুধু কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টিয়ে কিতাব শেষ করে প্রশংসা কুড়াতে চায়। একজন তো মাওলানা ছাহেবকে তার এ ধারণার কথা বলেই ফেললেন। মাওলানা মামলুক আলী ছাহেব তার কথার উত্তরে শুধু এটুকুই বললেন যে, মিঞা! আমার সামনে কোনো ছাত্র না বুঝে এগুতে পারে না।

تذکرۃ الرشید গ্রন্থের ২৯ নং পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার লিখেছেন– হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রহ.-এর দৌহিত্র ও শাহ রফীউদ্দীন রহ.-এর পুত্র হযরত শাহ মাখসূসুল্লাহ ছাহেবের সামনে হযরত গঙ্গুহী রহ. কোনোরূপ অর্থ ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা ছাড়া শুধু ইবারত পাঠ করে মেশকাত শরীফ খতম করেন।[২৩] [آپ بیتی-এর বিবরণ শেষ হয়েছে।]

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর মুতালা'আর অবস্থা

এখন স্বয়ং শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর মুতালা'আ কেমন হত তা শোনো। শায়খ নিজে লিখেছেন– মেশকাত শরীফ আমি তরজমা করে

---

২২. 'আপবীতি' ২ ঃ ১৯ - ২০

২৩. অর্থাৎ অর্থ ও উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হত না।

পড়িনি। পুরোটা তরজমা ছাড়া পড়েছি।[২৪] শুধু এটুকুর অনুমতি ছিল যে, কোনো শব্দের অর্থ জানতে চাইলে জিজ্ঞেস করে নাও। পড়াটা বুঝে বুঝে হচ্ছে কি-না, মাঝে মাঝে বিভিন্ন প্রশ্ন করে তা পরীক্ষা করে দেখতেন। 'মাযাহেরে হক' দেখা অপরাধ বলে গণ্য হত। হিদায়া ও তাহাবীর তরজমা দেখা জরুরী ছিল। তবে সিহাহ সিত্তার যে কিতাবের হাদীস হত, তা বের করে হাশিয়া দেখার অনুমতি ছিল। পড়ার নিয়ম ছিল, প্রতিটি হাদীসের পর এটা বলতে হত- এ হাদীস হানাফীদের পক্ষের না বিপক্ষের। যদি বিপক্ষের হয় তাহলে হানাফীদের দলিল এবং এ হাদীসের[২৫] জবাব কী? এগুলো আমাকে বলতে হত। যেন এগুলোও হাদীসে পাকের আবশ্যকীয় অংশ। হানাফীদের পক্ষের দলিল বলতে পারিনি এমন কোনো দিনের কথা মনে নেই। কারণ হিদায়া এবং তার শরাহ ও হাশিয়া এবং ফিক্‌হের অন্যান্য কিতাব খুব দেখা হত। তবে হাদীসের জবাব কখনো কখনো দিতে পারতাম না। তখন আব্বাজান নিজেই বলে দিতেন।[২৬]

অন্যত্র তিনি লিখেছেন, আব্বাজান প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির ঘোর বিরোধী ছিলেন। আব্বাজানের যারা খাস শাগরিদ ছিলেন বিশেষ করে মৌলভী আব্দুল্লাহ গঙ্গুহী, চাচাজান ও আমি, আমরা আব্বাজানের পড়ানোর পদ্ধতির সাথে বেশ পরিচিত। তিনি বলতেন, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি দ্বারা যোগ্যতা সৃষ্টি হয় না। শিক্ষক রাতভর অধ্যয়ন ও পড়াশোনা করেন এবং সকালে এসে তা দরসে ঝাড়েন। ছাত্রদের অনুগ্রহ যে, তারা শোনল বা শোনল না; যার যার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে থাকল। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, পড়াশোনার সকল চাপ ছাত্রের উপর থাকবে। তারাই মুতালা'আ করবে এবং তারাই দরসে আলোচনা করবে। তাঁর প্রসিদ্ধ উক্তি ছিল– "শিক্ষকের কাজ হলো শুধু 'হুঁ' বা 'উহুঁ' বলা।[২৭] যদি ছাত্র আজেবাজে কথা বেশি বলে, তাহলে

---

২৪. অর্থাৎ দরসে উস্তাদের তরজমা বলার প্রয়োজন হত না। উপরন্তু উস্তাদের কাছে তরজমা জিজ্ঞাসা করারও অনুমতি ছিল না।

২৫. وَجْهُ الاستدلال-এর।

২৬. 'আপবীতি' ১ ঃ ৩৮

২৭. শুদ্ধ হলে 'হুঁ' আর অশুদ্ধ হলে 'উহুঁ'।

ছাত্রের মুখে কিতাব ছুড়ে মারবে। চাই কিতাবের বাঁধাই নষ্ট হোক বা ছাত্রের নাক ভেঙ্গে যাক।" তবে কিতাব ছুড়ে মারতে আমি কখনো দেখিনি। এটা মদ্যপ ব্যক্তির ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ উক্তির মতো যে, যদি কেউ চতুর্থবার মদ পান করে, তাহলে তাকে হত্যা করো। কিন্তু তিনি তা কার্যকর করে দেখাননি।[২৮]

নিজের চেষ্টায় সামনের দরস বোঝার মেহনত-এর অবশিষ্ট আলোচনা

যাই হোক, সামনের দরসের যেসব পড়া বুঝনি, সেগুলো সম্পূর্ণ বা আংশিক যদি নিজের চেষ্টায় বুঝে দরসে উপস্থিত হতে পার, তদ্রূপ সামনের যেসব পড়া বোঝার ব্যাপারে তোমার দ্বিধা আছে, তুমি যদি নিজের চেষ্টায় সেসব দ্বিধা সম্পূর্ণ বা আংশিক দূর করে দরসে বস, তাহলে নিজে নিজে কিতাব বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন তোমার হয়ে যাবে। দরসে উস্তাদের আলোচনা শুনে তুমি বুঝতে পারবে– তোমার নিজের চেষ্টায় বোঝাটা কতটুকু সঠিক হয়েছে।

মোটকথা, নিজের চেষ্টায় সামনের দরস বোঝার মেহনত করা অনেক সুফলদায়ক প্রয়াস। যেসব ভাগ্যবান শিক্ষার্থী নিয়মিত এই চেষ্টা করে, তাদের ভবিষ্যত আসলেই অনেক উজ্জ্বল ইনশাআল্লাহ। তবে এই চেষ্টা এত বড় ফলদায়ক হওয়া সত্ত্বেও একটি অতিরিক্ত কাজ, ঐচ্ছিক বিষয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর তা করা জরুরি নয়। কারণ, তা এক দিকে যেমন কষ্টসাধ্য, অপর দিকে সময়সাপেক্ষও বটে। কিন্তু সামনের দরসের কী বুঝেছ; কী বুঝনি এবং কী বোঝা না বোঝার ব্যাপারে তোমার দ্বিধা আছে– এ তিনটি জিনিস যথার্থরূপে নির্ধারণ করা অর্থে মুতালা'আ করা, শিক্ষার্থীর ঐচ্ছিক বিষয় নয়। বরং তা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অবশ্যকরণীয় দায়িত্ব। এতটুকুর ব্যাপারে শিথিলতা মোটেই ক্ষমাযোগ্য নয়।

অনেকের জন্য দরস হয় মুতালা'আ, আর তাকরার হয় দরস

শোনো ভাই! তুমি যদি এতটুকু অর্থেরও মুতালা'আ না করে দরসে বস, তাহলে সেই দরস মনোযোগসহকারে শুনলেও দরস থেকে যা অর্জন হওয়ার

---

২৮. 'আপবীতি' ১ ঃ ৯৪ - ৯৫

কথা, তা তোমার পুরোপুরি অর্জন হবে না। সেই দরস দ্বারা তোমার সর্বোচ্চ মুতালা'আর কাজ হবে। পড়া পুরোপুরি বোঝার জন্য তোমার আরেকটি দরস লাগবে। আর স্বভাবতই মুতালা'আর তুলনায় দরসের জন্য সময় বেশী প্রয়োজন হয়। মূলত এ কারণেই অনেকের তাকরারে দরসের চেয়ে বেশী সময় ব্যয় হয়। কারণ তারা মুতালা'আ করে দরসে বসে না। ফলে দরসে উস্তাদের আলোচনা শোনা দ্বারা তাদের মুতালা'আর কাজ হয়। তার চেয়ে বেশি কিছু হয় না। তোমাদের অনেকের পরিচিত আমাদের ছাত্র মাওলানা আব্দুল্লাহ সালমান তাকরারের মধ্যে দরসের চেয়ে বেশী সময় ব্যয় হওয়ার এ কারণটা আমাকে বলেছে। আমি এর আগে তা খেয়াল করি নি। তাঁর উল্লেখ করা কারণটা আমার কাছে যৌক্তিক হয়েছে। আল্লাহ তাঁকে এবং আমাদের সকলকে قَابِل ও مَقْبُوْل [যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য] বানান। আমীন!

তো অনেকের জন্য দরস হয় মুতালা'আ, আর তাকরার হয় দরস। দরসে উস্তাদের মুখে শুনে তাদের পড়া বুঝে আসে না। কিন্তু তাকরারে নিজের সহপাঠীর মুখে শুনে পড়া বুঝে আসে। আল্লাহ পানাহ! আর তাকরারে এতো সময় ব্যয় হওয়ার কারণে জরুরি আরো অনেক কাজ করা যায় না। সুপরিকল্পিত রুটিন অনুযায়ী চলা সম্ভব হয় না। সব সমস্যার গোড়া হলো দরসে বসার পূর্বে দরসের প্রস্তুতি গ্রহণ না করা অর্থাৎ মুতালা'আ করে দরসে না বসা। মনে রাখবে, দরস-পরবর্তী তাকরারের তুলনায় দরস-পূর্ববর্তী মুতালা'আ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। وَأْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا [ঘরে দরজা দিয়ে প্রবেশ করা করো] আল্লাহ সকলকে বুঝ দিন। আমীন!

আমার মন চায়, কোনো তালিবে ইলমকে মুতালা'আ ছাড়া দরসে বসার সুযোগ না দেয়া অবশ্যকরণীয় হোক।[২৯]

---

২৯. শুনেছি, আমার প্রিয় ছাত্র মাওলানা মুখতার হোসাইন [নারায়ণগঞ্জ] তার ছাত্রদের জন্য মুতা'আলা করা আবশ্যক করে দিয়েছে। দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা পর্যন্ত অবস্থা নাকি মোটামুটি এমন হয়ে যায় যে, ছাত্ররা নিজেদের চেষ্টায় সামনের দরস বোঝার ও বোঝানোর যোগ্য হয়ে যায়। মাওলানা মুখতার দ্বিতীয় পরীক্ষার পর তাদেরকে বলে, এতদিন আমি পড়িয়েছি।

মুতালা'আর সময় নোট খাতা রাখবে

প্রত্যেক ঘণ্টার জন্য তোমার আলাদা আলাদা খাতা থাকবে। প্রস্তুতি গ্রহণের সময় পাঠসংশ্লিষ্ট যেসব কথা মনে আসবে এবং পাঠসংশ্লিষ্ট যেসব প্রশ্ন শ্রেণীকক্ষে তুমি শিক্ষককে করতে চাইবে, সেগুলো তোমার সেই বিশেষ খাতায় নোট করবে। এসব প্রশ্ন ও কথা আগামী কালের দরস বোঝা ও আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে উত্তম সহায়ক প্রমাণিত হবে। যেসকল শিক্ষার্থী পাঠ প্রস্তুত করেনি, তারা পরবর্তী দিন শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত হবে خالِيَ الذِّهْن হয়ে ও পরিকল্পনাহীন অবস্থায়। পক্ষান্তরে তুমি উপস্থিত হবে প্রশ্নে ভরা মন নিয়ে। আর কথায় আছে– 'যার প্রশ্ন থাকে তার লক্ষ্য থাকে'।

দরসের পূর্বে মুতালা'আ না করার কারণে অথবা মুতালা'আ করলেও দরসে কি কি প্রশ্ন করবে তা আগ থেকে ভেবে না রাখার কারণে, কতক শিক্ষার্থী দরসে অজ্ঞতাপূর্ণ প্রশ্ন করে, যা শিক্ষকের বিরক্তির কারণ হয়। ফলে প্রশ্নকারী শিক্ষার্থী তারপর আর কখনো প্রশ্ন করার সাহস পায় না।

দরসের প্রস্তুতি গ্রহণের উপকারিতা

দেখো– দরসের প্রস্তুতি গ্রহণ করলে তুমি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে পার্থক্য করতে পারবে এবং মৌল বা প্রথম স্তরের বিষয়কে গৌণ বা দ্বিতীয় স্তরের বিষয় থেকে পৃথক করতে সক্ষম হবে। উপরন্তু দরসে এমন সব প্রশ্ন করতে সমর্থ হবে, যেগুলো দ্বারা বিষয়ের শাঁস ও সারাংশ অধিক স্পষ্ট হবে। এভাবে প্রশ্নসমূহের উত্তর দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের দুর্বল দিকগুলো সবল করার সুযোগ পাবে।

এখন থেকে তোমরা পড়াবে। আমার কাজ থাকবে তোমাদের পড়ানো শোনা এবং প্রয়োজনে সহযোগিতা করা। এভাবে সে এ পর্যন্ত [১৪৩৫হি.] أُصُوْلُ الشاشِي، هدايةُ النحوِ، الفقهُ المُيَسَّرُ، الطريقُ إلى العربية (الجزء الثاني)، جمال القرآن কিতাবগুলো পড়িয়েছে। আগামী শিক্ষাবছরে বছরের শুরু থেকেই এভাবে পড়ানোর আশা করছে। আল্লাহ তাওফীক দান করুন ও কবুল করুন!

তুমি যখন এভাবে দরস প্রস্তুত করে দরসগাহে বসবে, তখন দরসের সময়টি তোমার জন্য আলোচনার ও ভালোভাবে জানার বিশেষ সুযোগ পরিণত হবে। উস্তাদের দরস দ্বারা তুমি সর্বোচ্চ স্তরের উপকৃত হতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যারা এভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করে দরসে বসেনি, তারা হয়ত স্পষ্ট বিষয়গুলো বুঝতেও অক্ষম হবে।

শোনো, দরসের প্রস্তুতিগ্রহণ শিক্ষার্থীকে তার সহপাঠীদের উপর জয়ী হওয়ার সুযোগ দান করে এবং দরসের সময়ও শিক্ষকের উপর একটি ভালো প্রভাব ফেলতে সক্ষম করে তোলে। ফলে দরসের সময়টি প্রস্তুতি গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর জন্য একটি উপভোগ্য বিনোদনে পরিণত হয়।

একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

ডক্টর রাফাত পাশা 'সাহিত্য অনুষদে'র তাঁর এক সহপাঠীর অবস্থা তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন–

সাহিত্য অনুষদে আমাদের সঙ্গে একজন শিক্ষার্থী ছিল। সে ভালোভাবে দরস প্রস্তুত করে দরসগাহে উপস্থিত হত। তার সচেতন প্রশ্ন ও মূল্যবান মন্তব্যগুলো অনেক সময় দরসের উপর প্রভাব বিস্তার করত এবং দরসের ধাপগুলো পরিচালনা করত। একদিন এই শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। পরদিন আমাদের শিক্ষক মহোদয় স্বয়ং তার সঙ্গে সাক্ষাত করেছেন। তাকে সালাম করে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করেছেন। বিজ্ঞদের যেমন বিনয় থাকে সেই বিনয়ে শিক্ষক তাকে বললেন– "আশা করি এরপর তোমাকে আমি প্রতিদিন উপস্থিত পাব। তুমি অনুপস্থিত থাকলে তা তোমার নিজের জন্য ক্ষতিকর না-ও হতে পারে, কিন্তু তাতে তোমার সহপাঠীদের ক্ষতি হয়।"

এই শিক্ষার্থী এই স্তরে শুধু এভাবেই পৌঁছেছে যে, সে পরবর্তী দিনের দরস প্রস্তুত করে দরসগাহে উপস্থিত হত।

দরস চলাকালীন স্তর

[মনোযোগসহকারে শোনার পর্ব]

দরসের প্রস্তুতি পর্ব সমাপ্ত করেছ। এখন আস্থা ও গর্বের হাসি নিয়ে নতুন দিনকে স্বাগত জানাতে তোমার কোনো বাধা নেই। কেননা, তুমি এমন অবস্থায় দরসে উপস্থিত হয়েছ যে, তোমার সামনে লক্ষ্য আছে। পক্ষান্তরে অন্য অনেকের হয়ত লক্ষ্য নেই।

তুমি শিক্ষা কার্যক্রমের দ্বিতীয় ধাপে উপনীত হয়েছ। শ্রেণীকক্ষে দরসগাহে প্রবেশ করেছ। তোমার বসার নির্দিষ্ট আসনে বসেছ। এখন তোমার প্রতি উপদেশ হলো– মনোযোগসহকারে দরস শ্রবণ করো।

মনোযোগসহকারে দরস শ্রবণের অর্থ

হ্যাঁ, শব্দ খেয়াল করো– 'মনোযোগসহকারে শ্রবণ', শুধু 'শোনা' বা 'শ্রবণ' নয়। যা বলা হয় তা গ্রহণ করার জন্য শ্রবণেন্দ্রিয় ব্যবহার করলেই 'শোনা' বা 'শ্রবণ' কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। চাই তা অনুধাবন করার জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো চেষ্টা ব্যয় করা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে 'মনোযোগসহকারে শ্রবণ' হলো সচেতনতা ও সতর্কতাসহ এমন স্বেচ্ছামূলক শোনা যে, দরস ও উস্তাদের প্রতি তোমার মনোযোগ সম্পূর্ণ নিবদ্ধ থাকবে। ভাবের বা চিন্তার বা অর্থের সমাবেশের কারণে মনোযোগে ফাটল ধরবে না।

মনোযোগসহকারে শ্রবণকারীর বৈশিষ্ট্য

আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. 'গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণকারী'র তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের মনোযোগের মূল্যায়ন করতে পারবে। লেখাপড়ার এই প্রাণবন্ত স্তরে সে কতটুকু সচেতন, তা নিজে নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।

১. 'মনোযোগ সহকারে শ্রবণকারী' শিক্ষার্থী অনেক সময় শিক্ষকের চেয়ে অগ্রসর হয়ে থাকে। দরসে শিক্ষকের আলোচনা যেখানে বিভিন্ন দিকে মোড় নেওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সে আগ থেকেই ভাবতে থাকে যে, আমার শিক্ষক মহোদয় এখন এদিক যাবেন না সেদিকে।

২. সে মৌলিক কথা ও গৌণ কথার মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয়। শিক্ষক যখন গৌণ অর্থাৎ কম গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন, তখন সে মৌলিক কথাগুলো মনে বসানোর চেষ্টা করে।

৩. তার মনে অনেক প্রশ্ন থাকে। সে সবসময় তার প্রশ্নসমূহের উত্তর পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে। অর্থাৎ পূর্ব থেকেই সে অনেক প্রশ্ন তৈরি করে রাখে। শিক্ষকের কোন্ কথায় কোন্ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল, তা লক্ষ রাখে।

দরস চলাকালে নোটখাতা সঙ্গে রাখা

মনোযোগসহকারে শ্রবণ করার প্রত্যাশিত ফল লাভ করার জন্য এবং গত রাতে দরসের প্রস্তুতিতে যে চেষ্টা ব্যয় করেছ তা দ্বারা পূর্ণতর উপকৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে, দরস-প্রস্তুতির খাতাটা দরস চলাকালে অবশ্যই সঙ্গে রাখবে। খাতাটা তোমার টেবিলে খোলা রাখবে। এভাবে দরসে খাতা খোলা রাখার দু'টি উদ্দেশ্য–

১. প্রস্তুতি-পর্বে যেসব প্রশ্ন ও কথা নোট করেছ, উস্তাদ সেসব প্রশ্নের যেসব উত্তর দিবেন এবং সেসমস্ত বিষয়ে যেসব কথা বলবেন, তা খাতায় নোট করবে। আর যেসবের ব্যাপারে কিছু বলেননি, সেগুলো জিজ্ঞাসা করবে।

২. দরসে গুরুত্বপূর্ণ যেসব সংজ্ঞা, পরিভাষা, মৌলিক কথা এবং তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যা ও মন্তব্য ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়, সেগুলো লিখবে।

তবে লক্ষ রাখতে হবে, এই লেখা যেন তোমার মাঝে এবং 'মনোযোগসহকারে শ্রবণে'র মাঝে আড়াল না হয়ে দাঁড়ায়। আর লিখবে তোমার নিজস্ব ভাষায়, উস্তাদের ভাষায় লিখবে না, তাহলে তোমার লেখাটা বুঝে লেখা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর ডক্টর আবদুল মতীন লিখেছেন–

'ক্লাসে শিক্ষকের কথা ধারাবাহিকভাবে নোট করার চেষ্টা না করে বরং মনোযোগ দিয়ে শোনা বেশী লাভজনক।

ক. অবশ্য অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো যেমন– লেখক বা চিন্তাবিদদের নাম, তাঁদের মতামত বা প্রকাশিত প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদির

নাম, নতুন শব্দ, শিক্ষকের নিজস্ব মতামতের মূল কথা ইত্যাদি সম্ভব হলে তৎক্ষণাৎ নোট করা বাঞ্ছনীয়।

খ. তবে ক্লাস শেষ হওয়ার পর অবসর থাকলে, কিংবা ঘরে ফেরার পর, শিক্ষকের বক্তৃতার সারমর্ম লিখে রাখার চেষ্টা করবেন। সব কথা মনে না থাকাই স্বাভাবিক। তবে মনে রাখবেন, মনোযোগ দিয়ে শোনার পর যে-কথা মনে থাকে, সচরাচর সেটাই আসল কথা। এরকম ধারাবাহিকভাবে নোট লিখতে পারলে সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটবে বলে আশা করা যায়।

গ. এছাড়া শিক্ষক যখন কোনো কথা লিখে নিতে বলবেন, তখন সেটা অবশ্যই নোট করবেন।'[৩০]

দরসে মনোযোগ নিবদ্ধ না থাকার কারণ

অনেকে বলে, মন দরসে সব সময় উপস্থিত থাকে না। দরসে বসলে মন এদিক-সেদিক ছুটাছুটি করে। ফলে বিভিন্ন সময় শিক্ষকের আলোচনা মনোযোগসহকারে শোনা হয় না। আমার ধারণা, এই অমনোযোগিতার প্রধান কারণ হলো গুরুত্বহীনতা। যদি শিক্ষার্থীর মনে লেখাপড়ার গুরুত্ব যথাযথ থাকে এবং এই অনুভূতি প্রবল থাকে যে, দরসে মনোযোগসহকারে উস্তাদের আলোচনা শোনার পর্বটি হলো পড়ালেখার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্ব, আবারও বলব– শিক্ষার্থীর কাছে যদি পড়াশুনার গুরুত্ব থাকে এবং এই অনুভূতি যদি তার পূর্ণতর থাকে, তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় দরসে অমনোযোগিতা থাকতে পারে না। অবশ্য خُلِقَ الإِنْسَانُ ضَعِيْفًا [মানুষকে দুর্বলরূপে সৃষ্টি করা হয়েছে] হিসাবে গুরুত্বের অনুভূতি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও মাঝেমধ্যে অমনোযোগিতা এসে যেতে পারে। ইলমে দ্বীন হাসিল করার জন্য আমাদের মনোযোগ অটুট থাকুক, তা তো শয়তানের সহ্য হওয়ার কথা নয়।

দরসে মনোযোগ নিবদ্ধ রাখার জন্য একটি পরামর্শ

তোমরা অনেকে জান, দরসে মনোযোগিতা ধরে রাখার জন্য আমি এ পরামর্শ দেই– একটি কাগজে বড় হরফে 'আমি দরসে উপস্থিত আছি তো?'

---

৩০. 'শিক্ষা সহায়িকা' পৃ. ১৩ - ১৪

লিখে কিতাবের উপর এমনভাবে রেখে দাও, যেন তার উপর বারবার চোখ পড়ে। এটা শুনলে অনেকে হাসে। কিন্তু আমার ধারণা হলো, এটা বেশ উপকারী প্রমাণিত হবে। তোমরা অভিজ্ঞতা অর্জন করে দেখতে পার।

গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু কথা

দরসসংশ্লিষ্ট আরও কিছু কথা আছে। সেগুলো তোমার কাছে কম গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর গুরুত্বও কম নয়। আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. সে ধরনের কয়েকটি উপদেশ দিয়েছেন–

১. নির্দিষ্ট সময়ের কমপক্ষে ১০ মিনিট পূর্বে দরসগাহে প্রবেশ করবে। এতে তুমি তোমার নির্দিষ্ট আসনে নিশ্চিন্ত হয়ে বসতে পারবে এবং দরস শোনার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে সক্ষম হবে।

২. এই 'মহাস্থানে' [মহান স্থানে] প্রবেশ করার সময় তোমার প্রতি আল্লাহর কৃপা ও করুণা স্মরণ করবে। কারণ, তিনি তোমাকে এমন সুযোগ দান করেছেন, যা তোমার বয়সের অনেককে দান করা হয়নি।

৩. স্মরণ রেখো, নেয়ামতের হক হলো তার শোকর করা। আর নেয়ামতের হক আদায় তখনই সম্পন্ন হয়, যখন একে সে উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যে উদ্দেশ্যে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৪. কুরআন-হাদীসে বর্ণিত ইলম ও তালেবে ইলমের ফযীলতকে স্মরণ করবে। তাছাড়া কিছুক্ষণ পরই তোমার সামনে উস্তাদ আসবেন। তিনি তোমাকে মনোযোগী পেলে খুশী হবেন, আর অমনোযোগী পেলে মনে কষ্ট পাবেন। ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে উস্তাদের এই খুশি ও কষ্টের প্রভাব স্মরণ করবে।

৫. মনে রাখবে, এই স্থানটি অন্যান্য স্থান থেকে অনেক ভিন্ন। একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে একে নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানের আচরণ-বিধি আলাদা।

কোনো দরস যেন না ছুটে

আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. 'দরসের স্তরে' সর্বশেষ যে উপদেশটি দিয়েছেন তা হলো– চূড়ান্ত চেষ্টা করবে, কারণ যা-ই হোক, কখনো যেন তোমার কোনো দরস না ছুটে। কেননা দরস শিকলের মতো, যার আংটাগুলো পরস্পর যুক্ত। একটি আংটা ছিন্ন হওয়া কখনো পুরো শিকল বেকার হওয়ার কারণ হতে পারে।

দরসে অনুপস্থিত থাকা ছাত্রদের জন্য কতটা যে ক্ষতির কারণ, তা আমরা এ থেকে অনুমান করতে পারি যে, ছাত্রদের কল্যাণকামী উস্তাদবৃন্দ তা মোটেই মেনে নিতে পারেন না। তাঁদের এ অবস্থা দেখে তো আমার أنا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَأَنْتُمْ تَقَحَّمُوْنَ فيها হাদীসের কথা মনে পড়ছে। সহীহ বুখারী[৩১] ও সহীহ মুসলিমে[৩২] আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا مَثَلِي ومَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَه جَعَل الفَرَاشُ وهذه الدَّوَابُّ التي تَقَع في النار يَقَعْنَ فيها، فجَعَل يَنْزِعُهُنَّ، ويَغْلِبْنَه فيَقْتَحِمْنَ فيها، فأنا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وأنتم تَقَحَّمُوْنَ فيها.

অর্থ. আমার ও মানুষের উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে আগুন জ্বালিয়েছে। আগুন যখন তার আশপাশ আলোকিত করল, তখন পতঙ্গ ও যে সকল পোকা আগুনে পড়ে সেগুলো আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করল। সে সেগুলোকে সরাতে লাগল। কিন্তু সেগুলো তাকে পরাজিত করে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে আমি [জাহান্নামের] আগুন থেকে রক্ষা করার জন্য তোমাদের কোমর ধরে আছি। আর তোমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছ।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর কঠোরতা

আমি এখানে 'আপবীতি' কিতাব[৩৩] থেকে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর নিজের অবস্থা তুলে ধরছি। দেখো তিনি এ ব্যাপারে কেমন কঠোর ছিলেন। তিনি লিখেছেন– দরসে অনুপস্থিত থাকা আমার নিকট মারাত্মক অপরাধ ছিল। আমার সে সময়ের ছাত্রদের হাজিরা খাতা এখনো আছে। সারা বছরে ب [বীমার / অসুস্থ] ও ر [রুখসত / ছুটি]-এর উল্লেখ কোথাও

---

৩১. সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১১৮ كتابُ الرِّقَاقِ، باب الانتهاء عن المعاصي

৩২. সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬০৯৫, ৬০৯৭, ৬০৯৮ كتابُ الفضائلِ، باب شَفَقَتِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى أُمَّتِهِ وَمُبَالَغَتِهِ فِي تَحْذِيرِهِمْ مِمَّا يَضُرُّهُمْ

৩৩. ২ঃ ৪৪

কোথাও পাওয়া যাবে। কিন্তু ঐ [অনুপস্থিত]-এর উল্লেখ কয়েক বছর মিলিয়েও পাওয়া কঠিন হবে।

আমাদের মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মনযূর আহমদ খান ছাহেব অত্যন্ত দয়ালু ও বিনয়ী ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের হাজিরা খাতায় অনেক ঐ পাওয়া যেত। তাঁর একটি উক্তি বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি রসিকতা করে বছরের বিভিন্ন সময় বলতেন– "মাওলানা যাকারিয়া ছাহেবের দরসে উপস্থিত থাকায় কোনো ছওয়াব নেই। কারণ, ছাত্ররা তাঁর দরসে ভয়ে উপস্থিত হয়। আমার দরসে উপস্থিত হওয়ায় ছওয়াব আছে।"

আমার উপর আকাবিরগণের আস্থা ছিল, তাই আমার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও অসংযত আচরণের কারণে তাঁদের পক্ষ থেকে কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হত না। আমার দরসে যে ছাত্র অনুপস্থিত থাকত, আমি তাঁকে পরের দিন বলতাম– তোমার অনুপস্থিতির অভিযোগ মুহতামিম ছাহেবের নিকট করার পরিবর্তে আমি সুনানে আবুদাঊদ বা সহীহ বুখারীর দরস থেকে তোমার নাম কেটে দিলাম। এখন তুমি মুহতামিম ছাহেবের নিকট গিয়ে আমার নামে অভিযোগ করো যে, মুহতামিম ছাহেবের অনুমতি ছাড়াই আমি তোমার নাম কেটে দিয়েছি। আর নতুন করে মুহতামিম ছাহেবের আদেশ নিয়ে আস যে, তোমার নাম দ্বিতীয়বার খাতায় উঠানো হোক। আমি তো তোমার নাম কেটে দিয়েছি। ['আপবীতি'র বিবরণ শেষ হয়েছে।]

নিয়মিত হাজিরির ব্যাপারে আকাবিরের পয়গাম

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. তাঁর এক প্রবন্ধে[৩৪] আকাবিরের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পয়গাম পেশ করেছেন। প্রথম পয়গামটি দরসে নিয়মিত উপস্থিতি বিষয়ে। তিনি লিখেন–

আমরা যেন বিরতি [ছুটি]র সময় ছাড়া অন্য কোনো সময় মাদরাসায় গরহাজির না থাকি। বিশেষত সবকে হাজিরির বিষয়ে পূর্ণমনোযোগী থাকা কর্তব্য, যেন কোনো অবস্থাতেই একটি সবকও ছুটে না যায়। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলার দরবারে দু'আ করতে থাকা উচিত– ইয়া আল্লাহ! সব ধরনের আকস্মিক দুর্ঘটনা ও রোগ-ব্যাধি থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

---

৩৪. 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' পৃষ্ঠা ১৫৪ - ১৬০ দ্রষ্টব্য।

যে যুগে বর্তমান সময়ের মতো দ্বীনি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা ছিল না এবং শিক্ষার্থীদের স্থায়ী আবাসনেরও সুবিধা ছিল না, সে সময়েও আকাবির ও আসলাফ নিয়মিত উপস্থিতির বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁরা এতটাই গুরুত্ব দিয়েছেন যে, বর্তমান সময়ের তালিবে ইলমরা তাকে বাড়াবাড়ি নামেও আখ্যায়িত করতে পারে।

হযরত আবু হুরায়রা রা. সম্পর্কে তালহা রা.-এর এ কথা হয়ত সবাই জানেন,

وكان أبو هريرةَ رضي الله عنه مسكينًا لا مالَ له ولا أهْلَ ولا وَلَدَ، وإنما كانت يَدُه مع يَدِ النبي ﷺ، وكان يَدُورُ مَعَه حَيْثُمَا دَارَ، ولا يُشَكُّ أنه قد عَلِمَ ما لم نَعْلَم، وسَمِعَ ما لم نَسْمَع.

আবু হুরায়রা ছিলেন সহায় সম্বলহীন, সম্পদ বা সন্তান বা পরিজন বলতে তাঁর কিছুই ছিলো না; তার হাত ছিলো নবীজীর হাতের সঙ্গে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে যেতেন তিনিও তাঁর সঙ্গে যেতেন। আর সন্দেহ নেই, তিনি যে ইলম হাছিল করছেন, আমরা তা পারিনি এবং তিনি যে হাদীছ শুনেছেন, আমরা তা শুনিনি।[৩৫]

মানাকিব বিষয়ক কিতাবসমূহে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. [১১৩ - ১৮২ হি.] সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি সতেরো বছর ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, কোনো দিন তাঁর সঙ্গে ফজরের নামায ছুটেনি। কোনো দিন এর ব্যতিক্রম হয়নি, এমনকি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিনও নয়। তিনি তাঁর নিজের একটি ঘটনা এভাবে বর্ণনা করছেন যে, আমার এক সন্তানের মৃত্যু হল। আমি তার দাফন-কাফনের দায়িত্ব আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-পড়শিদের উপর ন্যস্ত করি। কেন? তিনি নিজেই বলেন,

خَافَةَ أَنْ يَفُوْتَنِيْ مِنْ أبي حنيفةَ شَيْءٌ لا تَذْهَبُ حَسْرَتُه عَنِّيْ.

'শুধু এ আশঙ্কায় যে, আবু হানীফা রহ.-এর নিকট থেকে এমন কোনো বিষয় আমার ছুটে যাবে, যার আফসোস আর কখনো শেষ হবে না।'[৩৬]

---

৩৫. المُسْتَدْرَكُ للحاكم النيسابوريّ ৩ ঃ ৫১২

৩৬. مَنَاقِبُ أبي حنيفة للمُوَفَّقِ المَكِّيّ ২ ঃ ২১৫

এই যুগের আকাবিরদের অবস্থা

এটা হচ্ছে সে সময়ের কথা যখন ইলম অন্বেষণকারীদের জন্য প্রতিষ্ঠানগত সুযোগ-সুবিধা ছিল না। এরপর যখন শিক্ষা-ব্যবস্থার ধরন পরিবর্তন হল এবং প্রতিষ্ঠানগত ব্যবস্থাপনার অধীনে তালিবানে ইলমের জন্য ছাত্রাবাস ইত্যাদির সুবিধা সৃষ্টি হল, তখন যেন তালিবানে ইলমের জন্য নেমে এল আসমানী ঈদ। তারা তখন দিন-রাত মাদরাসার মধ্যেই আবদ্ধ থাকত এবং কিতাব ও উস্তাদের সাহচর্যে ইলম অর্জনে মগ্ন থাকত। নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ পঙ্‌ক্তি–

وطن سے ہم کیا کرینگے مدرسہ ہے وطن اپنا

مرینگے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا

তাঁদের সে অবস্থাই প্রকাশ করেছে। আজ যদি আমরা এই পঙক্তি দু'টি বলি, তবে তা কেবল মৌখিক দাবি হিসেবেই গণ্য হবে। যদি না আমরা আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করে দিল-দেমাগ তাদের মতো করে গঠন করার চেষ্টা করি এবং তনুমন এক করে ইলমে রাসিখ, খুলুকে আ'যীম, ফিকরে মুস্তাকীম ও যাওকে সালীম হাসিল করার জন্য নিজেদেরকে কুরবান করি।

ঐ সময়ের একজন মুদাররিস আবদুল আযীম মুনযিরী [৫৮১ - ৬৫৬ হি.] যিনি الترغيبُ والترهيبُ গ্রন্থের সংকলক, তাঁর সম্পর্কে ইতিহাসের সাক্ষ্য হলো–

وكان لا يَخْرُجُ مِنَ المدرسةِ لا لِعَزَاءٍ ولا لِهَنَاءٍ ولا لِفُرْجَةٍ ولا لِغَيْرِ ذلك، إلا لصلاةِ الجُمُعَة، بَلْ يستغرقُ كُلَّ الأَوْقاتِ في العِلْمِ.

তিনি মাদরাসা থেকে কখনোই বের হতেন না– না শোকে, না সুখে, না সুসংবাদে না দুঃসংবাদে; শুধু জুমার নামাজ ছাড়া। বরং সারাক্ষণ ডুবে থাকতেন ইলমের মাঝে।[৩৭]

যে যুগে মুদাররিসগণেরই এই অবস্থা, যাদের বিভিন্ন ইজতিমায়ী কাজে বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, সে যুগের তালিবে ইলমদের অবস্থা কেমন হবে, যাদের জন্য পূর্ণ ইলম-নিমগ্নতাই কাম্য।

---

৩৭. بُسْتَانُ العارِفِيْنَ للإمامِ النَّوَوِيِّ পৃ. ১৯১

আমাদের নিকট অতীতের একজন আলিম, 'তাফসীরে রূহুল মা'আনী'র গ্রন্থকার 'মাহমুদ আলূসী'র দৌহিত্র মাহমুদ শাকরী আলুসী সম্পর্কে তাঁর শাগরিদ বাহজাত আছারীর বক্তব্য হচ্ছে 'একদিন প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছিল, রাস্তা-ঘাট কর্দমাক্ত হয়ে গিয়েছিল, আমি ভাবলাম, উস্তাদজী হয়তো আজ আসতে পারবেন না, তাই আমিও সবকে হাজির হলাম না। পরদিন যখন সবকে হাজির হলাম, তখন উস্তাদজী রাগান্বিত হলেন এবং এ পঙ্‌ক্তির মাধ্যমে আমাকে ভর্ৎসনা করলেন, ولا خَيْرَ فِيْمَنْ عَاقَه الحَرُّ والبَرْدُ[৩৮]

উস্তাদে মুহতারাম (শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ রহ.)-এর কিতাব قِيْمَةُ الزَّمَنِ عندَ العلماءِ-এ, এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা উল্লেখিত হয়েছে। আকাবিরে হিন্দুস্তান, বিশেষত আকাবিরে দেওবন্দের এ জাতীয় ঘটনা তো আমাদের চোখের সামনে রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ.-এর 'আপবীতী' পড়ে দেখার মতো। তাঁর এ ঘটনা সর্বজনবিদিত যে, তিনি ও তাঁর এক সহপাঠী সংকল্প করেছিলেন, কোনো হাদীস যেন উস্তাদের নিকট থেকে শোনা ছাড়া না থাকে, আর কোনো হাদীস বিনা অজুতে শোনা না হয়। আল্লাহ তাঁকে এই সংকল্প পুরা করারও তাওফীক দান করেছিলেন। এর অর্থ এই যে, তিনি নিয়মিত দরসে উপস্থিত থেকেছেন এবং দেহ ও মন দু'টো নিয়েই উপস্থিত থেকেছেন। যেন لِمَنْ أَلْقَى السَّمْعَ وهُوَ شَهِيْدٌ-এর বাস্তব নমুনা। বলাবাহুল্য, অমনোযোগিতার সঙ্গে শুধু শারীরিক উপস্থিতি কখনো উপস্থিতি হিসেবে গণ্য হতে পারে না।

'ছুটি নেওয়া' মানে উপস্থিত না থাকা

এখানে একথাও বলে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, আজকাল আমাদের তালিবে ইলম ভাইয়েরা গরহাজিরির অর্থ অনেক সীমাবদ্ধ করে নিয়েছেন। তাদের মতে কেবল ছুটি নেওয়া ছাড়া এবং কোনোরূপ ওজর ছাড়া অনুপস্থিত থাকাই গরহাজিরি হিসেবে গণ্য। অতএব কেউ যদি ছুটি নিয়ে

---

৩৮. قِيْمَةُ الزَّمَنِ عِنْدَ العُلماءِ পৃ. ১১৬

কিংবা কোনো ওজর বা অসুস্থতার কারণে অনুপস্থিত থাকে, তবে তা আর গরহাজিরি নয়। এই ধারণা ভুল। ছুটি নিয়ে কি বিনা ছুটিতে, ওজরের কারণে কি বিনা ওজরে অনুপস্থিতি সব সময়ই অনুপস্থিতি। দরসে উপস্থিত থাকার সুফল উভয় ক্ষেত্রেই হাতছাড়া হবে। কোনো রোযাদারের গলায় যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি চলে যায়, তাহলে যেমন তার রোজা বিনষ্ট হয়, এখানেও তেমনি। হাঁ, কেউ যদি বাস্তবিকই কোনো সমস্যার কারণে বাধ্য হয়ে ছুটি নেয়, আর এজন্য তার মনস্তাপ হতে থাকে, তবে হয়তো আল্লাহ তা'আলা তার গরহাজিরির ক্ষতি পুষিয়ে দেবেন। কিন্তু সেটা তো ভিন্ন প্রসঙ্গ। তাই যথাসাধ্য ছুটি নেয়া থেকে বিরত থাকা এবং সামান্য অসুস্থতার কারণে সবকে গরহাজির থাকা তালিবানে ইলমের জন্য কোনোভাবেই সমীচীন নয়।

আজকাল তালিবে ইলমরা খালাতো, মামাতো, চাচাতো ভাই-বোনদের বিয়ের জন্যও ছুটি নিতে আসে। আর তা-ও শুধু আকদের দিনের জন্য নয়; ঘর-বাড়ি দেখা দিনের জন্য, আকদের দিনের জন্য, রুখসতী বা অলীমার দিনের জন্যও ছুটি নিতে আসে। নাউযুবিল্লাহ মিন যালিক! অথচ আপন বোনের বিয়েও এমন কোনো বিষয় নয় যার জন্য তালিবে ইলমকে ছুটি নিতে হবে।

তালিবে ইলমকে দরসে উপস্থিতির বিষয়ে এমন গুরুত্ব দিতে হবে এবং ইলমের জন্য এমনভাবে মগ্ন থাকতে হবে যেন অভিভাবকরাও তাকে ছুটি নেয়ার কথা বলতে কিংবা তার জন্য ছুটি চাইতে হিম্মত না করেন। বাড়িতে কোনো কাজ থাকলে তা অন্য কেউ সমাধা করবে। বিয়ে-শাদীর বিষয় হলে ছুটির দিনে তার আয়োজন করবে। অথচ এখন অবস্থা এমন হয়ছে, যেন শুধু কওমী মাদরাসার তালিবে ইলমই ছুটি নিতে সক্ষম, আর বাড়ির জন্য লোকেরা ব্যস্ততার কারণে ছুটি নিতে অপারগ! এত মানুষের মাঝে শুধু সে-ই হচ্ছে অকর্মা, যার কোনো কাজ নেই। এই আবহ সৃষ্টির পিছনে খোদ তালিবে ইলমেরও অপরাধ রয়েছে। সে কেন নিজেকে বেকার ভাবছে, কিংবা তার সম্পর্কে অন্যদের মনে এ ধারণা সৃষ্টির সুযোগ দিচ্ছে। তার উচিত ইলমের মধ্যে এমনভাবে নিজেকে নিমগ্ন করা, যেন পরিবারের অন্যান্য সদস্য, পাড়া-পড়শি ও সমাজের লোকেরা এ চিন্তা করতে বাধ্য হয় যে,তার একটি দিন কেন একটি ঘণ্টা নষ্ট করাও আমাদের জন্য সমীচিন নয়।

'তাখাসসুস'-এর তালিবে ইলমের জন্য উপস্থিতির বিষয়টি আরো গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু হায় রেওয়াজ সর্বস্বতা। এটা এখন 'তাখাসসুসে'ও এসে প্রবেশ করেছে। তাই নামকাওয়াস্তের 'তাখাসসুসকারী'দের অবস্থা লক্ষ করে অভিভাবকেরা ভাবেন, 'তাখাসসুসে' ভর্তির পর বেচারা নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেয়েছে। এখন নিশ্চিন্ত মনে তার জন্য ছুটি নেয়া যেতে পারে। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। আল্লাহ তা'আলাই আমাদের অবস্থার উপর মেহেরবানী করতে পারেন।

অসুস্থতার অজুহাতে ছুটি ও একটি আশ্চর্য ঘটনা

অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে অনেক ছাত্র ছুটি নিয়ে থাকে। অথচ সাধারণ অসুস্থতায় দরসে গরহাজির থাকা উচিত নয়। আমাদের উস্তাদ হযরত মাওলানা মিসবাহুল্লাহ শাহ ছাহেব রহ. যার কাছে আমরা شَرْحُ مَعَانِي الْآثَارِ পড়েছি, তিনি বলতেন, 'তোমরা অসুস্থতার কারণে দরসগাহে গরহাজির থাক কেন? কামরায় তো শুয়েই থাকবে, দরসগাহের পিছন দিকেই শুয়ে শুয়ে সবক শুনতে থাক।' হযরত মাওলানা ইউসুফ লুধিয়ানভী রহ. شَخْصِيَّات تَأَثُّرات, কিতাবে[৩৯] এ বিষয়ে এক আশ্চর্য ঘটনা উল্লেখ করেছেন। হযরত মাওলানা কারী রহিম বখশ পানিপথী রহ. [১৪০২ হি.]-এর আলোচনায় তিনি লেখেন, 'হযরত কারী ছাহেব তালিবে ইলমদের ছুটির বিষয়টি সমর্থন করতেন না। অসুস্থ তালিবে ইলমদের প্রতিও এই নির্দেশ ছিল যে, তারা যদি পড়তে না পারে, তবে যেন দরসগাহে এসে শুয়ে থাকে। তবুও দরসগাহে অনুপস্থিত থাকা তিনি অনুমোদন করতেন না। ...

এ প্রসঙ্গে এক আশ্চর্য ঘটনা তিনি আমাকে শুনিয়েনে। ঘটনা এই যে, এক তালিবে ইলম একটু বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। অভিভাবকরা তাকে হাসপাতালে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল। হযরত কারী ছাহেব রহ. বললেন, 'যদি তাকে বাঁচাতে হয় তবে এখানেই দরসগাহে থাকতে দাও। আর যদি মেরে ফেলতে হয় তবে হাসপাতাল নিয়ে যাও।' অভিভাবকরা তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল। তিন চারদিন পর্যন্ত চিকিৎসা হল। পরিশেষে ডাক্তাররা

---

[৩৯]. ১ঃ২১০

অপারগতা প্রকাশ করল। ছেলেটির বাপ ও চাচা কাঁদতে কাঁদতে হযরত কারী ছাহেব রহ.-এর কাছে এসে বলল, ছেলেটি তো মারা যাচ্ছে, আপনি বলেছিলেন, যদি ওকে মেরে ফেলতে হয় তবে হাসপাতালে নিয়ে যাও! আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি বলুন, ছেলেটি জীবিত থাকবে! হযরত কারী ছাহেব বলেন, আমি তাদেরকে বললাম, আল্লাহর বান্দা! আমার বলায় কী আসে যায়। আমি তো ওই কথা এমনি জযবার কারণে বলেছিলাম। আমার বলার কারণেই সে মারা যাচ্ছে, এমন কথা তোমরা ভাবছ কেন? কিন্তু তারা বারবার বলতে লাগল, না আপনি বলুন, সে মারা যাবে না। আমি বললাম, আচ্ছা তাকে দরসগাহে এনে শুইয়ে দাও। ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে। তারা সেই অর্ধমৃত ছেলেটিকে দরসগাহে এনে শুইয়ে দিল। আর আল্লাহ তা'আলা তার কালামের বরকতে তাকে সুস্থ করে দিলেন।'

এখন যদি কোনো তালিবে ইলম কারী ছাহেবের ওই শাগরিদের মতো হিম্মত না করে না করুক, কিন্তু সামান্য অসুস্থতার কারণে গরহাজির থাকার যে প্রবণতা কারো কারো মধ্যে দেখা যায়, তা অবশ্যই পরিহার করা উচিত।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নিয়মিত সবকে উপস্থিত থাকার তওফীদ দান করুন এবং আমাদের মধ্যে দু'চারজনকে হলেও শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর ইত্তেবা করার তাওফীক দান করুন, যার ছয় মাস পর্যন্ত মাদরাসার চার দেয়ালের বাইরে যাওয়ারও প্রয়োজন হতো না।

[মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দা. বা.-এর বক্তব্য শেষ হয়েছে।]

দরসের নির্ধারিত দশটি নিয়ম

'আপবীতি' কিতাবে[৪০] শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. তাঁর দরসের নির্ধারিত দশটি নিয়ম উল্লেখ করেছেন। আমরা এখন যেহেতু 'দরস চলাকালীন স্তরে'র আলোচনায় আছি, তাই প্রসঙ্গক্রমে হযরত শায়খুল হাদীস রহ.-এর দরসের উক্ত নিয়মগুলো তুলে ধরছি। নিয়মগুলো আমাদের উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ। তিনি লিখেছেন–

আমার শিক্ষকতার সময়, বিশেষ করে হাদীসের পাঠদানকালে যা ১৩৪০ হিজরী থেকে শুরু হয়, হাদীস এবং পঠিতব্য হাদীসের কিতাব সংক্রান্ত

---

৪০. ২ঃ ৪৪ - ৪৮

প্রাথমিক আলোচনার পর পরই আমি আমার দরসের নির্ধারিত দশটি নিয়ম বলতে বাধ্য হতাম। যেহেতু আমি ছিলাম অভদ্র, তাই নিয়মগুলো বলার পর পরিষ্কার ভাষায় বলে দিতাম যে, আমি এ সকল নিয়মের ব্যতিক্রম দেখলে মুখে কিছু বলব না, হাত দ্বারা বলব। সে সময় ইলমী আলোচনায় অধমের মুখ যদিও বেশি চলত, কিন্তু ছাত্রদের আমলী ব্যাপারে মুখের চেয়ে আমার হাত বেশি সচল থাকত। দরসের যে দশটি নিয়মের প্রতি আমি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতাম, সেগুলো হলো–

১. [দরসে অনুপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে এইমাত্র তাঁর যে বক্তব্য উল্লেখ করলাম, সেটাই ছিল প্রথম নিয়ম।]

২. নামাযের কাতারের মতো সারিবদ্ধভাবে দরসে বসতে হবে। কেউ সামনে, কেউ পিছনে, কেউ ডানে, কেউ বামে এভাবে অগোছালো অবস্থায় বসা দেখলে আমার খারাপ লাগে।

৩. বাহ্যিক আকার-আকৃতি, চাল-চলন ও পোষাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদির ব্যাপারেও আমি অত্যন্ত কঠোর ছিলাম। পূর্বসূরী আলেমগণের চাল-চলন ও পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যতিক্রম করাকে আমি অত্যন্ত খারাপ মনে করতাম। দাড়ির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব ছিল। একে তো যে ছাত্র দাড়ি মুণ্ডন করত বা কাটত, সে মাদরাসা থেকে ভর্তি ফরমই পেত না। যদি কেউ কোনোভাবে ভর্তি ফরম পেয়েও যেত, অথবা কোনো ছাত্র 'দাড়িতে হাত দিবে না' মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে ফরম গ্রহণ করে ভর্তিও হয়ে যেত, তবুও আমার দরসে বসার অনুমতি ছিল না।

একজন ছাত্র কিভাবে যেন এ হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও দাওরা জামাতে ভর্তি হয়ে গেল। সে বছর সুনানে আবুদাউদ আমার দায়িত্বে ছিল। সে মুহতামিম ছাহেবসহ অন্যান্য প্রবীণ শিক্ষকদের সুপারিশ নিয়ে আসল যে, সুনানে আবুদাউদের দরসে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হোক। আমি তাকে বলে দেই যে, যতদিন পর্যন্ত দূর থেকে দাড়ি বুঝা না যাবে, ততদিন পর্যন্ত আমি তোমার নাম অন্তর্ভুক্ত করতে অপারগ। ছাত্রটি আমার প্রতি এ কারণে খুবই ক্ষুব্ধ ছিল যে, অন্যান্য উস্তাদগণ এবং অনেক প্রবীণ উস্তাদগণও তার নাম তাঁদের খাতায় উঠিয়েছেন, অথচ আমি তাকে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছি। আমি আমার বদভ্যাসের কারণে শেষ পর্যন্ত তার নাম উঠাই নি। কিন্তু কয়েক বছর

পর তার নিকট থেকে বাইআত হওয়ার আবেদন জানিয়ে আমার কাছে একটি পত্র আসল। পত্র দেখে তার কথা আমার স্মরণ হলো। আমি তাকে উত্তরে লিখলাম, আমার বদভ্যাস ও মন্দ আচরণ সম্পর্কে তোমার জানা আছে। তোমার উচিত হলো, সহনশীল ও ধৈর্যশীল কোনো শায়খ নির্বাচন করা। উত্তরে সে অনুনয়-বিনয় করে লিখল যে, 'আপনার মতো কঠোর শায়খই আমার প্রয়োজন।'

৪. আমার অভ্যাস ছিল কিতাবুল হুদূদ ও অন্যান্য অধ্যায়ে যেসব অশালীন শব্দ আসত, সেগুলোর অনুবাদ করতে আমি কখনো দ্বিধা করতাম না। আমি কখনো আকার-ঈঙ্গিতে সেগুলোর অনুবাদ করিনি। আমি মনে করতাম, আরবীতে যদি এ সব শব্দ থাকতে পারে, তাহলে উর্দুতেও থাকতে পারে। রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবু বকর রা.-এর পবিত্র জিহ্বা অপেক্ষা আমার জিহ্বাকে আমি অধিক পবিত্র মনে করতাম না। কিন্তু দরসের প্রারম্ভেই দশটি নিয়মের মধ্যে এটির উপর বেশি জোর দিতাম যে, এ সব শব্দ শোনে কেউ যদি হাসে, যার ফলে হাদীসের অনুবাদের পরিবর্তে এগুলো গালিতে পরিণত হয়, তাহলে দরসেই তাকে পিটাব। তাছাড়া এ সকল শব্দের তরজমা বলার সময় আমি নিজেই চেহারার অবস্থা পরিবর্তন করে ফেলতাম। রাগত ব্যক্তির মতো চেহারা করতাম। ফলে ছাত্ররা হাসার সাহস পেত না। এর পরও যদি কেউ নির্লজ্জতার পরিচয় দিয়ে হাসত, তাহলে তার ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতাম।

৫. কিতাবের উপর কনুই ইত্যাদি রাখা– যেরূপ অনেক ছাত্রের অভ্যাস থাকে, আমার নিকট মারাত্মক বেআদবী ও গোস্তাখী মনে হতো। এ জন্য দরসের প্রথম দিনই এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিতাম। আর কিতাবের উপর কনুই রেখে এবং হাতের উপর মুখ রেখে ঘুমানো তো আরও জঘন্য অপরাধ ছিল। এ ব্যাপারেও প্রথম দরসেই কঠোর সতর্কবাণী শোনিয়ে দিতাম। সে সময় আমার শরীর যেহেতু একেবারে হালকা ছিল, একদম শুকনো ছিলাম, তাই অনেক সময় এমন হতো যে, ছাত্র হাদীস পড়ছে, আমি হাদীসের আলোচনা করছি, ছাত্র যখন দ্বিতীয় হাদীস শুরু করেছে, তখন আমি আমার স্থান থেকে উঠে চট করে ঘুমন্ত ছাত্রকে একটি থাপ্পর মেরে আবার নিজের স্থানে এসে বসে যেতাম। দাওরার ছাত্ররা আকাশ থেকে পড়ত যে, এটা কি হল? এটা

আমার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা বুঝে নিত, কোনো বেচারা হয়ত ঘুমিয়ে পড়ছিল। আমি এ ব্যাপারে প্রবীণ উস্তাদদের সন্তান বা বিশেষ ছাত্রদেরকেও ছাড় দিতাম না।

আমার হযরত, আমার মুর্শিদ ও মুনিব হযরত সাহারানপুরী রহ.-এর এক আত্মীয়-ছাত্রের এ অভ্যাস ছিল। তার সাথেও কয়েকবার আমাকে এ আচরণ করতে হয়েছে। আমার হযরতের কাছে সে আমার সম্পর্কে অভিযোগও করেছে। আল্লাহ আমার পীর ও মুর্শিদকে উচ্চ মাকাম দান করুন! আমার বিরুদ্ধে যেকোনো অভিযোগকে তিনি রেয়াতের নজরে দেখতেন। এই অভিযোগের ব্যাপারে হযরতের উত্তর ছিল– "আমি কি যাকারিয়াকে এর জন্য বকাঝকা করব যে, হাদীসের সাথে বেআদবী করার কারণে তুমি কেন মারলে?"

৭. হাদীসের দরসে বিশেষ পদ্ধতিতে বসার ব্যাপারে বছরের শুরু থেকে সতর্ক করে দিতাম। বলে দিতাম, কেউ আসন দিয়ে বসবে না। দেয়ালের সাথে হেলান দিয়ে বসবে না। হাদীসের কিতাবের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করবে; বাহ্যিকভাবে ও আন্তরিকভাবে হাদীসের কিতাবের অসম্মান হয় এরূপ কোনো আচরণ কেউ করবে না।

৮. পোষাক সম্পর্কেও আমি বছরের শুরুতে বিশেষভাবে সতর্ক করতাম। আমি তাদের বলতাম, পৃথিবীতে হাজার রকমের মানুষ হাজার রকম পোষাক পড়ে। তবে একটি বিষয় তোমরা লক্ষ করে দেখবে, অনুসৃত ব্যক্তি যারা তাদের সকলের পোষাক এক; লম্বা জামা বা জুব্বা। সে মুসলমান, পাদ্রী, অগ্নিপূজারী বা হিন্দু যা-ই হোক। কোমর পর্যন্ত পাঞ্জাবী এবং চোস্ত পায়জামা পরিধান করাকে আমি খুব খারাপ বলতাম যে, এমন পোষাক পরিহিত ব্যক্তিদের নামাযের সামনের কাতারে দাঁড়ানো উচিত নয়। কারণ এরা পরোক্ষভাবে নির্লজ্জতার সাথে অন্যকে তাদের গোপন অঙ্গগুলোর নড়াচড়া দেখাচ্ছে।

৯. হাদীস ও ফিকহের ইমামদের প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। তাঁদের বিরুদ্ধে মনে মনেও কোনোরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না। কোনো কোনো লোক হানাফী মাযহাবকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে অন্যান্য ইমামদের প্রতি এবং কোনো কোনো বেকুব হাদীসের ইমামদের প্রতি সমালোচনামূলক বাক্য ব্যবহার করে। আমার নিকট এটা অত্যন্ত

খারাপ মনে হয়। আমি কুতবুল ইরশাদ হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.-এর একটি কথা শৈশবে শুনেছিলাম, সম্ভবত تذكرة الرشيد গ্রন্থে তা লিখাও আছে যে, হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. একবার হানাফী মাযহাবের সমর্থনে বক্তব্য দিচ্ছেলেন। ছাত্ররা মনোযোগ দিয়ে তা শুনছিল। হঠাৎ একজন আবেগে বলে উঠল, ইমাম শাফেয়ী রহ. যদি এ আলোচনা শোনতেন, তাহলে তিনিও তাঁর মত ফিরিয়ে নিতেন। এ কথা শোনে হযরত গঙ্গুহী রহ. বললেন- তাওবা, তাওবা, আসতাগফিরুল্লাহ! যদি তিনি এখানে উপস্থিত থাকতেন, তাহলে আমার এ আলোচনা একটি দুর্বল বক্তব্যরূপে প্রমাণিত হতো। তিনি সহজেই এর উত্তর প্রদান করতেন। এখন ইমামগণ উপস্থিত নেই, তাঁদের মতামতগুলো আমাদের সামনে আছে, তাঁদের মতামতের মধ্যে আমরা ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর মতকে কুরআন-হাদীসের সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ পাই বলেই আমরা তাকে দলিলের মাধ্যমে শক্তিশালী করার চেষ্টা করি। ইমামদের কেউ বর্তমানে বেঁচে থাকলে তাঁর অনুসরণ ব্যতীত অন্য কোনো উপায় থাকত না।

১০. আমার এ বিষয়েও মারাত্মক আপত্তি ছিল এবং বছরের শুরুতেই আমি ছাত্রদেরকে সতর্ক করে দিতাম যে, সমকালীন কোনো উস্তাদের কথা উদ্ধৃত করতে চাইলে সমস্যা নেই। কিন্তু তাঁর নাম উল্লেখ করতে পারবে না। এর কারণও ছিল। হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেবের নিকট ছিল সুনানে তিরমিযী। আর আমার দায়িত্বে ছিল সুনানে আবু দাউদ। দুই কিতাবের অধ্যায় ও অনুচ্ছেদগুলো ফিকহী বিন্যাস অনুসারে বিন্যস্ত। তাই আমাদের দরসের আলোচনা সাধারণত একই বিষয়ে হতো। তখন জামাতে বেশ ভালো কয়েকজন ছাত্র ছিল। তারা যখন আমার ও মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেবের আলোচনার মধ্যে গড়মিল পেত, বেশ জোরালোভাবে আমার নিকট অথবা মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেবের নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করত।

আমি জানতে পারি, মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেবও বিষয়টির প্রতি দরসে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন যে, তোমরা শায়খের নাম বলে আমাকে প্রভাবিত করতে চাচ্ছ। তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পার। তবে কারো নাম নিবে না। আমিও এ ব্যাপারে কয়েক বছর যাবৎ ছাত্রদেরকে একাধিকবার

নিষেধ করি যে, কখনো তোমরা মাওলানা আব্দুর রহমান ছাহেবের নাম নিয়ে প্রশ্ন করবে না। কারণ মাওলানার নাম শোনার পর তাঁর কথা প্রত্যাখ্যান করা এক ধরনের বেআদবী। আর চুপ থাকা নিজের মতামতের বিপরীতটাকে মেনে নেয়ার নামান্তর। হাদীসের কিতাবের দরস তো অন্যান্য শিক্ষকদের নিকটও হতো। তবে আমার ও মাওলানা মরহুম আব্দুর রহমান ছাহেবের দরসের মাঝে এ ঘটনা বেশি ঘটত।

এ দশটি বিষয়ে বছরের শুরুতেই আমি একটি জোরালো বক্তব্য দিতাম এবং পুরো বছর কোনোটির ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হলে সতর্ক করতে থাকতাম। [أَبِيْ-এর বিবরণ শেষ হয়েছে।]

বোঝার জন্য দরসে প্রশ্ন করা

দরসে উস্তাদের বুঝানোর পরও যদি কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকে, তাহলে আদবের সাথে প্রশ্ন করে উক্ত অস্পষ্টতা দূর করে নিবে। এতে কোনো সমস্যা নেই। বরং এমনটিই করা উচিত। ডক্টর আবদুল মতীন লিখেছেন– 'ক্লাসে কেবল লোক-দেখানো ভাবে প্রশ্ন করা ঠিক নয়, তেমনি কোনো যথার্থ জিজ্ঞাসা মনে জাগলে শিক্ষককে প্রশ্ন করতে দ্বিধাবোধ করবেন না।

ক. এ বিষয়ে প্রয়োজনবোধে দৃঢ়তার সঙ্গে স্বাভাবিক প্রাথমিক সংকোচ কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করবেন।

খ. নিতান্ত জরুরী না হলে প্রশ্ন করবেন বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে।

গ. আপনার কোনো কোনো প্রশ্ন নেহাত অজ্ঞতার পরিচায়ক হতে পারে, এমন-কি অপ্রাসঙ্গিকও হতে পারে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। মনে রাখবেন, যে-কোনো সুশিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে উপলব্ধি ও কৌতূহল আশা করেন। তবে শিক্ষক সব সময় আপনার সব সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারবেন– এটা আশা করবেন না।'[৪১]

তবে লক্ষ রাখতে হবে যে, প্রশ্নে যেন বিরোধিতা ও বিতর্কের কোনো ভাব না থাকে। অন্যথায় এটি তোমার জন্য ধ্বংসের কারণ হতে পারে। আল্লাহ আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। দেখো, تعليمُ المتعلِّم কিতাবে আছে–

---

৪১. 'শিক্ষা সহায়িকা' পৃ. ১৪

ما وصل من وصل إلا بالتواضع، وما سقط من سقط إلا بالكبر.[৪২]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি লক্ষ্যে পৌঁছেছে সে সম্মান রক্ষা করার অভিলাষেই পৌঁছেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অধঃপতিত হয়েছে সে সম্মান রক্ষা না করার কারণেই অধঃপতিত হয়েছে।

প্রশ্ন করার কয়েকটি আদব

প্রশ্ন করার আদব সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দা. বা. লিখেছেন,[৪৩]

১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لا تتعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار فالنار.

অর্থ, এজন্য ইলম অর্জন করো না যে, তা দ্বারা আলেমদের সাথে গর্ব করবে বা মূর্খদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হবে কিংবা মজলিসের অধিকর্তা হবে। যে এমন করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম, তার জন্য রয়েছে জাহান্নাম।[৪৪]

আমরা লক্ষ করি না যে, অনেক সময় আমরা উস্তাদের সাথে যেভাবে ইশকাল ও ইতিরায শুরু করি, তা কখনো কখনো মুবাহাত ও মুমারাতের পর্যায়ে চলে যায়। আমরা চিন্তা করি না যে, এটা আমাদের জন্য ধ্বংসের কারণ; দুনিয়াতেও, আখেরাতেও।

বর্তমানে অনেক সময় উস্তাদের নিকট ইশকাল পেশ করার বৈধতার অপব্যবহার করা হয়। ইশকালের পরিবর্তে সরাসরি ইতিরায করা হয়। ইশকাল তো লাযিম মাসদার। যেমন বলা হয়ে থাকে– أشكل عليّ كذا অর্থাৎ আমার কাছে এটি জটিল মনে হচ্ছে। কারো কাছে কোনো কথা বা বিষয় জটিল মনে হলে, কোনো বিষয়ে সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি হলে কিংবা কিতাবের কোনো কথার যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ হলে তার এই ইশকালটি যথাযথ আদব ও বিনয়ের সাথে উস্তাদের নিকট পেশ করতে

---

৪২. تعليم المتعلم পৃ. ৪৬

৪৩. মাসিক আলকাউসার, ফেব্রুয়ারি '১৪, পৃ. ৩৯ - ৪২

৪৪. সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ৭৭

পারে। কেননা এটি হলো 'ইস্তিফহাম'[৪৫], যা ইলম শেখারই অংশ। তবে তা হতে হবে সংশ্লিষ্ট পূর্ণ আলোচনা শেষ হওয়ার পর। কারণ আলোচনার মাঝে থামিয়ে দেয়াও আদব পরিপন্থী। তাছাড়া এমনও হতে পারে যে, আলোচনার শেষভাগে আপনার ইশকালের উত্তর পাওয়া যাবে। তখন তো আপনি নিজেই লজ্জা ও সংকোচ বোধ করবেন।

২. আরেকটি আদব হলো ইশকাল পেশ করার আগে অনুমতি গ্রহণ করা এবং ইশকাল পেশ করার ক্ষেত্রে কখনো তর্কের ভাব প্রকাশ না পাওয়া। কেননা এটি মারাত্মক বেয়াদবী। আর তখন তা 'ইশকাল করা' থাকে না, 'ইতিরাযে পরিণত হয়। ইশকাল পেশ করতে কোনো বাধা নেই। কিন্তু ইতিরায করা সম্পূর্ণ আদব পরিপন্থী। ইতিরায তো হলো আপত্তি করা এবং উস্তাদ ও আলোচনার মাঝে প্রতিবন্ধক হওয়া। এটি কীভাবে জায়েজ হতে পারে?

ইশকালের মর্ম বোঝার পর এ কথা বোঝতে অসুবিধা হবে না যে, তালিবে ইলম উস্তাদের কাছে শুধু এমন বিষয় জিজ্ঞাসা করবে, যে বিষয়ে বাস্তবেই তার কোনো প্রশ্ন বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। যে বিষয়টি তার জানা আছে, অন্য কোনো উস্তাদ বা আলেমের কাছে শুনেছে, কোনো শরাহ বা হাশিয়ায় পেয়েছে কিংবা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনো কিতাব বা ইলমী সাময়িকীতে পড়েছে, তা তো অজানা নয়। তবে কেন তা উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করবে? তা-ও আবার দরসে?

মুতালা'আর প্রতি তাকিদ দেয়ার একটি বড় হেকমত এটাও, যেন সব বিষয় উস্তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন না হয়। তাই যে বিষয়টি জানা আছে, যে বিষয়ে কোনো ইশকাল বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়নি, তা উস্তাদের নিকট জিজ্ঞাসা করার পিছনে কী রহস্য থাকতে পারে? সাথীদের অবগতি উদ্দেশ্য হলে তাকরারের সময় বলে দেয়া যায়। তবে কি নিজের ইলম প্রকাশ করা উদ্দেশ্য? নাকি উস্তাদকে পরীক্ষা করা এবং উস্তাদকে পেরেশান করা উদ্দেশ্য? এগুলো কি ভালো কাজ? এগুলো ছাড়া আর কী হেকমত হতে পারে?

---

৪৫. অর্থাৎ বুঝিয়ে দেয়ার আবেদন।

আমাদের তলবে ইলমের যামানা [আলহামদুলিল্লাহ, বান্দা এখনও তালিবে ইলম, যদিও তলবের হক ও আদবগুলোর পরিপালন যথাযথভাবে হয়ে উঠে না। আমি সকল সাথীর নিকট দু'আর আবেদন করছি] এখনও নিকটঅতীত। আমি বা-আদব ও সমঝদার তালাবাকে দেখেছি, বিভিন্ন শরাহ ও হাশিয়া থেকে যা তাদের বোঝা সম্ভব ছিল, তা দরসে জিজ্ঞাসাই করতেন না। মুতালা'আর আগেও করতেন না, পরেও না। মোটকথা নিজের ইলম প্রকাশের জন্য বা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তিকে পেরেশান করার জন্য কিংবা উদ্দেশ্যহীনভাবে দরসে অযথা কোনো কথা জিজ্ঞাসা করা ইলম ও উস্তাদের আদবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আর এমন আচরণ তালিবে ইলমের বরবাদির কারণও হয়ে যেতে পারে।

৩. ইশকাল পেশ করার একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব এই যে, নিজ প্রতিষ্ঠানের কোনো উস্তাদ বা নিজ উস্তাদের কোনো সমবয়সী আলেম কিংবা তাঁর কোনো উস্তাদের কোনো কথাকে দলিল বানিয়ে ইশকাল পেশ না করা। এটাও উস্তাদকে পেরেশান ও অপ্রস্তুত করার শামিল। তেমনিভাবে উস্তাদের চেয়ে পদ-স্তর বা বয়সে ছোট কোনো আলেমের উদ্ধৃতি দিয়ে অথবা যাদের সাথে তাঁর স্বভাবের অমিল আছে তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে কোনো কথা জিজ্ঞাসা– সব কিছুই পরিত্যাজ্য। ...

'আপবীতি' কিতাবে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন–

"একই সময়ের মুদাররিসগণের কোনো কথা বর্ণনা করতে চাইলে আগ্রহভরেই করা যায়, তবে মুদাররিসের নাম উল্লেখ না করে। এ বিষয়টির প্রতি আমি নিজেও অনেক গুরুত্ব দিতাম এবং তালিবে ইলমদেরকেও শুরু থেকেই এ বিষয়ে সতর্ক করতাম। হযরত মাওলানা আব্দুল রহমান ছাহেব [কামিলপুরী] নাওয়ারাল্লাহু মারকাদাহু-এর কাছে যেহেতু তিরমিযী শরীফের সবক ছিল আর এই অধমের কাছে সবসময় ছিল আবু দাউদ শরীফ। তখনকার তালিবে ইলম কিছু সমঝদারও ছিল। আমার ও মাওলানা মরহুমের আলোচনায় কোনো অমিল পেলে তারা জোরালোভাবে আমার কাছে কিংবা মাওলানার কাছে ইতিরায করত। [ইশকাল পেশ করত।]

আমার জানা ছিল যে, মাওলানা মরহুমও তাঁর সবকে বলতেন, তোমরা শায়খের উল্লেখ করে আমাকে প্রভাবিত করতে চাও। কোনো ইতিরায করতে হলে শায়খের নাম উল্লেখ ছাড়াই করবে। আর আমিও একাধিকবার তালাবাদের বলেছি, তোমরা মাওলানার উল্লেখ করে কখনো ইতিরায করবে না। কেননা তাঁর কথা শোনার পর তাঁর কথা খণ্ডন করা বে-আদবী। আর এক্ষেত্রে চুপ থাকা নিজের বিরুদ্ধমতকে গ্রহণ করার নামান্তর।"[৪৬]

মোটকথা, ইলমের জন্যও অনেক আকল-বুদ্ধির প্রয়োজন। সহনশীলতা ও আদব রক্ষা করা দরকার। কোন্ কথা উস্তাদকে কখনোই জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়, কোন্ কথা নির্জনে বা খাস মজলিসে জিজ্ঞাসা করা উচিত আর কোন্ কথা দরস বা আম মজমায় জিজ্ঞাসা করা যায় আবার কোন্ কথা শুধু এমন উস্তাদকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত যার সাথে দুই দিক থেকেই [অবশ্যই আদব ও ভাব-গাম্ভীর্যতা বজায় রেখে] বে-তাকাল্লুফির সম্পর্ক রয়েছে– এসব বিষয়ের বিবেচনা ও পার্থক্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কিতাব ও ফনের সাধারণ জ্ঞান, পাঠ্যভুক্ত কিতাবের আলোচনার বাইরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অতিরিক্ত আলোচনা সবকিছু তালিবে ইলমের দায়িত্বে। তারা [ব্যক্তিগতভাবে] মুতালা'আ করে এসব অর্জন করবে। ...

৪. দরস গ্রহণের একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব এটাও যে, কোনো মর্ম ও ব্যাখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে কিংবা সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয়ে উস্তাদের কোনো ভুল হয়ে গেলে [যা হওয়া খুবই সম্ভব] আর তালিবে ইলমের এ সম্পর্কে অবগতি থাকলে দরস বা আম মজমায় উস্তাদের নিকট তা পেশ করবে না; বরং নির্জনে গিয়ে পূর্ণ আদব বজায় রেখে উস্তাদের নিকট তা ব্যক্ত করবে। পরামর্শ প্রার্থনা বা মতামত প্রকাশের পদ্ধতিতে তাকে অবগতি করবে। আর সংশ্লিষ্ট মাওয়াদ বিদ্যমান থাকলে তা উস্তাদের সামনে পেশ করে দেয়াই যথেষ্ট। তালিবে ইলম, উস্তাদ ও মজলিসের অবস্থার বিবেচনায় কখনো মজলিসেও আদবের সাথে ভুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে

---

৪৬. 'আপবীতি' আদদ ৬, ২/৩৩, প্রথম পরিচ্ছেদ, আকাবির কা তরযে তা'লীম।

পারে। সালাফের মাঝে এ ধরনের ঘটনাও রয়েছে। কিন্তু আমাদের মতো তালিবে ইলমদের জন্য ঐ পন্থাই সবচেয়ে নিরাপদ, যা দারাকুতনী রহ. তাঁর উস্তাদের ক্ষেত্রে অবলম্বন করেছেন।

ইমাম আবু বকর ইবনুল আনবারী [২৭১ - ৩২৮হি.] যিনি নাহু-লোগাতসহ কয়েকটি শাস্ত্রের ইমাম ও হাফেজ ছিলেন, প্রতি জুমাবারে তাঁর মজলিস হত। কোনো মজলিসে একটি হাদীস ইমলা করানোর সময় সনদের এক রাবীর নামে ভুল করে ফেলেন। ['হিব্বান'কে 'হাইয়ান' বলেছেন বা এ জাতীয় কোনো ভুল।] দারাকুতনী রহ. [৩০৬ - ৩৮৫হি.] সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমি চিন্তা করলাম, তিনি এত বড় মানুষ, তাঁর সূত্রে লোকেরা এই ওহাম লিখে নিবে, এটা কেমন কথা? কিন্তু তাঁকে এই ভরা মজলিসে কী করে বলি? দারাকুতনী বলেন, মজলিস শেষ হলে আমি তাঁর মুসতামলীকে বললাম যে, অমুক নামের ব্যাপারে শায়খের ওহাম হয়ে গিয়েছে। সঠিক হলো এই।

দারাকুতনী বলেন, পরবর্তী জুমায় আমি মজলিসে উপস্থিত হলে শুরুতেই ইবনুল আনবারী রহ. মুসতামলীকে বললেন, লোকদেরকে বলে দাও যে, গত জুমায় অমুক হাদীস ইমলা করার সময় সনদের অমুক নাম উচ্চারণে আমি ভুল করে ফেলেছি। সঠিক নাম এই। আর এ কথাও বলো যে, এই নওজোয়ান [দারাকুতনীর দিকে ইঙ্গিত করে] আমাকে তা সংশোধন করে দিয়েছিল। ...

হযরত নানুতবী রহ. [১২৪৮ - ১২৯৭হি.]-এর একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ। হযরত হাজী ছাহেব রহ. [১২৩৩ - ১৩১৭হি.] তাঁকে একটি খসড়া লেখা স্পষ্ট করে লিখে দেয়ার জন্য দিলেন। ঘটনাক্রমে তাতে একটি শব্দ ভুল লেখা ছিল। তিনি ভাবলেন, নিজে থেকে সঠিক শব্দ লিখলে তা বে-আদবী হবে। আবার ভুলই বা কীভাবে লিখবেন? তাই সে জায়গা তিনি খালি রেখে দিলেন এবং হযরত হাজী ছাহেব রহ.-এর নিকট আরজ করলেন, হযরত! এই শব্দটি বুঝতে পারছি না। হযরত তা দেখে নিজেই শুধরিয়ে দিলেন।[৪৭] ...

---

৪৭. كمالات اشرفيه পৃ. ১৬৪

বহস ও মুনাকাশা-র সাথে পড়া

ইমাম সাখাভী রহ. বলেন–

وأخذ غالبَ «شرح ألفيَّة العراقي» عن ولد مؤلِّفه الوَليِّ ورَامَ أولًا التدقيقَ في البحث بحيث يشكك في الاصطلاح، فلم يُوَافِقه الوليُّ على المخصوص في ذلك.

এতে বোঝা গেল, বহস ও মুনাকাশা [যুক্তিতর্ক ও গবেষণা-অনুসন্ধান]-এর সাথে পড়তে চাইলে আগে থেকেই অনুমতি নেয়া শর্ত। তবে এটা জরুরী নয় যে, উস্তাদের মানসিকতা সবসময় এর জন্য প্রস্তুত থাকবে। আর শাগরিদের মধ্যে এর যোগ্যতা ও রুচি থাকা তো সর্বাবস্থায় শর্ত। সালাফের যুগে ইমাম আবু হানিফা রহ.-এর সাথে তাঁর বেশ কয়েকজন শাগরিদের আচরণ, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহ.-এর সাথে তাঁর শাগরিদ মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেয়ী রহ.-এর আচরণ এ ধরনেরই ছিল। ...

[মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা.-এর বক্তব্য শেষ হয়েছে।]

শিক্ষকের মতো পড়তে চাইলে নিজেই গিয়ে প্রশ্ন ও উত্তর দেখে নাও

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখেছেন, "দাওরা শেষ করার পর আব্বাজানের কাছে হিদায়া সালিস পড়া শুরু করি। তখন আমার মধ্যে মুতালা'আ করার প্রচণ্ড স্পৃহা ছিল। হাদীসের কিতাব পড়া হয়ে গিয়েছিল। তাই দিনভর শুধু ফিকহের কিতাব দেখতাম। আর মাগরিবের পর আব্বাজানের কাছে তাঁর মসজিদে হিদায়া সালিস পড়তাম। আমি একাই ছাত্র ছিলাম। হিদায়ার উপর ফাতহুল কাদীর, ইনায়া, বিনায়া ও কেফায়ার সাহায্যে খুব প্রশ্ন করতাম। আব্বাজান দু'দিন পর বললেন, ছাত্রদের মতো যদি পড়তে চাও তাহলে পড়ো। শিক্ষকদের মতো পড়তে চাইলে নিজেই গিয়ে প্রশ্ন ও উত্তর দেখে নাও। আল্লাহর দয়া ও মেহেরবানীতে আমার কখনো নিজের কোনো উস্তাদের উপর মনে প্রশ্ন জাগেনি এবং মনে এই আত্মম্ভরিতা জন্মেনি যে, উস্তাদের পক্ষ থেকে আমার প্রশ্নের উত্তর আসেনি। এটা আল্লাহ তা'আলার অপার করুণা ও অনুগ্রহ।"[৪৮]

---

৪৮. 'আপবীতি' ১ ঃ ১০০

সারারাত কিতাব দেখে দেখে প্রশ্ন করতে লজ্জা হয় না?

তিনি আরও লিখেছেন, "যখন বুখারী ও তিরমিযী শরীফ হযরতের নিকট না পড়ে কোনো উপায় থাকল না, তখন একটি কৌশলের কথা চিন্তা করলাম যে, বেছে বেছে কিছু কঠিন প্রশ্ন তৈরি করে দরসে উপস্থিত হব এবং হযরতের বক্তব্যের উপর দমাদম প্রশ্ন করে বসব। যাতে হযরত আমার জ্ঞানের পরিধি দেখে এটা বলে দেন যে, তোমার পুনরায় পড়ার প্রয়োজন নেই। ... তবে আল্লাহ তা'আলার বড় ইহসান ও দয়া, আমার কখনো এই সন্দেহও আসেনি যে, হযরতের পক্ষ থেকে কোনো প্রশ্নের উত্তর পাইনি। যখন শয়তান সামান্যতম সন্দেহও উদ্রেক করত, তখন মনে মনে বলতাম যে, সারারাত কিতাব দেখে দেখে প্রশ্ন করতে লজ্জা হয় না?"[৪৯]

---

৪৯. 'আপবীতি' ১ ঃ ১০২

দরস-পরবর্তী স্তর [আয়ত্ত করা]

এ পর্যন্ত শিক্ষাকার্যক্রমের দু'টি স্তরের আলোচনা হয়েছে। প্রথম স্তর ছিল দরস-পূর্ববর্তী। সেটি ছিল প্রস্তুতি-পর্ব। দ্বিতীয় ছিল দরস চলাকালীন স্তর। এর প্রধান উপাদান ছিল 'মনোযোগসহকারে শ্রবণ'। এখন আমি তৃতীয় স্তরের আলোচনা করব। এটি দরস-পরবর্তী স্তর। এর মূল কথা হলো আয়ত্ত করা, যেমনটি পূর্বে শুনেছ।

পড়া আয়ত্ত করার চারটি পরামর্শ

১. দরসের পড়া আয়ত্ত করার জন্য তোমার প্রতি আমার সর্বপ্রথম পরামর্শ হলো, প্রস্তুতি-পর্ব ও 'মনোযোগসহকারে শ্রবণ' পর্বদ্বয় যথানিয়মে সমাপ্ত করার পর তুমি ধ্যানের সাথে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখো, দরসটি তোমার বাস্তবে কতটুকু বুঝে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ ১০০ ভাগ, না ৭৫ ভাগ, না ৫০ ভাগ, না তার চেয়ে কম। অথবা উদাহরণস্বরূপ দরসের কোন্ কোন্ অংশ পুরোপুরি বুঝেছ। কোন্ কোন্ অংশ আংশিক বুঝেছ। পড়ার কোনো অংশে কোনো অস্পষ্টতা রয়ে গেছে কি-না। এমনও কোনো অংশ আছে কি-না যা মোটেও বুঝনি। মোটকথা, উস্তাদের পাঠদান সমাপ্ত হওয়ার পর একটু সময় নিয়ে পড়াটি তোমার কতটুকু বুঝে এসেছে, ধ্যানের সাথে তা তুমি নিজেই পর্যালোচনা করে নির্ধারণ করো।

২. তারপর তোমার প্রতি দ্বিতীয় পরামর্শ হলো তাকরার করো। প্রতিদিন নির্দিষ্টভাবে একজনই এক কিতাব তাকরার করবে না। তাকরারের হালকায় বসার পর প্রথমে পরস্পর একটু আলোচনা করে নাও, দরসটি পুরোপুরি কে কে বুঝেছে। পুরোপুরি বুঝেছে এমন একজন তাকরার করবে। অন্য সকলে মনোযোগসহকারে শুনবে। নিজেদের অস্পষ্টতাগুলো দূর করার চেষ্টা করবে। দরসটি যারা পরিপূর্ণ বুঝেনি, তাকরার শোনা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হবে পুরোপুরি বোঝা। আর যে তালিবে ইলম দরসটি পরিপূর্ণ বুঝেছে, তাকরার করানো দ্বারা তার একটি উদ্দেশ্য হবে, নিজে যা বুঝেছে তা ব্যক্ত করার ও অন্যকে বোঝানোর যোগ্যতা অর্জন করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হবে, যারা বুঝেনি তাদেরকে সহযোগিতা করা।

৩. এরপর তোমার প্রতি তৃতীয় পরামর্শ হলো, দু'জন মিলে পরস্পর মুযাকারা করো। মুযাকারার অর্থ পুরো দরসটি প্রত্যেকের একে অপরকে শোনানো নয়। বরং মুযাকারার কাজ হলো নিজেদের বোঝার পর্যালোচনা করা। অর্থাৎ দরসটি কতটুকু বুঝেছ, তা দু'জন দু'জন করে পর্যালোচনা করে দেখবে। একে অপরকে দরস সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কথা জিজ্ঞাসা করবে এবং উত্তর দিবে। কোথাও কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয় কি-না, তা খতিয়ে দেখবে। সন্দেহ সৃষ্টি হলে তা কিভাবে দূর করা যায় তা পরস্পর আলোচনা করবে। 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ে[৫০] আল্লামা শাতেবী রহ.-এর উল্লেখকৃত "যেকোনো বিষয়ের মুহাক্কিক আলেমের চারটি শর্ত" বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে উক্ত শর্তগুলো আবার দেখে নিবে।

৪. তারপর তোমার প্রতি চতুর্থ পরামর্শ হলো, দরসটি যে কয়েকবার সম্ভব হয় পুনরাবৃত্তি করবে। 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ে[৫১] 'একটি কিতাব বহুবার পড়ার কিছু উদাহরণ' শিরোনামে قِيْمَةُ الزَّمَنِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ কিতাবের উদ্ধৃতিতে[৫২] যে সকল উদাহরণ পড়েছ, এখানে সেগুলো আবার দেখে নিবে।

"আপনি - তুমি - তুই"

তারপর শোনো, আদীব হুজুর-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পুষ্প' পত্রিকার এক সংখ্যায়[৫৩] "আপনি - তুমি - তুই" শিরোনামে একটি রোযনামচা প্রকাশিত হয়েছে।[৫৪] প্রাসঙ্গিকতার কারণে রোযনামচাটি এখানে উল্লেখ করছি। তোমাদের উপকার হবে ইনশাআল্লাহ।

"আজ দরসে আদীব সাহেব একটি সুন্দর কথা বললেন। আমরা যখন বললাম, হুজুর! মাসআলাটি ভালোভাবে বুঝিনি, তখন তিনি হেসে বললেন– দেখো ভাই! একটা ছেলের সাথে প্রথম যখন তোমার পরিচয় হয়, তখন

---

৫০. ২৩৭ - ২৩৯ পৃষ্ঠায়।

৫১. ১৭১ - ১৭৩ নং পৃষ্ঠায়।

৫২. পৃ. ১৭৫ - ১৮০

৫৩. ১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, জুমাদাল উলা, ১৪২১ হি.

৫৪. রোযনামচার লেখক হলো মাদরাসাতুল মাদীনাহ-এর ছাত্র ফয়যুল্লাহ।

তুমি তাকে 'আপনি' করে বল। তারপর পরিচয় যখন গভীর হয়, তখন 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে নেমে আস। যখন অন্তরঙ্গতা গভীরতর হয়, তখন[৫৫] 'তুমি' থেকে 'তুই'-এ নেমে যাও[৫৬]। প্রথম দিনেই তো আর 'তুই'-এর মতো অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয় না!

---

৫৫. কারো কারো ক্ষেত্রে।

৫৬. প্রসঙ্গত শোনো, এখানে আমাদের যে বিষয়টি শিক্ষণীয় ও গ্রহণীয় সেটাই শিখবে ও গ্রহণ করবে। অন্তরঙ্গতা প্রকাশ করার জন্য চিন্তাভাবনা না করেই কাউকে 'তুই' বলা শুরু করবে না। স্বাভাবিক অবস্থায় 'তুমি' শব্দই ব্যবহার করবে। কাউকে 'তুই' শব্দে সম্বোধন করার পূর্বে গভীরভবে চিন্তা করে নেবে, এতে সে বাস্তবে অধিক খুশী হবে কি-না। শুধু তোমার পক্ষ থেকে অন্তরঙ্গতা গভীর হলেই 'তুই' বলবে না। যাকে বলছ সে একে কীভাবে গ্রহণ করবে, তা-ও দেখতে হবে। মাঝে মধ্যে তো 'তুই' বলার কারণে ঝগড়াও বেঁধে যায়। আমার অভিজ্ঞতা তো হলো, আমাদের কেউ কেউ এমন অনেককেও 'তুই' বলে সম্বোধন করে, যাদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা গভীর থাকা দূরের কথা, তিনি হয়ত তাদের নামও জানেন না। তাদেরকে হয়ত দেখেছেনও মাত্র তখন, পরবর্তীতে আবার দেখার সম্ভাবনাও প্রবল নয়। আমার এই অভিজ্ঞতাও আছে যে, অন্তরঙ্গ মনে করে কেউ যাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে, সে তা মন থেকে গ্রহণ করে না। যাকে সম্বোধন করা হচ্ছে তার মধ্যে অন্তরঙ্গতা নেই। 'তুই' ব্যবহার করার জন্য উভয়ের মধ্যে অন্তরঙ্গতা থাকতে হবে। বরং যাকে সম্বোধন করা হবে সে এ ধরনের সম্বোধনে খুশী কি-না, সে ব্যাপারেও পূর্ণ নিশ্চিত হতে হবে। বুঝতেই পারছ, আমার অভিজ্ঞতাদু'টি সমবয়স্কদের বেলায় নয়। বরং বড়-ছোটদের বেলায়। আমাদের এক মাদরাসার এক উস্তাদের ছেলে কাঁদো কাঁদো অবস্থায় মাদরাসা থেকে বাসায় গিয়ে তার আম্মুকে বলেছে– "আমি এ মাদরাসায় পড়ব না, কারণ আমার হুজুর আমাকে 'তুই' বলে ডেকেছেন।" দেখেছ, 'তুই' সম্বোধনটা একটি শিশুর কত বড় কষ্টের কারণ হয়েছে? কারণ সে তাদের বাসায় এমন ডাক শোনতে অভ্যস্ত ছিল না। তারপরও কি আমি বলব, আমি অন্তরঙ্গতা নিয়েই 'তুই' বলে ডাকি?

সর্বশেষ বলব, আমি কখনো 'তুই' শব্দ ব্যবহার না করার কথা বলছি না। স্বীকার করি, 'তুই' শব্দ অন্তরঙ্গতার একটি প্রতীক। তবে যে কারো 'তুই' শব্দ নয়। যার মুখ থেকে 'তুই' শব্দের সম্বোধন শোনার জন্য কেউ উন্মুখ থাকে এবং যে শ্রোতা 'তুই' শব্দের প্রকারান্তরে তার প্রতি বক্তার অন্তরঙ্গতা অনুভব করে ও উপভোগ করে, শুধু তার ক্ষেত্রেই 'তুই', অন্যথায় স্নেহভাজন হলে 'তুমি'।

যে কোনো মাসআলার ক্ষেত্রেও একই কথা। প্রথমবার শোনার পর মাসআলাটির সাথে তোমার 'আপনি'-এর সম্পর্ক হয়েছে মাত্র। যখন আবার পড়বে এবং চিন্তা করবে, তখন মাসআলাটির সাথে তোমার একটি পরিচয় গড়ে ওঠবে এবং ধীরে ধীরে 'তুমি'র সম্পর্ক হয়ে যাবে। তারপর যখন তাকরার করবে এবং আরো চিন্তাভাবনা করবে, তখন মাসআলাটি এতো আপন হয়ে যাবে যে, তার সাথে 'তুই'-এর সম্পর্ক হয়ে যাবে। সুতরাং প্রথম পরিচয়ের সময় কিছুটা অস্পষ্টতা থাকলে তাতে চিন্তার কিছু নেই। রাতে সবাই মিলে তাকরার করো, তারপর আগামীকাল আবার বোঝাবো। তখন দেখো, মাসআলাটি তোমাদের কেমন আপন হয়ে যায়! প্রথমবারেই 'তুই' করে পেতে চাও, তা তো হবে না।" [রোযনামচা শেষ হয়েছে]

হযরত থানবীর ঠিকা ও দায়িত্বগ্রহণ

দরসের লেখাপড়ার তিন স্তরের আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পর আমি এখন তোমাদেরকে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ.-এর একটি বক্তব্য শোনাব। হযরত থানবী রহ. বলেছেন-[৫৭] 'তোমরা মাত্র তিনটি কাজ নিয়মিত অবশ্যই করবে। অতঃপর আমি ঠিকা নিব ও যিম্মাদার থাকব যে, ইলমী এসতেদাদ তোমাদের হাসিল হয়েই যাবে। প্রথম, যে সবক পড়া হবে তার মুতালা'আ অবশ্যই করে নিবে। আর মুতালা'আ কোনো কঠিন কাজ নয়। কেননা, মুতালা'আর উদ্দেশ্য শুধু এই যে, কী বুঝলে আর কী বুঝলে না, এর মধ্যে পার্থক্য হওয়া। এর বেশি খাটার প্রয়োজন নেই। দ্বিতীয়, তারপর উস্তাদের নিকট সবক ভালো করে বুঝে পড়বে, না বুঝে সম্মুখে অগ্রসর হবে না। ক্লাসে উস্তাদের কথা বুঝে না আসলে অন্য কোনো সময় বুঝে নেবে। তৃতীয়, একবার নিজেও মতলবের উপর তাকরীর করে নেবে। এ তিনটি মাত্র কাজ করার পর নিশ্চিন্ত থাকবে, স্মরণ থাকুক বা না থাকুক ইনশাআল্লাহ এসতেদাদ অবশ্যই পয়দা হয়ে যাবে। উক্ত তিনটি কাজ ওয়াজিবের স্তরের, সেই সঙ্গে আর একটি কাজ মুস্তাহাব স্তরের আছে। তা এই যে, প্রত্যহ কিছু পিছনের পড়া পড়ে নেবে।'

---

৫৭. 'আশরাফ চরিত' পৃ. ৭২

উন্মুক্ত লেখাপড়ার পর্বসমূহ

'উন্মুক্ত লেখাপড়া' শব্দটিকে এখানে আমি 'দরসের লেখাপড়া'র বিপরীতে ব্যবহার করেছি। দরসে কিতাব পড়ানোর একটি পরিমাণ নির্ধারিত থাকে। যেমন প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা বা দেড় পৃষ্ঠা বা দুই পৃষ্ঠা। দরসের পূর্বে মুতালা'আ করা, দরসে মনোযোগসহকারে শোনা ও দরসের পর আয়ত্ত করা প্রভৃতি পর্বে এতক্ষণ এ সংশ্লিষ্ট আলোচনা করা হয়েছে। সামনে যে আলোচনাগুলো হবে সেগুলো উন্মুক্ত লেখাপড়াসংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ কেউ যখন কোনো কিতাব বা বইয়ের শুধু নির্দিষ্ট কিছু পৃষ্ঠা পড়তে চায় না, বরং পুরো কিতাব ও বই পড়ার জন্য কিতাব ও বইটি হাতে নেয়, উদাহরণস্বরূপ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' বা 'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো?' বই দু'টি কেউ পড়তে চায়, তখন সে কীভাবে পড়বে, বর্তমানের 'উন্মুক্ত লেখাপড়ার পর্বসমূহ' শিরোনামের অধীনে সেই আলোচনা হবে।

অবশ্য আলোচ্য শিরোনামের অধীনে ডক্টর আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ.-এর যেসকল বক্তব্য আসবে, তিনি সেগুলোকে এই শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেন নি। তিনি বরং সেগুলোকে দরসের লেখাপড়ার তৃতীয় স্তর অর্থাৎ "দরস-পরবর্তী স্তর [আয়ত্ত করা]" শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর এ পর্বের আলোচনাগুলোকে দরস আয়ত্ত করার দিকনির্দেশনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

অবশ্য দরসের কিতাবসমূহ যখন সম্পূর্ণ সমাপ্ত হবে, তখন সেগুলো আয়ত্ত করার ক্ষেত্রেও বর্তমান শিরোনামের অনেকগুলো আলোচনা কাজে আসবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানের আলোচনা সমাপ্ত হওয়ার পর পরীক্ষাসংশ্লিষ্ট আলোচনা করব, যদিও পরীক্ষাসংশ্লিষ্ট আলোচনাগুলো 'উন্মুক্ত লেখাপড়া'র তুলনায় 'দরসের লেখাপড়া'র সাথে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। পরে করার কারণ হলো, অনেক সময় এমনও হয় যে, একটি কিতাব ও বই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং তার পরীক্ষা হয়, কিন্তু দরসে তা পড়ানের নিয়ম নেই, কিতাব ও বইটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত উদ্যোগে পড়ে নিতে হয়।

* * *

প্রথমে ডক্টর আবদুল মতীন-এর একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি। তিনি তাঁর 'শিক্ষা সহায়িকা' বইয়ে লিখেছেন– বলা বাহুল্য যে, কোনো বিষয়ে সম্যক জ্ঞান, উপলব্ধি বা মতামত প্রকাশের যোগ্যতা অর্জন করতে হলে অনেক বই পড়ার প্রয়োজন হয়। কিন্তু ছাত্রজীবনের সীমিত সময়ে তা সম্ভব নয়, এবং তার প্রয়োজনও নেই। সচরাচর পাঠক্রমের যে-কোনো পত্রের জন্য ভালো দু'তিনটি বই-ই যথেষ্ট। [এর জন্য তাঁর পরামর্শ হলো-]

ক. প্রথমে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর অপেক্ষাকৃত ভালো দু'তিনটি বই বেছে নেবেন। এ বিষয়ে শিক্ষকের পরামর্শ নিন।[৫৮]

খ. তারপর বইগুলোর উপর মোটামুটিভাবে চোখ বুলিয়ে নিয়ে ভালোভাবে পড়ার একটা পরিকল্পনা স্থির করুন।

গ. একটা বই ভালোভাবে পড়ার আগে হঠাৎ করে অন্য বই-এ যাবেন না। মনে রাখবেন, ভালো একটি বই 'ভালোভাবে' পড়ার পর অন্য বই পড়ার প্রয়োজন ও শ্রম অনেক কমে আসে। কোনো বিষয়ে যেমন-তেমন করে অনেকগুলো বই পড়ার চেয়ে বরং মনোযোগ দিয়ে দু'একটি ভালো বই পড়া শ্রেয়।[৫৯]

অতএব আমাদের পড়া যেন হয় পূর্ণ মনোযোগ ও সচেতনতার সাথে। আমাদের পড়া যেন 'বই-পোকা'দের পড়ার মতো না হয়। ৩৬৭ নং পৃষ্ঠায় 'বই-পোকা'দের অবস্থা ও সচেতনতার সাথে অধ্যয়ন বিষয়ে আলোচনা আসছে।

এবার শোনো, ডক্টর আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. শীর্ষ স্তরের শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের থেকে উন্মুক্ত লেখাপড়া করার এমন একটি মজবুত পরিকল্পনা উল্লেখ করেছেন, যাকে তাঁরা ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তারপর পরীক্ষার ফলাফলগুলো পর্যবেক্ষণ করেছেন। তখন তাঁদের সামনে

---

৫৮. প্রত্যেক তালিবুল ইলম ও শিক্ষার্থীর একজন তা'লীমী মুরুব্বী ও শিক্ষাবিষয়ক লালনপালনকারী থাকা অতীব জরুরী। অনুরূপভাবে থাকা জরুরী একজন ইসলাহী মুরুব্বী ও আত্মার ব্যাধিসমূহের চিকিৎসক। কোনো শিক্ষার্থী যদি একই সত্ত্বার মধ্যে উভয়কে পেয়ে যায়, তাহলে তা হবে তার জন্য সোনায় সোহাগা।

৫৯. 'শিক্ষা সহায়িকা' পৃ. ৩

সেই পরিকল্পনার চমৎকার সাফল্য প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের ছাত্ররা সেগুলোর অনেক সুফল লাভ করেছে।

তাঁদের সেই পরিকল্পনাটি পাঁচটি ধাপে গঠিত। ধাপ পাঁচটি হলো–

১. পৃষ্ঠা উল্টানো,

২. প্রশ্ন তৈরি করা,

৩. পাঠ করা,

৪. মনে রাখার চেষ্টা করা ও

৫. পুনরাবৃত্তি করা

তোমাদের মনে বসার জন্য আবার বলছি–

১. পৃষ্ঠা উল্টানো,

২. প্রশ্ন তৈরি করা,

৩. পাঠ করা,

৪. মনে রাখার চেষ্টা করা ও

৫. পুনরাবৃত্তি করা

নিজেদের মনে ভালোভাবে বসানোর জন্য তোমরাও আঙ্গুলে গুণে আমার সঙ্গে তিন বার বলো–

✦ পৃষ্ঠা উল্টানো, প্রশ্ন করা, পাঠ করা, মনে রাখার চেষ্টা করা ও পুনরাবৃত্তি করা।

✦ পৃষ্ঠা উল্টানো, প্রশ্ন করা, পাঠ করা, মনে রাখার চেষ্টা করা ও পুনরাবৃত্তি করা।

✦ পৃষ্ঠা উল্টানো, প্রশ্ন করা, পাঠ করা, মনে রাখার চেষ্টা করা ও পুনরাবৃত্তি করা।

এখন প্রতিটি ধাপের বিস্তারিত বিবরণ শুনো–

১. পৃষ্ঠা উল্টানো

'পৃষ্ঠা উল্টানো' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মূল পড়ার এবং পড়ার গভীরে পৌঁছার পূর্বে, তুমি যে বিষয় পড়তে চাচ্ছ, সে বিষয় সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা।

'পৃষ্ঠা উল্টানো'র উপমা

সড়ক নির্মাণ ও সুগম করার কাজে হাত দেয়ার পূর্বে প্রকৌশলী মাটিতে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেন। সমতল ভূমি, পাহাড়, উপত্যকা,হ্রদ ও বন মোটকথা কোথায় কী অবস্থা তা আগে পর্যবেক্ষণ করেন। 'পঠন' কর্মের জন্য 'পৃষ্ঠা উল্টানো'র কাজটিকে এর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

অতএব, যে কিতাব বা বই তুমি পড়বে, প্রথম বৈঠকেই তার পৃষ্ঠাগুলো উল্টাও। 'পৃষ্ঠা উল্টানো'র এ কাজে তুমি 'সমগ্র' থেকে 'অংশে' এবং 'অংশ' থেকে 'ক্ষুদ্রাংশে' স্থানান্তরিত হও। [সামনে "কীভাবে 'পৃষ্ঠা উল্টানো'র উদ্দেশ্য অর্জিত হবে" শিরোনামের অধীনে এর ব্যাখ্যা আসবে।] তুমি যদি প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত করে দরস শুনে থাক, তাহলে এ পর্বে তোমার সময় ও চেষ্টা অনেক কম ব্যয় হবে।

'পৃষ্ঠা উল্টানো'র উদাহরণ

মনে করো, তুমি ছানূভী দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। আদীব হুজুর-এর اَلطَّرِيْقُ اِلَى اَلْبَلَاغَةِ প্রথম খণ্ড তোমার সিলেবাসভুক্ত। পড়ার জন্য তুমি কিতাবটি হাতে নিয়েছ। তো পুরো কিতাবের পৃষ্ঠাগুলো উল্টাও। কিতাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো জানতে চেষ্টা করো। তুমি বুঝতে পারবে যে, এ খণ্ডটি عِلْمُ الْمَعَانِيْ-এর জন্য নির্দিষ্ট। আর عِلْمُ الْمَعَانِيْ হলো ঐ ইলম, যা দ্বারা আরবী শব্দের ঐ সকল অবস্থা জানা যায়, যেগুলো অনুসরণ করলে কালাম مُقْتَضَى الْحَالِ। তথা স্থান-কাল-পাত্রের চাহিদা অনুযায়ী হয়। আরবী শব্দের অবস্থা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো–

أ. اَلذِّكْرُ وَالْحَذْفُ، ب. اَلتَّقْدِيْمُ وَالتَّأْخِيْرُ، ج. اَلتَّعْرِيْفُ وَالتَّنْكِيْرُ، د. اَلتَّقْيِيْدُ وَالْإِطْلَاقُ، هـ. اَلْوَصْلُ وَالْفَصْلُ وَغَيْرُهَا.

الطَّرِيْقُ إِلَى الْبَلَاغَةِ কিতাব সম্পর্কে যা বলা হলো, ফিকহ, উসূলে ফিকহ, উসূলে তাফসীর, উলূমুল কুরআন ইত্যাদি বিষয়ের কিতাবসমূহ সম্পর্কেও একই কথা।

এই 'সংক্ষিপ্ত খুঁটিয়ে দেখা'র কাজে এসব কিতাবের ভূমিকাসমূহ ও সূচীসমূহ থেকে তুমি অনেক সহায়তা পাবে। তবে 'সংক্ষিপ্ত পর্যবেক্ষণ' তোমার জন্য যথেষ্ট হবে না। প্রতিটি অংশের আনুষঙ্গিক 'পর্যবেক্ষণ'ও করতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি আলোচনা আলাদা আলাদাভাবেও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে।

একটা দুঃখজনক বাস্তবতা

এখানে অবশ্য একটা দুঃখজনক বাস্তবতা আছে। তাহলো, দরসে নেজামী নামে প্রসিদ্ধ আমাদের নেসাবের কিতাবগুলোর ছাপার অবস্থা বড়ই করুণ। এগুলোর ছাপা বড়ই সেকেলে। সময় যেন এখনও কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে আছে। এখনও যেন প্রকাশনাবিপ্লব প্রাথমিক পর্যায় অতিক্রম করছে। সামগ্রিকভাবে কিতাবগুলোর শুরুতে সেগুলোর পরিচিতিমূলক ভূমিকা আছে বলাটাও মুশকিল। দাড়ি-কমা-কোলন-সেমিকোলন প্রভৃতি যতিচিহ্নের ব্যবহার থাকা দূরের কথা, অনুচ্ছেদভিত্তিক বিভাজনও নেই। পার্শ্ব শিরোনাম নেই। এক কথায় প্রয়োজনীয় অঙ্গসজ্জার চরম অনুপস্থিতি। বলাবাহুল্য, এগুলো মুসান্নিফগণের ত্রুটি নয়। এগুলো প্রকাশকদের অবহেলা।

আমাদের নেসাবের অধিকাংশ প্রাচীন কিতাবের ছাপার অবস্থা এমন যে, এগুলো পড়তে যদি কেউ একান্ত বাধ্য না হয়, তাহলে আমার মনে হয় না, অনুসন্ধানের সাধারণ পিপাসার্তরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেগুলো অধ্যয়ন করবে। এক্ষেত্রে সাধারণ আগ্রহের যতই দোষারোপ করা হোক, কিন্তু এটাই হলো চরম বাস্তবতা। আমি তো এ ঘরানারই ঘনিষ্ঠ একজন। কওমী মাদরাসারই একজন ছাত্র। সুতরাং আমার কথাগুলোকে সাধারণ সমালোচনা গণ্য না করে আত্মসমালোচনা গণ্য করা ন্যায়সঙ্গত হবে। ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই। হয়ত কথাগুলো এই ছাত্র-মজলিসে বলা সম্পূর্ণ উপযোগী হয়নি। আল্লাহ মাফ করুন!

সময়ের একটি প্রয়োজন

মোটকথা, দরসে নেজামীর 'মাবনী' কিতাবগুলোর সর্বাধুনিক সংস্করণ ও শৈল্পিক প্রকাশ সময়ের একটি তীব্র প্রয়োজন। 'মাবনি কিতাব' বলে সেসব কিতাব আমার উদ্দেশ্য, যেগুলো দীর্ঘকাল পর্যন্ত নেসাব থেকে বাদ পড়ার নয়। নেসাবে যতই কাটছাঁট হোক, সেগুলো আপন স্থানে থাকার মতো। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ অঙ্গনেও কিছু কাজ করার নিয়ত করেছি। তোমরা উদাহরণস্বরূপ 'ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা' থেকে আমার সযত্নে প্রকাশিত هِدَايَةُ النَّحْوِ কিতাবটি, هِدَايَةُ النَّحْوِ কিতাবের অন্যান্য সংস্করণের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো।

এই মজলিসে এই আলোচনা করা দ্বারা আমি আশা করি, তোমাদের অনেকের মনেও ভবিষ্যতে এ অঙ্গনে কাজ করার একটি চেতনা জাগ্রত হয়েছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে মুরুব্বীদের তত্ত্বাবধানে দিলের সব নেক তামান্না ইখলাসের সাথে পুরো করার তাওফীক দান করুন। আর তিনি আমাদের দিলে ভালো ভালো অনেক ইচ্ছার ইলহামও করুন। আমীন!

'পৃষ্ঠা উল্টানো'র অবশিষ্ট আলোচনা

কথা চলছিল 'উন্মুক্ত লেখাপড়া'র 'পৃষ্ঠা উল্টানো' পর্ব প্রসঙ্গে, যার জন্য আমি 'খুঁটিয়ে দেখা' 'পর্যবেক্ষণ করা' প্রভৃতি শব্দও ব্যবহার করলাম। আমাদের কিতাবগুলোর প্রচলিত সংস্করণগুলো যে সূচিপত্র ও পার্শ্ব শিরোনাম থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত, তা-ও তো নয়। ইচ্ছা থাকলে বর্তমান অবস্থায়ও এসব কিতাব থেকে যথেষ্ট উপকৃত হওয়া সম্ভব। আমাদের মহান আকাবির ও সুযোগ্য আসাতিজা কেরাম এসব সংস্করণ অধ্যয়ন করেই তো নিজ নিজ স্তরে পৌঁছেছেন, যদিও প্রকাশগুলো শৈল্পিক হলে ফায়দা বেশি হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল।

কীভাবে 'পৃষ্ঠা উল্টানো'র উদ্দেশ্য অর্জিত হবে

যাই হোক, কিতাবের বিষয়গুলোর সামগ্রিক ধারণা লাভ করার উদ্দেশ্যে চিন্ত া করে ও মনোযোগের সাথে ধীরে ধীরে সূচীপত্র পড়ো। ভিতরের সবগুলো শিরোনাম ও সারসংক্ষেপ পড়তে ভুল করো না, যদি সারসংক্ষেপ থাকে।

অদ্রূপ যদি কিতাবে চিত্র, ম্যাপ ও নকশা থাকে, তাহলে সেগুলোও যেন তোমার পুরোপুরি দেখা হয়। পৃষ্ঠা উল্টানোর এ কাজটি কয়েকবার করবে। এভাবে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে মস্তিষ্কে কিতাব সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করার পর কিতাবের যে অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ বা পাঠ পড়তে চাচ্ছ, তার পৃষ্ঠাগুলো উল্টাও। তা খুঁটিয়ে দেখো ও পর্যবেক্ষণ করো। সমগ্র কিতাবের প্রতি যে পরিমাণ মনোযোগ দিয়েছ, এর প্রতি তার চেয়ে বেশী মনোযোগ দাও। শুরুতে 'পৃষ্ঠা উল্টানোর উপমা' শিরোনামের অধীনে 'সমগ্র থেকে অংশে এবং অংশ থেকে ক্ষুদ্রাংশে স্থানান্তরিত হওয়া' বলে এ কথাই বোঝানো হয়েছে।

শিরোনামের প্রতি মনোযোগী হও

এই পর্যবেক্ষণ কাজে মূল, পার্শ্বস্থ ও টীকার শিরোনামগুলোর সাহায্য নাও। এ অনুভূতি যেন তোমার মনে সবসময় বিদ্যমান থাকে যে, লেখকগণ শিরোনাম লেখার সময় সর্বাত্মক চেষ্টা করেন, যেন শিরোনাম সামনের আলোচনার মূল বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশকারী হয়। একটি পরিচ্ছেদ পড়ার পর তোমারও এই অভিজ্ঞতা হবে যে, সর্বোত্তম যে শব্দ বা বাক্য দ্বারা পরিচ্ছেদটির ব্যাপক আলোচনাকে সংক্ষিপ্ত করা যায়, তা হলো সেই শব্দ বা বাক্যটি, যাকে লেখক শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অনেক শিক্ষার্থী এসব শিরোনামকে গুরুত্ব দেয় না। এ ক্ষেত্রে তাদের উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো, যে এক অন্ধকার পথে চলে। তখন কেউ যদি তার জন্য বাতি জ্বালায়, সে বাতির আলো গ্রহণ না করে অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

প্রথমে তুমি কিতাবের পৃষ্ঠাগুলো উল্টিয়েছ এবং কিতাবের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলো মোটামুটি জানতে পেরেছ। তারপর তোমার বর্তমান পরিচ্ছেদটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছ এবং তার আনুষঙ্গিক দিকগুলো সম্পর্কে অবগত হয়েছ। এখন তুমি প্রশান্ত মনে দ্বিতীয় ধাপের ব্যাখ্যা শোনো। দ্বিতীয় ধাপ ছিল 'প্রশ্ন করা'।

২. প্রশ্ন করা

প্রশ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য বেশি স্মরণ থাকে

জ্ঞানার্জন ও তথ্য লাভের ক্ষেত্রে 'প্রশ্ন করা'র ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। ইতিহাস সাক্ষী, মানুষ অধিক গুরুত্বপূর্ণ যেসব জ্ঞান অর্জন করেছে, সেগুলো ছিল বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর, যে প্রশ্নগুলো তারা নিজকে বা অন্যকে করেছে। 'পড়া' ও 'মুখস্থ করা' অবশ্যই জ্ঞানার্জনের অন্যতম মাধ্যম। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, 'প্রশ্ন করা'র মাধ্যমে মানুষ যা অর্জন করে, তা 'পড়া' ও 'মুখস্থ করা'র মাধ্যমে যা অর্জন করে তার তুলনায় বেশি স্মরণ থাকে।

প্রশ্নার্জিত তথ্য বেশি স্মরণ থাকার কারণ

প্রশ্নের এই ভূমিকা ও অবদান অবশ্য এমনিতেই নয়। প্রশ্নের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। তাহলো, প্রশ্ন করতে হলে বিষয় নিয়ে আন্তরিকভাবে চিন্তা করতে হয়। মস্তিষ্কে বিষয়টির একটি ছবি তৈরি করতে হয়। ফলে বিষয়টি মস্তিষ্কে একটি স্থান করে নেয়।

যার কাছে প্রশ্ন থাকে তার লক্ষ্য থাকে

প্রশ্নে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা থাকে তা হলো, প্রশ্ন শিক্ষার্থীর জন্য একটি লক্ষ্য স্থির করে। এ কারণেই তোমার কানে এ কথাটি বারবার বলতে চাই, তোমাকে বারবার স্মরণ করাতে চাই, 'যার কাছে প্রশ্ন থাকে তার লক্ষ্য থাকে'।

হাদীসের আলোকে প্রশ্নের গুরুত্ব

প্রশ্নের ভূমিকা এতো বেশি যে, হাদীস শরীফে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ অর্থাৎ না জানার চিকিৎসা হলো প্রশ্ন করা।[৬০]

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন- حُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ অর্থাৎ সুন্দর প্রশ্ন জ্ঞানের অর্ধেক।[৬১]

---

৬০. সুনানে আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৩৬ ও ৩৩৭

৬১. শু'আবুল ঈমান লিলবাইহাকী, হাদীস নং ৬৫৬৮

'যার কাছে প্রশ্ন থাকে তার লক্ষ্য থাকে'-এর ব্যাখ্যা

'যার কাছে প্রশ্ন থাকে তার লক্ষ্য থাকে'-এর ব্যাখ্যার জন্য উদাহরণস্বরূপ বলব– এই আলোচনাগুলো যখন আল্লাহর তাওফীকে বই আকারে বের হবে, আর তুমি বইটি সংগ্রহ করে পড়তে বসবে, তখন হয়ত তুমি মুক্ত মনে বইটি পড়া শুরু করবে, সামনে কী লেখা আসছে তার অপেক্ষায় থাকবে; অথবা প্রশ্নে ভারাক্রান্ত অবস্থায় পড়া আরম্ভ করবে, তোমার মনে অনেক প্রশ্ন দানা বেঁধে আছে, বইটি পড়ে তুমি সেসব প্রশ্নের উত্তর জানতে চাচ্ছ। যেমন তুমি মনে মনে বলছ–

১. 'লেখাপড়া' বিষয়টি কী?

২. 'লেখাপড়া করা' ও 'পাঠ করা'– এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য কী?

৩. 'লেখাপড়া করা' কি এক জিনিস? আর 'পাঠ করা' কি অন্য জিনিস?

৪. 'লেখাপড়া করা' ও 'গবেষণা করা' বিষয়দ্বয়ের মধ্যে কী পার্থক্য?

৫. পড়া, লেখাপড়া ও গবেষণা' এ বিষয়গুলো কি একই শিকলের বিভিন্ন আংটা? নাকি শুধুই এমন কিছু বিষয়, যেগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কিছু সম্পর্ক আছে।

বইটির শুধু নাম দেখে তোমার মনে এ ধরনের অনেক প্রশ্ন জাগতে পারে।

'প্রশ্ন করা'র পর্ব কখন আরম্ভ হয়?

উন্মুক্ত পড়ালেখার পর্বগুলো যেভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে, তা থেকে দৃশ্যত ধারণা হয় যে, 'প্রশ্ন করা'র পর্বটি 'পৃষ্ঠা উল্টানো' পর্বের পর শুরু হয়। কিন্তু বাস্তবতা এমন নয়। 'প্রশ্ন করা'র পর্বটি মূলত 'পৃষ্ঠা উল্টানো'র পর্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয়। কারণ আগেই বলা হয়েছে– প্রশ্ন করাই হলো জ্ঞানার্জন ও শিক্ষাগ্রহণের সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যম এবং লেখাপড়া ও পড়াশুনার শাঁস ও মগজ।

উদাহরণস্বরূপ বালাগাতের কিতাবে তুমি اَلْكِنَايَةُ-এর আলোচনা পড়বে। পৃষ্ঠা উল্টানোর পর্বে আছ। তো নিজকে এই প্রশ্নগুলো করো–

১. اَلْكِنَايَةُ-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী?

২. আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থদ্বয়ের মধ্যে কী সম্পর্ক?

৩. কিনায়া الْحَقِيْقَةُ-এর অন্তর্ভুক্ত, না الْمَجَازُ-এর অন্তর্ভুক্ত?

৪. যদি الْمَجَازُ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে الْكِنَايَةُ ও الْاِسْتِعَارَةُ-এর মধ্যে কী পার্থক্য?

৫. الْكِنَايَةُ ও আধুনিক সাহিত্যের الرَّمْزُ-এর মধ্যে কী সম্পর্ক?

যখনই কোনো উত্তর পাও, তা তোমার মনে বা তোমার খাতায় বা একসঙ্গে উভয় স্থানে সংরক্ষণ করো। এই উত্তর থেকে অন্য একটি প্রশ্ন উদ্ভাবন করার চেষ্টা করো এবং তার উত্তর তালাশ করো। তুমি লক্ষ করবে, বহু প্রশ্ন তোমার উপর 'ঝাঁপিয়ে' পড়ছে এবং যখনই তুমি নিজকে এক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছ, তা তোমাকে একটি নতুন প্রশ্ন তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করছে।

প্রশ্ন তৈরি করার দক্ষতা অর্জনের উপায়

এটাও বাস্তব যে, প্রশ্ন তৈরি করা সহজ কাজ নয়। তা অবশ্যই এমন কাজ, যা অনুশীলন, সময় ও চেষ্টাসাপেক্ষ। তবে তার সুফল এতো অধিক যে, তা অর্জন করার সকল চেষ্টাকে আনন্দকর ও তৃপ্তিদায়ক বানিয়ে দেয়।

প্রশ্ন তৈরি করার দক্ষতা অর্জনের জন্য তোমরা একটি কাজ করতে পার– অনেক লেখক তাঁদের কিতাবের পরিচ্ছেদগুলোতে প্রশ্নমালা সংযোজন করেন। সেসব প্রশ্ন মনোযোগসহকারে পড়ো। তাহলে তুমিও সেভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্ন তৈরির প্রতি সিলেবাসের বই সংকলনকারীগণের গুরুত্বারোপ

শোনো, যেসকল সফল লেখক শিক্ষার্থীদের সিলেবাসের জন্য বই সংকলন করেন, তাঁরা প্রশ্ন তৈরির কাজটিকে নিজেদের অন্যতম কর্তব্য গণ্য করেন। একে অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। এর জন্য যথেষ্ট বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা ব্যয় করেন। 'ইসলামিয়া কুতুবখানা ঢাকা' থেকে আমার সযত্নে প্রকাশিত الْقِرَاءَةُ الرَّاشِدَةُ ও هداية النحو، قَصَصُ النبيين، الفقهُ الْمُيَسَّرُ কিতাবগুলো উদাহরণস্বরূপ নাড়াচাড়া করে তোমরাও অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পার।

প্রশ্নমালা কখন পড়বে?

কিতাব ও বইয়ে যদি প্রশ্নমালা থাকে, সেগুলো পরিচ্ছেদ পড়ার পরে তো পড়বেই। মূল পড়ার আগেও পড়ে নিবে। তাহলে পড়ে কী কী প্রশ্নের উত্তর বের করতে হবে, তা তোমার আগেই জানা হয়ে যাবে। আর সেই আগের কথাটি সবসময় স্মরণ রাখবে– 'যার কাছে প্রশ্ন থাকে তার লক্ষ্য থাকে'।

قَصَصُ النَّبِيِّيْنَ পড়ার পদ্ধতি

'প্রশ্নমালা'র সূত্র ধরে অনুশীলনীবিষয়ক একটি কথা মনে পড়েছে– কয়েকদিন আগে মুতাওয়াসসিতা ৩য় বর্ষের এক ছাত্র আমার تَدْرِيْبَات [অনুশীলনী] সম্বলিত قَصَصُ النَّبِيِّيْنَ সিরিজটি কীভাবে পড়বে, তা জানতে চেয়েছে। আমি তাকে বলেছি–

১. প্রথমে মূল দরস নিজের মেহনতে বিশুদ্ধভাবে পড়ার চেষ্টা করবে। صَرْفِيْ ও نَحْوِيْ দৃষ্টিতে পড়া যেন নির্ভুল হয়। উচ্চারণও যেন আদর্শ হয়। তারপর নির্ভরযোগ্য একজনকে عِبَارَتْ শুনিয়ে পড়া নির্ভুল ও আদর্শ হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে।

২. এরপর তারকীবী দৃষ্টিকোণে ইবারতের সঠিক বাংলা অনুবাদ করার চেষ্টা করবে এবং আস্থাভাজন একজনকে অনুবাদ শুনিয়ে তোমার সঠিক বুঝার ব্যাপারে নিশ্চিত হবে।

৩. তারপর تَدْرِيْبَات পড়বে এবং সেখানে কী কী কাজ করার কথা বলা হয়েছে, তা ভালোভাবে অনুধাবন করবে।

৪. এরপর সে কাজগুলো যথাযথ সম্পন্ন করার জন্য দরসটি যেভাবে যতবার পড়া দরকার হয়, সেভাবে ততবার পড়বে।

৫. তারপর تَدْرِيْبَات সম্পন্ন করবে এবং নির্ভরযোগ্য একজনকে শুনিয়ে ও লেখা দেখিয়ে উত্তর সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা লাভ করবে। এভাবে প্রতিটি দরস পড়বে।

৩. পাঠ করা

যে বই ও পরিচ্ছেদটি তুমি পাঠ করবে, তার পৃষ্ঠাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছ। তাতে কী কী প্রশ্ন হতে পারে, তা উত্থাপন করেছ। তাহলে এখন তৃতীয় পর্ব শুরু করি। তৃতীয় পর্ব হলো পাঠ করা।

'পাঠ করা' প্রথম কাজ নয়

অধিকাংশ শিক্ষার্থী পড়া বা পাঠ করাকে প্রথম কাজ মনে করে। বরং অনেকে পড়াকে শেষ কাজও মনে করে। পাঠ করা মূলত লেখাপড়ার প্রথম কাজও নয়, শেষ কাজও নয়। পাঠ করার আগে লেখাপড়ার দু'টি পর্ব রয়েছে, তার পরেও আছে দু'টি পর্ব।

'পাঠ করা'র লক্ষ্য ও উক্ত লক্ষ্য অর্জনের উপায়

আমাদের বোঝা দরকার, আমরা কোনো লেখা কেন পাঠ করি? আমরা পাঠ করি জানার জন্য, বোঝার জন্য, আয়ত্ত করার জন্য, বাস্তবায়নের জন্য, অন্যকে জানানোর জন্য, নিজকে গড়ার জন্য, অন্যকে গড়ার জন্য।

পাঠ করার এসব মহান লক্ষ্য তখনই অর্জিত হবে, যখন আমরা 'পাঠ করা'র সময় সেসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করব, যেগুলো পৃষ্ঠা উল্টানোর সময় আমাদের মনে এসেছে এবং লেখক পরিচ্ছেদের শেষে যেসব প্রশ্ন আমাদের সামনে পেশ করেছেন।

পাঠযোগ্য লেখার ৩টি উপাদান

পাঠ করার সময় এই সচেতন উপলব্ধি আমাদের থাকতে হবে যে, প্রত্যেক পাঠযোগ্য লেখা তিনটি উপাদানে গঠিত থাকে–

১. মূল বক্তব্য।

২. মূল বক্তব্যকে শক্তিশালী করার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা।

৩. গৌণ বক্তব্য যা টীকায় উল্লেখ থাকে।

কোন্‌টি মূল কথা, কোন্‌টি ব্যাখ্যামূলক কথা, আর কোন্‌টি প্রাসঙ্গিক অতিরিক্ত কথা, জাগ্রত মানসিকতা নিয়ে এগুলো চিহ্নিত করবে। প্রথম

উপাদানকে তার উপযুক্ত মনোযোগ ও গুরুত্ব দিবে। দ্বিতীয় উপাদানকে প্রথমটির সেবায় নিয়োজিত করবে। আর তৃতীয় উপাদানের প্রতি তার প্রাপ্যের অধিক মনোযোগ দিবে না।

টীকায় সংক্ষিপ্ত শব্দে মূল বক্তব্য লিখে রাখা

পুরো বই ও পরিচ্ছেদের বক্তব্যগুলো আয়ত্ত করার জন্যে এবং সেগুলোর মধ্যে সুন্দর যোগসূত্র তৈরি করার উদ্দেশ্যে আমাদের উচিত, প্রতিটি বক্তব্যকে একটি সংক্ষিপ্ত শব্দে লিখে রাখা এবং ঐ শব্দটিকে পাশে টীকায় নোট করা।

মূল পাঠে রেখা টানা

কিতাব ও বইয়ের মূল পাঠে রেখা টানারও প্রয়োজন হয়। এই রেখা টানা প্রত্যেক সফল পাঠের একটি আবশ্যক কাজ। তবে শর্ত হলো, অবশ্যই তা যথাস্থানে হতে হবে। কারণ, যারা গভীরভাবে চিন্তা না করে কিতাব ও বইয়ে মন মতো রেখা টানে, তারা নিজেদেরকে এমন বিপদে ফেলে, যার কষ্টদায়ক পরিণতি পরীক্ষার সময় উপস্থিত হওয়ার পরই অনুভব করে। কারণ পরীক্ষার সময় রেখা টানা বক্তব্যগুলো বিশেষভাবে পড়া হয়।

কখন রেখা টানবে?

যেসব শিক্ষাবিদ রেখা টানার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন, তাঁরা এ কাজে তাড়াহুড়া না করার ব্যাপারেও সতর্ক করেন। তাঁরা পরিষ্কার ভাষায় এ উপদেশ দেন যে, শিক্ষার্থীরা যেন একবার পড়ার পরই রেখা না টানে। তাঁদের পরামর্শ হলো, প্রথমবার পড়ার সময় শিক্ষার্থীরা যেসব লাইনকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, তারা যেন বইয়ের টীকায় সেসব লাইন বরাবর হালকা ইঙ্গিত দেয়। তবে এসব ইঙ্গিত কলমের পরিবর্তে পেন্সিল দিয়ে দেয়া ভালো। কালির অবিমোচ্য দাগ ও পেন্সিলের অতিরিক্ত রেখা দিয়ে পৃষ্ঠার স্বচ্ছতা নষ্ট করবে না।

আরেকটি কথা হলো, কিতাব যদি মাদরাসার কুতুবখানার হয় তাহলে কিতাবে রেখা টানবে না এবং নিজে কোনো লেখাও লিখবে না। কারণ কিতাবটি তোমার মতো আরও অনেকে পড়বে। আর রেখা টানার ও কোনো কিছু লেখার কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করা সকলের পক্ষে সম্ভব বা

সহজ নয়। তাই অন্যের কিতাবে কিছু না লেখাই বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া কমপক্ষে দু'বার পড়ার পর রেখা টানবে।

আসলে রেখা টানার প্রয়োজন হয় পড়ার পরিমাণ যখন বেশী হয়। মূল বক্তব্য, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা, শাস্ত্রীয় শব্দাবলি ও তাত্ত্বিক পরিভাষা ইত্যাদির উপর রেখা টানবে। তবে সাবধান! এভাবে রেখা টানার পরিমাণ যেন বেশী না হয়ে যায়। কারণ, পরিমাণ বেশী হলে গুরুত্ব থাকে না। প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়। উপরন্তু পরবর্তীতে তা তোমার বিরক্তির কারণ হবে।

কোনো পড়া দুর্বোধ্য ঠেকলে সেখানেও দাগ টানবে এবং কয়েকবার পড়ে স্পষ্ট করার চেষ্টা করবে। তবে পড়াটা পুরো পাঠ করার পূর্বে বোঝার জন্য জিদ ধরবে না। কারণ অনেক সময় পরবর্তী কোনো অংশ বা পুরো পড়াটি পাঠ করার পর দুর্বোধ্যতা আপনা আপনি দূর হয়ে যায়।

যখন ভাগ-বিভক্তি ও শাখা-প্রশাখা বেশী থাকে

তোমার কিতাবে ভাগ-বিভক্তি ও শাখা-প্রশাখা যদি বেশী থাকে, তাহলে সংখ্যা ব্যবহার করে সেগুলো বিন্যস্ত করে নাও। যেমন সবচেয়ে বড় ভাগের জন্য ব্যবহার করো– أَوَّلًا [প্রথমত], ثَانِيًا [দ্বিতীয়ত], ثَالِثًا [তৃতীয়ত] ...

এরপর পরবর্তী ভাগের জন্য– ১, ২, ৩ ...]। যদি এরপরও কোনো ভাগ থাকে, তাহলে তার জন্য اَلْأَبْجَدِيَّةُ اَلْحُرُوْفُ। বা বর্ণমালা ব্যবহার করো। অর্থাৎ ... د ، ج ، ب ، أ [ক, খ, গ, ঘ ...] অথবা অন্য কোনো সংকেত ব্যবহার করো, যা তোমার বিক্ষিপ্ত পড়াগুলো বিন্যস্ত রাখবে এবং পড়াগুলো পরস্পর যুক্ত রাখতে তোমাকে সহায়তা করবে।

সবকিছু পড়বে

শিক্ষাবিদগণের একটি বিশেষ উপদেশ হলো, উদ্যমী হয়ে পড়া এবং সবকিছু পড়া। শায়খ আলী তানতাবী রহ. লিখেছেন– "বিশ্রাম গ্রহণ করে উদ্যমের সাথে এক ঘন্টা পড়া ক্লান্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চার ঘন্টা পড়ার তুলনায় অধিক ফলদায়ক। তোমার ধারণা হবে পাঠ মুখস্থ করে ফেলেছ, অথচ বাস্তবে মুখস্থ হয়নি।" সামনে ৩৮৪ - ৩৯০ নং পৃষ্ঠায় তাঁর পুরো বক্তব্য আসবে।

কিতাব ও পরিচ্ছেদের প্রধান শিরোনাম, আনুষঙ্গিক শিরোনাম এবং টীকার শিরোনাম সবকিছু পড়ো। টীকা, পাদটীকা, পার্শ্বটীকা এগুলোও পড়ো। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ পড়ো। চার্ট-চিত্র থাকলে দেখো। কখনো একটি মাত্র চিত্র এক হাজার শব্দের বিকল্প হয়। ছোট-বড় কিছুই বাদ দিয়ো না। কারণ, যা লেখা হয়েছে তা অনর্থক লেখা হয়নি। অবশ্যই একটি লক্ষ্য সামনে রেখে লেখা হয়েছে। তোমার জন্য এবং তোমার প্রয়োজনে লেখা হয়েছে। এক এক অনুচ্ছেদ করে পুরো পরিচ্ছেদ পড়বে।

বুঝে বুঝে পড়বে এবং বোঝার পরীক্ষা করবে

অমীশ দাস অপু [আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়] লিখেছেন, 'ছাত্ররা পড়াশোনা করে এবং ভাবে, তারা সব জেনে ফেলেছে। কিন্তু পরীক্ষার সময় এলে তারা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তারা এটা বুঝতে চায় না যে, ঠিকমতো পড়ালেখা করেনি বলেই সমস্যার মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

যা হোক, ছাত্রদের সবারই উচিত অন্তত একবার নিজের যোগ্যতাকে পরীক্ষা করে দেখা। কীভাবে বুঝবেন আপনি যা পড়ছেন তা ঠিক মতো পড়া হয়েছে কিনা। একটা পরীক্ষা হয়ে যাক।

বিশেষ কোনো বিষয় নিয়ে টানা এক ঘণ্টা পড়ে যান। ক্লান্ত হয়ে পড়লে ছেড়ে দেন ওটা। তারপর যা পড়েছেন তা সংক্ষেপে লিখে ফেলুন খাতায়। এবার বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন লেখাটা। তা হলেই বুঝতে পারবেন আপনার পড়া আসলে কতটুকু এগিয়েছে।

আরেকটা কাজও করা যায়। কিছু প্রশ্নপত্র তৈরি করুন। সপ্তাহখানেক পরে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখে ফেলুন। বোঝা যাবে কতটুকু এগিয়েছেন আপনি। বই মুখস্থ করা আর হাতেকলমে শেখার মধ্যে বিস্তর ফারাক। আপনি পাঞ্জাবি ভাষা শিখতে চাইলে বই পড়ে যতটুকু না শিখতে পারবেন, পাঞ্জাবি কারো সঙ্গে কিছুদিন কথা বলে তার চেয়ে অনেক বেশি শিখতে পারবেন। ...

যোগ্যতা পরীক্ষার জন্য নিজে নিজে বাসায় বসে যে পরীক্ষাটা আপনি দেবেন, তাতে যদি দেখেন শুদ্ধভাবে লিখতে পেরেছেন, তা হলে আপনার মনোবল বেড়ে যাবে। আপনি লেখাপড়ায় আরো উৎসাহী হয়ে উঠবেন।

নিজের মূল্যায়ন নিজেই যথার্থভাবে করতে পারলে তাতে যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, তা ভবিষ্যতে চলার পথে পাথেয় হয়ে থাকে।"[৬২]

যখন দুর্বোধ্য কোনো বিষয়ের সম্মুখীন হবে

কোনো কোনো পড়া বাস্তবেই জটিল ও দুর্বোধ্য থাকে। সেগুলো সহজে বুঝে আসে না। তো তখন কী করবে? যদি বুঝে না আসে, তাহলে সেগুলো নিয়েই কী বসে থাকবে?

এ বিষয়ে শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণ দু'ভাগে বিভক্ত। এক দলের মত হলো, দুর্গম গিরিপথ এখনই সুগম করতে হবে। অর্থাৎ পড়া যতই দুর্বোধ্য ও জটিল হোক, এখনই বুঝতে হবে। দুর্গম ঘাঁটিতে বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সতর্কতার অবরোধ আরোপ করো। আঘাতের পর আঘাত অব্যাহত রাখলে দুর্গের বিজয় নিশ্চিত। অর্থাৎ আত্মবিশ্বাসের সাথে চেষ্টা অব্যাহত রাখলে পড়া যত কঠিনই হোক, বুঝে আসবেই।

একটি পরিচ্ছেদ আয়ত্ত করার সঙ্গে একটি ভূখণ্ড দখলের যথেষ্ট মিল আছে। কোনো দখলদার বাহিনী যখন বিরোধী বাহিনীকে সম্পূর্ণ দমন না করে এখানে একটি কেল্লা সেখানে একটি দুর্গ রেখে চলে যায়, তখন অচিরেই বিরোধী বাহিনী পিছনের দিক থেকে হুমকি দেয়। তারপর ঐ ভূখণ্ড নতুনভাবে জয় করতে হয়। মোটকথা, কোনো পড়া অস্পষ্ট রেখে সামনে অগ্রসর হওয়া যাবে না। সময় ও চেষ্টা যতই ব্যয় হোক, এখনই বুঝতে হবে।

অন্য একদল বিশেষজ্ঞের বক্তব্য হলো, এ কথা ঠিক যে, ঘাঁটিগুলো একের পর এক জয় করে যেতে হবে। তবে এই সিদ্ধান্তে আমরা যেন আহমক সাব্যস্ত না হই। কারণ, ঘাঁটির আশেপাশে কখনো অধিক নিরাপদ পথ থাকে। অর্থাৎ প্রয়োজনে বিকল্প পথ খুঁজতে হবে।

এই দ্বিতীয় মতটিকে সমর্থন করে একজন বড় অভিজ্ঞ গবেষক বলেছেন, "আমার নিজের প্রতি আস্থা ছিল। প্রত্যয় ও সাহসিকতার সাথে লক্ষ্য অভিমুখে চলতাম। অনেক সময় সামনে অনেক দুর্গম ঘাঁটি ও শক্তিশালী প্রাচীর অন্তরায় হত। তখন আমি অগ্রসর হয়ে যেতাম। অগ্রসর হওয়ার পর

---

৬২. 'পরীক্ষায় ভালো ফল করার কলাকৌশল' পৃ. ২৮

এমন বিস্ফোরক অবশ্যই পেয়ে যেতাম; যা শক্তিশালী প্রাচীরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়; দুর্গম ঘাঁটিকে সুগম করে দেয়।"

জনৈক অভিজ্ঞ গবেষকের এই মন্তব্য উল্লেখ করার পর আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. লিখেছেন,

"হে কঠোর পরিশ্রমী শিক্ষার্থী! আমি তোমাকে বলব, লেখাপড়া করতে গিয়ে তুমি যদি এমন দুর্গম ঘাঁটির মুখোমুখি হও, তাহলে সাবধান! সেই সেনাপতির মতো একগুঁয়ে হয়ো না, যে সেনাপতি মুখোমুখি অভিযানে তার বাহিনীকে নিঃশেষ করে দেয়। ফলে তার অনেক সৈন্য প্রাণ হারায়। জয়ের জন্য তাকে -যদি জয়লাভ করেও- চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হয়।"

রাফাত পাশা রহ. এবং ঐ গবেষক যা বুঝাতে চেয়েছেন, তা সহজ ভাষায় শোনো, কোনো পাঠ জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হলে, তার পিছনে পুরো সময় ও সর্বাত্মক চেষ্টা ব্যয় করতে থেকো না। রিজার্ভ শক্তি ব্যয় করতে যেয়ো না। অস্বাভাবিক কষ্ট করো না। স্বাভাবিক চেষ্টা ব্যয় করে অগ্রসর হয়ে যাও। বিরতি দিয়ে দিয়ে বিভিন্ন সময় পড়ো। নিরাশ হয়ো না। তোমার চেষ্টা বৃথা যাবে না। মেহনত বেফায়দা হবে না। অবচেতন মন কাজ করে যাবে। তোমার ঘুম ও বিশ্রামের সময়গুলোতে মস্তিষ্ক তোমার পড়াগুলোকে সুবিন্যস্ত করবে। এক সময় জটিলতা দূর হয়ে যাবে। মাসআলা হল্ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, জটিল মনে হলেই পড়া রেখে দিবে আর পৃষ্ঠা উল্টাবে। এ আলোচনার শুরুর দিকে রাফাত পাশা রহ.-এর উদ্ধৃতি দিয়ে স্বাভাবিক চেষ্টা ও অস্বাভাবিক চেষ্টার মধ্যকার পার্থক্য-রেখা উল্লেখ করা হয়েছে। আত্মবিশ্বাসের সাথে সেই অর্থে স্বাভাবিক চেষ্টা চালিয়ে যাও এবং আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকো। ৩৬২ নং পৃষ্ঠায় 'কখন রেখা টানবে?' শিরোনামের অধীনেও দুর্বোধ্যতা বিষয়ে কিছু কথা অতিবাহিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, অজানা শব্দ সামনে আসলে সর্বক্ষেত্রেই তার অর্থ জানার চেষ্টা করবে। অবশ্য অর্থ সঙ্গে সঙ্গেই যে জানতে হবে তা কিন্তু নয়। এক-দেড় পৃষ্ঠা পড়ার পর অভিধান ঘেঁটে সবগুলো অজানা শব্দের অর্থ এক সঙ্গে জেনে নিলে সময়ও বাঁচবে এবং পড়াও বারবার ব্যাহত হবে না। তবে বিশেষ প্রয়োজনের কথা অবশ্যই ভিন্ন। বিশেষ প্রয়োজন হলে অভিধান সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে হবে।

সারাংশ লেখা

আলোচ্যমান 'পাঠ করা' পর্বে উল্লেখিত পদ্ধতিতে পাঠ সমাপ্ত করার পর সারাংশ লেখার খাতাটা নিবে। চেষ্টার ফসল সংরক্ষণ করবে। সারাংশ লিখবে। এমনভাবে পাঠের মূল বক্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাগুলো নোট করবে, যাতে তোমার অনুধাবনের সৌন্দর্য প্রকাশ পায়। এভাবে নিয়মিত পড়লে ও লিখলে, পাঠে যদি অপ্রয়োজনীয় কোনো বক্তব্য থাকে, সেগুলো চিহ্নিত করে বাদ দেয়ার দক্ষতাও তোমার মধ্যে সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

সারাংশ লেখার কাজটা প্রথম দিকে কঠিন মনে হতে পারে। কিন্তু নিয়মিত করলে এক সময় তা সহজ হয়ে আসবে। কোনো লেখার সবগুলো কথার গুরুত্ব সমান নয়। পাঠ শেষে সারাংশ লেখার অভ্যাস গড়ে তুললে তুলনামূলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যকীয় কথাগুলো সহজে চিহ্নিত হবে।

অধ্যয়নে চাই পূর্ণ সচেতনতা

হ্যাঁ, অধ্যয়ন করবে পূর্ণ মনোযোগ ও সচেতনতার সাথে। পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় কিতাব মুতালা'আ করবে। অমনোযোগিতা ও মনের বিক্ষিপ্ততা ফলদায়ক পড়াশুনার প্রধান প্রতিবন্ধক। এলোপাতাড়ি ও অগভীর অধ্যয়নে শ্রম ও সময় উভয়েরই অপচয় ঘটে। উদাসীনতা ও অমনোযোগিতার চার ঘণ্টার লেখাপড়ার তুলনায় জাগ্রত অবস্থার ও মনোযোগসহকারে এক ঘণ্টার পড়ালেখা অধিক সুফলদায়ক। এই মাত্র শায়খ আলী তানতাবী রহ.-এর এ সম্পর্কিত একটি উক্তি অতিবাহিত হয়েছে।

অনীশ দাস অপু লিখেছেন, ' "বই-পোকা" বলে একটা কথা আছে। যারা সারাক্ষণ বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে থাকে, তারাই হলো বই-পোকা। পড়া একটি ভালো অভ্যাস। কিন্তু বই-পোকা হওয়া ভালো নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বই-পোকারা গোগ্রাসে বই পড়ছে। এক রাতে একটা বই সাবাড় করে ফেলে। তা আবার গর্ব করেও বলে। কিন্তু বইটা হজম করতে পারেনি। অর্থাৎ বইয়ের বিষয়বস্তু মাথায় ঢোকেনি। এতে কোনো লাভ হলো?

বেশি বেশি বই পড়ুন ক্ষতি নেই। প্রবাদ আছে– দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞান অন্বেষণ করো। আর জ্ঞান অন্বেষণের জন্য বইয়ের বিকল্প নেই। কিন্তু সে পড়াটা যেন পড়ার মতো হয়। ...

দ্রুতগামী পাঠক হিসেবে বাহবা কুড়াবার জন্য একরাতে একটি বই শেষ করে ফেলার মধ্যে খুব বেশি কৃতিত্ব, কিন্তু নেই, যদি না বইটি আপনি বুঝতে পারেন। বই-পোকা কথাটি বেশিরভাব ক্ষেত্রে ব্যাঙ্গাত্মক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর আলতু-ফালতু বই পড়ে বই-পোকা হবার সত্যি কোনো মানে নেই।'[৬৩]

এখন আমি মুতালা'আর ক্ষেত্রে জাগ্রত অবস্থার বিভিন্ন স্তর বিষয়ে হযরাতুল উস্তাদ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দা. বা.-এর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বক্তব্য তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন–[৬৪]

অধ্যয়নের প্রতিটি স্তরেই মেধা ও বুদ্ধির ব্যবহার জরুরী। অধ্যয়নের প্রথম স্তর কিতাব নির্বাচন থেকেই এর প্রয়োজন। বরং এর জন্য অভিজ্ঞতাহীন বুদ্ধিও যথেষ্ট নয়। কোনো অভিজ্ঞ ও দক্ষ বিবেকবানের পরামর্শ নেয়ারও প্রয়োজন পড়ে। বিশেষকরে দ্বীনীয়াত অধ্যয়নের ক্ষেত্রে সমঝদার আলেমের পরামর্শ নেয়া জরুরী।

তালিবে ইলমদের খেদমতে যে কথাটি পেশ করতে চাই তা হলো, তারা যেন 'জাগ্রত' অবস্থায় কিতাব মুতালা'আ করেন। মনোযোগবিহীন মুতালা'আ হয়তো পুরোপুরি নিষ্ফল হয় কিংবা এর ফল যৎসামান্য।

মুতালা'আর ক্ষেত্রে জাগ্রত অবস্থার অনেকগুলো স্তর আছে। যথা ঃ

১. প্রথম স্তর তো হলো, কিতাব বুঝে বুঝে পড়া। কঠিন ও জটিল স্থানগুলো সমাধান ও হল করে পড়া।

২. বিচক্ষণ অধ্যয়নের এটিও একটি অংশ যে, কোনো লেখক ও প্রকাশকের ভুলের শিকার না হওয়া। সঠিক বিষয়টি বের করে করে অন্তত ভুলকে সঠিক মনে করা থেকে বিরত থাকা।

৩. আরেকটি স্তর হলো, কৌতুহলী মনোভাব নিয়ে পড়া। অস্পষ্ট স্থানগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ খুঁজে খুঁজে পড়া। এটা জরুরী নয় যে, সকল অস্পষ্ট বিষয় প্রথম দিনই স্পষ্ট হয়ে যাবে। তবে কৌতুহলী স্বভাব না হলে তালিবে ইলমী জীবনের অনেকগুলো বছর কেটে

---

৬৩. 'পরীক্ষায় ভালো ফল করার কলাকৌশল' পৃ. ৩৯

৬৪. মাসিক আলকাউসার, নভেম্বর ২০১৪ ঈ. পৃ. ৩৮ - ৪০

গেলেও অস্পষ্ট বিষয়গুলো অস্পষ্টই থেকে যাবে। যেমন ধরুন, আপনি প্রথমবারের মতো الكُوْفِيُّوْن ও البَصْرِيُّوْن পরিভাষাটি পড়লেন। এখন এর মিসদাক কারা তা খোঁজ করুন। উভয় দলের কমপক্ষে চার-পাঁচজন ইমামের নাম জেনে দিন। তাঁদের মৃত্যু-সন খুঁজে বের করুন।

অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে জামালুদ্দীন কিফতীর إِنْبَاءُ الرُّوَاةِ فِي أَخْبَارِ النُّحَاةِ ও জালালুদ্দীন সুয়ূতী রহ.-এর بُغْيَةُ الوُعَاةِ فِي أَخْبَارِ اللُّغَوِيِّيْنَ والنُّحَاةِ-এর নামও জানতে পারবেন।

কোনো আলেম বা মুসান্নিফের নাম এলে কিংবা কোনো কিতাবের হাওয়ালা/উদ্ধৃতি এলে খোঁজ করা দরকার যে, এই বুযুর্গ কে? তিনি কোন্ যুগের মানুষ? আর তাঁর জীবনী কোথায় পাওয়া যাবে? কিতাব হলে তাঁর পূর্ণ নাম কী? মুসান্নিফের নাম ও সময়কাল এবং কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে নাকি মাখতূত [হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি] আকারে অপ্রকাশিত রয়েছে ইত্যাদি বিষয়গুলোও জানতে হবে। যেমন, কোথাও نفطويه নাম এল। জানতে হবে এর সঠিক উচ্চারণ কী, তিনি কোন্ যুগের? সিবওয়াইর আগের, নাকি পরের? অথবা ইবনুল আছীরের নাম এল যে, তিনি তাঁর তারীখে এমন লিখেছেন। তাহলে জানতে হবে তারীখ বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাবের নাম কী? জানা গেল কিতাবের নাম الكَامِلُ فِي التَّارِيخِ- এখন জানার বিষয় হলো, এই কিতাবটির নির্ভরযোগ্যতা কতটুকু? এরপর জানতে হবে جَامِعُ الأُصُوْلِ-এর লেখক ইবনুল আছীর আর المَثَلُ السَّائِرُ-এর লেখক ইবনুল আছীর একই ব্যক্তি নাকি দু'জন আলাদা? খোঁজ করে জানা গেল বড় ভাই মাজদুদ্দীন ইবনুল আছীর [৬০৬ হিজরী] جامِعُ الأُصُوْلِ ও النِّهَايَة-এর লেখক। ইযযুদ্দীন ইবনুল আছীর [৬৩০ হিজরী] الكَامِلُ ও اللُّبَاب-এর লেখক। আর নাসরুল্লাহ ইবনুল আছীর হলেন المَثَلُ السَّائِرُ-এর লেখক।

কোথাও المُحِيْط-এর উদ্ধৃতি এল। ফিক্হের কোনো কিতাব কিংবা ফিক্হী কোনো মাসআলায় এই উদ্ধৃতি পাওয়া গেলে তা হয়তো مُحِيْط السَّرَخْسِيِّ হবে, নতুবা المُحِيْط البُرْهَانِيُّ-

التَّجْرِيْد-এর উদ্ধৃতি এলে দেখতে হবে তা تَجْرِيدُ القُدُوْرِيِّ, নাকি التجريدُ الرُّكْنِيُّ? কোথাও الإمْدَاد-এর উদ্ধৃতি পাওয়া গেলে জানতে হবে, এটি কি إمْدَادُ الفَتَّاحِ, না অন্য কোনো কিতাব? কোথাও فَيْض-এর উদ্ধৃতি এলে জানতে হবে তা কি فَيْضُ البَارِيْ, না فَيْضُ المَوْلَى الكَرِيْم? যদি فَيْضُ البَارِيْ হয় তাহলে জানতে হবে তা শাহ ছাহেবের فَيْضُ البَارِيْ, নাকি সহীহ বুখারীর ফার্সী শরাহ فَيْضُ الباري?

এই নিবন্ধটি কেউ মনোযোগের সাথে পড়লে উল্লেখিত উদাহরণসমূহে যে বিষয়গুলো অস্পষ্ট রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে তার কৌতুহল জাগতে থাকবে এবং তার মনে বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক হতে থাকবে। এই প্রশ্নগুলো আলাদা খাতায় টুকে রাখতে হবে যেন সময়-সুযোগ মতো সমাধান বের করা সম্ভব হয়।

এখানে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, এসব বিষয়ে অপারগতার ক্ষেত্রে নিজের উস্তাদের কাছ থেকে সহযোগিতা নেয়ার অবকাশ আছে, কিন্তু তাঁদের কাছে সরাসরি জিজ্ঞাসা উচিত নয়। বরং নিজেই তা খুঁজে বের করবে। অপারগ হলে এতটুকু জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে, এ বিষয়টি আমি কোথায় খুঁজতে পারি?

আপনার মাদরাসার কুতুবখানায় যদি كَشْفُ الظُّنُوْنِ عَنْ أَسَامِي الكُتُبِ والفُنُوْنِ، إيْضَاحُ المَكْنُوْنِ فِي الذَّيْلِ عَلَى كَشْفِ الظُّنُوْنِ، هَدِيَّةُ العارِفِيْنَ فِي أَسْمَاءِ المُؤَلِّفِيْنَ কিতাব তিনটি একসঙ্গে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। مُعْجَمُ المُؤَلِّفِيْنَ لِعُمَر رِضَا كَحَّالَة، الأَعْلَامُ لِخَيْرِ الدِّينِ الزِّرِكْلِيِّ، تَتِمَّاتُ الأَعْلَامِ، الإعْلَامُ بِنَقْدِ أَوْهَامِ الأَعْلَامِ، المُسْتَدْرَكُ عَلَى مُعْجَمِ المُؤَلِّفِيْنَ ইত্যাদি এ বিষয়ের কিছু কিতাব থাকে, তাহলে তো আপনি ঘরে বসেই এসবের উত্তর নিজেই খুঁজে নিতে পারেন। অনেক অস্পষ্টতাই এখানে দূর হয়ে যাবে।

কৌতুহলী মুতালা'আর একটি অংশ এটাও যে, কিতাবে কোনো হাদীস হাওয়ালা ও হুকুম ছাড়া উল্লেখিত হলে তার হাওয়ালা খুঁজে বের করা ও সনদগত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা। মাদরাসার কুতুবখানায় যদি এর তাহকীক ও গবেষণার উপায়-উপকরণ বিদ্যমান না থাকে, তবে তা খাতায় লিখে রাখুন। যেন সুযোগ পেলেই তাহকীক করতে পারেন।

মোটকথা, মনে যদি কৌতুহল না থাকে তবে সকল বিষয় অস্পষ্টই থেকে যাবে।

৪. মুতালা'আর ক্ষেত্রে বিচক্ষণতার আরেকটি স্তর হলো, তালিবে ইলমের এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা যে, কিতাবের কোনো কথা আগের জানা বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক কি না। অথবা এ কিতাবেরই কোনো বয়ান বা এই মুসান্নিফের অন্য কিতাবের কোনো বয়ানের সাথে কিংবা অন্য মুসান্নিফের কোনো বয়ানের সাথে সাংঘর্ষিক হচ্ছে কি না? যদি সাংঘর্ষিক হয় তবে কি নিজের বুঝের দুর্বলতা বা ত্রুটির কারণে হয়েছে, না বাস্তবেই দু'টোর মধ্যে বিরোধ আছে? বাস্তবেই যদি বিরোধ থাকে তাহলে দেখতে হবে কোনটি সঠিক বা সঠিক হওয়ার অধিক নিকটবর্তী নাকি দু'টোই নিজ নিজ স্থানে ঠিক?

আর সকল অবস্থায় এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হবে যে, কোনো কথা مُسَلَّم [সর্বজনস্বীকৃত], إجماع [সর্বসম্মত] কিংবা بَدِيْهِي [সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত] বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক কি না? এমন সন্দেহ সৃষ্টি হলে তাৎক্ষণিতভাবে নিজ উস্তাদের শরণাপন্ন হয়ে সন্দেহ নিরসন করা উচিত। আর বাস্তবেই যদি অধ্যায়নাধীন কিতাবে ত্রুটি থাকে, তবে তা চিহ্নিত করে রাখা উচিত।

৫. বিচক্ষণতার আরেকটি দিক এই যে, লেখক যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ইস্তিফাদা শুধু ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ না রাখা; বরং কথার প্রাসঙ্গিকতায় বিক্ষিপ্ত বিভিন্ন ফায়দাও অর্জন করার চেষ্টা করা। যেমন আমি نُوْرُ الإِيْضَاحِ-এর ছাত্র। আমার উস্তাদ আমাকে مَرَاقِي الفَلَاحِ ও তার হাশিয়া [حَاشِيَةُ الطَّحْطَاوِيْ عَلَى المَرَاقِي] মুতালা'আ করার পরামর্শ দিয়েছেন। কুতুবে ফিক্‌হ ও এর মুসান্নিফীন সম্পর্কে আমার জানা

নেই। কে আগের আর কে পরের তা-ও আমি জানি না। এখন حاشيةُ الطَّحْطَاوِيِّ-এর এক জায়গায় পেয়েছি- فِي البَحْرِ عَنِ البَزَّازِيَّة তাহলে আমাকে লক্ষ রাখতে হবে, সামনে কোথাও দুই কিতাবের মুসান্নিফের নামও উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে কি না? নতুবা পৃথকভাবে তা জানার নিয়ত রাখব আর ধীরে ধীরে ইনশাআল্লাহ তা জানা হয়ে যাবে। আমি যদি চোখ-কান খোলা রেখে মুতালা'আর অভ্যাস গড়ে তুলি, তাহলে শুধু এই ইবারত থেকে আমি এ কথা সহজেই জানতে পারব যে, البَزَّازِيَّة কিতাবটি البَحْر-এর আগে লিখিত। এখানে তাহতাবী আমাকে বলেননি যে, البَحْر পরের কিতাব। কিন্তু তাঁর হাওয়ালার আন্দায [বর্ণনাভঙ্গি] থেকে বিষয়টি সহজেই জানা যায়। আর আমি যদি চোখ বন্ধ করে মুতালা'আ করি, তাহলে এ বিষয়টি না জেনেই সামনে অগ্রসর হতে থাকব।

তিনি যদি এভাবে হাওয়ালা দিতেন- ... وفِي البَحْرِ والبَزَّازِيَّة তাহলে আমি বিষয়টি জানতে পারতাম না।

অথবা কোথাও উল্লেখ হলো- وفي حاشية الدُّرَرِ للمؤلف - এ থেকে এই বিষয়টি জানব যে, শুরুনবুলালী রহ. دُرَر-এর উপরও একটি হাশিয়া লিখেছেন। এরপর যখন অন্য জায়গায় দেখব- ونَقَلَ المصنفُ فِي حاشية الدُّرِّ عن الزَّيْلَعِيِّ তখন জানব যে, যায়লায়ী রহ. মুসান্নিফের [শুরুনবুলালী] আগের যুগের মানুষ। বাকি থাকল এই কথা যে, যায়লায়ী কে? এবং সুনির্দিষ্টভাবে তিনি কোন্ যুগের মানুষ? তাহলে তা আমার খাতায় অন্যান্য সমাধানযোগ্য বিষয়গুলোর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। সামনে অগ্রসর হওয়ার আগে এই হাওয়ালার বিষয়ে আমার মাথায় এ প্রশ্ন জাগ্রত হওয়াও জরুরী যে, আমি তো সামনে-পিছনে কয়েক জায়গায় حاشيةُ الدُّرَرِ للمصنف শব্দটি দেখেছি। তাহলে এই حاشية الدُّرِّ কোন্ কিতাব? তবে কি তিনি الدُّرّ কিতাবেরও হাশিয়া লিখেছেন, না এটি মুদ্রণপ্রমাদ। যার সঠিক শব্দ হবে حاشيةُ الدُّرَرِ? তাহকীকের পর জানা যাবে যে, এটি আসলেই মুদ্রণপ্রমাদ। الدُّرّ অর্থাৎ الدُّرُّ المُخْتَارُ তো হলো আলাউদ্দীন হাছকাফী [১০৮৮ হিজরী]-এর কিতাব,

যিনি শুরুনবুলালী রহ.-এর পরের। তিনি এই কিতাবের হাশিয়া কীভাবে লিখবেন?

উদ্দেশ্য হলো, কিতাবের বর্ণনাভঙ্গি ও তাতে উত্থাপিত বিষয়গুলো একটু গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে মাকসূদে কালাম ছাড়াও আরো অনেক মা'লূমাত অর্জন করা যায়। কোনো বিচক্ষণ তালিবে ইলম এ সকল মা'লূমাত না জেনে সামনে অগ্রসর হতেই পারে না।

বিচক্ষণতার সাথে মুতালা'আ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিচক্ষণতার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য, প্রধান প্রকারসমূহ ও উপকারিতা এবং মনোযোগহীন মুতালা'আর অপকারিতা এক দীর্ঘ আলোচনার বিষয়। আজকের এই অবসরে সংক্ষেপে এ কয়েকটি কথাই পেশ করলাম।

আল্লাহ তা'আলা উস্তাযে মুহতারাম হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নুমানী রহ. [১৩৩৩ - ১৪২০ হি.]-এর প্রতি দয়া করুন। তাঁর নিকট যখন বলা হতো, হযরত! আলহামদুলিল্লাহ, অমুক কিতাবের মুতালা'আ শেষ হয়েছে, তখন কখনো তিনি মুবারকবাদ দিতেন, দু'আ দিতেন। কখনো বা সতর্কতার জন্য প্রশ্ন করতেন– پڑھا یا ہضم بھی کیا؟ শুধু পড়েছই, নাকি হজমও করেছ? আর বাস্তবেও হজম হওয়া ছাড়া খাদ্যের উপকারিতা পাওয়া যায় না। অধ্যয়নের বিষয়টিও তেমন। অধীত বিষয় ফলপ্রসূ তখনই হয়, যখন তা ভালোভাবে হজম হয়। হযরতের এ শিরোনাম থেকে এই শিক্ষাও পাওয়া যায় যে, যে জিনিস হজমযোগ্য নয় কিংবা আমার পক্ষে যা হজম করা সম্ভব নয়, তা আমার পড়া উচিত নয়।

শায়খ আবদুল ফাত্তাহ রহ.-এর একটি বিষয় আরজ করি। শায়খের সাধারণ নিয়ম এই ছিল যে, অধ্যয়নের সময় খুব লক্ষ রাখতেন, এমন কোনো তথ্য-ফায়েদা তো চলে যাচ্ছে না, যা আমার অমুক কিতাব বা অমুক প্রবন্ধে যোগ হতে পারে বা অমুক তাহকীকযোগ্য বিষয়ে বা অমুক রচনাযোগ্য কিতাবে কাজে আসবে। সাথে সাথে তা নোট করে নির্ধারিত স্থানে রেখে দিতেন। এটিও অন্বেষী-অধ্যয়নের এক গুরুত্বপূর্ণ রোকন।

[মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেবের বক্তব্য শেষ হয়েছে।]

৪. মনে রাখার চেষ্টা করা

লেখাপড়ার তিনটি পর্ব তুমি অতিক্রম করেছ–

- ✦ যে পরিচ্ছেদ পাঠ করবে তার পৃষ্ঠাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছ;
- ✦ পরিচ্ছেদ সংশ্লিষ্ট অনেক প্রশ্ন তৈরি করেছ;
- ✦ তারপর আন্তরিকতার সাথে ও সচেতনভাবে পাঠ করেছ।

তোমার কত কষ্ট লাগবে, মনে কত আঘাত পাবে, যদি দেখা গেল যে, এতো ঐকান্তিক চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের পরও যা পড়েছ, তার সবকিছু তোমার মনে নেই!

মনে রাখার অর্থ

এখানে মনে রাখার অর্থ মুখস্থ করা নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, বিষয়ের মূল বক্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যাগুলো নিজের মতো করে ব্যক্ত করতে পারার যোগ্যতা অর্জন করা। আর তা তখনই সম্ভব হবে, যখন তুমি প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শেষে এবং প্রতি দুই শিরোনামের মধ্যখানে থামবে। নিজকে নিজের পড়া শুনাবে এবং যা পড়েছ, তা নিজের মনে বসাবে।

নিজকে নিজের পড়া শোনানোর ব্যাখ্যা

নিজকে নিজের পড়া শোনানোর সময় তিনটি জিনিস তোমাকে যথাযথভাবে নির্ণয় করতে হবে–

১. কী কী স্মরণ আছে;

২. কী কী স্মরণ নেই;

৩. আর কোথায় কোথায় অস্পষ্টতা আছে।

তারপর

- ✦ যা স্মরণ আছে তা মনে বসাও;
- ✦ যা স্মরণ নেই তা আবার দেখো;
- ✦ আর যা অস্পষ্ট আছে তা স্পষ্ট করে নাও।

মনে রাখার মূলে রয়েছে মনোযোগ দান

কোনো বিষয় মনে না থাকার কথা বলে অযথা নিজের প্রতি বিরক্ত হবে না। যে কোনো বিষয়ই হোক, মনে রাখা সাধারণত মনোযোগ দান ও চিন্তার গভীরতার উপর নির্ভর করে। আমাদের অনেক কিছু মনে না থাকার অন্যতম কারণ হলো, পর্যাপ্ত মনোযোগের অভাব। আর মনোযোগ দেয়াও একটি ইচ্ছাধীন এবং চর্চার বিষয়। তো স্মৃতিশক্তিকে প্রখর করার জন্য গভীর মনোযোগ দেয়ার অভ্যাস গড়ে তুলবে।

শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. আলমুওয়াফ্ফাক আলমাক্কী রহ. ও আলকারদারী রহ.-এর مَنَاقِبُ الإمامِ أبي حنيفةَ কিতাবের[৬৫] উদ্ধৃতিতে قِيْمَةُ الزَّمَنِ عند العلماءِ কিতাবে[৬৬] উল্লেখ করেছেন, এক ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফা রহ. কে জিজ্ঞাসা করেছেন, ফিক্হ যেন মুখস্থ থাকে এর জন্য কিসের সাহায্য গ্রহণ করা যায়? তিনি উত্তরে বলেছেন, মনোযোগ নিবদ্ধকরণের। লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, মনোযোগ নিবদ্ধকরণের জন্য কিসের সাহায্য নেয়া যায়? তিনি বললেন, লোকজনের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জন করার। লোকটি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, সম্পর্ক বর্জন করার জন্য কিসের সাহায্য নেয়া যায়? তিনি বললেন, প্রয়োজন পরিমাণ সামগ্রী গ্রহণ করার তার চেয়ে বেশি গ্রহণ করো না।

শায়খ রহ. তাঁর উক্ত কিতাবে[৬৭] سِيَرُ أَعْلَامِ النُّبَلَاءِ কিতাবের[৬৮] উদ্ধৃতিতে লিখেছেন, ইমাম বুখারী রহ. বলেছেন, মুখস্থের জন্য ব্যক্তির আগ্রহ ও বারবার দেখার তুলনায় অধিক উপকারী কোনো জিনিস আমার জানা নেই।

কান টানলে মাথা আসে

কোনো তথ্য স্মরণ রাখার অন্যতম একটি কৌশল হলো 'কান টানলে মাথা আসে' নামক পদ্ধতি গ্রহণ করা। এর ব্যাখ্যা হলো, স্মৃতিতে গেঁথে আছে

---

৬৫. ১ ঃ ৩৫২ للمُوَفَّق المَكِّيّ ও ২ ঃ ৩৫০ للكَرْدَرِيّ

৬৬. পৃ. ১৮৬ কায়রোর দারুস সালামের প্রথম সংস্করণ, ১৪৩১ হি./২০১০ ঈ.।

৬৭. পৃ. ১৮৭

৬৮. ১২ ঃ ৪০৬

এমন কোনো পুরানো তথ্যের সাথে বিভিন্ন মিল-অমিলের দিকে লক্ষ করে নতুন তথ্যটি আটকে দিবে। উদাহরণস্বরূপ একজন আল্লাহওয়ালার সঙ্গে তোমার পরিচয় হয়েছে। তাঁর নাম ইবরাহিম খলিল। এই আল্লাহওয়ালা সেই ধর্মেরই কথা বলেন, যে ধর্মের কথা বলেছেন হযরত ইবরাহিম খলিল আলাইহিস সালাম। এ বিষয়টি তোমার জানা আছে। নামের ও বৈশিষ্ট্যের এই মিলের ভিত্তিতে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের নামের সাথে নতুন পরিচিত আল্লাহওয়ালার নামকে আটকে দিবে। কিছু সময় এই মিলের কথা মনে মনে চিন্তা করবে।

অথবা উদাহরণস্বরূপ হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.-এর মৃত্যুবরণ করেছেন ৭৪৮ হিজরীতে। এ তথ্যটি তোমার জানা আছে। পরে তুমি জানতে পারলে, হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ. মৃত্যুবরণ করেছেন ৭৫২ হিজরীতে। তথ্যদুটো খেয়াল করলেই তুমি স্মরণ রাখতে পারবে, হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ. হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী রহ.-এর ৪ বছর পর মৃত্যুবরণ করেছেন আর হাফেজ শামসুদ্দীন যাহাবী রহ. হাফেজ ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর ৪ বছর পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন। এরপর তুমি জানতে পারলে, ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ৮৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর ও ইবনুল কায়্যিম রহ.-এর মৃত্যু-সনটি খেয়াল করলে তুমি স্মরণ রাখতে পারবে, দু'জনের মৃত্যু-সনের মধ্যে শুধু সাত-আটের পার্থক্য। দু'জনের মৃত্যু-সনের মধ্যে পূর্ণ ১০০ বছরের ব্যবধান। তারপর কিছু সময় এই মিলের কথা মনে মনে চিন্তা করবে।

তো পুরানো তথ্যটি হচ্ছে কান, আর নতুন তথ্যটি হচ্ছে মাথা। যেভাবে কানের সাথে মাথা আটকে দিলে, কান টানলে মাথা আসে, অনুরূপভাবে পুরনো তথ্য স্মরণ করলে নতুন তথ্য স্মরণ হবে।[৬৯]

---

৬৯. মনোযোগ দেয়ার উদাহরণ দিতে গিয়ে এভাবেও বলা যায়, তুমি যখন দরসের পর তোমার কিতাব উঠিয়ে রাখবে, তখন কিতাব রাখাটাকে সচেতনভাবে অনুভব করবে। শুধু স্বভাবের তাড়নায় রাখবে না। কোথায় রেখেছ, ভালোভাবে খেয়াল করো। রুমে তোমার শেলফে রেখেছ, নাকি অন্য কোথাও? যেখানেই রেখেছ, স্থানটা ভালভাবে দেখো। সেখানে আরো কোনো কিতাব বা অন্য কিছু আছে কি-না? কিতাবটি সোজা করে রেখেছ, না

মনোযোগ দেয়ার বিভিন্ন দিক

বিভিন্নভাবে মনোযোগ দিতে হবে। যেমন কারো নাম স্মরণ রাখতে চাও। তো খেয়াল করো নামটি مُفْرَد [একক] না مُرَكَّب [যৌগিক]। 'মুহাম্মদ' মুফরাদ নাম, 'আবু বকর' মুরাক্কাব নাম। নামটি অনারবী না আরবী। 'ইবরাহিম' অনারবী নাম, আর 'খালেদ' আরবী নাম। নামটির উচ্চারণ সহজ না কঠিন। 'মদীনা'র উচ্চারণ সহজ, 'জিরির্‌রানা'র উচ্চারণ কঠিন। ব্যক্তিত্বের সাথে নামের মিল কতটুকু। যেমন একজনের নাম মুজাহিদ, তো তার মধ্যে জিহাদের প্রেরণা কেমন আছে। আর একজনের নাম ওয়ালীউল্লাহ, তো আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক কেমন।

আলাপকালে কারো কথা মনে না থাকার প্রধান কারণ হলো, তার কথার প্রতি মনোযোগী না হওয়া। হয়ত শ্রোতার মন অলসভাবে অন্যত্র বিচরণ করতে থাকে। অথবা সে নিজে যা বলতে চায়, তার প্রতিই তার মনোযোগ নিবদ্ধ থাকে। মনে রাখবে, 'ভালো শ্রোতার প্রভাব ভালো বক্তার তুলনায় বেশী হয়'।

আর মনোযোগ দেয়ার অভ্যাস করার জন্য এমন বিষয়ই নির্বাচন করবে, যা স্মরণ রাখার উপর তোমার লেখাপড়াসংশ্লিষ্ট কোনো কিছু নির্ভর করে।

পড়া মুখস্থ হওয়ার সহায়ক কিছু পরামর্শ

কেউ যদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে এবং সঠিক পদ্ধতিতে চেষ্টা অব্যাহত রাখে, তাহলে তার পড়া স্মরণ না থাকার কোনো কারণ নেই। শায়খ

বাঁকা করে? কিতাবটি অন্য কিছুর সাথে লেগে আছে না আলাদা আছে। সেখানে আলো আছে না অন্ধকার? আলো থাকলে তা কেমন আলো? অন্ধকার থাকলেও তা কেমন অন্ধকার? সেখানে তোমার ঠাণ্ডা লাগছে, না গরম লাগছে, না স্বাভাবিক অবস্থায় আছ? চোখ বন্ধ করে কল্পনায় কিতাবটি দেখো। হাত দিয়ে স্পর্শ করো। মোটকথা, সবগুলো ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করো। কারণ, কোন্ ইন্দ্রিয় পরবর্তীতে বিষয়টি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে, তা তুমি জান না। প্রথম দিকে এভাবে অনুভব করতে গেলে কিছু সময় ব্যয় হবে। কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে গেলে তা হবে কয়েক সেকেন্ডের কাজ।

আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. تهذيبُ التهذيبِ কিতাবের[৭০] উদ্ধৃতিতে قيمةُ الزَّمَنِ কিতাবে[৭১] লিখেছেন, "আলী বিন খাশরাম রহ. বলেছেন, আমি ওয়াকী বিন আলজার্‌রাহ রহ.-এর হাতে কখনো কোনো কিতাব দেখিনি। তিনি সব মুখস্থ রাখতেন। আমি তাঁকে মুখস্থ রাখার ঔষধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, গোনাহ বর্জন। মুখস্থ রাখার জন্য এর তুলনায় অধিক সহায়ক কোনো কিছু আমি পাইনি।" ৪৮৭ - ৪৮৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত 'পরবর্তী সংযোজন' শিরোনামের লেখাটি অবশ্যই পড়ে নিবে।

قِيْمَةُ الزَّمَنِ কিতাবের টীকায় শায়খের সুযোগ্য পুত্র সালমান আবু গুদ্দাহ সুনানে দারেমী[৭২] থেকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন– "যে ব্যক্তি কোনো বিষয় জানার পর ভুলে যায়, আমার ধারণায় তার এই ভুলে যাওয়াটা তার কোনো গোনাহের কারণেই হয়।"

তাছাড়া বিরতি দিয়ে দিয়ে পড়বে। অর্থ ও তাৎপর্য বুঝে পড়বে। মনোযোগের সাথে পড়বে। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বসবে। চেষ্টা করবে, পড়ার স্থানও যেন একই থাকে। মুখস্থ হওয়ার বিশ্বাসের সাথে পড়বে। সর্বোপরি আল্লাহর কাছে দু'আ করবে। পড়া মুখস্থ অবশ্যই হবে ইনশাআল্লাহ।

ডক্টর আবদুল মতীন এ বিষয়ে কিছু সুন্দর পরামর্শ দিয়েছেন–

ক. কেবল মনে মনে না পড়ে মাঝে মধ্যে শব্দ করে পড়লে পড়াশুনায় ক্লান্তি বা একঘেয়েমি দেরিতে আসে, মনে রাখারও সুবিধা হয়। এর ফলে উচ্চারণও স্পষ্ট হয়। [পড়ার দুটি পদ্ধতি– নিঃশব্দে পড়া এবং শব্দ করে পড়া। দুটিরই কিছু দোষ-গুণ আছে। সাধারণত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রায় সব সময় নিঃশব্দেই পড়ি। শব্দ করে পড়া ও আবৃত্তি করে পড়ার সুযোগও সব জায়গায় থাকে না। তৎসত্ত্বেও অন্তত শিক্ষার্থীদের কিছু সময় আবৃত্তি বা শব্দ করে পড়ার চেষ্টা করা উচিত।]

---

৭০. ১১ ঃ ১২৯
৭১. পৃ. ১৮৬
৭২. ১ ঃ ৩৭৯

খ. বানান, শব্দার্থ ও অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো মনে রাখার জন্য শেখার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো উচ্চারণ করা এবং লেখাও প্রয়োজন। একাধিক ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিখলে স্বাভাবিক নিয়মেই শেখা স্পষ্টতর ও দৃঢ়তর হয়। বানান অনেকটা সেরেফ কলম ও হাতের নড়াচড়ার ব্যাপার। লিখে বানান শিখলে শুদ্ধ বানান অংশতঃ কলমের ডগাতেই আশ্রয় লাভ করে।

গ. সেজন্য পড়ার টেবিলে নিজের সঙ্গে সব সময় কাগজ ও পেনসিল মজুদ রাখা উচিত।[৭৩]

স্মরণ রাখার কিছু সহজ উপায়

হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. এক প্রসঙ্গে স্মরণ রাখার কিছু সহজ উপায় উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন–

১. প্রথম কাজ হলো অলসতা ঝেড়ে মুখস্থ করার মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এজন্য মাঝে মাঝে বিষয়টির গুরুত্ব ও প্রয়োজন সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে এবং আইম্মায়ে হুফফাযের ঘটনাবলি ও আযকিয়ায়ে উম্মতের হালত-জীবনী পাঠ করতে হবে। সাথে সাথে নিজেকে বোঝাতে হবে যে, মুখস্থ করা আমার কাজ। কিন্তু মুখস্থ হওয়া ও মুখস্থ থাকা আমার দায়িত্ব নয়। কারণ, اَلسَّعْيُ مِنِّي وَالْإِتْمَامُ مِنَ اللهِ [চেষ্টা আমার কাজ, ফল দিবেন আল্লাহ]। অতএব আমি প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব। কবি বলেন, "হে প্রেমিক! প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ?! আসলে তুমি সাহস হারিয়েছ। হে পথিক! পদে পদে তোমার ঘটছে পদস্খলন?! আসলে তোমার পা-ই খোড়া, পথ বাঁকা নয়। বন্ধু! পথের কষ্টে ভয় পেয়ো না, সাহসে বুক বাঁধ। পথ কঠিন নয়, কঠিন হল পথচলা। কর্মই তোমাকে নিয়ে যাবে সমাপ্তির শিখরে। সূচনাই কঠিন, সমাপ্তি কঠিন নয়।"

---

৭৩. 'শিক্ষা সহায়িকা' পৃ. ৫

২. মুখস্থ করতে থাকা আমার কাজ। কতটুকু মুখস্থ হল, কত দিনে হল, তা আমার চিন্তার বিষয় নয়। আমি চেষ্টা করতে থাকব, আর বলতে থাকব–

وَأُفَوِّضُ أَمْرِيْ إِلَى اللهِ، إِنَّ اللهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ.

[অর্থ. আমি আমার বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করছি। অবশ্যই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন।]

৩. ভুলে যাওয়ার ভয়ে মুখস্থ না করা বোকামী। এ যেন ময়লা হওয়ার ভয়ে কাপড় না ধোয়া, অপিরষ্কার হওয়ার ভয়ে আঙ্গিনা পরিষ্কার না করা, আর ক্ষুধার ভয়ে আহার না করা। কবি বলেন– لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَابِ [মৃত্যুর জন্য জন্ম লাভ করো এবং ধ্বংসের জন্য নির্মাণ করো।]

আমি বলি, ভোলার জন্যই মুখস্থ করুন এবং ভুলতে থাকুন। কত ভুলবেন? এ বিষয়ে কামাল হাসিল করা নিশ্চয়ই আপনার কম নয়!!

কারো মনে হতে পারে যে, ভুলে যাওয়া গোনাহ। অতএব, মুখস্থ করে গোনাহর ঝুঁকি সেধে নেয়ার দরকার কী? আসলে ভুলে যাওয়া নয়, অবহেলা ও চর্চাহীনতার কারণে ভুলে যাওয়া গোনাহ। তাই কেউ যদি মুখস্থ করার পর চর্চা ও অনুশীলন অব্যাহত রাখে, তাহলে ভুলে যাওয়ার গোনাহ থেকে [কুরআন মজীদের ক্ষেত্রে] এবং ভুলে যাওয়ার বে-বরকতি থেকে [কুরআন ও গায়রে কুরআন সবকিছুর ক্ষেত্রে] আল্লাহর তা'আলা তাকে হেফাযত করবেন।

৪. একটি সহজ সত্য এই যে, আগ্রহের বিষয় ভোলা যায় না। কবিতা প্রসঙ্গে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. একবার বলেছিলেন– 'যে কবিতা ভালো লাগে তা মুখস্থ হয়ে যায়।' কাজেই যা মুখস্থ করতে চান, অন্তরে তার মহব্বত বাড়ান। মনে রাখবেন, হৃদয়ে যদি ভালবাসা জাগে, বক্ষে ধারণ সহজ হয়ে যায়।[৭৪]

---

[৭৪]. মাসিক 'আলকাউসার', সফর ১৪৩২ হি./জানুয়ারী ২০১১ ঈ।

প্রকৃত তালিবে ইলমের উচিত সর্বাত্মক চেষ্টায় সার্বক্ষণিক নিরত রাখা। 'আপবীতি'তে আছে, জনৈক কবি বলেছেন–

"দেখা তাঁর পাই বা না পাই
খোঁজ আমি করেই যাব,
প্রাপ্তি কিছু হোক বা না হোক
আশা আমি করেই যাব।
মনের যত গোপন কথা
প্রিয়ার সনে বলেই যাব,
শুনুক বা সে না-ই শুনুক
নিজের গান গেয়েই যাব।"

যদি চেষ্টা-মেহনত এভাবে চলতে থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলার অপার ও অসীম রহমতের ব্যাপারে তো এই আশা যে, তিনি এমন ব্যক্তিকে রিক্তহস্তে ফিরিয়ে দিবেন না।[৭৫] আর ১৭২ - ১৭৩ নং পৃষ্ঠায় কুরআন পাকের প্রত্যেক পৃষ্ঠা ১০০ বার পড়ার ঘটনাটি পুনরায় পড়ো।

আরেকটি কথা, খেতে যে পরিমাণ সময় ব্যয় হয়, হজম করতে তার তুলনায় অনেক বেশী সময় ব্যয় হয়। জ্ঞানার্জনও খাবার খাওয়ার মতো। হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

শোনো, 'ভুলে যাওয়া' মানুষের একটা স্বভাব। ভুলে যাওয়ার তরবারি পঠিত বিষয়াদির উপর কোষমুক্ত থাকে। ভুলে যাওয়ার আপদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করার জন্যে এবং তার ধ্বংসাত্মক সক্রিয় প্রভাব প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তোমাকে আরেকটি কাজ করতে হবে। তার নাম 'পুনারাবৃত্তি'।

---

[৭৫]. 'আপবীতি' ২ ঃ ৪৪২

৫. পুনরাবৃত্তি

পুনরাবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা

হয়তো বলবে- পৃষ্ঠা উল্টানো, প্রশ্ন করা, পাঠ করা ও মনে রাখার চেষ্টা করা– এতো সব কিছু করার পরও কি পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে? শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হলো, যতদিন পর্যন্ত ভুলে যাওয়ার আপদ থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পুনরাবৃত্তির কোনো বিকল্প নেই। ভুলে যাওয়ার আপদ দূর করার জন্য পুনরাবৃত্তি করতে হবেই। পড়া আয়ত্ত করার জন্য পুনরাবৃত্তি ছাড়া কোনো উপায় নেই।

এখন প্রশ্ন হলো, পুনরাবৃত্তি কখন করবে এবং কীভাবে করবে?

পুনরাবৃত্তির সময়

অধিকাংশ শিক্ষার্থী পুনরাবৃত্তিকে পরীক্ষার প্রস্তুতির সময়ের জন্য মুলতবি করে রাখে। এদেরকে বলবো, পরীক্ষার পূর্ববর্তী দিনগুলো হলো সর্বশেষ পুনরাবৃত্তির সময়। সেই দিনগুলো প্রথম পুনরাবৃত্তির সময় নয়। কিতাবের একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় অথবা একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত করার পরবর্তী সময়টি হলো প্রথম পুনরাবৃত্তির উপযুক্ত সময়।

পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি

তো পুনরাবৃত্তি কখন করবে, তা শুনেছ। এখন শোন, পুনরাবৃত্তি কীভাবে করবে? পুনরাবৃত্তি মূলত এতক্ষণ উল্লেখিত চার পর্বের সমষ্টির নাম। অতএব, তোমাকে আবার পৃষ্ঠা উল্টানো, প্রশ্ন করা, পাঠ করা ও মনে রাখার চেষ্টা করা– এই কাজগুলো করতে হবে। তবে কাজগুলো এখন তোমার এমন এক পর্যায়ে এসে করা হচ্ছে যখন পুরো বই বা পরিচ্ছেদ তুমি পড়েছ এবং অনুধাবন করেছ। মূল বক্তব্যগুলোকে দ্বিতীয় স্তরের বক্তব্যগুলো থেকে পৃথক করেছ। এমন এক কিতাব ও বইয়ে পর্বগুলো সম্পাদন করবে, যার পাশের ফাঁকা জায়গায় বক্তব্যগুলোর প্রতি ইঙ্গিতমূলক অনেক ছোট ছোট

বাক্য বা শব্দ লেখা আছে। কিতাব ও বইয়ের মূল পাঠে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি ইঙ্গিতবহ বিভিন্ন রেখা টানা আছে। পড়া সুবিন্যস্ত রাখার সহায়ক নম্বর ও হরফসমূহ দ্বারা কিতাব ও বইয়ের পাশের ফাঁকা জায়গায় অনেক চিহ্ন দেয়া আছে।

এই পুনরাবৃত্তিতে তোমার সময় ও শ্রম বেশী ব্যয় হবে না। কারণ, পড়াগুলো তোমার এখনও তাজা আছে। এখনও ভুলে যাওয়ার আপদ তোমার উপর আপতিত হয়নি।

এই পুনরাবৃত্তির পদ্ধতি হলো, আলোচনাগুলোকে তুমি এখন দেখবে একটি বড় সমগ্ররূপে। প্রথম চার পর্বে সেগুলো দেখেছ খণ্ডিতরূপে।

এই পুনরাবৃত্তির ফলে কিতাবের বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করতে তুমি সক্ষম হবে। কিতাবের নির্যাস ও সারাংশ তুলে ধরতে সমর্থ হবে। যেসব পড়া স্মরণ রাখতে হবে এবং মনে বসাতে হবে, এই পুনরাবৃত্তির সময় সেগুলো স্মরণ করবে এবং মনে বসাবে।

শোনো, এই পুনরাবৃত্তির পর পরীক্ষার পূর্ববর্তী পুনরাবৃত্তির আগে আরেকবার পুনরাবৃত্তি করলে তা তোমার জন্য খুবই উপকারী হবে। তাহলে তথ্যগুলো মনে জীবন্ত থাকবে। তখন তুমি লেখাপড়ার পথচলা অব্যাহত রাখার তাওফীক লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। আমাদের আকাবিরগণ তিনবার নয়, একটি কিতাব বহুবার পুনরাবৃত্তি করতেন। 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ১৭১ - ১৭৩ পৃষ্ঠায় এ ধরনের কিছু উদাহরণ উল্লেখ করা হয়েছে।

দরসের লেখাপড়ার স্তরসমূহ ও উন্মুক্ত লেখাপড়ার পর্বসমূহের আলোচনা শোনার পর এখন আমরা পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট জরুরি কিছু আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

পরীক্ষার্থীদের জন্য আটটি উপদেশ

শায়খ আলী তানতাবী রহ. তাঁর مَعَ النَّاسِ কিতাবে[৭৬] إلى الطُّلَّابِ শিরোনামে পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। বাংলাভাষায় অনুবাদ করে তাঁর পুরো প্রবন্ধটি এখানে তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন–

কয়েকদিন হলো মাগরিবের কিছুক্ষণ পূর্বে আমার এক বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তাঁর পুত্র আমাকে সালাম করল। তখন তার চেহারা ছিল ফ্যাকাশে। চেহারায় দুর্বলতার ছাপ স্পষ্ট।

জিজ্ঞাসা করলাম, ভালো আছো তো?

তার পিতা উত্তরে বললেন, না, কোনো সমস্যা নেই। ঘুমিয়ে ছিল তো। তাই এমন দেখাচ্ছে।

আমি বললাম, অসময়ে ঘুমাবে কেন?

তিনি বললেন, যেন রাত্রিজাগরণ করতে পারে। সে প্রতি রাতে দু'টো পর্যন্ত জাগ্রত থাকে।

আমি বললাম, কেন?

তিনি বললেন, যেন পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

আমি বললাম, আল্লাহ পানাহ! এ তো পরীক্ষায় ফেল করার সহজতম পথ। আমি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর পড়াশোনার অসংখ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছি। কোনো পরীক্ষায় ফেল করিনি। বরং সকল পরীক্ষায় আমি কৃতকার্য ও অগ্রবর্তীদের মধ্যে থাকতাম। পরীক্ষার জন্য আমি এক ঘণ্টাও অতিরিক্ত জাগ্রত থাকিনি। আমি বরং পরীক্ষার দিনগুলোতে অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশি ঘুমাতাম।

ছেলেটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, বেশি ঘুমাতেন?

আমি বললাম, হ্যাঁ, এ ছাড়া আর কী? পরীক্ষা একটি প্রতিযোগিতা। তুমি কি কোনো ক্রীড়াবিদ বা মুষ্ঠিযোদ্ধা বা কুস্তিগীরকে প্রতিযোগিতার

---

[৭৬]. পৃ. ১৫৩ - ১৫৯, অষ্টম সংস্করণ, ২০১১ ঈ.।

রাতগুলোকে জাগ্রত থেকে নিজের দেহকে দুর্বল করতে দেখেছ? নাকি শক্তিশালী ও উদ্যমী অবস্থায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য পানাহার ও বিশ্রাম করতে দেখ?

১. পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি আমার সর্বপ্রথম উপদেশ হলো, ভালো খাবার গ্রহণ করা এবং আট ঘণ্টা ঘুমানো।

সে বলল, সময় কোথায়?

আমি বললাম, অনেক সময়। বিশ্রাম গ্রহণ করে উদ্যমের সাথে এক ঘণ্টা পড়া ক্লান্ত ও তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় চার ঘণ্টা পড়ার তুলনায় অধিক ফলদায়ক। তোমার ধারণা হবে পাঠ মুখস্থ করে ফেলেছ, অথচ বাস্তবে মুখস্থ হয়নি।

২. সে বলল, এই যদি হয় আপনার প্রথম উপদেশ তাহলে আপনার দ্বিতীয় উপদেশ কী?

আমি বললাম, প্রথমে নিজকে চিনো, তারপর কীভাবে পড়বে তা জানো।

কতক ছাত্র শিক্ষক থেকে পাঠ শ্রবণ করে, তারপর তা ভুলে যায়। পরে যখন নিজে নিজে পড়ে, তখন তার মনে গেঁথে যায়।

আর কতক ছাত্র নিজে নিজে পড়ে, তারপর তা ভুলে যায়। পরে যখন অন্যের মুখ থেকে শোনো, তখন তার মনে গেঁথে যায়।

অর্থাৎ কতক ছাত্র আছে 'দৃষ্টিসম্পন্ন', কিতাবের পৃষ্ঠা ও উক্ত পৃষ্ঠায় বিষয়টি যে স্থানে উল্লেখ হয়েছে তা পরীক্ষার হলে তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আর কতক ছাত্র আছে 'শ্রবণসম্পন্ন', শিক্ষকের আওয়াজ তার কানে বাজতে থাকে।

অতএব তুমি যদি 'দৃষ্টিসম্পন্ন' হয়ে থাক, তাহলে একা একা পড়ো। পক্ষান্তরে তুমি যদি 'শ্রবণসম্পন্ন' হয়ে থাক, তাহলে তোমার মতো একজন সহপাঠীর সাথে পড়ো। তোমাকে পড়ে শোনাতে তাকে অনুরোধ করো।

সে বলল, আমি 'দৃষ্টিসম্পন্ন' নাকি 'শ্রবণসম্পন্ন' তা কীভাবে জানব?

আমি বললাম, আমি এমন দশটি শব্দ লিখব যেগুলোর মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নেই। (যেমন- বই, মিনার, সতের, হারুনুর রশীদ ... তারপর শব্দগুলোকে মাত্র একবার পড়ে শোনাব। সেগুলোর মধ্য থেকে

যা তোমার স্মরণ থাকে, তুমি সেগুলো লিখবে। এরপর আবার এমন দশটি শব্দ লিখব এবং তোমাকে একবার সেগুলো দেখাব। সেগুলোর মধ্য থেকে যা তোমার স্মরণ থাকে, তুমি সেগুলো লিখবে। শোনা দ্বারা তোমার যদি বেশি শব্দ স্মরণ থাকে, তাহলে তুমি 'শ্রবণসম্পন্ন'। অন্যথায় তুমি 'দৃষ্টিসম্পন্ন'।

৩. সে বলল, আপনার তৃতীয় উপদেশ কী?

আমি বললাম, পাঠসমূহের বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ রেখে নিজের জন্য একটি রুটিন তৈরি করবে। উদাহরণস্বরূপ অংক বা বীজগণিত পড়ে ক্লান্ত হয়ে গেলে ইতিহাস বা সাহিত্য পড়বে। তাহলে প্রথমটির কারণে ক্লান্ত হয়ে পড়লে দ্বিতীয়টি তোমার বিশ্রামের কাজ দেবে।

আমার ধারণা অনুসারে পড়ার সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো, প্রথমে পুরো কিতাবটি একবার দ্রুত পড়ে নিবে। তারপর কিতাবের এক এক পরিচ্ছেদ বুঝে বুঝে পড়বে। নিজে নিজে পড়ার সময় অবশ্যই তোমার হাতে পেন্সিল রাখবে। গুরুত্বপূর্ণ বাক্যের নিচে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিবে। অপ্রয়োজনীয় ব্যাখ্যার উপর হালকা দাগ দিবে। আর সমন্বিত অনুচ্ছেদের দিকে তীর চিহ্ন দিয়ে ইঙ্গিত করবে।

তারপর আসে পুনরাবৃত্তির পর্ব। কিতাবটি হাতে নিয়ে নির্জন পথে হাঁটতে থাকো। এক একটি করে কিতাবের সবক'টি বিষয় স্মরণে আনতে চেষ্টা করো। কল্পনা করো, তুমি এখন পরীক্ষার হলে, আর এ প্রশ্নের উত্তর তোমার কাছে চাওয়া হয়েছে। যদি বুঝতে পার উত্তর তোমার স্মরণে আছে, তাহলে সামনে অগ্রসর হও। অন্যথায় কিতাব খুলে শুধু দাগ দেয়া বাক্য ও অনুচ্ছেদগুলো আবার পড়ো। তাহলে ভুলে যাওয়া বিষয়গুলো স্মরণে আসবে। আর যদি দেখ, বিষয়টি তোমার কিছুই স্মরণে আসছে না, তাহলে পুরো পরিচ্ছেদটি পুনরায় পড়ো।

৪. ভয় পেয়োনা। পরীক্ষাভীতি নির্বুদ্ধিতা, ত্রুটি ও ভীরুতার কারণে হয় না। পরীক্ষাভীতির উৎস মাত্র একটা জিনিস– কতক শিক্ষার্থী ভাবে, কিতাব দীর্ঘ আর সময় কম। তারা পুরো কিতাব অল্প সময়ে পড়ে শেষ করতে চায়। যখন দেখে যে, তা সম্ভব হচ্ছে না, তখন তাদের মধ্যে এই আতঙ্ক কাজ করে যে, পরীক্ষা সন্নিকটে অথচ পড়া মুখস্থ করা পুরো হয়নি।

তাদের উদাহরণ হলো ঐ ব্যক্তির মতো যে পায়ে হেঁটে 'মিয্যা'[৭৭] থেকে বিমান ধরার জন্য বিমানবন্দরে যেতে চায় অথচ তার হাতে সময় আছে মাত্র দু' ঘন্টা। সে নিজকে বলে, আমি কীভাবে পৌঁছাব? অথবা সে পাগলের মতো দৌড়ে ক্লান্ত হয়ে এক পর্যায়ে মাটিতে পড়ে যায়, সে কখনো পৌঁছাতে পারবে না। পক্ষান্তরে সে যদি সময় ও পায়ের কদম ভাগ করে এবং নিজকে বলে, প্রতি মিনিটে আমার মাত্র একশ' কদম হাঁটতে হবে, তারপর এই পরিকল্পনা অনুসারে নিশ্চিন্তে হাঁটে, তাহলে 'মিয্যা' থেকে বিমানবন্দরে দু' ঘন্টায় অবশ্যই পৌঁছাতে পারবে এবং নিরাপদে পৌঁছাতে পারবে।

৫. কতক শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলের সামনে দাঁড়িয়ে কিতাবের সবগুলো বিষয় মস্তিষ্কে উপস্থিত করতে চেষ্টা করে। যখন দেখে যে, সবগুলো বিষয় স্মরণে আসছে না তখন ধরে নেয়, তার পাঠ মুখস্থ হয়নি। তখন অস্থির ও উৎকণ্ঠিত হয় এবং ঘাবড়ে যায়।[৭৮] অথচ জানলেও সবগুলো বিষয় একসঙ্গে স্মরণ করা অসম্ভব।

তোমার কত বন্ধুর নাম তুমি জান! কিন্তু তুমি কি এক মুহূর্তে সকলের নাম ধারাবাহিকভাবে বলতে পারবে? না, কখনো না। কিন্তু যদি সে তোমার সামনে দিয়ে অতিক্রম করে, কিংবা তোমার সামনে তার বিবরণ দেয়া হয়, তাহলে তার নাম তোমার স্মরণে আসবে। সুতরাং এ মুহূর্তে স্মরণ না থাকার অর্থ এই নয় যে, তা তোমার স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে।

৬. কোনো পাঠ পড়া শেষ করার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিবে অথবা দূরবর্তী কোনো বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবে, তাহলে অবশ্যই তা তোমার মনে গেঁথে যাবে। কোনো কোনো ছাত্র পাঠ একবার পড়ার পর পুনরায়

---

৭৭. সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের একটি স্থানের নাম। 'আসমাউর রিজালে'র কিতাব تهذيبُ الكمالِ-এর লেখক হাফেয আবুল হাজ্জাজ মিয্যী রহ. এখানেই জন্মগ্রহণ করেন।

৭৮. আমার এক ছাত্র মাওলানা আমানুল্লাহ আব্দুল আজিজ [কিশোরগঞ্জ] লিখেছে, কোনো কোনো ছাত্র পরীক্ষার হলে প্রবেশ করার পর প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এমন করে থাকে।

পড়ে, এভাবে কয়েকবার পড়ে, সে মনে করে, এটি উত্তম পদ্ধতি, অথচ কাজটা হয়েছে ঐ ব্যক্তির মতো যে ক্যামেরার মাধ্যমে কোনো ছবি তুলে, তারপর ফিল্ম না ঘুরিয়েই দ্বিতীয়বার ছবি তুলে, তাহলে হবে কী? এটাই হবে যে, উভয় ছবি নষ্ট হবে।

৭. পরীক্ষার রাতে বিশ্রাম নিবে। কিতাবের পড়া রেখে দিয়ে কোনো হাল্কা গল্পে চোখ বুলাবে। কিংবা তোমার পরিবার বা বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ করবে। কিংবা এমন কোনো কিছু উপভোগ করবে যা তোমাকে পরীক্ষার চিন্তা থেকে বিরত রাখবে। সম্ভব হলে পরীক্ষার রাতে ৯ ঘন্টা বা ১০ ঘন্টা ঘুমাবে। এই আশঙ্কা করবেনা যে, জ্ঞাত বিষয়গুলো তোমার মাথা থেকে হারিয়ে যাবে। কারণ স্মৃতিশক্তির বিষয়টি বিস্ময়কর। বিশেষত যারা যৌবনের শুরুভাগে থাকে। শৈশবে স্মৃতিতে যা অঙ্কন করা হয় তা ভুলা যায় না। গত রাতে আমি কী খেয়েছি তা ভুলে যাই। কিন্তু ৪০/৪৫ বছর পূর্বে যা ঘটেছিল তা স্মরণ থাকে। এখনো যেন তা দেখছি।

৮. জেনে রেখো পরীক্ষা একটি মানদণ্ড। সাধারণত সঠিক ফলাফল দেয়। কখনো কখনো ভুলও করে। উত্তরপত্র নিরীক্ষণকারী একজন মানুষ। তিনি যখন স্বস্তি অনুভব করেন, উত্তরপত্র গভীরভাবে দেখেন। ক্লান্ত হলে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখেন না। তিনি যেমন উদ্যমী থাকেন, তদ্রূপ ক্লান্তও হন। নির্ভুল যেমন করেন, তেমনি ভুলও করেন। আরাম ও ক্লান্তি এবং সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির অবস্থার পরিবর্তনের কারণে একই রকম দুই খাতায় তাঁর রায় দুই রকম হয়ে যায়।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ-কর্তৃপক্ষ একবার একজন নিরীক্ষণকারীকে পরীক্ষা করেছেন। তাঁরা তাঁকে কিছু খাতা দিয়েছেন। তিনি নিরীক্ষণ শেষে সেগুলোতে নম্বর যুক্ত করেছেন। তাঁরা নম্বরগুলো মুছে খাতাগুলো তাঁকে পুনরায় দিয়েছেন। দেখা গেল তিনি রায় পরিবর্তন করছেন। দু'বারে একশ'র মধ্যে বিশটিরও বেশি উত্তরপত্রে তাঁর নম্বর ভিন্ন হয়েছে।

পরীক্ষা-কর্তৃপক্ষ একবার একজন পরীক্ষককে এমন উত্তর লেখার দায়িত্ব দিয়েছেন যা লিখলে পরীক্ষার্থী পূর্ণ নম্বর লাভের যোগ্য হবে। তাঁরা তাঁর লেখা উত্তরটিতে অতি সামান্য পরিবর্তন আনেন। তারপর ভিন্ন হস্তাক্ষরে লিখে অন্য কিছু খাতার সঙ্গে নিরীক্ষণ করার জন্য তাঁর নিকট পেশ করেন। দেখা গেল তিনি উক্ত খাতায় মধ্যম স্তরের চেয়েও কম নম্বর দিলেন।

খাতা নিরীক্ষণকারীর হাতে স্বর্ণের মানদণ্ড নেই। কখনো তিনি একশ' নম্বরের প্রশ্নে ষাট ও সত্তরের মধ্যে দ্বিধায় থাকেন। ষাট দিবেন না সত্তর দিবেন। কখনো এই দশ নম্বরের উপর পরীক্ষার্থীর পাস-ফেল নির্ভর করে।

খাতা কখনো একজন কঠোর মেযাজের নিরীক্ষণকারীর হাতে আসে। তিনি তা ফেল করিয়ে দেন। কখনো সহজ মেযাজের নিরীক্ষণকারীর হাতে আসে। তিনি তা চালিয়ে দেন।

তাহলে এখন পরীক্ষার্থী হিসেবে তোমার করণীয় কী?

হাঁ, তোমার করণীয় হলো তোমার হস্তলিপি স্পষ্ট করা। কেননা অসুন্দর হস্তাক্ষর ও অস্পষ্ট লেখা অনেক সময় নিরীক্ষণকারীর ক্রোধ ও ঘৃণা উদ্রেক করে। ফলে খাতায় তাঁর রায় মন্দ হয় এবং তিনি পরীক্ষার্থীকে ফেল করিয়ে দেন। তাছাড়া বেশী বেশী শিরোনাম দিয়ে লিখবে। অনুচ্ছেদগুলো পৃথক পৃথক ও ভাগ ভাগ করে লিখবে। অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিক কিছু লেখা থেকে বিরত থাকবে। কখনো শিক্ষার্থী উত্তরপত্রে প্রসঙ্গত এমন বিষয় লেখে যা প্রশ্নে চাওয়া হয়নি। এর মাধ্যমে সে তার জ্ঞান প্রকাশ করতে চায়। পরে এমন ভুল করে বসে যার মধ্যে তার অজ্ঞতা ফুটে উঠে। আর তা তার ফেল করার কারণ হয়।

এ-ই হলো তোমার করণীয়। পরীক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এটিই তোমার কর্তব্য। মানুষের কাজ হলো চেষ্টা ও কাজ করে যাওয়া। কিন্তু ফলাফল সবসময় চেষ্টা ও কাজের উপর নির্ভরশীল নয়।

দু'জন ব্যক্তি অসুস্থ হয়। দু'জন একই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয় এবং একই চিকিৎসা গ্রহণ করে। হাসপাতালে একই কামরায় থাকে এবং উভয়ের আচরণও একই রকম হয়। তারপর একজন মৃত্যুবরণ করে অন্যজন সুস্থ হয়ে উঠে। কেন এমন হয়? আল্লাহর হুকুমে এমন হয়।

দু'জন ব্যক্তি দুটি দোকান খুলেন। একই ধরনের পণ্য দোকানে রাখেন। একই পদ্ধতিতে ব্যবসা করেন। একজন এমন এক বিক্রি করেন যে, এক বিক্রিতেই তিনি বড় বড় ধনীদের একজন হয়ে যান। আর অন্যজন আপনাবস্থায় স্থির থাকেন। কেন এমন হয়? আল্লাহর হুকুমে এমন হয়।

আমি চেষ্টা না করার কথা বলছি না। চেষ্টা করা অবশ্যই কাম্য। শিক্ষার্থীর পুরো কিতাব পড়তে হবে। এমনকি সেই হাশিয়াও পড়তে হবে অন্যরা যাকে গুরুত্ব দেয় না। কারণ কখনো এমন স্থান থেকেও পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে।

সব কিছুর পর আল্লাহর দিকে ধাবিত হবে। আল্লাহর নিকট সাফল্য ভিক্ষা চাইবে। এটি সর্বশেষ উপদেশ হলেও সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। অতএব হে শিক্ষার্থী! তুমি যখন তোমার প্রস্তুতি পূর্ণ করবে এবং তোমার সাধ্যের সবকিছু করবে, তখন আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ করে বলবে– হে আল্লাহ! আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। কিছু বিষয় আছে যেগুলো আমি করতে অক্ষম। একমাত্র তুমিই তা করতে সক্ষম। অতএব তুমি তোমার কুদরতে আমাকে সাফল্য দান করো। আমার উত্তরপত্র কোনো কঠোর নিরীক্ষণকারীর হাতে দিয়ো না যিনি সদয় হবেন না ও কোমল আচরণ করবেন না। অনুরূপভাবে কোনো অমনোযোগীর হাতে দিয়ো না যে সূক্ষ্মভাবে যাচাই করবে না। তদ্রূপ দিয়ো না কোনো উপহাসকারী কিংবা ক্লান্তের হাতে যে সঠিক বিচার করবে না।

এসবের পূর্বে লক্ষ করো, তুমি যদি তোমার আচরণে ও কাজ-কর্মে কোনো গোনাহে লিপ্ত থাক, তাহলে গোনাহ থেকে তাওবা করো। হে ছাত্রী! তুমি যদি তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ ও স্বভাব-চরিত্রে কোনো পাপাচারে লিপ্ত থাক এবং শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করে থাক, তাহলে তা থেকে ফিরে আসো। আল্লাহর হকের ব্যাপারে যদি তোমাদের কোনো ত্রুটি ও অবহেলা থাকে, তবে তা বর্জন করো। অবশ্যপালনীয় কর্তব্যসমূহ পালন করো, হারাম থেকে বিরত থাকো। এটাই সফলতার পথ।

এই ব্যবস্থাপনা আমার পক্ষ থেকে নয়। এটি ইমাম শাফেয়ী রহ.-এর উস্তাদ ইমাম ওয়াকী রহ.-এর ব্যবস্থাপনা। ইমাম শাফেয়ী রহ. বলেছেন–[৭৯]

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعٍ سُوْءَ حِفْظِي فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ المَعَاصِي

وقال بِأَنَّ هذا العلمَ نُوْرٌ ونُوْرُ اللهِ لا يُهْدَى لِعَاصِي

অর্থ. আমি ওয়াকীর নিকট আমার মুখস্থশক্তির দুর্বলতার অভিযোগ করলাম। তখন তিনি আমাকে গোনাহ বর্জন করার পরামর্শ দিয়ে বললেন, এই ইলম হলো নূর। আর কোনো গোনাহগারকে আল্লাহর নূরের পথ প্রদর্শন করা হয় না।

[শায়খ আলী তানতাবী রহ.-এর আলোচনা শেষ হয়েছে।]

---

৭৯. ৫২ নং পৃষ্ঠার আরবী টীকাটি দ্রষ্টব্য।

পরীক্ষা একটি মজার খেলা

পরীক্ষা শিক্ষার্থীর যোগ্যতা প্রমাণ করার অন্যতম সুযোগ

অনেকে পরীক্ষাকে বিপদ মনে করে। অথচ পরীক্ষা হলো নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার এবং প্রতিভা প্রকাশ করার একটি চমৎকার সুযোগ। كَيْفَ تَعَلَّمُ الْإِنْشَاءَ কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের পাদটীকায় এক স্থানে লেখা হয়েছে– "পরীক্ষা না থাকলে নিজের যোগ্যতাকে প্রমাণ করে উপরে ওঠার পথ পেতে না। অতএব পরীক্ষাকে মজার খেলা হিসেবে গ্রহণ করো।" অবশ্য পরীক্ষা সেসকল শিক্ষার্থীর জন্য বিপদই, যারা বিগত দিনগুলোতে লেখাপড়ার ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

কারা পরীক্ষার জন্য অধীর অপেক্ষমান থাকে?

যেসকল শিক্ষার্থী যথানিয়মে লেখাপড়া করে, তাদের জন্য পরীক্ষা বিপদ হওয়া দূরের কথা, তারা বরং পরীক্ষার জন্য অধীর অপেক্ষমান থাকে। যারা রুটিন তৈরি করে, তারপর দরসের প্রস্তুতির স্তর থেকে শুরু করে আয়ত্ত করার স্তর পর্যন্ত দরসের সবকটি স্তর যথানিয়মে সমাপ্ত করে এবং কুদৃষ্টি, কুকল্পনা ও কুসম্পর্কসহ সকল গোনাহ থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করে, তাদের জন্য পরীক্ষার দিনগুলো কৃষকের সেসকল দিনের মতো, যে দিনগুলো কৃষক চাষাবাদ ও কয়েক মাসের পরিচর্যায় অবিরাম কষ্ট করার পর ফসল কাটার মৌসুমে অতিবাহিত করেন।

পরীক্ষাভীতি শরীরের উপরও ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে

পরীক্ষার কথা শুনলেই কেউ কেউ ঘাবড়ে যায়। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। এই পরীক্ষাভীতি থেকে মুক্ত থাকা অত্যন্ত জরুরী। কারণ, পরীক্ষাভীতি একটা মানসিক সমস্যা হলেও শরীরের উপরও তা অনেক প্রভাব ফেলে। পরীক্ষাভীতুরা সাধারণত টেনশনে ভোগে। তাদের খাবার হজম হয় না। ঘন ঘন তৃষ্ণা পায়। বমি বমি ভাব থাকে। বারবার টয়লেটে যাওয়ার

প্রয়োজন হয়। হাত-পা ঘামে। হাত-পা কাঁপে। বুক ধড়ফড় করে, জ্বর আসে[৮০] ।]

---

৮০. টেনশনের কুফল

টেনশন হলো ভাবাবেগজনিত চাপ ও উৎকণ্ঠার নাম। এর ফলে শরীরের পেশী উত্তেজিত ও শক্ত হয়ে উঠে। এ অবস্থা দ্বারা মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়। আর তখনই শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি জন্মলাভ করে। টেনশন থেকে হৃদরোগ, অনিদ্রা, ডায়রিয়া, ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, উচ্চ রক্তচাপ, বাতব্যথা, ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে ব্যথা, বিষণ্নতা ও বদমেজাজের মতো রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। টেনশন থেকে আরো যেসব সমস্যা হতে পারে তা হলো- বুক ধড়ফড় করা, ঘাম হওয়া, খিদে কমে যাওয়া, অ্যালার্জি বের হওয়া, হাত-পা কাঁপা ইত্যাদি।

টেনশন থেকে সৃষ্ট রোগসমূহের চিকিৎসা

'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ১৯৫ - ১৯৭ নং পৃষ্ঠায় টীকায় শরীর শিথিল করার পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। আশা করি তোমাদের তা পড়া হয়েছে। আশা করি তোমরা বুঝেছ যে, শিথিলায়ন এমন প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সচেতনভাবে শরীরের পেশীগুলো শিথিল করা যায়। পেশীগুলো শিথিল হওয়ার সাথে সাথে দেহ-মনে স্বস্তি ফিরে আসে। আর তখন পেশীর উত্তেজিত ও শক্ত হওয়ার ফলে স্বাস্থ্যগত যেসকল সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেগুলো দূর হতে থাকে। মূলত টেনশন থেকে সৃষ্ট রোগসমূহের মূল চিকিৎসা হলো– শরীর শিথিল করা; রোগের মুখোশ ভেদ করে মনে মনে সুস্থতার কল্পনার করা; বিশ্বাসের সাথে মনে মনে সুস্থ হওয়ার দোয়া করা; আশাবাদী থাকা; প্রশান্ত ও হাস্যোজ্জ্বল থাকা এবং হাদীসে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট মাসনুন দুআসমূহ [সম্ভব হলে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে] বারবার পড়া। 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের উপরিউক্ত প্রধান শিরোনামের অধীনে নিম্নোক্ত কয়েকটি শাখা শিরোনামে হাস্যোজ্জ্বল থাকার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এসেছে। সেখানে দেখে নিবে। "সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকার প্রয়োজনীয়তা", "পরবর্তীকালের সুফিয়ায়ে কেরামের দৃষ্টিতে আনন্দ-ফুর্তি" "যে বলে, আমি তো হাসতে পারি না" "সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল থাকা একটি দায়েমী সুন্নত"।

পরীক্ষার কারণে ভয় পাবে কেন? পরীক্ষা তো একটা সুযোগ। পরীক্ষা না থাকলে কি নিজের যোগ্যতাকে প্রকাশ করে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হতো? পরীক্ষা সাফল্যের দরজা উন্মোচিত করে। দক্ষ ও অদক্ষ ব্যক্তির স্তর পরীক্ষা ছাড়া সমপর্যায়েরই থেকে যায়।

পরীক্ষার অনুশীলন

পূর্বের দু' চারটে প্রশ্নপত্র সংগ্রহ করে কামরায় নিজে নিজে প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দাও। একটি উত্তরের জন্য পরীক্ষার হলে যতটুকু সময় নির্ধারিত থাকে, কামরায় ততটুকু সময়ের মধ্যেই লেখা সমাপ্ত করতে চেষ্টা করো। ভুলগুলো বের করো এবং সংশোধন করো। মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজনে ঐ বিষয়ের উস্তাদকে বা জামাতের তোমার চেয়ে ভাল শিক্ষার্থীকে অনুশীলনটি দেখাও। এভাবে পরিকল্পনা অনুসারে চললে পরীক্ষাকে চাপ তো মনে হবেই না, উপরন্তু পরীক্ষা হয়ে উঠবে আনন্দদায়ক।

এ কথাটি মনে রেখো, অধিকাংশ পরীক্ষা হয় লিখিত। অথচ অধিকাংশ ছাত্র পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করে শুধু পড়ার মাধ্যমে। তারা পড়ার পাশাপাশি লেখে না। লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতি শুধু মৌখিক হওয়া কেমন যৌক্তিক? এ অবস্থায় পরীক্ষার হলে উত্তর যে সন্তোষজনকভাবে দিতে পারবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। যথেষ্ট পড়া সত্ত্বেও সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারায় অবাক হওয়ার কিছু নেই।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো, অনেকেই পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করে কিতাব ও বইয়ের পড়া হুবহু মুখস্থ করার মাধ্যমে। বোঝা দরকার, মুখস্থ বিদ্যা কতটুকু কাজে লাগে? শব্দার্থ, জরীপ, ঘটনা বিবরণী, তথ্য ইত্যাদি স্মরণ রাখার জন্য মুখস্থ করা ঠিক আছে। বরং এগুলো মুখস্থ করতেই হবে। বাকি কথা হলো, তোতা পাখির মতো মুখস্থ করবে না। বুঝে বুঝে মুখস্থ করবে। বুঝে পড়লে মনে থাকবে বেশি। মুখস্থ হতে সময়ও লাগবে কম।

'কিন্তু রচনামূলক প্রশ্নের জন্য মুখস্থবিদ্যা চলবে না। এক ক্লাসভর্তি ছাত্র যদি একই বিষয়ের উপর শুধু মুখস্থই করতে থাকে, তা হলে তাদের পরীক্ষার খাতায় ভালো নম্বর পাবার আশা বৃথা। কারণ শিক্ষক একই ধাঁচের লেখা দেখে বিরক্ত হয়ে উঠবেন। নকল করে সবাই লিখেছে এমনটি ভাবাও

বিচিত্র নয়। ফলে কম নম্বর দেবেন তিনি। কাজেই ডাটা [জরীপ] কণ্ঠস্থ করার জন্য মুখস্থ চললেও রচনা লিখতে [দাড়ি-কমা- সেমিকোলনসহ মুখস্থ করার] এ পদ্ধতির উপযোগিতা নেই তা মনে রাখতে হবে।' 'রচনামূলক প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা যে যার দৃষ্টিকোণ থেকে -স্বতন্ত্র প্রকাশভঙ্গিতে- প্রশ্নের উত্তর দেবে, সেটাই আশা করেন পরীক্ষক।'[৮১] আর তখনই আশানুরূপ নম্বর পাওয়ার আশা করতে পার।

রচনামূলক প্রশ্নে উপস্থাপনটাই প্রধান। অতএব রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূল কথাগুলো মুখস্থ ও আত্মস্থ করার পর সময় নিয়ে হৃদয়গ্রাহী উপস্থাপনের পৃথকভাবে অনুশীলন করতে হবে।

পরীক্ষাভীতির কয়েকটা কারণ ও সেগুলোর সমাধান

পরীক্ষাভীতির কারণ চিহ্নিত করো। অনেক সময় সিলেবাস থাকে দীর্ঘ। তো পরীক্ষার পূর্ববর্তী দিনগুলোর জন্য পড়া জমিয়ে না রাখলেই হয়। যেদিন যতটুকু পড়া হয়, সেদিন ততটুকু আয়ত্ত করা মোটেই কঠিন নয়। যখনকার পড়া তখনই পড়ে নিলে পরীক্ষার সময় কোনো চাপ মনে হবে না। পরীক্ষার সময় শুধু পুনরাবৃত্তি করলে এবং উত্তর লেখার উপরিউক্ত অনুশীলন করলেই চলবে।

কারো কারো মধ্যে পরীক্ষাভীতি দেখা দেয় নির্দিষ্ট সময়ে উত্তর সম্পূর্ণ লিখতে না পারার কারণে। তাদের লেখার গতি ধীর। এর সমাধান হলো, বেশী বেশী লিখবে। সুন্দর লেখাকে অনুসরণ করে বেশী বেশী লিখলে লেখা পরিচ্ছন্নও হয়, দ্রুতও হয়। লেখার সময় গুনগুন করে পড়বে না। তাতে লেখার গতি কমে যায়।

স্মরণশক্তি বিক্ষিপ্ত হওয়ার অন্যতম একটা কারণ

অনেকে পরীক্ষার আগে সব পড়া ভুলে যায়। ফলে শুরু হয় পরীক্ষাভীতি। এর কারণ মূলত আতঙ্ক। পরীক্ষা আতঙ্কের কোনো বিষয়ই নয়।

---

৮১. উর্ধ্বকমার ভেতরের লেখাগুলো 'পরীক্ষায় ভালো ফল করার কলাকৌশল' [পৃ. ৯, ২২ - ২৩] বই থেকে নেয়া হয়েছে।

মনে রাখবে, পড়া স্মরণ রাখা শরীরের কাজ নয়। পড়া স্মরণ রাখা হলো মস্তিষ্কের কাজ। আতঙ্কগ্রস্ত হলে মস্তিষ্কের ভারসাম্য ঠিক থাকে না। স্মরণশক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। ফলে পড়া ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক পরিণতি হয়। সম্পূর্ণ প্রশান্ত ও আত্মবিশ্বাসী থাকবে। আগে ভালোভাবে আয়ত্ত করে থাকলে ভুলবে না। মনে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

অবশ্য -যেমনটি এইমাত্র বলা হয়েছে- পড়ার পুনরাবৃত্তি করতে থাকবে। তারপরও কোনো পড়া ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। কিন্তু এর জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হবে না। ভাল করে মুখস্থ করে থাকলে প্রয়োজনের সময় পড়া মনে উঁকি দিবে। তবে শর্ত হলো, নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস থাকতে হবে এবং মনকে রাখতে হবে শান্ত। অর্থাৎ মনকে উত্তেজনামুক্ত রাখতে হবে।

তাছাড়া প্রতিদিন বিশ্বাসসহ কয়েকবার আওড়াবে– "পড়তে আমার ভাল লাগে, মন দিয়ে পড়ব। যা পড়ব তা বুঝব, মনেও রাখব। পরীক্ষা খুবই সহজ, ভালভাবেই পাশ করব।" প্রতিদিন বিশ্বাসসহ অন্তত একবার বলবে– "অমূলক ভয়-ভীতি, নেতিবাচক চিন্তা ও কথার প্রভাব থেকে আমি সবসময় মুক্ত থাকব।"

পড়া মুখস্থ থাকার ও পরীক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করার কল্পনাও করবে। 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ১৮৮ নং পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। সেখানে দেখে নিবে।

ভয় দূর করার আরো দু'টি কৌশল

আর ভয় দূর করার জন্য ভান করাও অত্যন্ত উপকারী একটি পদক্ষেপ। অর্থাৎ এমনভাবে চলো যে, তুমি মোটেই ভয় পাচ্ছ না। তাছাড়া ভয়ের কথা একটি কাগজে লিখে দ্বিতীয়বার না পড়েই কাগজটি পুড়িয়ে ফেল। ভয় অনেক কমে যাবে ইনশাআল্লাহ।

কীভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে?

'পরীক্ষার্থীদের জন্য আটটি উপদেশ' ও 'পরীক্ষা একটি মজার খেলা' শিরোনামদ্বয়ের অধীনে এতক্ষণ যে আলোচনা করা হলো, তাতে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কেও বিভিন্ন কথা এসেছে। পূর্বের দু' চারটে প্রশ্নপত্র সামনে রেখে নির্ধারিত সময়ে উত্তর লেখার অনুশীলন করার যে কথাটি বলা হয়েছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর গুরুত্ব অনুধাবন করো এবং তা দ্বারা উপকৃত হও।

كَيْفَ نَتَعَلَّمُ الْإِنْشَاءَ কিতাবের প্রথম খণ্ডের পাদটীকায় এক স্থানে আছে– জামাতে প্রথম হলে জীবনে প্রথম হওয়ার পথ সহজ হয়। আর জামাতে প্রথম হতে হলে পরীক্ষা দিতে হয় আত্মবিশ্বাসের সাথে এবং অনুসরণ করতে হয় কিছু সহজ-সরল পদ্ধতি। এ দু'য়ের অভাবে অনেকের পড়াশুনা ভালো হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষা খারাপ হয়।

খেয়ারের দিনগুলোর কাজ

এখন শোনো, ডক্টর আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. বলেছেন, একটা আক্ষেপের বিষয় হলো কোনো কোনো ছাত্র খেয়ারের সময়কে[৮২] লেখাপড়া করার সুযোগ মনে করে। অথচ এ দিনগুলো সাধারণ পড়ালেখার জন্য নয়। খেয়ারের দিনগুলো হলো পুনরাবৃত্তি করার জন্য।

শ্রেণীকক্ষে তুমি যেসব কথা নোট করেছ, পুরো শিক্ষাবর্ষে যেসব সারসংক্ষেপ ও সারাংশ লিখেছ, খেয়ারের সময়টি হলো সেগুলো পুনরাবৃত্তি করার জন্য। কিতাব ও বইয়ে মূল বক্তব্যগুলোর উপরে যেসব স্থানে রেখা টেনেছ, সেগুলো গভীরভাবে ভাবার জন্য হলো খেয়ারের সময়টি। হ্যাঁ, খেয়ারের সময়টি হলো কিতাব ও বইয়ের সে সব বাক্য পাঠ করার জন্য, যেগুলো তুমি কোনো চিন্তার সারাংশ নির্ণয় বা কোনো মূলকথার উদাহরণ দান বা কোনো সূত্রের প্রয়োগ ও অনুশীলন হিসেবে টীকায় লিখেছ।

---

৮২. অর্থাৎ পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ দেয়ার জন্য পরীক্ষার পূর্বে যে ক'দিন দরস বন্ধ থাকে সেই দিনগুলোকে।

পুনরাবৃত্তির জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ

তোমার লেখাপড়ার ধরণ যেমনই হোক, পরীক্ষার পুনরাবৃত্তির ইচ্ছা করার পর এভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করো–.

১. পরীক্ষার সময়সূচী জেনে নাও। তারপর খেয়ারের সময়গুলো এবং পরীক্ষার দিনগুলোতে লেখাপড়া করার জন্য একটি রুটিন তৈরি করে নাও। পরিকল্পনা করার সময় নামাজ, ঘুম, আরাম ও খাবারের দিকগুলো লক্ষ রাখবে।

২. যেসব শিক্ষার্থী এই বলে গর্ব করে যে, তারা খেয়ারের সময়টিকে অবিরাম সাধনায় ও নির্ঘুম অবস্থায় অতিবাহিত করে এবং একটু একটু করে চা-কফি ইত্যাদি পান করে 'বেঁচে' থাকে, তারা আসলে বাড়াবাড়ি ও সীমালঙ্ঘন করছে। তারা নিজেদেরকে ভীষণ কষ্ট ও কঠিন বিপদে ফেলছে।

৩. দেহের শক্তি ও সামর্থ্য সীমিত। কেউ যখন তার সামর্থ্য ও সক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করে, তখন তা তার জন্য অস্বাভাবিক কষ্টের কারণ হয়। তখন সে ভাল-মন্দ বিবেচনা করার শক্তি হারিয়ে ফেলে। আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. স্বাভাবিক চেষ্টা ও অস্বাভাবিক চেষ্টার মধ্যে একটি পার্থক্য-রেখা টেনেছেন। তোমাদের স্মরণ থাকার কথা, আমি তা আলোচনার একেবারে শুরুর দিকে 'কষ্ট-ক্লেশ ও স্বাস্থ্য' শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছি।

তো এই দিক-নির্দেশনার আলোকে খেয়ারের সময়গুলো কাটাবে। সারা বছর ভালো করে লেখাপড়া করবে। হ্যাঁ, খেয়ারের সময়টি সাধারণ লেখাপড়া করার সময় নয়। শুধু এ সময় পড়ালেখা করলে ভাল ফলাফল অর্জন করা যায় না। খেয়ারের সময়টি মূলত পুরো বছরের পড়াশুনার পুনরাবৃত্তি করার সময়।

পরীক্ষা দেয়া ক্লান্ত ও শক্তিহীন শিক্ষার্থীর কাজ নয়

যখন খেয়ারের সময় শেষ হয়ে যাবে এবং পরীক্ষার দিন উপস্থিত হবে, তখন তোমার রুটিনে পরিবর্তন আসবে। পরীক্ষার রাতে ৩ ঘন্টার বেশী পড়ার প্রয়োজন নেই। কারণ পরীক্ষা নিজেই একটি কষ্টসাধ্য কাজ। পরীক্ষা দেয়া ক্লান্ত ও শক্তিহীন শিক্ষার্থীর কাজ নয়।

দাঁত পরিষ্কার করা

পরীক্ষার আগের রাতেও শোয়ার পূর্বে দাঁত পরিষ্কার করবে এবং পরীক্ষার হলে অবশ্যই নাস্তা করে যাবে। আর অন্যান্য দিনের মতো সেদিনের নাস্তার পরও দাঁত পরিষ্কার করবে। আমি একথাটি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে বললাম। পরীক্ষার হলে পর্যবেক্ষকরূপে দায়িত্ব পালনকালে প্রতি পরীক্ষায়ই কমপক্ষে দু'চারজন পরীক্ষার্থী এমন পেয়েছি, যারা কোনো প্রশ্ন সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করার জন্য যখন দাঁড়িয়েছে, তখন সামনে দাঁড়ানো কষ্টকর হয়েছে। হয়ত লেখাপড়ার ব্যস্ততার অজুহাতে গোসলও করেনি অনেকদিন। ইতস্ততার কারণে তখন কিছু বলতে পারিনি। তাই এখন মজলিসে বলে দিলাম।

প্রশ্নের ব্যাপারে ধারণার আশ্রয় নিবে না

আর শোনো, প্রশ্নের ব্যাপারে ধারণার আশ্রয় নিবে না এবং আন্দাজে প্রশ্ন নির্ধারণ করবে না। অনেক শিক্ষার্থী প্রশ্নের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং সেসব প্রশ্নের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে। তারপর পরীক্ষায় যদি সেসব প্রশ্ন না আসে, শিক্ষকের প্রতি ক্রুদ্ধ ও বিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে পরীক্ষার হল থেকে বের হয়। কারণ, তাদের ধারণায় কীভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে হয় শিক্ষক তা জানেন না। অথবা তারা শিক্ষকের জন্য যেসব প্রশ্ন নির্ধারণ করেছে তিনি সেগুলো বুঝেননি!

সান্ত্বনার দুষ্টচক্র

অনেকে ভাবে, এবার কোনো রকমে পরীক্ষাটা দিই; পরের বার ভালো করে পড়বো। তো সান্ত্বনার এ ধরনের দুষ্টচক্র তৈরি করবে না।

পরীক্ষার হলের আচরণ-বিধি

ইচ্ছে করে উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করবে না

একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা হলো, পরীক্ষার একটা ভয় আছে। এই ভয়ের একটা বিশেষ ক্ষতি হলো, এর কারণে অনেকের শিরা-উপশিরা উত্তেজিত হয় এবং হৃদপিণ্ডে কম্পন সৃষ্টি হয়। তখন কোন্ প্রশ্নটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, কোন্ প্রশ্নটি সাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ও কোন্ প্রশ্নটি কম গুরুত্বপূর্ণ– এই পার্থক্য করার ক্ষমতা অনেকে হারিয়ে ফেলে। তো তোমার প্রতি এই স্তরে উপদেশ হলো, ইচ্ছা করে উত্তেজনা ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করো না। শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ হলো, পরীক্ষা শুরু হওয়ার দশ মিনিট পূর্বে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করবে। হলে শান্তভাবে যাবে। অন্যদের সাথে ধাক্কাধাক্কি করে প্রবেশ করবে না। নিজের আসনে স্থির হয়ে বসবে। এটা তোমাকে কিছুটা প্রশান্তি দিবে।

পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তের কিছু বর্জনীয় বিষয়

পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে কোনো জটিল পড়া নিয়ে কারো সাথে বিতর্ক করবে না। এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকবে। শিক্ষাবিদগণ হলে প্রবেশ করার পূর্ব মুহূর্তে পড়া পুনরাবৃত্তি করতে এবং কিতাবের পৃষ্ঠা উল্টাতে কঠোরভাবে নিষেধ করেন। কারণ, এ মুহূর্তের পুনরাবৃত্তি করা ও পৃষ্ঠা উল্টানো দ্বারা গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা ছাড়া কিছুই অর্জন হয় না। কিন্তু অভিজ্ঞতা হলো, এই উপদেশগুলো খুব কম ছাত্র-ছাত্রীই গ্রহণ করে।

আর পরীক্ষার আগে এমন সহপাঠীদের সাথে কথা বলবে না, যাদের প্রস্তুতি খারাপ বা যারা আতঙ্কিত। কারণ, এতে তুমিও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে এবং তোমার মধ্যেও আতঙ্ক সংক্রমিত হবে।

কাগজ হাতে পাওয়ার পর প্রথম করণীয় কাজগুলো

উত্তর লেখার জন্য কাগজ হাতে পাওয়ার পর পরই প্রথম পৃষ্ঠার শূন্যস্থানগুলো পূরণ করে নিবে। অর্থাৎ সংখ্যায় ও অক্ষরে ফরম নম্বর, মারহালা [স্তর], জামাত [শ্রেণী], বিষয়, কিতাব ইত্যাদি তথ্যগুলো কাগজ হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লিখে ফেলবে। তারপর প্রশ্নপত্র হাতে আসার পর সবগুলো প্রশ্ন পড়বে। প্রতিটি প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করবে। প্রতিটি প্রশ্নের

সীমা ও পরিমাণ জানবে। তাহলে কোন প্রশ্নের উত্তর দিবে, আর কোনটির উত্তর দিবে না, তা বুঝেশুনে নির্বাচন করতে পারবে যদি নির্বাচনের স্বাধীনতা থাকে এবং নির্দিষ্ট সময়কে সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

কয়েকটি জরুরী পরামর্শ

كَيْفَ نَتَعَلَّمُ الْإِنْشَاءَ[৮৩] কিতাবের প্রথম খণ্ডের পাদটীকায় এক স্থানে আছে–

১. জটিল প্রশ্নের উত্তর নয়, লেখা শুরু করো সহজ ও ভালোভাবে জানা প্রশ্নের উত্তরটি দিয়ে। কোনো কোনো সময় কঠিন প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে পরে সহজ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সুযোগ থাকে না। আরবীতে একটি প্রবাদ আছে– عُصْفُوْرٌ فِي الْيَدِ خَيْرٌ مِنْ عَشَرَةٍ عَلَى الشَّجَرَةِ

অর্থ. হাতের একটি চড়ুই গাছের দশটির চেয়ে ভালো।

২. বেশী নম্বর পাওয়ার আশায় জটিল প্রশ্নের উত্তর দিতে যেয়ো না।

৩. প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সময় ভাগ করে নিবে। বরাদ্দকৃত সময়ে উত্তর শেষ না হলে ফাঁকা রেখে পরের প্রশ্নে চলে যাবে।

৪. কোনো প্রশ্নের উত্তর এমন মাত্রাতিরিক্ত দীর্ঘ করবেনা যে, অন্য উত্তরগুলোকে অতিরিক্ত সংক্ষেপ করতে হয়। উত্তর দীর্ঘ হওয়ায় এক প্রশ্নে নম্বর যে পরিমাণ বাড়বে, অতিরিক্ত সংক্ষেপ করার ফলে অন্য প্রশ্নে নম্বর তার চেয়ে বেশী কমবে।

৫. যে কয়টি প্রশ্নের উত্তর চাওয়া হয়, সব ক'টারই উত্তর দিবে। কম উত্তরের ক্ষতি ভালো উত্তর দিয়ে পূরণ করা সহজ নয়। অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়।'[৮৪]

---

৮৩. كَيْفَ نَتَعَلَّمُ الْإِنْشَاءَ নামে প্রকাশিত জামেয়া মাদানিয়া যাত্রাবাড়ী [ঢাকা] মাদরাসার সাবেক উস্তাদ মাওলানা নো'মান সাহেব দা. বা.-এরও একটি কিতাব আছে। তবে আমার কিতাবটি পূর্বে লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছে। আমার কিতাবটি প্রকাশিত হওয়ার ১ বছর পর তাঁর কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া তাঁর কিতাবটি এক খণ্ডের। আর আমার কিতাবটি তিন খণ্ডের।

৮৪. চতুর্থ ও পঞ্চম পরামর্শ দু'টি 'শিক্ষা সহায়িকা' পৃ. ২০ থেকে নেয়া হয়েছে।

পরীক্ষার হল সংশ্লিষ্ট কিছু সাধারণ জ্ঞাতব্য[৮৫]

১. প্রবেশপত্র সঙ্গে নেয়া। হার্ডবোর্ডের উপরে স্কস্টেপ দিয়ে সেঁটে দিলে প্রবেশপত্র ভুলে রেখে আসার সম্ভাবনা থাকে না।

২. পকেটে টাকা-পয়সা, কাগজ-পত্র, মানিব্যাগ ইত্যাদি না রাখা।

৩. হার্ডবোর্ডের সাথে শুধু একটি রুল কাগজ নেয়া। পুরনো কোনো প্রশ্ন বা অতিরিক্ত কোনো কাগজ না নেয়া।

৪. সময় সাড়ে তিন ঘণ্টা হলেও পরীক্ষার্থী মনে মনে নিজের উপর তিন ঘণ্টার মধ্যে উত্তর লেখা শেষ করার সংকল্প করবে এবং সে অনুযায়ী চেষ্টা করবে। ফলে উত্তর লেখার পর যে সময় বাঁচবে সে সময়ে দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার উত্তরগুলো বারবার যাচাই করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

৫. উত্তর লেখা শেষ হলে দ্বিতীয়বার উত্তরগুলো এভাবে দেখা যে, প্রশ্নে যা চাওয়া হয়েছে তা উত্তরে আসল কি না।

* যেমন ১ নং প্রশ্নে (ক), (খ) ও (গ) অংশের উত্তর দেওয়া হলো কি না। (গ) ভুলবশত থেকে গেল কি না।

* অথবা (ক) প্রশ্নের মধ্যে আবার দু'টো অংশ রয়েছে। যেমন নামাযের সময়গুলো সুন্দর করে লিখ। মাকরুহ ওয়াক্ত উল্লেখ করো। এখানে (ক)-এর উত্তরের ক্ষেত্রে খেয়াল করতে হবে, 'নামাযের সময়' ও 'মাকরুহ ওয়াক্ত' প্রশ্নের দু'টো অংশই এলো কি না।

* কিংবা শব্দার্থ চাওয়া হলো ১০ টি। এখানে দশটি শব্দ এলো কি না তা গুনে যাচাই করে দেখা।

৬. তৃতীয়বার দেখার সময় শব্দের বানান ভুল ও উত্তরের শুদ্ধতা লক্ষ করা।

৭. ভুল সংশোধনে ফ্লুইড বা সাদা কালি ব্যবহারে বিরত থাকা। সাদা কালির ব্যবহার উত্তরপত্রের সৌন্দর্য কমিয়ে দেয়। তাছাড়া অন্যান্য

---

[৮৫]. নিম্নের নির্দেশনাগুলো মাওলানা ইহতিশামুল হক ছাহেবের লেখা। তিনি ঢাকার মিরপুরস্থ জামেউল উলুম মাদরাসার শিক্ষক। বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড বেফাকের কেন্দ্রীয় পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি নির্দেশনাগুলো লিখেছেন।

শিক্ষাব্যবস্থায়ও এটি নিষিদ্ধ। ভুল শব্দ বা বাক্য এক দাগে কেটে দেয়াটাই ভালো।

৮. কোনোভাবেই প্রশ্নপত্রে না লেখা। না কোনো শব্দ, না বাক্য। বানান ঠিক আছে কি না যাচাই করতে হলে উত্তরপত্রের কোনো এক পৃষ্ঠাকে রাফ হিসেবে ব্যবহার করে উত্তরপত্র জমা দেয়ার আগে ওই পৃষ্ঠাটি ক্রস দিয়ে কেটে দেয়া। উল্লেখ্য, প্রশ্নপত্রে শব্দ/বাক্য লিখলে নিয়মানুযায়ী তাকে 'নকল' হিসেবে গণ্য করা হয়।

৯. কোনো কোনো পরীক্ষার হলে পরীক্ষা চলাকালেই পরীক্ষার্থীর দস্তখত নেয়া হয়। কিন্তু যেখানে তা হয় না সেখানে উত্তরপত্র জমা দেয়ার সময় অবশ্যই দস্তখতপত্রে স্বাক্ষর করা। স্বাক্ষর না হলে উত্তরপত্র 'বাতিল' বলে গণ্য হয়।

১০. উত্তরপত্রে সৌন্দর্যের জন্য বিভিন্ন রঙের সাইনপেন, মার্কার পেন ব্যবহার না করে দু'টি কলম ব্যবহার করাই যথেষ্ট মনে হয়। একটি ঘন নীল ও অপরটি কালো। নীল কলম শিরোনাম বা দাগ টানায় ব্যবহার করা এবং কালো কলম উত্তর লেখায় ব্যবহার করা।

১১. যদি চতুর্ভুজ স্কেল থাকে তবে উত্তরপত্রের চারপাশে দাগ টানায় তেমন সময় ব্যয় হবে না। তবে চতুর্ভুজ স্কেল না থাকলে লম্বা স্কেল দিয়ে দাগ দিয়ে সময় ব্যয় না করাই ভাল। কারণ শেষের দিকে কখনো সময়ের খুব হাহাকার পড়ে। ১০-১২ পৃষ্ঠা দাগ দিয়ে যে ৬-৭ মিনিট নষ্ট হলো, সেই ৬-৭ মিনিটই শেষের দিকে অতি মূল্যবান হয়ে দেখা দেয়। হ্যাঁ, উত্তর লেখা শেষ হয়ে গেলে চার পাশে দাগ দেয়াসহ ইত্যাদি সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ করা যেতে পারে।

১২. কোনোমতেই এমন ব্যবহার ও আচরণ না করা যা মাদরাসার সুনাম ক্ষুণ্ন করে।

১৩. পরীক্ষকদের সাথে সদাচার ও বিনয় প্রদর্শন করা।

১৪. ইস্তেঞ্জায় যেতে হলে অনুমতি নেয়া।

১৫. উত্তরপত্র হাতে পাওয়ার পর সর্বপ্রথম 'পরীক্ষার্থীর জন্য' ঘরগুলো সতর্কতার সাথে পূরণ করা। সেখানে নিবন্ধন নং ও রোল নং নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশপত্র দেখে লেখা।

১৬. রোল নং কথায় লিখতে হয়। কথায় রোল নং এর বানান [আরবী বা বাংলা] পরীক্ষার আগেই কারো কাছ থেকে জেনে ঠিক করে নেয়া।

১৭. লুজ [অতিরিক্ত] কাগজ নিলে উত্তর লেখার আগেই তাতে অবশ্যই 'বিষয়' এর নাম ও পরীক্ষার্থীর রোল নং লিখে নেয়া। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ পরীক্ষার্থীদের খাতার প্যাকেট কতবার যে খোলা হয় এবং চেক করা হয় তা কেবল পরীক্ষকরাই জানেন। বারবার খোলার কারণে মাত্র একটি পিনে সাঁটা লুজ কাগজ কখনো মূল উত্তরপত্র থেকে পৃথক হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। সেক্ষেত্রে বিষয় ও রোল নং লেখা থাকলে কোনো অসুবিধা হয় না।

১৮. উত্তর লেখার প্রথম থেকেই পৃষ্ঠার নম্বর দেয়া। যে কোনো পৃষ্ঠায় উত্তর লেখার আগেই পৃষ্ঠার নম্বর দেয়া। পৃষ্ঠার নম্বর প্রথম থেকে না দেয়া হলে শেষে অনেক পৃষ্ঠা জমা হয়ে যায় এবং সময়ের অভাবে তাড়াহুড়ো করে এলোমেলোভাবে পৃষ্ঠার নম্বর দেয়া হয়। পৃষ্ঠার নম্বর এলোমেলো হলে পরীক্ষক খুবই বিরক্ত হন এবং নম্বর কর্তন করেন।

১৯. যথাসম্ভব উত্তর প্রদানে প্রশ্নের ধারাবাহিকতা ঠিক রাখা। বিশেষত যে প্রশ্নের মধ্যে যে (ক), (খ) ও (গ) অংশ থাকে সেখানে (ক), (খ) ও (গ) এর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা খুবই জরুরি। এমন যেন না হয় যে, ১ নং প্রশ্নের উত্তর পরীক্ষার্থী দিচ্ছে, কিন্তু সে শুরু করল (খ) দিয়ে। তারপর (ক) ও শেষে (গ)। এতে পরীক্ষক খুবই বিরক্তিবোধ করেন।

২০. উত্তরপত্র সুন্দর হওয়ার অন্যতম পয়েন্ট হলো, প্রতিটি উত্তর শিরোনাম দিয়ে লেখা। শিরোনাম দেয়া হলে উত্তরের মান বৃদ্ধি পায়।

২১. নিচের শ্রেণির পরীক্ষার্থীরা অনুবাদের উত্তর লেখার সময় এক পাশে মূল উঠিয়ে তার পাশে অনুবাদ লিখলে ভাল হয়। কারণ নিচের জামাতের কিতাব যেমন রওজায় ছোট ছোট বাক্য থাকে এবং যে কোনো ৫টি বাক্যের অনুবাদ লিখতে বলা হয়। তখন পরীক্ষার্থী কখনো শুধু ৫টি অনুবাদ লিখে, বাক্য উঠায় না। এতে পরীক্ষকের বুঝতে অসুবিধা হয়– আসলেই সে বাক্যের সঠিক অনুবাদ করল কি না।

২২. মোটকথা, পরীক্ষার্থীকে তার উত্তরপত্র এমনভাবে সাজাতে হবে যেন পরীক্ষকের প্রথম নজরেই পরীক্ষার্থীর সম্পর্কে সুধারণা সৃষ্টি হয়ে যায়। সুধারণা থাকলে কখনো ছোট ভুল পরীক্ষক এড়াতে পারেন। ধারণা মন্দ হলে কখনো নম্বরও মন্দভাবেই [দু'ই-এক কম করে] প্রদান করা হয়।

আরও দুটি জ্ঞাতব্য দিক হলো,

১. প্রবেশপত্রের অপর পৃষ্ঠায় বিভিন্ন জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত থাকে। গুরুত্বের সাথে সেগুলোও মেনে চলা আবশ্যক।

২. পরীক্ষার হলে কারও কারও কলম-রুলার-সাদা কাগজ প্রভৃতি টেবিলের নিচে পড়ে থাকতে দেখা যায়। এটা ইলমের উপকরণের সাথে বেআদবীর অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ আমাকে ও তোমাকে ইলমের সকল উপকরণের প্রতি আদব বজায় রাখার তাওফীক দান করুন!

প্রশ্নের পরিভাষা

পরীক্ষকগণ প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেন। প্রশ্নপত্রের সেসব পরিভাষার উদ্দেশ্য জেনে নেয়া জরুরি। প্রশ্নে ব্যবহার করার জন্য পরীক্ষকগণের মনে যেসব শব্দ ও ভাষা উদয় হয়, সবগুলো নির্দিষ্ট করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তোমার প্রশ্নে যেসব শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, চিন্তা করে সর্বপ্রথম সেগুলোর সঠিক উদ্দেশ্য বুঝে নিবে। উদ্দেশ্য বুঝতে ভুল করবে না।

এখানে আমরা উদাহরণস্বরূপ দশটি পরিভাষার ব্যাখ্যা করব ইনশাআল্লাহ। পরিভাষা দশটি হলো– اُكْتُبِ التَّحْلِيْلَ اللَّفْظِيَّ لِلْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ [নিম্নলিখিত শব্দগুলোর তাহকীক (শাব্দিক বিশ্লেষণ) লেখো], وَازِنْ [তুলনা করো], عَرِّفْ [পরিচয় দাও], اُنْقُدْ [সমালোচনা করো, যাচাই করো], صِفْ [বিবরণ দাও, বর্ণনা করো], وَضِّحْ / أَوْضِحْ [স্পষ্ট করো], لَخِّصْ [সারাংশ লিখ], نَاقِشْ [আলোচনা করো], عَدِّدْ [গুণে গুণে লিখ], تَتَبَّعْ [অনুসন্ধান করো]।

১. اُكْتُبِ التَّحْلِيْلَ اللَّفْظِيَّ / তাহকীক করো

যদি বলা হয়, اُكْتُبِ التَّحْلِيْلَ اللَّفْظِيَّ لِلْكَلِمَاتِ التَّالِيَةِ [নিম্নলিখিত শব্দগুলোর তাহকীক লেখো], তাহলে শব্দটি اسم, না فِعْل, না حَرْف, তা লিখবে। اسم হলে جامد, না مصدر, না مشتق, তা নির্দিষ্ট করবে। جامد অবস্থায় واحد হলে তার جمع কী এবং جمع হলে তার واحد কী, তা লিখবে। مشتق অবস্থায় اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آله، اسم تفضيل، صفة مشبَّهَه-এর মধ্যে থেকে শব্দটি যে প্রকারের, তা নির্ধারণ করবে। এর صيغه লিখবে। পক্ষান্তরে مصدر হলে যে বাবের مصدر, সে বাবও নির্ণয় করবে। তারপর অর্থ লিখবে।

আর فِعْل হলে তা কোন ছীগা? তার بحث কী? باب কী? مصدر কী? ماده কী? جنس কী? অর্থ কী? ইত্যাদি লিখবে।

পক্ষান্তরে حرف হলে তা সতের প্রকারের কোন প্রকার, নির্ধারণ করবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে তার কী অর্থ, তা-ও লিখবে।

২. وَازِنْ / তুলনা করো

যদি বলা হয়, وَازِنْ بَيْنَ كَذَا كَذَا [অমুক অমুক জিনিসের মধ্যে তুলনা করো], তাহলে তোমার কাজ হবে, প্রথমে জিনিস দু'টির প্রতিটির বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা লেখা। মনে রাখবে, ঐ বিশেষ গুণকে বৈশিষ্ট্য বলে, যা শুধু একটি জিনিসের মধ্যে থাকে, অন্য জিনিসের মধ্যে থাকে না। তো প্রথমে প্রতিটি জিনিসের বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা লিখবে। তারপর এ দু'য়ের মধ্যকার যৌথ গুণগুলো লিখবে। অর্থাৎ যেসব গুণ উভয়টির মধ্যে পাওয়া যায়। তারপর যেসব ক্ষেত্রে উভয়টি অভিন্ন এবং যেসব ক্ষেত্রে উভয়টি ভিন্ন, সেসবের আলোকে জিনিস দু'টির মধ্যে তুলনা করবে কোনটি কেমন।

৩. عَرِّفْ / পরিচয় দাও

যদি বলা হয়, عَرِّفْ كَذَا [অমুক জিনিসের পরিচয় দাও], তাহলে তোমার কাজ হবে, সেসব স্পষ্ট বাস্তবতা ও সূক্ষ্ম বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা, যেগুলো দ্বারা এ জিনিসটিকে নির্ধারণ করা যায়। তোমার এ সংজ্ঞা যেন এ জিনিসটির সকল শাখাকে সমন্বয় করে এবং যেসব জিনিস তার অন্তর্ভুক্ত নয় সেগুলোকে দূর করে। শুধু পরিচয় চাওয়া হলে এতটুকুই লিখবে। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ লিখবে না।

৪. اُنْقُدْ / সমালোচনা করো

যদি বলা হয়, اُنْقُدْ كَذَا [অমুক জিনিসের সমালোচনা করো], তাহলে তুমি জিনিসটির ভালো-মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করবে। তারপর কারণ বর্ণনা করে একটি যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে।

৫. صِفْ / বিবরণ দাও

যদি বলা হয়, صِفْ كَذَا [জিনিসটির বিবরণ দাও], তাহলে জিনিসটির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করে তার একটি চিত্রায়ণ করবে। তবে কোনো রায় দেবে না।

৬. أَوْضِحْ، وَضِّحْ / স্পষ্ট করো

যদি বলা হয়, وَضِّحْ كَذَا বা أَوْضِحْ كَذَا [জিনিসটি স্পষ্ট করো], তাহলে এর অর্থ হচ্ছে, তোমার সামনে একটি সংক্ষিপ্ত বা অস্পষ্ট বক্তব্য কিংবা একটি ব্যাপক বিষয় আছে। তোমার দায়িত্ব হলো, পরীক্ষকের সামনে তা স্পষ্ট করে তুলে ধরা। যদি সংশ্লিষ্ট কোনো নকশা-নমুনা ইত্যাদি থাকে, তাহলে স্পষ্ট করার জন্য সেগুলোরও সাহায্য নিবে।

৭. لَخِّصْ / সার-সংক্ষেপ লিখ

যদি বলা হয়, لَخِّصْ كَذَا [সার-সংক্ষেপ নির্ণয় করো], তাহলে তোমার কাজ হবে, বিষয়টির একটি সারাংশ লেখা। এর জন্য যে জিনিসের সারাংশ লেখা উদ্দেশ্য, তার অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রধান উপাদানগুলো উল্লেখ করবে এবং সে সকল উপাদানের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে।

৮. نَاقِشْ / আলোচনা করো

যদি বলা হয়– نَاقِشْ كَذَا [আলোচনা করো], তাহলে তোমার কাজ হবে, বিষয় বা ভাবটি যাচাই করা। তা বিশ্লেষণ করা। তা থেকে যা প্রমাণিত হয় দলিল দিয়ে তা প্রমাণিত করা। তার থেকে যা খণ্ডন হয়, তা-ও দলিলসহ খণ্ডন করা।

৯. عَدِّدِ الْحَالَاتِ/অবস্থাগুলো গুণে গুণে লিখ

যদি বলা হয়, عَدِّدْ حَالَاتِ كَذَا [অমুক জিনিসের অবস্থা বর্ণনা করো], তাহলে তোমার কাজ হবে, ঐ জিনিসের অবস্থাগুলো ধারাবাহিকভাবে লেখা। প্রতিটি অবস্থার সঙ্গে ঐ অবস্থার স্পষ্টতর বৈশিষ্ট্যগুলোও উল্লেখ করা, যেগুলোর কারণে অন্য অবস্থা থেকে তা ভিন্ন হয়ে যায়।

১০. تَتَبَّعْ / অনুসন্ধান করো

যদি বলা হয়, تَتَبَّعْ كَذَا مِمَّا دَرَسْتَه [তোমার পঠিত অংশের অমুক জিনিসটি অনুসন্ধান করো], তাহলে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করে পরিচ্ছেদটি চিন্তা করবে। বিষয়টি পরিচ্ছেদের কোথায় কোথায় উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব স্থান নির্ধারণ করবে।

পরীক্ষার খাতায় কীভাবে লিখবে?

'পরীক্ষায় ভালো ফল করার কলাকৌশল' বইয়ে আছে–

'ভালো লেখার একমাত্র উপায় প্রতিদিন কিছু না কিছু লেখা। ছোটো ছোটো প্রশ্ন তৈরি করে রোজকার পড়া লিখতে পারেন আপনি। আরেকটি কাজ করতে পারেন তাহলো ডায়েরি লেখা। ডায়েরি লেখার যে অনেক উপকারিতা আছে সেটা শুরু করলেই বুঝতে পারবেন। ...

পরীক্ষার সময় ছোটোবড়ো যে প্রশ্নের উত্তরই লিখুন না কেন, পরিকল্পনা করে লিখবেন। প্রথমেই জানিয়ে দেবেন কী লিখতে যাচ্ছেন। এ পর্যায়ে বেশি কথা লেখার দরবার নেই। পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়ে মধ্যখানে প্রশ্নের উত্তর বিশদভাবে লিখবেন। আর সবশেষে উপসংহারে, দু'চার লাইনে জানিয়ে দেবেন এতক্ষণ কী লিখলেন।

উপসংহার লেখার ব্যাপারে একটি সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। 'সংক্ষেপে বলতে গেলে' ধরনের বাক্য দিয়ে উপসংহার টানলে বিরক্ত হবেন পরীক্ষক। সংক্ষিপ্ত কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিবরণের মতো টানতে হবে উপসংহার। ...

রচনমূলক প্রশ্নে বাক্যগঠন হবে ছোট ছোট। ব্যাকরণগত ত্রুটিগুলো পরিহার করে চলবেন। ছোট ছোট বাক্য দিয়ে লিখলে পরীক্ষক খুশি হন। ...

একজন শিক্ষক আপনার উত্তরপত্র থেকে যা জানতে চান তা হলো ঃ

১. আপনি আপনার চিন্তা-চেতনাগুলো ঠিকঠাক ব্যক্ত করতে পেরেছেন কিনা।

২. যে বিষয়টি সম্পর্কে লিখতে বলা হয়েছে সে বিষয়টি সম্পর্কে আপনার ধারণা কতটুকু স্বচ্ছ।

৩. আপনার নিজস্ব চিন্তাধারা দিয়ে পয়েন্টগুলো ব্যাখ্যা করতে পারছেন কিনা।

৪. আপনার উত্তরপত্রের প্রথম প্রশ্নের কয়েক লাইন পড়েই তিনি আপনার সম্পর্কে একটা ধারণা নিতে চান। আর সে ধারণাটা যদি ইতিবাচক হয়, তাহলে বেঁচে গেলেন। আর নেতিবাচক হলে ডুবলেন।'[৮৬]

---

[৮৬]. 'পরীক্ষায় ভালো ফল করার কলাকৌশল' পৃ. ৬৫ - ৬৭

কীভাবে উত্তরপত্র মানসম্মত করবে?

আব্দুর রহমান রাফাত পাশা রহ. فَنُّ الْإِمْتِحَانَاتِ بَيْنَ الطَّالِبِ وَالْمُعَلِّمِ কিতাবে উত্তরপত্রসংশ্লিষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কতগুলো উপদেশ দিয়েছেন। উপদেশগুলো সব সময় যেন তোমার স্মরণ থাকে।

পরীক্ষার্থীর যে অবদান পরীক্ষক কখনো ভোলেন না

বিষয়বস্তুর পয়েন্টগুলো ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা এবং সুবিন্যস্ত উত্তর দেয়া একটি শিল্প। নম্বর দেয়ার ক্ষেত্রে এই শিল্পের যথেষ্ট প্রভাব থাকে। একজন পরীক্ষককে শত শত উত্তরপত্র যাচাই করতে হয়। যে পরিক্ষার্থী সুবিন্যস্তরূপে উত্তর লিখে, তার উত্তরপত্র যাচাই করা শিক্ষকের জন্য সহজ হয়। তাই নম্বর দেয়ার সময় পরীক্ষক এমন পরীক্ষার্থীর অবদান কখনো ভোলেন না।

স্পষ্ট হস্তাক্ষরের সুফল

স্পষ্ট হস্তাক্ষরে লিখবে। কারণ, যে লেখা শিক্ষক পড়তে পারেন না, সে লেখার জন্য তিনি তোমাকে নম্বর দিবেন কীভাবে?

উত্তরপত্র নিরীক্ষার কর্তৃপক্ষ নম্বর দেয়ার সময় হস্তাক্ষরকে গুরুত্ব না দেয়ার জন্য নিরীক্ষণকারীদেরকে শক্ত ভাষায় অনেক দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, উত্তর একরকম হওয়ার পরও যে খাতার হস্ত াক্ষর ও বিন্যাস অধিক সুন্দর, নিরীক্ষণকারী অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে খাতায় অধিক নম্বর দেন।

তবে 'শিক্ষা সহায়িকা' বইয়ে আছে[৮৭], 'হস্তলিপি সুন্দর না হলেও চলবে। কিন্তু দুস্পাঠ্য হলে চলবে না। সোজা লাইনে এবং লাইনগুলোর মাঝখানে পরিমিত ফাঁক রেখে লেখার অভ্যাস করা উচিত। লাইনের মাঝখানে ফাঁক রাখলে প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজন সহজ হয়।'

উত্তরের ভাষা যেন পরিমিত ও পরিষ্কার হয়

তোমার উত্তরের ভাষা যেন স্পষ্ট হয়। স্মরণ রাখবে, উদ্দেশ্য বুঝতে বিঘ্নতা ঘটায় এমন সংক্ষিপ্তকরণ এবং বিরক্তিকর দীর্ঘায়ন, উভয়টি লেখার অন্যতম দোষ।

---

৮৭. পৃ. ২১

উদ্দেশ্য বুঝতে বিঘ্নতাসৃষ্টিকারী সংক্ষিপ্তকরণের কুফল

কারণ উত্তরপত্র যাচাই করার সময় নিরীক্ষণকারী দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করার মানসিকতা নিয়ে বসেন না। তাই সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে তোমার লেখার উদ্দেশ্য বুঝতে যদি বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়, তিনি গভীরভাবে চিন্তা করে সে লেখা বুঝতে যাবেন না।

বিরক্তিকর দীর্ঘায়নের ক্ষতি

অনুরূপভাবে নিরীক্ষণকারী তোমার বিরক্তিকর দীর্ঘ লেখা ভালোভাবে পড়বেন না। কারণ তিনি উপভোগ করার জন্য তোমার খাতা নিয়ে বসেননি।

কোনো কোনো শিক্ষার্থী উত্তরপত্রকে মোটা বানানোর আগ্রহে আলোচনা দীর্ঘ করে ও বিশদভাবে বর্ণনা দেয়। এদেরকে বলব, শিক্ষক যত সাধারণ স্তরেরই হন, কোনটি ফেনা আর কোনটি মুক্তা, তা সহজেই নির্ণয় করতে পারেন। তাই এ ধরনের দীর্ঘায়ন শিক্ষকদের কোনো করুণা আকর্ষণ করতে পারে না। উপরন্তু এ ধরনের লেখার কারণে তাঁরা বিরক্ত হন। তাই তোমার বক্তব্য হতে হবে পরিমিত ও পরিষ্কার।

ভাষা যেন হয় নির্ভুল

তোমার ভাষা যেন নির্ভুল হয়। মনে রাখবে, পরীক্ষার নম্বরের ক্ষেত্রে ভাষা, ব্যাকরণ, হস্তলিপি প্রভৃতিসংশ্লিষ্ট ভুলসমূহের বিরাট প্রভাব থাকে। উত্তরপত্র যাচাইকারী শিক্ষক এগুলোর মাধ্যমে তোমার স্তর নির্ধারণ করবেন। 'শিক্ষা সহায়িকা' বইয়ে[৮৮] আছে, 'শুদ্ধ হওয়া ছাড়াও ভাষা যদি উন্নত মানের হয়, তাহলে আরও ভালো। তবে সাহিত্য ছাড়া অন্য বিষয়ে এর গুরুত্ব খুব বেশী নয়।'

উত্তর সঠিক হওয়ার ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হলে কী করবে?

অনেক শিক্ষার্থী পরীক্ষার হলে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের দ্বিধা হয়, প্রশ্নের উত্তর সেটাই কি-না যা তারা লিখেছে, নাকি অন্য কিছু? তাদের লিখিত উত্তর ভুল হয়েছে, নাকি নির্ভুল আছে? এ ব্যাপারে তোমার প্রতি উপদেশ

---

৮৮. পৃ. ২১

হলো, উত্তর শুধু তখনই পরিবর্তন করবে, যখন লিখিত উত্তর ভুল হওয়ার ধারণা প্রবল হয়। পক্ষান্তরে তুমি যদি এ ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হও যে, কী লিখেছ আর কী লিখা উচিত ছিল, তাহলে শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণের উপদেশ হলো, প্রথমে যা লিখেছ সেটাই রেখে দাও। কারণ, অভিজ্ঞতা হলো, শিক্ষার্থী যখন উত্তর দেয়ার ক্ষেত্রে অনুমানের উপর নির্ভর করে, তখন সঠিকতার নিকটতর উত্তরই মনে সর্বপ্রথম উদিত হয়।

লেখা শেষ করার পর উত্তরপত্র পুনরায় দেখার উপকারিতা

উত্তর লেখা থেকে অবসর হওয়ার পর এবং এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার পর যে, তুমি সবক'টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েছ, কোনো প্রশ্ন ভোলনি, উত্তরপত্র ধীরস্থিরভাবে পুনরায় দেখো। তুমি অতি অবাক হয়ে লক্ষ করবে, তোমার এমন কিছু ভুল হয়েছে, যেগুলো তোমার ধারণায় তোমার মতো শিক্ষার্থীর হওয়ার কথা ছিল না।

খাতা জমা দেয়ার পর লিখিত উত্তর নিয়ে চিন্তা করার কুফল

তুমি যখন উত্তরপত্র তত্ত্বাবধায়কের হাতে হস্তান্তর করবে, তখন তোমার প্রতি উপদেশ হলো, যা লিখেছ তা নিয়ে চিন্তা করবে না। কারণ, এই চিন্তা অনেক সময় তোমার মধ্যে এই ধারণা জন্ম দিবে যে, তুমি সঠিক উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়েছ। তখন নম্বরের ব্যাপারে তোমার অনুমান খারাপ হবে। তদ্রূপ রুমে এসে কিতাব দেখে উত্তরের সঠিকতা যাচাই করবে না। কারণ ভুল প্রমাণিত হলে তুমি মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়বে। ফলে পরবর্তী বিষয়ের পরীক্ষার জন্য তোমার মন যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণে অগ্রসর হবে না।

মৌখিক পরীক্ষা

মৌখিক পরীক্ষা চলাকালীন কিছু সাধারণ জ্ঞাতব্য[৮৯]

১. মৌখিক পরীক্ষার হলে আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রবেশ করবে। তোমার আচরণ দেখে যেন পরীক্ষকের মনে হয়, তুমি একজন ভদ্রছেলে ও অভিজাত পরিবারের সন্তান।

২. নোংরা পরিচ্ছদ বা আলুথালু বেশে উপস্থিত হবে না। দামী পরিচ্ছদ আবশ্যক নয় আর কৃত্রিম পোশাক অবশ্য বর্জনীয়।

৩. ভদ্রবেশে ও নম্রতার সাথে প্রবেশ করবে। নাম ঘোষণামাত্র হুড়মুড়িয়ে প্রবেশ করবে না।

৪. কোলের উপর হাত জড়ো করে বসবে। শিরদাঁড়া থাকবে টানটান। হাতে কোনো বই বা ব্যাগ থাকলে এবং তা সামনের টেবিলে রাখার প্রয়োজন হলে পরীক্ষকের কাছে অনুমতি প্রার্থনা করবে। বসতে বলার পর বসবে। বসার সময় شُكْرًا বা شُكْرًا بِلَّهِ বলবে।

৫. পরীক্ষকের প্রশ্ন মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কোনো প্রশ্ন বুঝতে না পারলে পরীক্ষককে তা একটু বুঝিয়ে দিতে অনুরোধ করায় দোষ নেই। বরং না বুঝে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতে শুরু করা উচিত নয়। নির্বোধ বা ভুল উত্তরের চেয়ে বিলম্বিত উত্তর শ্রেয়।

৬. ঠিকভাবে বসে কাঁচু-মাচু না হয়ে পরিষ্কার ভাষায় এমনভাবে উত্তর দিবে যেন পরীক্ষক সহজে সব কথা শুনতে পান।

৭. প্রশ্নের উত্তর প্রাসঙ্গিক এবং পর্যাপ্ত অথচ সংক্ষিপ্ত হওয়া শ্রেয়। নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক উত্তর দেয়া বা অতিরিক্ত কথা বলে নিজকে অনাবশ্যক জটিলতায় জড়িয়ে ফেলা উচিত নয়।

৮. প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে যুক্তি থাকতে হবে।

---

৮৯. নিম্নের জ্ঞাতব্যগুলো আমি 'শিক্ষা সহায়িকা' ও 'পরীক্ষায় ভালো ফল করার কলাকৌশল' বইদু'টির আলোকে সংকলন করেছি।

৯. প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সময় মুখ হাঁড়ি করে বা চেহারা করুণ করে রাখবে না। হাসি হাসি মুখে উত্তর দেবে। তোমার হাসিমুখ দেখলে পরীক্ষক বুঝবেন, তোমার আত্মবিশ্বাসে কমতি নেই।

১০. ভেতরে ভেতরে নার্ভাস হলেও বাইরে তা বুঝতে দেবে না। মনে রাখবে, তুমি পরীক্ষা দিতে গিয়েছ, পেটানোর জন্য তোমাকে জেলে বন্দী করা হয়নি।

১১. বিড়বিড় করবে না। শিক্ষার্থী সব কথা জানে বা সব কথা তার স্মরণ আছে– কোনো পরীক্ষক তা আশা করেন না। সুতরাং কোনো প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে বলে দেবে, عَفْوًا, উস্তাদজী! এ প্রশ্নের উত্তর আমার জানা নেই কিংবা عَفْوًا, উস্তাদজী! এ প্রশ্নের উত্তর আমার মনে পড়ছে না। মনে করার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করা অনাবশ্যক।

১২. অনেক পড়াশোনা করেছ বলে আত্মগর্বে বলীয়ান হবে না। তোমাকে অহঙ্কারী হতে দেখলে পরীক্ষক অসন্তুষ্ট হবেন। তোমার অহঙ্কার চূর্ণ করার জন্য তিনি তখন এমন কঠিন কঠিন প্রশ্ন শুরু করতে পারেন যে, তোমার অবস্থা হতে পারে 'ছেড়ে দে মা! কেঁদে বাঁচি'র মতো।

১৩. খুব উঁচু স্বরে বা নিচু গলায় উত্তর দেবে না। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখবে।

১৪. যে প্রশ্ন করা হয় ঠিক সে প্রশ্নের উত্তর দেবে।

১৫. মৌখিক পরীক্ষায় যেমন বিনা প্রয়োজনে অজ্ঞতা প্রকাশ করা অর্থহীন, তেমনি কৌশলে অজ্ঞতা চাপা দেয়াও অনুচিত।

১৬. কোনো কথার সূত্র ধরে পরীক্ষককে পাল্টা প্রশ্ন করা উচিত নয়।

১৭. পরীক্ষকের প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক বা অনুচিতভাবে জটিল হলেও উষ্মা প্রকাশ করতে নেই।

১৮. পরীক্ষা শেষ হলে সপ্রতিভভাবে উঠে দাঁড়িয়ে পরীক্ষককে সালাম দিয়ে বিনয়ী ভঙ্গিতে পরীক্ষার হল বা রুম থেকে বের হবে।

পরীক্ষা সম্পর্কে শেষ কথা

পরীক্ষায় প্রথম হলে জীবনে প্রথম হওয়ার পথ সহজ হয়

পরীক্ষা সম্পর্কে একটি বিশেষ কথা আগেও বলা হয়েছে। আলোচনার শেষ দিকে আবারও বলছি। এটি অত্যন্ত বাস্তব কথা, শুধু বিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞতা নয়, অনেক সাধারণ মানুষেরও পূর্বজ্ঞান। তা হলো, একটি সাফল্য অনেক সাফল্য অর্জনের সুযোগ করে দেয়। একটি সফলতা অনেক সফলতার দুর্গম পথ সুগম করে দেয়। পরীক্ষায় প্রথম হলে জীবনে প্রথম হওয়ার পথ সহজ হয়। শিক্ষাবিষয়ক যে-কোনো পেশায় যোগদান করার ক্ষেত্রে পরীক্ষার ফলাফল 'পাসপোর্ট' হিসেবে কাজ করে। আর সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে আত্মবিশ্বাসের সাথে পরীক্ষা দিলে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া কঠিন নয়। আল্লাহর কাছে তাওফীক চেয়ে তুমি সঠিক পদ্ধতিতে চেষ্টা করতে থাক, আল্লাহ তাওফীক দান করবেন ইনশাআল্লাহ। তিনি কি ইরশাদ করেননি– وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

অর্থ. আর যারা আমার পথে কষ্ট করে, আমি তাদেরকে অতি অবশ্যই আমার পথসমূহ দেখাব।[৯০]

পরীক্ষা জীবন নয়, জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র

তবে এ কথাও মনে রাখবে যে, পরীক্ষা জীবন নয়, জীবনের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। একটি পরীক্ষা খারাপ হলেই জীবন বরবাদ হয়ে যায় না। অতএব, কোনো কারণে একটি পরীক্ষা খারাপ হলেই মুষড়ে পড়বে না। পরবর্তী পরীক্ষাগুলো ভালোভাবে দিবে। কয়েকবার ব্যর্থ না হয়ে সফল হয়েছে, অতীতে এমন সফল লোক খুব কমই অতিবাহিত হয়েছেন। আর ফলাফল খারাপ হওয়ার দায়ভার নিজেই নিবে। উত্তরপত্র নিরীক্ষণকারী বা অন্য কারো উপর চাপাবে না। ভুলগুলো খুঁজে বের করবে এবং সেগুলোর পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকবে।

---

৯০. সূরা 'আনকাবূত, আয়াত নং ৬৯

পরীক্ষা লক্ষ্য, না উপলক্ষ্য?

পরীক্ষা সম্পর্কে আমার আপাতত সর্বশেষ কথা হলো, পরীক্ষাকে পড়া আয়ত্ত করার একটি বিশেষ উপলক্ষ্য মনে করবে। পরীক্ষাকে লেখাপড়া করার লক্ষ্য মনে করবে না। যদি পরীক্ষাকে পড়া আয়ত্ত করার উপলক্ষ্য মনে কর, তাহলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পরও বিভিন্ন সুযোগে পুনরাবৃত্তি করে পড়া স্মরণ রাখবে। পক্ষান্তরে পরীক্ষাকে যদি লেখাপড়া করার লক্ষ্য মনে কর, অর্থাৎ যদি শুধু পরীক্ষায় পাশ করার উদ্দেশ্যে লেখাপড়া কর, তাহলে পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর পড়া আর পুনরাবৃত্তি করবে না। পরীক্ষার পর পড়া আর স্মরণ রাখতে চেষ্টা করবে না, বরং ভুলতে শুরু করবে।

ভুলে যেও না আখেরাতের পরীক্ষার কথা

দুনিয়ার পরীক্ষার সবচেয়ে মন্দ পরিণতি হলো বছরের তিন পরীক্ষায় তিনবার ফেল করা। এই ক্ষুদ্রতম পরীক্ষার জন্য যখন আমরা এতো পরিশ্রম করি, একে এতো গুরুত্ব দিই এবং এতে পাশ করার জন্য এত কষ্ট করি, তখন চিন্তা করা দরকার, আখেরাতের বৃহত্তম পরীক্ষার জন্য আমাদের কী পরিমাণ প্রস্তুতি গ্রহণ করা দরকার, "যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো উপকারে আসবে না, তবে যে ব্যক্তি পবিত্র আত্মা নিয়ে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে।"[৯১]

সিলেবাসবহির্ভূত পড়াশুনার প্রয়োজনীয়তা

আমি আলোচনার একেবারে শুরুর দিকে 'লেখাপড়ার পরিকল্পনা' শিরোনামের অধীনেও বলে এসেছি, এখানেও বলব, সিলেবাসের কিতাব ও বইয়ে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ের আলোচনা ঠেসে দেয়া হয়নি। প্রয়োজনীয় বহু বিষয় এমন আছে, যেগুলো অন্যান্য কিতাব ও বই পড়ে এবং 'পত্রিকা' শিরোনামের বিভিন্ন 'রিসালা' অধ্যয়ন করে জানতে হয়। পরীক্ষাকে লেখাপড়ার 'উপলক্ষ্যে'র পরিবর্তে 'লক্ষ্য' মনে করলে নিরাপদে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য যে সীমিত পরিমাণ পড়ার দরকার হবে, শিক্ষার্থী শুধু ততটুকু পড়বে। সিলেবাসের বাইরের কোনো কিতাব, বই ও 'রিসালা' পড়বে না।

---

[৯১]. সূরা শু'আরা, আয়াত নং ৮৮ - ৮৯

সব পত্রিকাই কি শিক্ষার্থীদের জন্য ক্ষতিকর?

আমার বড় অবাক লাগে, 'মারকাযুদ্দাওয়া আলইসলামিয়া ঢাকা'-র মুখপত্র মাসিক 'আলকাউসার'-এর মতো পত্রিকা পড়া থেকেও কোনো কোনো শিক্ষার্থী বিরত থাকে। কারণ, এগুলো পত্রিকা (?)! এমনকি পরীক্ষার পরবর্তী বিরতিগুলোতেও তারা সিলেবাস বহির্ভূত কিছু পড়ে না এবং তাদেরকে পড়ার অনুমতি দেয়া হয় না। কমপক্ষে উদ্বুদ্ধ তো অবশ্যই করে না। সুনির্দিষ্টভাবে কয়েকজনের কথা আমার মনে আছে, 'শবাস্তব বলছি না।

আমার মনে প্রশ্ন জাগে, এগুলো আদৌ কি সেই পত্রিকা, যা পড়া আমাদের কতিপয় আকাবির ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর বলেছেন? পত্রিকা নামধারী হলেই যদি ছাত্রদের তা থেকে দূরে থাকা জরুরি হয়, তাহলে মুজাদ্দিদে মিল্লাত হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. [১২৮০ - ১৩৬২ হি.]-এর তত্ত্বাবধানে থানাভবনের খানকা থেকে প্রকাশিত মাসিক النُّور পত্রিকার কোনো কপি যদি কোনো ছাত্রের হাতে আসে, অথবা শায়খুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. [১২৯৬ - ১৩৭৭ হি.]-এর তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত সাপ্তাহিক الجمعيت, অথবা দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত মাসিক الداعي, মাসিক دارالعلوم ও পাক্ষিক آئينہ دارالعلوم পত্রিকার দু-চার কপি যদি কোনো শিক্ষার্থীর সংগ্রহে থাকে, তবে কি শিক্ষার্থী এ ধরনের পত্রিকা পড়া থেকেও বিরত থাকবে? আল্লাহ সকলকে আকাবিরের পথে অবিচল রাখুন। আমীন!

তারপরও বলব, তুমি তোমার তা'লীমী মুরুব্বীর অনুমতি ছাড়া কিছু পড়বে না। ততটুকুই পড়বে যতটুকু পড়া তোমার তত্ত্বাবধায়ক উস্তাদ তোমার জন্য মুনাসিব মনে করবেন। তার বাইরে পড়া তোমার জন্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

দরসের পড়া আয়ত্ত করাই শিক্ষার্থীদের প্রধান কর্তব্য

ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই। আমি নিজেও এই আলোচনায় দরসের কিতাবসমূহকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়ার কথা বলেছি। তোমাদের স্মরণ থাকার কথা, আমি বলেছি, আসাতিজা কেরাম দরসগাহে যে তা'লীম দান করেন, সেগুলো আত্মস্থ করাই তোমার প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং প্রথমেই তুমি দরসের পড়াগুলো শিখবে।

পড়াতে মন না বসার কিছু কারণ ও সেগুলোর সমাধান

আগ্রহের অভাব

কারো মধ্যে লেখাপড়ার আগ্রহ কম থাকলে তার সমাধান হলো ঐ বিষয়ের গুরুত্ব ও উপকারিতা মনে বসানো। প্রথমে মূল ইলমের ফযীলত মনে বসাও। তারপর তোমার নির্দিষ্ট কিতাবের ভূমিকা পড়ে এবং উস্তাদের আলোচনা শুনে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝো। নিজে নিজেও ঐ বিষয়ের উপকারী দিকগুলো খুঁজে বের করো। তাছাড়া আগ্রহ আছে কি নেই সে দিকে না তাকিয়ে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে কাজ করতে থাক। তাতেও ধীরে ধীরে মনে আগ্রহ সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া বেশি বেশি رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا বলে আল্লাহর কাছে দু'আ করবে।

মনোযোগের অভাব

গল্প-গুজবের প্রতি আগ্রহ

মনের বিক্ষিপ্ততা

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. কে একটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রশ্নের সারকথা ছিল এই যে, মন খুব বিক্ষিপ্ত থাকে। পড়াশোনায় মন বসে না। মনোযোগের অভাব। গল্প-গুজব করতে খুব ভাল লাগে। কোনো কিছু মুখস্থ করা খুব কঠিন হয় এবং কিছু মুখস্থ করা হলেও মনে থাকে না।

তিনি উত্তরে লিখেছেন, মেরে দোস্ত! দুনিয়াতে কোনো কাজ হিম্মত ছাড়া হয় না। শুধু আকাঙ্ক্ষা ও দু'আর দ্বারাই যদি সকল কাজ হয়ে যেত, তাহলে আল্লাহ দুনিয়াকে 'দারুল আসবাব' বানাতেন না। আর আমাদেরকেও শরীয়তের অনুগত থাকার বিধান দিতেন না।[৯২] এ জন্য খালেস দিলে

---

৯২. হুজুর অন্য এক প্রসঙ্গে লিখেছেন– আজকাল আমাদের আরেকটা বড় সমস্যা হলো সব বিষয়ই আমরা দু'আ দিয়ে সমাধান করতে চাই। আত্মশুদ্ধির জন্য,

তওবা করে হিম্মত করুন এবং কিছু কিছু মুজাহাদা আরম্ভ করুন। আর আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করুন। আল্লাহ তা'আলা রাস্তা খুলে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

চিন্তা-ভাবনা বিক্ষিপ্ত থাকার যে কারণ আপনি উল্লেখ করেছেন তার জন্য রূহানী ও জিসমানী দুই ধরনের চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হওয়া কর্তব্য। রূহানী চিকিৎসক-এর অর্থ হলো, মুসলিহ ও শায়েখে কামেল।[৯৩] খুব দ্রুত আপনি কোনো শায়েখে কামেলের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক কায়েম করুন। পাশাপাশি কোনো অভিজ্ঞ ও দরদী চিকিৎসককে আপনার অবস্থা জানিয়ে ওষুধপত্র ব্যবহার করুন। এটা শুধু রূহানী রোগের বিষয় নয়। শারীরিক অসুবিধাও এখানে রয়েছে, যা সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে নিরাময়যোগ্য। [রূহানী ও জিসমানী উভয় ধরনের] চিকিৎকসক রোগীর জন্য আমানতদার হয়ে থাকেন। রোগীর সমস্যা তারা অন্যদের সঙ্গে আলোচনা করেন না এবং রোগীকেও তুচ্ছজ্ঞান করেন না। এ জন্য শায়খ ও ডাক্তারকে নিজের অবস্থা জানাতে কোনোরূপ দ্বিধা করা উচিত নয়।

পড়াশোনায় মন দিলেই মন বসবে। এটা কখনো ভাববেন না যে, 'মন বসা' ইচ্ছাধীন নয়। এটা মানুষের সম্পূর্ণ ইচ্ছা ও সামর্থ্যের ভিতরের বিষয়। কেউ হিম্মত করলেই আল্লাহ তা'আলা তাকে তাওফীক দান করেন।

খারাপ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য শুধু দু'আ চাই। অথচ শুধু দু'আ দিয়ে খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করা যায় না। আত্মশুদ্ধি করা যায় না। সেজন্য ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগাতে হয়। এরপর দু'আ-কান্নাকাটি করে যেতে হয়। হাকীম মাযহার সাহেবের কাছে আমি শুনেছি– আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলতেন, তাহাজ্জুদ পড়ে, দু'আ করে ও কাঁদতে কাঁদতে বুযুর্গ হওয়া যায়, কিন্তু আলেম হওয়া যায় না। তাফাক্কুহ অর্জন করা যায় না। সেজন্য দরকার মেহনত, মুজাহাদা ও অধ্যবসায়। অর্থাৎ সুন্নাতুল্লাহ বা আল্লাহ তা'আলার নীতিই হলো যে ব্যক্তি তার ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করে তিনি তাকে তাওফীক দেন। তো ইসলাহের জন্য ইচ্ছাশক্তি ব্যবহার করার কোনো বিকল্প নেই। ইচ্ছাশক্তির মধ্যে দু'আও শামিল থাকে। এরপর ভিন্নভাবে আরও দু'আ করে যেতে থাকলে ইনশাআল্লাহ খুব সহজেই ইসলাহ সম্ভব। [সূত্র. মাসিক আলকাউসার, মে '১৪, পৃ. ৪৫]

৯৩. সামনে ৪৯৭ নং পৃষ্ঠায় 'শায়েখে কামেলে'র পরিচয় দেয়া হয়েছে।

গল্প-গুজবের ব্যাপারে দু'টো বিষয় মনে রাখবেন। প্রথম বিষয়টি এই যে, যবানের ভুল ব্যবহার বা অহেতুক ব্যবহার মানুষের দ্বীন ও দুনিয়া দু'টোই বরবাদ করে দেয়। এজন্য একে নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত জরুরি। একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে- جِرْمُه صغيرٌ وجُرْمُه كبيرٌ [তার আকৃতি ছোট কিন্তু অপরাধ বড়] উক্তিটি স্মরণ রাখুন। দ্বিতীয় কথা এই যে, গল্প-গুজব তো একাকী কখনো হয় না। অবশ্যই অন্য কারো সঙ্গে আপনি গল্প-গুজবে মগ্ন হচ্ছেন। এতে অন্যের যেসময় আপনি নষ্ট করছেন, যদিও তার সন্তুষ্টিক্রমেই হোক না কেন, নিঃসন্দেহে তা কবিরা গুনাহ। আর যদি অন্যদের অসুবিধা হয়ে থাকে, তবে তো এটা তৃতীয় কবীরা গুনাহ। ভাই! নিজের উপর দয়া করুন।

পড়া ভুলে যাওয়ার অভিযোগও আপনি করেছেন। উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে আমল করতে থাকলে ইনশাআল্লাহ এই অভিযোগও দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হেফাজত করুন এবং প্রতি পদক্ষেপে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আমীন।[৯৪]

পড়া মনে না থাকা

অনেকের অভিযোগ হলো, পড়া মনে থাকে না, তাই পড়ায় মন বসে না। তাদেরকে বলব, এ পুস্তকের ৩৭৫ নং পৃষ্ঠায় মুখস্থ থাকা সংশ্লিষ্ট ইমাম আবু হানিফা রহ. ও ইমাম বুখারী রহ.-এর দু'টি উক্তি অতীত হয়েছে। তদ্রূপ ৩৭৮ নং পৃষ্ঠায় ওয়াকী বিন আলজার্‌রাহ রহ. ও হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা.-এর দু'টি উক্তি অতিবাহিত হয়েছে। উপরিউক্ত পৃষ্ঠাগুলো পুনরায় পড়ো। বরং তুমি ৩৪৬ নং পৃষ্ঠার 'পড়া আয়ত্ত করার চারটি পরামর্শ' এবং ৩৭৪ নং পৃষ্ঠার 'মনে রাখার চেষ্টা করা' শিরোনামদ্বয়ের পরবর্তী পুরো লেখাটিই পুনরায় পড়ে নাও। উপরন্তু আমি তোমাকে 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ৫২ নং পৃষ্ঠার 'মেধার স্বল্পতা' শিরোনামের পরবর্তী ঘটনা চারটি পুনরায় পড়ারও পরামর্শ দিচ্ছি। এগুলো পড়ো। হতাশা দূর হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

---

৯৪. 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' পৃ. ৫১৬ - ৫১৭

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর পিতা হযরত মাওলানা ইয়াহইয়া রহ.-এর একটি উক্তি একটু পর 'অবৈধ প্রেম' শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করব ইনশাআল্লাহ। তাতে তিনি বলেছেন, "একজন মানুষ যতই মেধাহীন ও দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হোক না কেন, যদি তার মাঝে বন্ধুত্ব পাতানো ও সম্পর্ক তৈরির রোগ না থাকে, তাহলে কোনো এক সময় সে অবশ্যই কাজের লোক হয়। আরেকজন যতই যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রখরমেধাবী ও জ্ঞানপিপাসী হোক না কেন, যদি তার মাঝে সম্পর্ক পাতানোর স্বভাব থাকে, তাহলে সে তার আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা বিস্মৃত হবেই।"

পূর্বের পরীক্ষায় ফেল করা

পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর না পাওয়া

পড়াতে মন না বসার আরেকটা কারণ হতে পারে, পূর্বের পরীক্ষায় ফেল করা, অথবা পরীক্ষায় আশানুরূপ নম্বর না পাওয়া। তো এ সম্পর্কে প্রথম কথা হলো, ফলাফল খারাপ হওয়ার দায়ভার নিজে নাও। ভুলগুলো খুঁজে বের করো। পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকো।

দ্বিতীয় কথা হলো, কয়েকবার ব্যর্থ না হয়ে সফল হয়েছে, অতীতে এমন সফল লোক খুব কমই অতিবাহিত হয়েছেন। ব্যর্থতার সিঁড়ি বেয়েই সফল ব্যক্তিরা সাফল্য অর্জন করেছেন। ভাগ্যবান তালিবে ইলমরা কখনো হতাশ হয় না। ব্যর্থতার সিঁড়ি পার হওয়ার সময়ও তারা আত্মবিশ্বাস হারায় না। তারা চেষ্টা অব্যাহত রাখে। এক সময় সফল হয়-ই।

পড়াশুনায় অভ্যস্ত না হওয়া

পড়াতে মন না বসার একটা কারণ পড়াশুনায় অভ্যস্ত না হওয়াও হতে পারে। তো এর জন্য জামাতের আদর্শ তালেবে ইলমদের অনুকরণ করো। তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো। পড়ার সময় তাদের সাথে বসে পড়বে। খানা একসঙ্গে খেলে তাদের সঙ্গে খাবে। বিকালে ঘুরতে বের হলে তাদের সঙ্গে বের হবে। তোমার মধ্যে তাদের ইতিবাচক প্রভাব পড়বেই।

উদ্যম একজন থেকে অপরজনে সঞ্চারিত হয়। উদ্যমী ছাত্রদের সংশ্রবে উদ্যমী হওয়ার এবং মেহনতি তালিবে ইলমদের সোহবতে মেহনতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং বন্ধু নির্বাচনে তোমাকে সতর্ক হতে হবে। আজেবাজে সহপাঠীদের সঙ্গে সম্পর্ক তো রাখবেই না, এমনকি যারা

লেখাপড়ায় কম উদ্যমী, সে সকল সহপাঠীদের সঙ্গেও সম্পর্ক কমিয়ে, আত্মবিশ্বাসী ও পরিশ্রমী ছাত্রদের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলো। এই সম্পর্ক তোমার সাফল্য ও প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে। মনে রাখবে, সহপাঠী মানেই বন্ধু নয়। সুসম্পর্ক থাকবে সবার সাথে। কিন্তু বন্ধুত্ব হবে কেবল তাদের সাথে, যাদের চেতনা ও লক্ষ্যের সাথে তোমার মিল রয়েছে। 'আপবীতি'তে[৯৫] 'পরিবেশের প্রভাব' শিরোনামে একটি অধ্যায় আছে। অধ্যায়টি পড়ে নিবে ইনশাআল্লাহ।

বস্তুত ছাত্রজীবনে বন্ধুদের প্রভাব অনস্বীকার্য। বরং অধিকাংশ ছাত্রদের জীবনধারা প্রধানত বন্ধুদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। বন্ধু বন্ধুর অনুরূপ হয়। তাই নেতিবাচক, লক্ষ্যহীন, অলস, ঝগড়াটে ও রূঢ় সহপাঠীদের থেকে সবসময় কৌশলে নিরাপদ দূরত্বে থাকবে। অন্যথায় তারা তোমাকে বিচ্যুত করতে পারে। মেষপালের সাথে সিংহ প্রতিপালিত হলে, সিংহও নিজেকে মেষ মনে করতে থাকে।

তাছাড়া লেখাপড়ায় মন বসার ভান করো, তাহলেও উপকার হবে, তুমি লেখাপড়ায় মনোযোগী হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

ভালো পরিবেশের অভাব

পড়ায় মন না বসার আরেকটা কারণ হতে পারে, ভালো পরিবেশের অভাব। এ সম্পর্কে উস্তাদে মুহতারাম শায়খুল হাদীস আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী দা.বা.-এর একটি উক্তি শোনাব– 'খোকা! পরিবেশ আসমান থেকে নাযিল হয় না। নিজের তৈরি করতে হয়'। লেখাপড়া মূলত নিজের কাজ। অনুকূল পরিবেশ হলো উন্নতির পথে সহায়ক। অন্যথায় ডালিম গাছের নীচে শাইখুল হিন্দ তৈরি হলেন কীভাবে?

'পরীক্ষায় ভালো ফল করার কলাকৌশল' বইয়ে[৯৬] আছে– 'অনেক ছাত্রছাত্রী অভিযোগ করে বাড়ীতে লেখাপড়া করার মতো পরিবেশ নেই। এটা আসলে শুধু একটা অজুহাত। কেউ পড়তে চাইলে মনের মতো পরিবেশের জন্য বসে থাকে না। সে জানে তাকে পড়তে বসতে হবে। কাজেই পরিবেশ যা-

---

৯৫. ২ঃ ১০৮ - ১২১

৯৬. পৃ. ২৬

ই হোক না কেন, সেটাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনবে না। পড়ার পরিবেশ নেই বলে যারা অজুহাত তোলে, তারা আসলে পড়ায় ফাঁকি দিতে চায়।

পরিবেশের সাথে নিজকে মানিয়ে নিয়ে পড়তে হবে আপনাকে। ধরা যাক, আপনার বাসা হৈ-হট্টগোলপূর্ণ বাসার ঠিক পাশে। এক্ষেত্রে হৈ-হট্টগোল সহ্য করেই আপনাকে পড়তে হবে। মনে রাখবেন পরিবেশের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকলে চলবে না। তাতে শুধু সময় নষ্ট হবে। যে-কোনো পরিবেশকে আপনার কাজের উপযুক্ত পরিবেশ বলে ভাবতে শিখুন, দেখবেন আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না।'

মনের অবৈধ আকর্ষণ

প্রসঙ্গত দ্বিধা বাদ দিয়ে বলি, আক্রান্তরা অবৈধ প্রেমের দুঃশ্চিন্তা থেকে মাথাটাকে পবিত্র করে নাও। কুদৃষ্টি ও কুকল্পনার নোংরামি থেকে পবিত্র হও। অবৈধ প্রেম ও অবৈধ আকর্ষণ জীবনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দেয়। আচ্ছা বলো তো, আসাতেজা কেরাম ও অভিভাবকবৃন্দ অর্থাৎ যারা তোমাদের কল্যাণকামী, তাঁরা কেন অবৈধ প্রেমে বাধা দেন? প্রয়োজনে আসাতেজা কেরামের সহযোগিতা গ্রহণ করো। পূর্ণ গোপনীয়তা বজায় রেখে তাঁরা তোমাদের সহযোগিতা করবেন ইনশাআল্লাহ। ৪৮৭ - ৪৮৯ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখিত 'পরবর্তী সংযোজন' শিরোনামের লেখাটি অবশ্যই পড়ে নিবে।

তাছাড়া কোনো কামেল শায়েখের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক স্থাপন করে চলবে। 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ২৬৭ - ২৬৯ নং পৃষ্ঠায় 'ছাত্র জীবনে বাইআত হওয়া না হওয়া' শিরোনামে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযুর নো'মানী রহ. যে আলোচনা করেছেন, আন্তরিকতার সাথে তা পুনরায় পড়ে নিবে।

আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.-এর "আল্লাহর মহব্বত লাভের পরীক্ষিত তিনটি কিতাব" নামে প্রকাশিত বইটি সকলের পড়া উচিত এবং বারবার পড়া উচিত।

শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. 'আপবীতি' কিতাবে লিখেছেন, "আব্বাজান সবচেয়ে বেশি কড়াকড়ি করতেন বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক তৈরির ব্যাপারে। তাঁর একটি উক্তি যা তিনি প্রায়ই বলতেন যে, 'একজন মানুষ যতই মেধাহীন ও

দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী হোক না কেন, যদি তার মাঝে বন্ধুত্ব পাতানো ও সম্পর্ক তৈরির রোগ না থাকে, তাহলে কোনো এক সময় সে অবশ্যই কাজের লোক হয়। আরেকজন যতই যোগ্যতাসম্পন্ন, প্রখরমেধাবী ও জ্ঞানপিপাসী হোক না কেন, যদি তার মাঝে সম্পর্ক পাতানোর স্বভাব থাকে, তাহলে সে তার আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা বিস্মৃত হবেই।'

তাছাড়া অল্পবয়সী দাড়িবিহীন বালকদের কারো সাথে মেলামেশা করা তাঁর দৃষ্টিতে অত্যন্ত আশঙ্কাজনক ছিল। ... আমার জন্য তো এটা সম্ভবই ছিল না যে, আমি কাউকে সালাম দিব কিংবা আমি স্বেচ্ছায় এমন কারো পাশে জামাতে নামাযে দাঁড়াব যার পাশে এর আগের নামাযে দাঁড়িয়েছিলাম। যদি অপরিচিত কেউ আমাকে সালাম দিত, তাহলে আমার কাছে জানতে চাওয়া হত যে, এ কে? যদি নামাযে আমার পাশে ঘটনাক্রমে এমন কেউ এসে দাঁড়াত, যে এর আগের নামাযেও আমার পাশে দাঁড়িয়েছিল, তাহলে ভয়ের চোটে নিয়ত ছেড়ে দিয়ে আমাকে অন্যত্র দাঁড়াতে হত। তা না হলে আমাকে ভুগতে হত। পাশের লোক আবার কী মনে করে এ জন্য কখনো আমাকে নাক ঝাড়ার বাহানা করতে হত। কখনো আবার কাশি ফেলার বাহানা করে সটকে পড়তে হত।"[৯৭]

তিনি আরও লিখেছেন, "আব্বাজানের নিকট লেখাপড়ার তুলনায় অবাধ মেলামেশা থেকে বেঁচে থাকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল।"[৯৮]

মানসিক আঘাত

মানসিক আঘাতের উদাহরণ হিসেবে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর অবস্থা উল্লেখ করা যায়। 'বিপদাপদ মানুষের জীবনে থাকেই। কিন্তু তাঁর জীবনে তা দেখা দিয়েছিল প্রচণ্ডরকম। উনিশ বছর বয়সে তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। ঠিক দশ মাস পর ইন্তিকাল করেন শ্রদ্ধেয়া জননী। বিবাহের কয়েক বছর পর ইন্তিকাল করেন প্রথমা স্ত্রী। সন্তানদের মধ্যে একের পর এক পাঁচজন ইন্তেকাল করে। দু' মেয়ের ইন্তেকাল হয় বিবাহের পর। অবশিষ্টরা শৈশবেই ইন্তেকাল করে। বিবাহের অল্প ক' বছর পর এক মেয়ের স্বামীর ইন্তেকাল হয়। এরপর ইন্তেকাল করেন তাঁর চাচা হযরত

---

৯৭. 'আপবীতি' ১ ঃ ২৫ - ২৬

৯৮. 'আপবীতি' ১ ঃ ৭৫

আকদাস মাওলানা ইলয়াস রহ.। এরপর ইন্তেকাল করেন তাঁর চাচাত ভাই ও জামাতা হযরতজী ইউসুফ রহ.। এরপর ইন্তেকাল করেন তাঁর পরমপ্রিয় দু' আকাবির শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানী ও হযরত আকদাস শাহ আব্দুল কাদির রায়পুরী রহ.। কিন্তু এত সব বিপদ সত্ত্বেও তিনি ভেঙ্গে পড়েননি। বরং প্রতিটি বিপদকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন।[৯৯]

শারীরিক অসুস্থতা

'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ৫৫ - ৫৬ নং পৃষ্ঠায় ইমাম শাফেয়ী রহ. ও তাবলীগ জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলয়াছ কান্দলবী রহ.-এর অসুস্থতার ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আকাবিরদের জীবনীগ্রন্থসমূহে এ ধরনের প্রচুর ঘটনা পাওয়া যাবে।

মানসিক আঘাত এবং শারীরিক অসুস্থতা অবশ্যই দুঃখজনক। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সুস্থ ও অবসর রাখুন। আর যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদেরকে ধৈর্যধারণ করার তাওফীক দিন এবং বিপদের উত্তম বিকল্প দান করুন। আমীন![১০০]

কিন্তু ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীগণ আল্লাহর রহমতে এ ধরনের ঘটনায় ভেঙ্গে পড়েন না। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. قِيْمَة الزَّمَنِ عندَ العلماءِ কিতাবে[১০১] ইমাম আলমুআফ্ফাক আলমাক্কী রহ.-এর مَنَاقِب الإمامِ أَبِي حَنِيفةَ কিতাব থেকে নকল করেছেন, ইমাম আবু ইউসুফ রহ. বলেছেন– আমার এক ছেলে মৃত্যুবরণ করল। আমি তার কাফন-দাফনে উপস্থিত থাকিনি। আমার প্রতিবেশী ও আত্মীয়দের উপর তাকে ন্যস্ত করলাম। যাতে ইমাম আবু হানিফার কোনো বিষয় জানা আমার না ছুটে যায় যার আক্ষেপ আমার কখনো দূর হবে না।[১০২]

---

৯৯. 'আপবীতি' ১ ঃ ১৩

১০০. اللَّهُمَّ أَجِرْهُمْ فِي مُصِيبَتِهِمْ وَأَخْلِفْ لَهُمْ خَيْرًا مِّنْهَا

১০১. পৃ. ৫৮

১০২. مَنَاقِب الإمامِ أَبِي حَنِيفةَ ১ ঃ ৪৭২

আঘাত ও অসুস্থতার শিকার শিক্ষার্থীদেরকে পূর্ণ প্রশান্ত ও সুস্থ মানুষদের মতো মেহনত করার কথা বলছি না। শুধু এটুকু বলছি যে, আমাদের উচিত এ ধরনের অবস্থার শিকার আকাবিরদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং আমাদের সাধ্যমত মেহনত করতে থাকা। আল্লাহ তাওফীকদাতা।

মাদরাসার লেখাপড়ার প্রতি আস্থাহীনতা

মাদরাসার লেখাপড়ার প্রতি আস্থাহীনতাও কারো কারো পড়াতে মন না বসার কারণ হতে পারে। এমন কেউ থেকে থাকলে তাকে হযরত আলী মিঁয়া নাদাবী রহ.-এর বয়ান সংকলন پا جا سراغ زندگی [অনুবাদ 'জীবন পথের পাথেয়'] কিতাবের চতুর্থ বয়ানটি বিশেষভাবে পড়ার পরামর্শ দিব। ঐ বয়ানটির শিরোনাম হলো, آج نبوت محمدی پر الحاد و دہریت کا حملہ ہے، کوئی شاہین ہے جو اسکے مقابلہ کی سعادت حاصل کرے؟ [মুহাম্মদী নবুওয়ত তোমাকে ডাকছে– হে জওয়ান! হও আগুয়ান]।

বাইরের সাথে সম্পর্ক

পড়ায় মন না বসার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটা কারণ হলো, বাইরের সাথে সম্পর্ক। মাদরাসায় থাকাবস্থায় নিজেদের সঙ্গে মোবাইল রাখা শিক্ষার্থীদের জন্য কত যে ক্ষতিকর, তা বলে শেষ করা যাবে না। যাদের আস্থা আছে যে, আসাতিজা কেরাম তাদের কল্যাণকামী, তারা নিজেদের সাথে মোবাইল রাখা ছেড়ে দাও। উস্তাদে মুহতারাম আল্লামা নূর হোসাইন কাসেমী দা.বা.কে বহুবার বলতে শুনেছি– 'ইলমের গভীরতা অর্জন হওয়ার জন্য গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন করা শর্ত। আর গভীর মনোযোগের সঙ্গে অধ্যয়ন সম্পন্ন হওয়ার জন্য বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা শর্ত।'

মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. বলেছেন, বর্তমানে মনকে বিক্ষিপ্ত করে এমন জিনিসের তো অভাব নেই। তবে পত্রিকা ও জাওয়াল [মোবাইল] এ ব্যাপারে সবচে' বেশি ক্ষতিকর। ... মাদরাসায় তো আশাকরি কেউ জাওয়াল ব্যবহার করে না। বাড়িতে গেলে অনেকে মা বাবা কিংবা বড় ভাই বা অন্য কারো জাওয়াল হাতে নেয়। সেটাও না করা উচিত। একান্তই কোনো প্রয়োজন হলে, যেমন তুমি তোমার উস্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাও, তো সেজন্য অবশ্যই তাদের অনুমতি নিবে। ... এবং ফোন করা শেষ হলেই রেখে দিবে। অযথা কখনো জাওয়াল হাতে

রাখবে না। বিশেষ করে যেসব জাওয়ালে শাবাকার [ইন্টারনেট] সংযোগ আছে, সেগুলোর ধারে কাছেও যাওয়ার চেষ্টা করবে না। শাবাকা মানে পুরো দুনিয়া। একজন তালিবে ইলমের নিমগ্নতা নষ্ট করে দেয়ার জন্য এর চেয়ে বড় মাধ্যম আর কী হতে পারে? এমনকি তিন মাস পরেও কোনো বিরতিতে বাড়ি গিয়ে তুমি শাবাকা ব্যবহার করবে, আর এই দীর্ঘ সময় যা কিছু অর্জন করেছ তার সবটুকু বরবাদ করে দিবে, এ আশঙ্কা অসম্ভব কোনো আশঙ্কা নয়।

তিনি আরও লিখেছেন, এখনকার তালিবে ইলমের মধ্যে ব্যাপকভাবে একটা সমস্যা দেখা যায়। চিন্তাগত সমস্যা। তারা মনে করে, আমাদেরকে সবকিছু জানতে হবে। সবকিছু শিখতে হবে। যুগসচেতন হতে হবে।

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ أَهْلَ زَمَانِهِ فَهُوَ جَاهِلٌ নিজের যামানা থেকে যে বেখবর সে জাহেল। এ কথা ঠিক। কিন্তু যামানার খরব রাখার পদ্ধতি কী? পত্রিকা পড়া? খবর দেখা? ইন্টারনেট ব্যবহার করা? ওরা এটাকেই ধরে নিয়েছে যুগসচেতনতা। অথচ তালিবে ইলমের জন্য যামানা সম্পর্কে 'বাখবর' বা যুগসচেতন হওয়ার পদ্ধতি এটা নয়। তালিবুল ইলম প্রথমে সঠিকভাবে ইলমে ওয়াহীকে ধারণ করবে। ইলমে ওয়াহীকে গ্রহণ করবে এবং সেজন্য মাদরাসার পরিবেশে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ রেখে পূর্ণ যোগ্যতা অর্জন করবে। এর পর যখন যামানাকে দিবে, যামানার সকল সমস্যার সমাধান পেশ করবে, তখন দেখা যাবে তার আর কী কী জানা দরকার। কিন্তু এখন তার নেয়ার সময়। গ্রহণ করার সময়। অর্জন করার সময়। দেয়ার সময় নয়। সেজন্য একজন 'মুকতাদা' আলেমের জন্য যামানা থেকে বেখবর হওয়া দোষের হলেও তালিবুল ইলমের জন্য এটা 'কামাল'। এটা গুণ।

চোখ কান মুখ সব কিছু বন্ধ করে নিজেকে ইলমের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে হবে এবং এখনই আমাকে সবকিছু জেনে ফেলতে হবে, এমন চিন্তা থেকে যেহেনকে মুক্ত করতে হবে। 'খোদরায়ী' [নিজে নিজে সিদ্ধান্তগ্রহণ] থেকে নিজেকে রক্ষা করতে না পারলে তালিবে ইলমীর যামানা কামিয়াব হতে পারে না। 'কিতাবী ইসতিদাদ' ও 'ফন্নী ইসতিদাদ'কে যে তালিবুল ইলম দ্বিতীয় পর্যায়ের মনে করে, সে আবার কিসের তালিবুল ইলম?[১০৩]

---

[১০৩]. মাসিক 'আলকাউসার', মে '১৪, পৃ. ৪৪ - ৪৫

উল্লেখ্য, 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ২৪৩-২৪৫ নং পৃষ্ঠায় 'কিতাবী ইসতিদাদ' ও 'ফন্নী ইসতিদাদ' অর্জন করার পদ্ধতির ব্যাখ্যা এসেছে।

শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া কান্দলবী রহ. 'আপবীতি' কিতাবে লিখেছেন, ইমাম গায্যালী রহ. إحياءُ العلوم কিতাবে লিখেছেন, তালিবে ইলমের অনেক আদব ও শর্ত আছে। তন্মধ্যে মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো দশটি। একটি হলো নিজেকে অন্য কোনো কাজে না জড়ানো। পরিবার-পরিজন ও ঘড়বাড়ি ছেড়ে দূরে গিয়ে ইলম অর্জন করা। যেন পারিবারিক কোনো কাজে জড়াতে না হয়। কারণ নানাবিধ সম্পর্ক সর্বদাই ইলম অর্জনে প্রতিবন্ধক হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাকে ইরশাদ করেন– مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ

অর্থ. আল্লাহ কোনো মানুষের মধ্যে দু'টি হৃদয় স্থাপন করেননি।[১০৪]

এ জন্য প্রসিদ্ধ আছে যে, তুমি তোমার সর্বস্ব বিলিয়ে না দেয়া পর্যন্ত ইলম তোমাকে কিছুই দিবে না। ইমাম গায্যালী রহ. বলেন, যে হৃদয় বিভিন্ন বিষয়ে লিপ্ত থাকে, তা ক্ষেতের সেই পানির ড্রেনের মতো, যা দিয়ে পানি ক্ষেতে প্রবেশ করতে পারে না। কিছু পানি এদিকে যায় আর কিছু যায় অন্য দিকে। আর কিছু বাতাসে মিলিয়ে যায়। পরিশেষে সামান্য যে পানি থাকে তা ক্ষেতের জন্য যথেষ্ট নয়।

আমি বাল্যকালে আমার আব্বার [মাওলানা ইয়াহইয়া কান্দলবী রহ.] কাছে একটি ঘটনা শুনেছি, একাধিকবার শুনেছি। একবার এক বয়স্ক ব্যক্তি মাদরাসায় পড়ার ইচ্ছা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়। তার স্ত্রী ও সন্তানাদি ছিল। ইলম অর্জনের আগ্রহ ও আবেগ ছিল তার তীব্র। তাই সে দূরে চলে যায়। সেখানে পড়ালেখা শুরু করে। কিছুদিন বাড়ির লোকেরা তার ঠিকানা খুঁজে পায়নি। তারপর ঠিকানা পাওয়ার পর তারা চিঠি পাঠাতে শুরু করে। দু' চারটি চিঠি পড়ে তিনি চিন্তিত হয়ে পড়েন। সেগুলোতে গৃহস্থালি বিভিন্ন সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা উল্লেখ ছিল। তিনি গোসলখানা থেকে একটি ভাঙ্গা পাত্র এনে নিজের কাছে রাখেন। দশ/বার বছর পর্যন্ত যত চিঠি ও টেলিগ্রাম আসে, তা না পড়ে সেখানে রেখে দিতেন। শিক্ষা-দীক্ষা সমাপ্তির

---

[১০৪]. সূরা আহযাব, আয়াত নং ৪

পর পাত্রটি উল্টো করে ধরে চিঠিগুলো বের করেন। পুরাতন চিঠিগুলো নিচে ছিল, সেগুলো উপরে উঠে আসে। তিনি ধারাবাহিকভাবে একটির পর একটি পড়তে থাকেন। কোনো চিঠিতে সন্তানের অসুস্থতার কথা, কোনোটিতে স্ত্রীর অসুস্থতার কথা, কোনোটি স্ত্রীর মৃত্যুবরণ করার সংবাদ, কোনোটিতে মায়ের মৃত্যুর সংবাদ, কোনোটিতে পিতার মৃত্যুর সংবাদ ছিল। যখন দেখলেন, আত্মীয়-স্বজন সকলেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তখন ভাবলেন, বাড়ি গিয়ে আর কী করব? তাই সেখানেই শিক্ষকতা শুরু করে দেন। মাসআলার দৃষ্টিকোণে ঘটনার নানাদিক নিয়ে ওলামায়ে কেরাম মত ব্যক্ত করবেন। কিন্তু ইলম অর্জনের জন্য এমনই হওয়া উচিত। এরূপ না হলে লক্ষ্যে পৌছা যায় না।[১০৫]

'বাইরের সাথে সম্পর্ক' শিরোনামে কথা কিছুটা দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু কথা বলার সুযোগ তো সবসময় হয় না। তাই এখানে আলোচ্য বিষয়ে ইমামে রাব্বানী হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ.-এর একটি ঘটনাও উল্লেখ করছি। আমাদের ফায়দা হবে ইনশাআল্লাহ। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. 'আপবীতি'তে[১০৬] লিখেছেন– হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গুহী রহ. একবার বলেন, আমি শাহ আব্দুল গণী রহ.-এর নিকট যখন পড়তাম, যেখানে আমার খাবার নির্ধারিত ছিল, সেখানে আমি নিজেই খাবার আনার জন্য যেতাম। রাস্তায় একজন আত্মভোলা লোককে পড়ে থাকতে দেখতাম। আমি পড়াশোনায় এত ব্যস্ত থাকতাম যে, দরবেশ কেন কোনো জিনিসের প্রতি তাকানোর আমার সময় ছিল না। একদিন আত্মভোলা লোকটি আমাকে বললেন, মৌলভী! তুমি প্রতিদিন কোথায় যাও? আমি বললাম, খাবার আনার জন্য যাই। তিনি বললেন, আমি তোমাকে দু' বেলাই এদিক দিয়ে যেতে দেখি। অন্য কোনো রাস্তা নেই? আমি বললান, অন্য রাস্তাটি বাজারের ভিতর দিয়ে। সেখান দিয়ে যাতায়াতে বিভিন্ন জিনিস চোখে পড়ে। হতে পারে কোনো জিনিস দেখে মন খারাপ হয়ে যাবে, তাই সেদিক দিয়ে যাওয়া-আসা করি না। আত্মভোলা লোকটি বলল, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তোমার আর্থিক অনটন আছে। আমি তোমাকে স্বর্ণ বানানোর পদ্ধতি শিখিয়ে দিব। তুমি একটা সময় করে আমার নিকট এসো।

---

১০৫. 'আপবীতি' ২ ঃ ৬৭ - ৬৮

১০৬. 'আপবীতি' ২ ঃ ৭০ - ৭১

আমি তাঁকে একটা সময় করে আসব বলে কথা দিলাম। কিন্তু খানকায় এনে পড়াশোনার ব্যস্ততায় আর স্মরণ ছিল না। দ্বিতীয় দিন লোকটির সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, মৌলভী! তুমি তো আসলে না। আমি বললাম, পড়ালেখার কারণে সময় করতে পারছি না, আচ্ছা শুক্রবার আসব। এরপর শুক্রবার আসল। কিতাব মুতালা'আর কারণে সেদিনও আমার স্মরণ ছিল না। এরপর আবার তার সাথে সাক্ষাৎ হয়।

তিনি বললেন, মৌলভী! তুমি আসার ওয়াদা করেছিলে। কিন্তু আসনি। আমার তো কিতাব মুতালা'আর কারণে স্মরণ থাকে না। আমি পরবর্তী জুমায় তাঁর নিকট যাওয়ার ওয়াদা করি। এভাবে কয়েক জুমা চলে যায়। আমার আর যাওয়া হয় না। পরিশেষে এক জুমায় সেই দরবেশ আমার নিকট খানকায় আসেন এবং আমাকে শাহ নিযামুদ্দীনের দরগায় নিয়ে যান। সেখানে তিনি আমাকে এক ধরনের ঘাস দেখিয়ে বলেন, এই ঘাস এই এই স্থানে পাওয়া যায়। ভালো করে দেখে নাও। আমি ভালভাবে চিনে নিলাম। সবশেষে তিনি সামান্য ঘাস ছিড়ে আনেন। আমার কামরায় এসে আমাকে সামনে বসিয়ে তা দ্বারা স্বর্ণ তৈরিতে লেগে যান। স্বর্ণ তৈরি হয় এবং আমি তৈরি করার পদ্ধতি শিখে নিই। স্বর্ণের টুকরাটি তিনি আমার হাতে দিয়ে এই বলে চলে যান যে, বিক্রি করে নিজের কাজে লাগাও। আমার কাজ ছিল কিতাব মুতালা'আ করা। বাজারে গিয়ে স্বর্ণ বিক্রি করার আমার সময় কোথায়?

কয়েকদিন পর সেই দরবেশের সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলেন, মৌলভী! তুমি সেই স্বর্ণ বিক্রি করনি? আচ্ছা যাও আমি বিক্রি করে দিব। পরে একদিন এসে আমার কাছ থেকে স্বর্ণখণ্ডটি নিয়ে যান এবং বাজারে বিক্রি করে তার মূল্য আমাকে দিয়ে যান। এরপর আরেকদিন তাঁর সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি আমাকে বলেন, মৌলভী! আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, তুমি আমার সাথে চলো। সেই ঘাস আবার দেখে নিবে। যাহোক, তিনি আমাকে সাথে সাথে নিয়ে যান এবং ঘাসটি দেখান। এরপর তিনি অন্যত্র কোথাও চলে যান।[১০৭]

---

১০৭. تذكرة الرشيد ২ ঃ ২৮৮

দেখেছো, লেখাপড়ার বাইরের সকল জিনিস থেকে হযরত গঙ্গুহী রহ. ছাত্রজীবনে কী পরিমাণ দূরে থাকতেন! কেমন ছিল তাঁর একাগ্রতার অবস্থা!

বাইরের সাথে সম্পর্ক রাখার আরেকটি পদ্ধতি হলো কোনো ছাত্র সংগঠনের সাথে সম্পর্ক রাখা।

আকাবিরদের দৃষ্টিতে ছাত্র সংগঠন

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. 'আকাবিরের দৃষ্টিতে ছাত্র সংগঠন' শিরোনামে 'আপবীতি' কিতাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন– আমার নিকট বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়ে দিচ্ছি। আমি মাদরাসাগুলোতে ছাত্র সংগঠনের সম্পূর্ণ বিরোধী। ছাত্রজীবন থেকেই এর খারাপ দিকগুলো আমার নিকট স্পষ্ট ছিল। কিন্তু দিনে দিনে যত অভিজ্ঞতা বেড়েছে, এর প্রতি আমার ঘৃণা ততোধিক বেড়েছে। এখন তো নামও শুনতে পারি না। এর থেকে জড়িত ছাত্রদেরকে মন থেকে ভাল লাগে না। কাজের বিষয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সাহাবায়ে কেরামের যে নীতি ছিল, আকাবিরদের প্রতি আমারও সেই একই নীতি। সাহাবায়ে কেরাম বলতেন, যে কাজ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেননি, আমরা কিভাবে তা করব? আল্লামা মুনযিরী রহ. الترغيبُ والترهيبُ কিতাবে[১০৮] হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেন– البَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ[১০৯] অর্থ. বরকত হলো তোমাদের আকাবিরদের সাথে।

---

[১০৮]. ১ ঃ ৩৫ হাদীস নং ১৬৬

[১০৯]. قال الشيخ محمد أَيْمَن الشَّبْرَاوِيُّ في حاشية «سِيَر أعلامِ النُّبَلاءِ» ٧ : ٣٨٥ طَبْع دارالحديث القاهرة : صحيح : أخرجه الحاكم (٦٢/١)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٧١/٨ - ١٧٢)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٦٥/١١)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (٣٦) و (٣٧) من طريق ابن المبارك، به وقال الحاكم : صحيح. و وافقه الذهبي. قلت : وهو كما قالا.

আমার আকাবিরগণ যারা নবীদের সত্যিকার উত্তরাধিকারী ও স্থলবর্তী তাঁদের কথা ও কাজকে আমি সর্বদা সুন্নতের অধিক অনুকূল পেয়েছি[১১০] এবং তার বিপরীতে আমি সর্বদা ক্ষতিই পেয়েছি। আকাবিরগণ সব সময় ছাত্র সংগঠনের বিরোধী ছিলেন। এ গ্রন্থে 'আকাবিরদের পাঠদান পদ্ধতি' অধ্যায়ে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছি। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম সদরুল মুদাররিসের আমলে দেওবন্দ মাদরাসায় 'ফয়েজ রেসাঁ' নামে একটি ছাত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। হযরত মাওলানা যখন বিষয়টা অবগত হলেন, তিনি বললেন, দুষ্টরা! এক একজন করে আস, তোদেরকে ছাত্র সংগঠন করানো শিখিয়ে দেব। সব অপদার্থকে মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করব। ব্যস, এক হুমকিতেই 'ফয়েজ'-এর পরিবর্তে 'হায়েজ' শুরু হয়ে যায়।

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. الْنُّوْر পত্রিকায় অধিক পরিমাণে এ বিষয়টার ভয়াভহতা বর্ণনা করেন এবং বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন। সেখান থেকে আমি 'স্ট্রাইক' গ্রন্থে অনেক কিছুই নকল করেছি। আমি স্বচক্ষে এ দৃশ্যও দেখেছি যে, সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এক ছাত্র নিহত হয়েছে। আকাবিরদেরকে অসম্মান করা হয়েছে। নিজ কর্মী, সমর্থক ও নেতার কথায় মাদরাসার আকাবির ও উস্তাদদের নির্দেশ অমান্য করার ঘটনাও ঘটেছে। এসব কর্মকাণ্ড দেখে এর প্রতি আমার ঘৃণা আরও বেড়ে যায়। এ সকল ছাত্রদের মাঝে আকাবিরদের প্রতি সম্মানবোধ তো থাকেই না, ইলমের সাথেও তাঁদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। ভাল বক্তব্য দিতে পারলেই নিজেকে আলেম মনে করে এবং উস্তাদদের সমালোচনা করে। আর যে উস্তাদদের সমালোচনা করে, ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়াই তার কপালের লিখন।

জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে। ছাত্র সংগঠনের নির্বাচনেও এসব কর্মকাণ্ড চলে। জাতীয় নির্বাচনে শহরবাসী ও গ্রামের লোকজন নিজ নিজ এলাকায় অবস্থান করে। প্রত্যেকের ঘর-বাড়ি বিরোধী পক্ষের লোকজনের ঘর-বাড়ি থেকে দূরে থাকে। কিন্তু ছাত্ররা সকলেই এক জায়গায় থাকে। আর নির্বাচনী বিরোধিতার ফলে পারস্পরিক পাল্টাপাল্টি

---

[১১০]. 'আপবীতি' ষষ্ঠ খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে 'কুরআন ও হাদীসের উপর আকাবিরগণের আস্থা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ আছে।

মিথ্যা ও বানোয়াট অভিযোগ, কুৎসা রটনার কথা সর্বদা মাদরাসা কর্তৃপক্ষ ও উস্তাদের নিকট পৌছতে থাকে। দু' পক্ষে মারামারির ঘটনা তো অহরহ ঘটে। মাদরাসা কর্তৃপক্ষেরও পেরেশানী বেড়ে যায়। তাদের বিষয়গুলো ফায়সালা করার জন্য আলাদা সময় ব্যয় করতে হয়। পড়াশোনা ও মুতালা'আর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকে না। প্রতিটি মুহূর্ত কাটে এ চিন্তা ও তদবিরে যে, কিভাবে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা যায় এবং মাদরাসা থেকে বহিষ্কার করা যায়। এটাই তাদের ভিন্ন ও স্বতন্ত্র কাজে রূপ নেয়। এ জন্য 'ছাত্র সংগঠন' শব্দের প্রতিই আমার ঘৃণা জন্মেছে। আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন।[১১১]

শায়খুল হাদীস রহ. 'আপবীতি'তে অন্যত্র লিখেন, ছাত্রদের পত্রিকা পাঠ, সভা-সমাবেশে যোগদান, সমিতি গঠন ও সংগঠন সম্পৃক্ততা ইত্যাদি বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি হলো, আমি এসব বিষয়কে ছাত্রদের জন্য ক্ষতিকর মনে করি। আমাদের ছাত্রজীবনে বরং শিক্ষকতার প্রাথমিক জীবনেও ছাত্রদের কথা তো পরে উস্তাদগণ পর্যন্ত পত্রিকা পাঠে অভ্যস্ত ছিলেন না। ছাত্রদের স্ট্রাইক এবং যেসব ফেৎনা ও হাঙ্গামা আজকাল মাদরাসাগুলোতে দেখা যাচ্ছে, আমার দৃষ্টিতে পত্রিকা পাঠের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ছাত্ররা পত্রিকায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও কল-কারখানার শ্রমিকদের স্ট্রাইকের ঘটনা পড়ে এবং তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। কিন্তু বেকুবরা এটা বুঝে না যে, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণের উত্তরাধিকারী ও উত্তরসূরী। তারা এরই যোগ্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের আদর্শকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরে দুনিয়াবাসীর জন্য আদর্শ ও অনুসরণীয় হবে। আর আহম্মকরা অন্যদের থুথু চেটে তাদের অনুসরণকারী হচ্ছে।

হযরত ওমর রা. কে তাওরাত পড়তে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তিম বর্ণ হয়ে গিয়েছিল। হযরত আবু বকর রা. তা অনুধাবন করতে পেরে তাঁকে বলেছেন, ওমর! তোমার ধ্বংস হউক। তুমি কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের চেহারা দেখছ না? ওমর রা.

---

[১১১]. 'আপবীতি' ২ ঃ ৩৭০ - ৩৭২

যখন চেহারা মুবারকের দিকে তাকালেন, তিনি ক্রোধ-বিবর্ণ চেহারা দেখে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দু' হাঁটু ফেলে বলতে শুরু করলেন– আমি আল্লাহর কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্রোধ থেকে আশ্রয় চাই। আমরা রব হিসেবে আল্লাহর প্রতি, ধর্ম হিসেবে ইসলামের প্রতি এবং নবী হিসেবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের প্রতি সন্তুষ্ট। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম বললেন, মুহাম্মদের প্রাণ যার হাতে তাঁর শপথ, যদি মুসা তোমাদের সামনে বিদ্যমান থাকতেন আর তোমরা আমাকে ছেড়ে তাঁর অনুসরণ করতে, তাহলে তোমরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হতে। যদি মুসা জীবিত থাকতেন এবং আমার নবুয়ত-কাল পেতেন, তাহলে অবশ্যই আমার অনুসরণ করতেন।[১১২]

রাঈসুল আহ্‌রার মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব রহ. তাঁর ছোট ছেলেদেরকে শায়খুল হাদীস রহ.-এর তারবিয়তে রাখার অনুরোধ করেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর শায়খ নিম্নোক্ত চার শর্তে তাদেরকে নিজের এক স্নেহাস্পদ মৌলভী আনীসুর রহমান ছাহেবের মাদরাসায় রাখেন–

১. সংবাদপত্র দেখা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। কোনো সংবাদপত্র দেখার অভিযোগ যদি আমার কাছে আসে তাহলে সালাম।

২. কোনো সভা-সমাবেশে যেতে পারবে না। উক্ত সমাবেশে আব্বাজান [মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেব] বক্তৃতা করুন কিংবা শাহ আতাউল্লাহ বুখারী বক্তৃতা করুন কিংবা হযরত মাদানী বক্তৃতা করুন কিংবা স্বয়ং আমিও যদি কোনো সমাবেশে অংশগ্রহণ করি, তবু তাতে যাওয়া যাবে না। কোনো কারণে যদি আমি অনুমতি দিয়েও দেই তবুও না।

৩. আমার অনুমতি ছাড়া মাদরাসার বাইরে যেতে পারবে না।

৪. কোনো ছাত্রের সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখতে পারবে না। কেউ বন্ধুও নয়, শত্রুও নয়। কারো সাথে মহব্বতও নয়, দুশমনিও নয়।

---

১১২. 'আপবীতি ১ ঃ ১৯৮ - ১৯৯। আর হাদীসের সূত্র হলো, সুনানে দারেমী ১ ঃ ১২৬, হাদীস নং ৪৩৫; মুসনাদে আহমদ ৩ ঃ ৩৮৭; কিতাবুস্ সুন্নাহ লিবনি আবী আসিম ১ ঃ ২৭, হাদীস নং ৫০

শায়খুল হাদীস রহ. লিখেছেন, মাওলানার ছেলেকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমি তার সদা কৃতজ্ঞ থাকব। প্রথম দু'টি শর্ত সে আমার প্রত্যাশার চেয়েও ভালোভাবে পালন করেছে। এক দু'বছর পর যখন মনে করলাম যে, বক্তৃতা শুনলে কোনো ক্ষতির আশংকা নেই, তখন উপরিউক্ত তিন আকাবিরের বক্তৃতা শোনার তাকে অনুমতি দেই। অন্তর থেকে এবং ইখলাসের সাথে তাকে অনুমতি দেই কিন্তু সে বলল, আমার তো কৃত ওয়াদা পুরো করতে হবে।[১১৩]

মোটকথা, পড়াতে মন না বসার বিভিন্ন কারণ থাকতে পারে। কারণ চিহ্নিত করে সেগুলো দূর করো। 'ইলমে দ্বীন থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ' শিরোনামে আদীব হুজুরের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইয়ে[১১৪] আলোচনাটি যুক্ত হয়েছে। আলোচনাটি অবশ্যই পড়ে নিবে, অনেক উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ।

---

১১৩. 'আপবীতি' ১ ঃ ৭০। শায়খ তারপর লিখেছেন, তবে তৃতীয় ও চতুর্থ শর্তের উপর মৌলভী আনীস তেমন দৃঢ়তা দেখাতে পারেনি, যেমনটি প্রথম দু'টি শর্তের ক্ষেত্রে দেখিয়েছিল। যদি আমি বলি যে, মূলত এর জন্য আমার দুর্বলতাই দায়ী তাহলে তা অতিশয়োক্তি হবে না।

এরপর শায়খ আরও লিখেছেন, মাওলানা হাবীবুর রহমান ছাহেবের পীড়াপীড়ির পেছনে মৌলভী আব্দুল জলীলেরও কিছুটা ভূমিকা ছিল। মূলত তাকে দেখেই তাঁর ছেলেকে আমার তরবিয়তে রাখতে তিনি আগ্রহী হন। মৌলভী আব্দুল জলীল ছিল হযরত রায়পুরী রহ.-এর ভাতিজা। আমার কাছে থাকত এবং মাদরাসায় পড়ত। অত্যন্ত একাগ্রতা ও অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশুনা করত এবং ঈর্ষণীয় জীবনযাপন করত। তার একটি অভ্যাস আমার কাছে বেশ ভাল লাগত। হযরত রহ. যখন সাহারানপুর আগমন করতেন এবং কোথাও তাঁর দাওয়াত বা থাকা হত, সে কখনো ঘর থেকে না খেয়ে সেখানে উপস্থিত হত না। আমার ঘর থেকে খেয়ে তারপর যেত। লোকেরা খাওয়ার অনুরোধ করলে কিংবা স্বয়ং হযরত বললেও বিনয়ের সাথে অস্বীকৃতি জানাত আর বলত, আমি খেয়ে এসেছি। আমিও অনেক সময় বলতাম কিন্তু ও সর্বদাই ওযর পেশ করত। কেউ যদি আগে থেকে দাওয়াত করত তাহলে বলত, ঐ সময় আসা সম্ভব নয়। আমার তখন আসায় লেখাপড়ার ক্ষতি হবে।

১১৪. পৃ. ৩২১ - ৩২৫

ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

অতএব, তোমার ইচ্ছা করতে হবে। কথায় আছে– ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। আর ভালো হওয়ার যদি তুমি ইচ্ছাই না করো, তাহলে যত কৌশলই বলা হোক না কেন, কোনো লাভ হবে না। আর শোনো– ইচ্ছা করাও একটি ইচ্ছাধীন বিষয়। সুতরাং ভালো হওয়ার ইচ্ছা করো, ইচ্ছার কল্পনা নয়।

'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ১৯০-১৯৫ নং পৃষ্ঠায় 'ইলমের মহব্বত বৃদ্ধির ১২ টি উপায়' শিরোনামের লেখাটি পুনরায় পড়ে নিবে।

দু'টি আশার বাণী

১. আশা করি তোমার স্মরণ আছে, 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ৯৫ নং পৃষ্ঠায় ও ১০২ নং পৃষ্ঠায় পড়েছ– জীবনে সফল হওয়ার প্রধান ভিত্তি দু'টি– ক. ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি, খ. সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য। ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে পারলে তোমারও এই অভিজ্ঞতা অর্জন হবে যে, মেধার স্বল্পতা, শারীরিক অসুস্থতা, আর্থিক অসচ্ছলতা, আর্থিক অধিক সচ্ছলতা, পারিবারিক প্রতিকূলতা, পরিবেশের প্রতিকূলতা, বংশীয় আভিজাত্যহীনতা, ইয়াতীম হওয়া, বয়স বেশী হওয়া, জীবনের দীর্ঘ সময় বিপথে কেটে যাওয়া, এমনকি শারীরিক ত্রুটি যেমন বধিরতা বোবাত্ব ও অন্ধত্ব ইত্যাদি কিছুই বাধা নয়। সফলতার প্রাকৃতিক নিয়মাবলি অনুসরণকারীদেরকে এ ধরনের কিছুই বাধা দিয়ে রাখতে পারে না। এগুলো প্রধান সমস্যা নয়। প্রধান সমস্যা হলো নেতিবাচক মানসিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি।

২. 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ৯৫ নং পৃষ্ঠায় এ কথাও জেনেছ যে, বাস্তবতা হলো, যারা কোনো বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয় না, তাদের তুলনায় যারা বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, তাদের আত্মবিশ্বাস ও কর্মক্ষমতা অনেক বেশী হয়।

শেষ কথা

আলোচনার পটভূমি

দেখো ভাই! একটা অপরাধবোধ থেকে এই আলোচনাগুলো শুরু হয়েছিলো। তোমরা আমার কাছে লেখাপড়াসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যার কথা বল। নিজেও অনেকের বিভিন্ন দুরাবস্থা লক্ষ করি। একজন শিক্ষক হিসেবে النَّصِيحَةُ। الدِّينُ [দীন হলো কল্যাণকামিতা]-এর দাবি অনুসারে আমার পক্ষে যতটুকু সমাধান পেশ করা সম্ভব, তা পুরোপুরি বলা উচিত ছিল। কিন্তু অন্যান্য ইলমী ব্যস্ততার কারণে সুবিন্যস্তরূপে বিস্তারিত আলোচনা করা হত না। বিক্ষিপ্তভাবে সাধারণ কিছু কথাই শুধু বলা হত। এভাবে বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছিল। ফলে কতক ভাই তো এ পর্যন্ত বলেছে– আমাকে নাকি আল্লাহর দরবারে এর জন্য জবাব দিতে হবে। আমার কাছেও এ ব্যাপারে আমার প্রায় চুপ থাকাটা রীতিমত একটা অপরাধ মনে হতে থাকে। এই অনুভূতি তীব্র হতে হতে এক সময় তীব্রতর হলো এবং অসহ্যকর পর্যায়ে পৌঁছল। অবশেষে 'দরসে তরজমাতুল কুরআন'সহ অন্যান্য জরুরি কাজ কিছুটা মুলতবি রেখে হলেও লেখাপড়াসংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোর সমাধান বিষয়ে বিস্তারিতভাবে কথা শুরু করতে বাধ্য হই। আল্লাহর শোকর, তিনি বিভিন্ন দিক স্পষ্ট করার তাওফীক দান করেছেন। ডক্টর আব্দুর রহমান রাফাত পাশা-এর فَنُّ الدِّرَاسَةِ ও فَنُّ الْإِمْتِحَانَاتِ কিতাব দু'টির মূল বক্তব্যগুলোও এ আলোচনায় এসে গেছে। আল্লাহ যদি কবুল করেন, তবেই সার্থকতা। অন্যথায় ... নাহ! বলতে কষ্ট লাগছে। আল্লাহ হেফাজত করুন! আমীন!!

আমি ও তোমরা কেউ যেন জবাবদিহিতার মুখোমুখি না হই

তোমাদের প্রতি আমার খুব ঈর্ষা লাগছে। তোমরা এ সমস্ত দিক-নির্দেশনার অনুসরণ করে অনেক অগ্রসর হয়ে যাবে। আর আমি? আমি কি كَنَبْلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا থেকে যাব? আল্লাহ আমাকেও নিজকে গড়ার তাওফীক দিন। এ প্রশ্নের সম্মুখীন যেন না হই যে, ছাত্রদেরকে তো অনেক উপদেশ খয়রাত

করেছ, নিজকে কতটুকু গড়েছ? হ্যাঁ, তোমরাও যেন এ জিজ্ঞাসার মুখোমুখি না হও যে, দিক-নির্দেশনা তো কম পাওনি, কতটুকু কদর করেছ?

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ، فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَه، اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَاهُمُ اللهُ، وَاُولٰئِكَ هُمْ اُوْلُوا الْأَلْبَابِ.

সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও, যারা মনোযোগের সঙ্গে কথা শোনে, তারপর তার সর্বোত্তম কথার অনুসরণ করে। ওরাই হলো এমন লোক আল্লাহ যাদের হেদায়াত দান করেছেন। আর ওরাই হলো বুদ্ধিমান।[১১৫]

সেসকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর কথা বড় বেশী মনে পড়ছে, যাদের উচ্চারণ বা আচরণ আমাকে এ আলোচনাগুলো করতে অনুপ্রাণিত করেছে, যারা হয়েছে একটি বরকতময় সাদকায়ে জারিয়ার অসীলা। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে قَابِلْ ও مَقْبُوْل [যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য] বানাও! আমীন!!

আলোচনা এখানেই আপাতত শেষ করছি।

وَصَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَعُلَمَاءِ اُمَّتِهٖ أَجْمَعِيْنَ.



---

[১১৫]. সূরা যুমার, আয়াত নং ১৭ - ১৮

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা

ভূমিকা

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য স্বাস্থ্যের প্রতি যথাযথ যত্নবান থাকা খুবই প্রয়োজন। কারণ, সর্বদা উদ্যম ও আগ্রহের সাথে লেখাপড়া করতে পারার পেছনে স্বাস্থ্যের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। তাই স্বাস্থ্যের ভিত্তিসমূহ কী কী এবং সুস্বাস্থ্যের জন্য কী কী করণীয়, এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে কিছু কথা জানা থাকা খুবই জরুরি।

নিম্নে এমন কিছু নির্দেশনা প্রদান করা হচ্ছে, যেগুলো অনুসরণ করলে স্বাস্থ্যবিষয়ক দিকনির্দেশনার প্রাথমিক প্রয়োজন মোটামুটি পূরণ হবে ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া মাঝে মধ্যে অভিজ্ঞ এবং আন্তরিক কোনো স্বাস্থ্যবিশেষজ্ঞের পরামর্শও গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য, দুনিয়ার আফিয়াতের তুলনায় অনেক বেশী প্রয়োজন আখেরাতের আফিয়াত। তাই দুনিয়ার আফিয়াতের চেষ্টার তুলনায় আখেরাতের আফিয়াতের চেষ্টা যেন আমাদের বেশী হয়।

সুস্বাস্থ্যের অর্থ

১. সুস্বাস্থ্য মূলত কর্মক্ষমতার নাম। শরীরের মাংস বা পেশি সুস্বাস্থ্যের মানদণ্ড নয়।

২. শুধু সুস্থ থাকার নাম সুস্বাস্থ্য নয়। ভালো থাকার এমন এক অন্তর্গত অনুভূতিকে সুস্বাস্থ্য বলে, যা ব্যক্তিকে তার কর্মে সবসময় আনন্দিত রাখে।

সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি

১. শোকর, দু'আ ও দান, ২. সঠিক জীবনদৃষ্টি, ৩. পরিমিত স্বাস্থ্যসম্মত আহার, ৪. যথানিয়মে পর্যাপ্ত পানি পান, ৫. শিথিলায়ন, ৬. দম চর্চা, ৭. ব্যায়াম/হাঁটা।

স্বাস্থ্য ও নিরাময়ের দায়িত্ব প্রত্যেকের নিজের নিতে হয়। সুস্বাস্থ্যের ভিত্তিসমূহ অনুসরণ করতে পারলে প্রচলিত চিকিৎসাব্যবস্থার শতকরা ৯০

ভাগ খরচই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। কারণ, ৯০ ভাগ রোগই জন্ম নেয় সুস্বাস্থ্যের ভিত্তিসমূহ অনুসরণ না করার ফলে। শতকরা মাত্র ১০ ভাগ রোগের কারণ দৈহিক আঘাত এবং ঔষধ ও অপারেশনের প্রতিক্রিয়া।

ভিত্তিসমূহের ব্যাখ্যা

১. শোকর, দু'আ ও দান

ঈমানের পর সুস্বাস্থ্য ও অবসর আলাহ্ তা'আলার সবচেয়ে বড় নেয়ামত। শোকর আদায় করলে আল্লাহ্ তাঁর নেয়ামত বাড়িয়ে দেন। তাই নিজের প্রয়োজনেই আল্লাহর সকল নেয়ামতের জন্য শোকর করবে। তোমাকে যা দেয়া হয়েছে, তার পরিমাণ চিন্তা করো। আল্লাহর যেসকল বান্দা সে পরিমাণ করুণা লাভ করেনি, তাদের অবস্থা স্মরণ করো। তাহলে শোকরের মনোভাব সৃষ্টি হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর দরবারে নিজের ও সকলের সুস্বাস্থ্য ও অবসরের জন্য দু'আ করবে। আল্লাহ্ দু'আ কবুল করেন।

আর সমস্যামুক্তিতে দানের ভূমিকাও হাদীস ও বাস্তবতা দ্বারা সুপ্রমাণিত। সচ্ছল-অসচ্ছল উভয়াবস্থায় সামর্থানুযায়ী আন্তরিকতার সাথে দান করবে। তাছাড়া, দান অন্তরে তৃপ্তি দান করে এবং সম্পদে বরকত আনয়ন করে।

২. সঠিক জীবনদৃষ্টি

ক. 'সঠিক জীবনদৃষ্টি' দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হলো, মনে-প্রাণে এই বিশ্বাস করা যে, আমি সুস্থ থাকব বা আমি সুস্থ হব। মূলত ইতিবাচক মানসিকতা ও আশাবাদ স্বাস্থ্য রক্ষা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং নিরাময় তরান্বিত করে।

খ. মানব দেহ আলাহ তা'আলার সবচেয়ে বিস্ময়কর সৃষ্টি। চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ বিষয়টি মোটামুটি জানেন। মানুষ প্রতিদিন কোটি কোটি ভাইরাস প্রভৃতির মুখোমুখি হয়। কিন্তু সেগুলোর অতি ক্ষুদ্রাংশই রোগ পর্যন্ত গড়ায়। এর কারণ, আলাহ তা'আলা প্রত্যেককেই রোগের বিরুদ্ধে শারীরিক ও মানসিক প্রতিরোধক্ষমতা দান করেছেন। বস্তুত সুস্থতা স্বাভাবিক, অসুস্থতা অস্বাভাবিক।

গ. আমাদের দেহ নির্বোধ জড় পদার্থ নয়। দেহের প্রতিটি কোষে সংবাদবাহক আছে। আবেগ-অনুভূতিই মূলত সেসমস্ত সংবাদবাহকের মাধ্যমে প্রতিটি কোষকে পরিচালনা করে। ফলে রোগ নিয়ে যারা অহেতুক দুশ্চিন্তায় ভোগে, তারা সহজে রোগাক্রান্ত হয়। পক্ষান্তরে যারা ব্যস্ত, রোগ নিয়ে দুশ্চিন্তা করার সময় পায় না, তাদের গড়পড়তা স্বাস্থ্য অনেক ভালো। অতএব, পূর্ণ উচ্ছ্বাসের সাথে দিনে অন্তত ২০ বার একান্ত মনে বলবে– 'শোকর আলহামদুলিল্লাহ, বেশ ভালো আছি।'

ঘ. পূর্বের পয়েন্টে শুনেছ, চিন্তা-চেতনাই মানুষের মন ও দেহ নিয়ন্ত্রণ করে। সুতরাং রাগ, ক্ষোভ, সন্দেহ প্রভৃতি নেতিচিন্তা থেকে মুক্ত থাকবে। তদ্রূপ অশ্লীল ছবি দেখা প্রভৃতি স্নায়ু-উত্তেজক আবেগ সংযত রাখবে। কারণ, এগুলো দেহে বিষাক্ত অণু সৃষ্টি করে এবং দুরারোগ্য ব্যাধি জন্ম দেয়। ক্ষোভ ও বিদ্বেষ এমন বিষ, যা নিজে পান করে, আর ভাবে– মারা যাবে তার প্রতিপক্ষ। নেতিচিন্তার প্রভাবে দেহের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। সবসময় ইতিবাচক চিন্তা করবে। তোমার সুস্থ থাকার সামর্থ বেড়ে যাবে।

ঙ. পাশ্চাত্যের চিকিৎসাব্যবস্থা আসলে হয়ে উঠেছে চিকিৎসাব্যবসা। আর এ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করছে বীমা কোম্পানী, ঔষধ কোম্পানী ও চিকিৎসা প্রযুক্তি নির্মাণ ফ্যাক্টরির মালিকেরা। মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসকগণ পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন– লোকেরা মনে করে যে, সুস্বাস্থ্য বা নিরাময় ডাক্তারের কাছে বা হাসপাতালে রয়েছে। ডাক্তার তাদরকে ট্যাবলেট বা ইনজেকশন দিয়ে সুস্থ করে দিবেন। এ আশায় ডাক্তারের পর ডাক্তার ও ঔষধের পর ঔষধ পরিবর্তন করে। কিন্তু নিরাময় লাভ করতে ব্যর্থ হয়। সুস্বাস্থ্যের ভিত্তিসমূহ অনুসরণ করে সুস্থ থাকার দায়িত্ব মূলত প্রত্যেকের নিজের নিতে হয়। ডাক্তার শুধু পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী মাত্র।

চ. ছোটখাটো অসুখ হলেই ঔষধ খাবে না। এতে নতুন রোগ সৃষ্টি হতে পারে। ব্যাকটোরিয়া ও ভাইরাসজনিত রোগে প্রয়োজনে ডাক্তারের শরণাপন্ন হবে। তবে এমন ডাক্তারের কাছেই যাবে, যিনি যথেষ্ট সময় দিয়ে মনোযোগের সাথে রোগী দেখেন এবং ঔষধ পরিমিত লেখেন। আর আল্লাহ না করুন, কোনো গুরুতর শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে কমপক্ষে তিনজন বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণ করবে। সরকারী বড় বড় হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারও থাকেন, আবার খরচও কম হয়।

৩. পরিমিত স্বাস্থ্যসম্মত আহার

ক. টিনজাত, প্রক্রিয়াজাত ও পরিশোধিত কোনো খাবার খাবে না। এ সমস্ত খাবার বিভিন্ন কঠিন রোগ সৃষ্টির কারণ হয়। তথাকথিত কোমল পানি কিডনী ও মূত্রাশয়ের জন্য অত্যন্ত কঠিন প্রমাণিত হতে পারে। তাই তা সম্পূর্ণ বর্জন করবে। মিষ্টি বিশেষ করে রঙ্গিন মিষ্টি খাবে না। কারণ, খাবারের যে রঙ দেয়া হয়, তা ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হতে পারে। এ ছাড়া অতিরিক্ত তেল, মশলা, ঝাল ও ভাজা-পোড়া খাবার যথাসম্ভব বর্জন করবে। হোটেলের খাবার পারতপক্ষে খাবে না। ফাস্টফুডেরও কিছু খাবে না। চিকিৎসকগণ বলেছেন, ফাস্টফুড ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। হাড়, দাঁত ও চোখের জটিলতা, এমনকি কিডনী ও মূত্রাশয়ের ক্যান্সার সৃষ্টির কারণ হতে পারে।

খ. পুষ্টি বিশেষজ্ঞগণ ময়দার পরিবর্তে লাল আটা, চিনির পরিবর্তে গুড়, দুধ চায়ের পরিবর্তে গুড় দিয়ে হালকা রঙ চা, প্যাকেটজাত ফলের রসের পরিবর্তে টাটকা ফল এবং কোমল পানির পরিবর্তে ডাব, আর ডাব না পাওয়া গেলে লেবু-পানি খাওয়ার পরামর্শ দেন।

গ. বাঁধা কপি, লালশাক, পুঁইশাক, ডাটা প্রভৃতি সবজি পর্যাপ্ত খাবে। ডাল খাবে পরিমিত। আর মাছ ও গোশত খাবে সীমিত পরিমাণে। খাবারে সালাদ খাবে। টমেটো, গাজর, শসা, ধনিয়া পাতা, পুদিনা পাতা ইত্যাদি দিয়ে সালাদ তৈরি করবে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে এক মুঠ ভিজানো কাঁচা ছোলা ও এক টুকরো আদা এক চিমটি বিট লবণসহ খাবে। আর সবসময় দেশীয় মৌসুমী ফল পর্যাপ্ত খাবে। মৌসুমী ফল সে মৌসুমের রোগ-ব্যাধির প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। পুষ্টির জন্য দুধ, কলা ও ডিম খাবে। এক কথায়, স্বাভাবিক প্রাকৃতিক খাবার খাবে।

ঘ. চোখের ক্ষুধা সংযমের সাথে দমন করবে। আর কখনো খাওয়ার প্রতিযোগিতায় নামবে না। তা তোমার অপূরণীয় ক্ষতির কারণ হতে পারে। রাসূল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের আদর্শ অনুসরণ করে পাকস্থলীর এক-তৃতীয়াংশ সবসময় ফাঁকা রাখবে। এক-তৃতীয়াংশ খাবার ও এক তৃতীয়াংশ পানীয় দ্বারা পূর্ণ করবে। চিকিৎসকগণ দীর্ঘ নিরীক্ষায় দেখেছেন, এভাবে খাবার গ্রহণ করলে পাকস্থলীর রোগ-ব্যাধি থেকে পুরোপুরি মুক্ত থাকা যায় এবং শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।

ডাক্তারগণ ওজন কমাতে তেলেভাজা খাবার, কেক, বিস্কুট, চকোলেট ও আইসক্রিম পরিহার করারও পরামর্শ দেন।

ঙ. রাতে চর্বিদার ও গুরুপাক খাবার খাবে না এবং খাওয়ার পরপরই শুয়ে পড়বে না। ['গুরুপাক' অর্থ– সহজে হজম হয় না এমন; দুষ্পাচ্য।] তা দুঃস্বপ্ন ও হার্ট এটাকের কারণ হতে পারে। আর কখনো গুরুপাক খাবার খেয়ে ফেললে একটুকরো লেবুর খোসা চিবিয়ে খাবে। লেবুর খোসা প্রাকৃতিক হজমী। হ্যাঁ, অনাগ্রহ ও বিরক্তির মনোভাব নিয়ে কখনো কিছু খাবে না। খাওয়ার আগে বিশ্বাসের সাথে মনে মনে বলবে, 'আল্লাহ মজার সাথেই খাওয়াবেন। ইনশাআলাহ সব হজম হবে।' দেখবে, খুব ভালো হজম হয়েছে।

৪. যথানিয়মে পর্যাপ্ত পানি পান

ক. আল্লাহ তা'আলা পানির মধ্যে অনুর্বর মাটিকে উর্বর করার মতো ক্ষমতা রেখেছেন। তো পানি নিরাময়ের অন্যতম একটি উৎস। সুস্বাস্থ্যের জন্য পানি পান করার ডাক্তারি পদ্ধতি হলো–

রাতে দাঁত পরিষ্কার করে ঘুমাবে। ভোরে ঘুম থেকে উঠে কুলি না করে সহজে যতটুকু সম্ভব পানি পান করবে।

খ. সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবারের পর দু' ঘণ্টা পর্যন্ত এবং রাতের খাবারের পর ঘুমানো পর্যন্ত কোনো খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করবে না। আর রাতের খাবার সন্ধ্যার পর পর খেয়ে নিবে। নাস্তা ও খাবারের সময় পানি পান করবে প্রয়োজন অনুপাতে সামান্য পরিমাণ। নাস্তা ও খাবারের এক ঘণ্টা পর সম্ভব অনুসারে দু-এক গ্লাস পানি পান করবে।

এ পদ্ধতিতে পানি পান করলে আল্লাহর রহমতে রোগমুক্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

৫. শিথিলায়ন

ক. টেনশন হলো, ভাবাবেগজনিত চাপ ও উৎকণ্ঠার নাম। এর ফলে শরীরের পেশী উত্তেজিত ও শক্ত হয়ে উঠে। এ অবস্থা দ্বারা মস্তিষ্ক প্রভাবিত হয়। আর তখনই শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তি বাড়তে থাকে এবং বিভিন্ন রোগ-ব্যাধি জন্ম লাভ করে। টেনশন থেকে হৃদরোগ, অনিদ্রা,

ডায়রিয়া, ডায়াবেটিস, গ্যাস্ট্রিক, আলসার, উচ্চ রক্তচাপ, বাতব্যথা, ঘাড়ে ও মেরুদণ্ডে ব্যথা, বিষণ্নতা ও বদমেজাজের মতো রোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে। টেনশন থেকে আরো যেসব সমস্যা হতে পারে তা হলো– বুক ধড়ফড় করা, ঘাম হওয়া, খিদে কমে যাওয়া, অ্যালার্জি বের হওয়া, হাত-পা কাঁপা ইত্যাদি।

খ. 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ১৯৫ - ১৯৭ নং পৃষ্ঠার টীকায় শরীর শিথিল করার একটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করি তোমরা বুঝেছ যে, শিথিলায়ন এমন এক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে সচেতনভাবে শরীরের পেশী শিথিল করা যায়। পেশী শিথিল হওয়ার সাথে সাথে দেহ-মনে স্বস্তি ফিরে আসে। আর তখন পেশীর উত্তেজিত ও শক্ত হওয়ার ফলে স্বাস্থ্যগত যে সকল সমস্যা দেখা দিয়েছিল, সেগুলো দূর হতে থাকে। মূলত টেনশন থেকে সৃষ্ট রোগসমূহের মূল চিকিৎসা হলো শরীর শিথিল করা; রোগের মুখোশ ভেদ করে মনে মনে সুস্থতার ছবি দেখা; বিশ্বাসের সাথে মনে মনে সুস্থ হওয়ার আশা ব্যক্ত করা এবং প্রশান্ত ও হাস্যোজ্জ্বল থাকা।

গ. মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসকগণ পরিসংখ্যান করে দেখেছেন, শতকরা ৭০ ভাগ রোগের কারণই হচ্ছে মানসিক। অর্থাৎ কোনো ঘটনার কারণে মানুষের মানসিক প্রতিক্রিয়াই ৭০ ভাগ রোগের জন্য দায়ী। শতকরা ২০ ভাগ রোগের কারণ হচ্ছে– ইনফেকশন, ভাইরাস আক্রমণ, ভুল খাদ্যগ্রহণ ও ব্যায়াম না করা। শতকরা মাত্র ১০ ভাগ রোগের কারণ হলো– দৈহিক আঘাত, ঔষধ ও অপারেশনের প্রতিক্রিয়া।

তাই মনোবিজ্ঞানী চিকিৎসাবিদগণের চূড়ান্ত কথা হলো, শতকরা ৭০ ভাগ রোগই আল্লাহর রহমতে শুধু সুস্থ জীবনদৃষ্টি গ্রহণ করে শিথিলায়নের মাধ্যমে দূর করা সম্ভব। অন্যান্য রোগের চিকিৎসায়ও ঔষধ ও সার্জারির পাশাপাশি ধ্যানাবস্থায় বিশ্বাসের সাথে সুস্থ হওয়ার আশা ব্যক্ত করা এবং সুস্থ হওয়ার কল্পনা করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ, আমাদের দেহ যতটা না বস্তু, তার চেয়ে বেশী চেতনা। আগেই শুনেছ, আবেগ-অনুভূতিই মূলত দেহের প্রতিটি কোষকে পরিচালনা করে।

ঘ. গভীর শিথিলায়ন ব্যথা দূর করার পাশাপাশি ব্যথার সাথে জড়িত আবেগকেও দূর করে। একজন চিকিৎসাবিশারদ খুব সুন্দরভাবে বলেছেন– "সবচেয়ে কষ্টকর ব্যাপার হচ্ছে রাত তিনটার সময় যখন আপনি প্রচণ্ড মাথাব্যথার কারণে জেগে উঠেন, তখন আপনার নিজকে প্রচণ্ড অসহায় মনে হয়। আপনি বিছানায় শুয়ে আহাজারী করেন। ভাবেন, আপনার কিছুই করার নেই। সে সময় যদি আপনি শিথিলায়ন করেন, তাহলে পরিস্থিতির উপর একটা নিয়ন্ত্রণ আসতে থাকে। অসহায়ত্বের ভাব কমে যায়। সেই সাথে কমে যায় ব্যথার কষ্ট।"

৬. দম চর্চা

শরীরের প্রতিটি কোষকে উদ্যমী রাখার জন্য বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ দম নেবে। নির্দিষ্ট নিয়মে দম গ্রহণের চর্চা করলে শরীর পর্যাপ্ত অক্সিজেন লাভ করে। ক্লান্তি-শ্রান্তি ও আলস্যভাব-অবসাদ দূর হয়ে যায়। তখন তুমি হয়ে উঠবে প্রাণবন্ত ও প্রাণোচ্ছল। আর বুক ফুলিয়ে দম নেয়ার অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের অজু করার পর ১৯ বার করে দম নিবে। অর্থাৎ ১৯ বার করে দিনে ৫ দফা দম নিবে। মুখ বন্ধ থাকবে। মেরুদণ্ড সোজা রেখে ধীরে ধীরে নাক দিয়ে দম নিয়ে বুক ফোলাতে থাকবে। বুক পুরো ফুলে গেলে কয়েক সেকেন্ড থামবে। তারপর ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে দম ছাড়বে। অজু করার পর সুযোগ না হলে অন্য সময় নিবে।

৭. ব্যায়াম/হাঁটা

প্রতিদিন ২০/২৫ মিনিট শারীরিক ব্যায়াম করবে। সুস্থ থাকার ক্ষেত্রে ব্যায়ামের গুরুত্ব অনেক। কিছু কিছু ব্যায়াম শিখে নিবে। ব্যায়ামের বিকল্প হলো হাঁটা। ব্যায়াম করতে না পারলে ২০/২৫ মিনিট হাঁটবে। ঘণ্টায় ৪ মাইল গতিতে হাঁটবে। অর্থাৎ ১৫ মিনিটে এক মাইল পথ অতিক্রম করবে। আর সুযোগ পেলেই সকালে খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটবে। ভোরের মৃদুমন্দ বাতাস স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী।

অভাব কর্মক্ষেত্রের নয়, যোগ্যতার[১]

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

আনন্দ-বেদনার মুহূর্ত

মানুষের জীবনে ছোট হোক, বড় হোক, যুবক হোক, বৃদ্ধ হোক, প্রত্যেকের জীবনেই কিছু আনন্দের মুহূর্ত থাকে, আবার থাকে কিছু বেদনার মুহূর্ত। শিশুরও আনন্দ থাকে, বেদনা থাকে। শিশুর আনন্দ-বেদনার উপলক্ষ থাকে ভিন্ন। যুবক ও বৃদ্ধদের আনন্দ-বেদনার উপলক্ষ থাকে ভিন্ন। তবে আনন্দ ও বেদনা শিশু থেকে নিয়ে বৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকের জীবনেই থাকে। শিশু তার মাকে না দেখতে পেলে কাঁদে, এটা তার বেদনার মুহূর্ত। মা তাকে কোলে নিলে কান্না থেমে যায়, এটা তার আনন্দের মুহূর্ত। একজন যুবক মায়ের নৈকট্য ও দূরত্বের বিষয়টা এভাবে অনুভব করে না।

তালিবানে ইলমের আনন্দ-বেদনার মুহূর্ত

তো, তালিবে ইলমের জীবনে مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ طَالِبُ العلمِ তারও আনন্দ-বেদনার মুহূর্ত আছে। আমি এখন সর্বস্তরের মানুষের আনন্দ-বেদনার মুহূর্তগুলোর আলোচনা করব না। আমাদের জীবনের আনন্দের মুহূর্ত কোনটা, আর বেদনার মুহূর্ত কোনটা, তা নিয়ে আলোচনা করব।

নীতিগতভাবে প্রত্যেক তালিবে ইলমের আনন্দের মুহূর্ত হলো, যখন সে তার উদ্দেশ্যের পথে আগুয়ান থাকে, চলমান থাকে। আর বেদনার মুহূর্ত হলো, যখন সে তার উদ্দেশ্যের ব্যাপারে অমনোযোগী থাকে, অন্যমনস্ক

---

১. এটি আদীব হুজুরের একটি বয়ান। তিনি বিগত ১২ - ৫ - ১৪৩০ হি. [৮ - ৫ - ২০০৯ ঈ.] বাদ জুমা মাদরাসাতুল মদীনার ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বয়ানটি করেছেন। আমি বয়ানটি এ বইয়ে প্রকাশের অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দান করে শুধু ক্যাসেটই প্রদান করলেন না, উপরন্তু বাহকের হাতে 'বাইতুল্লাহর ছায়া থেকে' শিরোনামের একটি চিঠি ও 'পিতৃত্বের ছায়া' শিরোনামের অপর একটি বয়ান প্রদান করে সে দু'টিও প্রকাশের অনুমতি প্রদান করলেন। ১২ই জুমাদাল উলা-র বয়ানটিকে আমরা 'অভাব কর্মক্ষেত্রের নয়, যোগ্যতার' শিরোনামে প্রকাশ করলাম।

থাকে। অমনোযোগের মুহূর্তটা এক ঘণ্টা হলে ঐ এক ঘণ্টা হলো বেদনার মুহূর্ত। আর লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হওয়ার মুহূর্ত যদি এক ঘণ্টা হয়, তাহলে সেই এক ঘণ্টা হলো আনন্দের মুহূর্ত।

তারপর কথা হলো, ইলমের বিভিন্ন প্রকার আছে। বিভিন্ন শাখা আছে। যার যে শাখার প্রতি আগ্রহ বেশী, সে যখন ঐ বিষয়ে নিয়োজিত থাকে, তখন তার শান্তি আসে। এটা অনুভব করার বিষয়। আর ঐ কাজ থেকে যখন সে বিচ্ছিন্ন থাকে, ঐ সময়টা হয় তার কষ্টের সময়। এখানে 'বেদনার সময়' বললাম না। 'কষ্টের সময়' বললাম।

আমার আনন্দ-বেদনার মুহূর্ত

একজন তালিবে ইলম হিসেবে আমারও আনন্দের মুহূর্ত, বেদনার মুহূর্ত ও কষ্টের মুহূর্ত আছে। আমার সবচেয়ে আনন্দের মুহূর্ত হলো, যখন আমি আমার তালিবে ইলম ভাইদের চেহারা উজ্জ্বল দেখি। যখন কারো চেহারায় তলবে ইলমের ঝিলিক দেখি। তখনকার সময়টা আমার জন্য আনন্দের মুহূর্ত। আগে এ ধরনের মুহূর্ত জীবনে অনেক পেতাম। এখন ধীরে ধীরে কমে গেছে। অবশ্য আল্লাহর রহমতে একেবারে হারিয়ে যায় নি। তবে আজকের সুন্দর মুহূর্তে, 'সুন্দর মুহূর্ত' বললাম এজন্য যে, এটা দ্বীনী আলোচনার মজলিস। ফেরেশতারা আমাদেরকে বেষ্টন করে আছেন। এই মজলিসে যদি একজনও সৌভাগ্যবান মানুষ থাকেন, তাহলে তাঁর جَلِيْس [বসার সঙ্গী] হিসেবে আমরাও উপকৃত হবো।

আমার বড় কষ্ট লাগে যখন মানুষ শক্তভাবে কথা বলে, শক্তভাবে চিন্তা করে– আমি কিতাব বুঝি না, আমার পড়া মনে থাকে না, কি হবে এসব পড়ে? শয়তান খুব ধূর্ততার সাথে এভাবে আমাদেরকে পেরেশান করে।

যা নিয়ে আমার পেরেশানী

আমি বিশ্বাসের সাথে বলছি, এই মজলিসের অনেকের চেয়ে আমি অনেক কম জানি। তারপরও কম জানার কারণে আমার কোনো পেরেশানী নেই। আমার পেরেশানী হলো, তোমাদের জিম্মাদার হিসেবে আমার মধ্যে ইলমের প্রতি যে পরিমাণ মুহাব্বত থাকার কথা, আমি নিজের মধ্যে সে পরিমাণ মুহাব্বত অনুভব করি না। তো এর জন্যই আমার সব দুশ্চিন্তা। ইলমের প্রতি মুহাব্বত থাকলে যে আচরণ প্রকাশ পাওয়ার কথা, সে ধরনের আচরণ আমার থেকে প্রকাশ পাচ্ছে না। এটা আমার খুব কষ্টের বিষয়।

আল্লাহর শোকর আদায় করা চাই

তাছাড়া যতটুকু জানি, এর জন্য আল্লাহর শোকর আদায় করি না। বান্দা যখন শোকর আদায় করে, তখন তার মনে একটা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়। তুমি যখন কারো কাছে থেকে অপ্রত্যাশিত কোনো অনুগ্রহ লাভ কর, তখন তার শোকর আদায় করার জন্য তোমার চোখ, মুখ, বুক, হৃদয় মোটকথা সব অঙ্গে একটা বিশেষ অবস্থা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ যখন আমাকে কোনো ইলম দান করেন, অন্তরের অন্তস্থল থেকে শোকর আদায় করলে আমার আচরণে যে পরিবর্তন আসার কথা ছিল, সে ধরনের পরিবর্তন আমি আমার মধ্যে লক্ষ করি না। এটা আমার কষ্টের বিষয়। আমরা সবাই যদি এ ধরনের কষ্ট অনুভব করতে থাকি, তাহলে তা হবে আমাদের জন্য অনেক বড় নেয়ামত।

এই মুহূর্তে পৃথিবীতে কত মানুষ কত রকমের অনর্থক কাজে, কুসংস্কারে, আল্লাহর অবাধ্যতা ও গুনাহে লিপ্ত আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আল্লাহর ঘরে জুমার নামাজ আদায় করার পর, মাদরাসায় ইজতেমায়ীভাবে দস্তরখানে বসার তাওফীক দান করেছেন। দস্তরখান থেকে ফারেগ হওয়ার পর আবার ঈমান তাজা করার এক মজলিসে একত্রিত হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। নিজের মধ্যে শোকরের একটা কাইফিয়্যাত হওয়া দরকার। এই কাইফিয়্যাত আমাদের হয় না কেন? এটা একটা কষ্টের বিষয়।

প্রত্যেকের এই কষ্টটা হওয়া দরকার

তো আমাদের প্রত্যেকের এই কষ্টটা হওয়া দরকার যে, ইলমের সাথে মুহাব্বত হয় না কেন? আহলে ইলমদের সাথে মুহাব্বত হয় না কেন? মাদরাসার সাথে মুহাব্বত হয় না কেন? আসাতেজা কেরামের সাথে ছাত্রদের মুহাব্বতের তা'আল্লুক হয় না কেন? ছাত্রদের সাথে আসাতেজা কেরামের মুহাব্বতের তা'আল্লুক হয় না কেন? আমি তোমাদেরকে ভালোবাসতে পারি না কেন? তোমরা আমাকে ভালোবাসতে পারো না কেন? তো এই কষ্টটা আমাদের প্রত্যেকের হওয়া দরকার। এই কষ্টটা যেদিন আমাদের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় আসবে, সেদিন আমাদের জিন্দেগীতে এমন পরিবর্তন আসবে, যাকে ہا پلٹ جانا [স্বরূপ বদলে যাওয়া] বলা হয়। তখন তুমি খুব অল্প সময়ে দ্বীনের অনেক কাজ করতে পারবে।

দ্বীনের কাজ كَمْ দ্বারা হয় না, كَيْف দ্বারা হয়

দ্বীনের কাজ কখনো كَمْ দ্বারা হয় না, كَيْف দ্বারা হয়। كَمْ অর্থ পরিমাণ। আর كَيْف অর্থ অবস্থা। তো যে পরিমাণ তোমার ইলম আছে, সে পরিমাণ তুমি খেদমত করবে না। তুমি মূলত খেদমত করবে দিলের কাইফিয়্যাতের ভিত্তিতে। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এমন كَيْف দান করেন, যে كَيْف জনাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সোহবতে সাহাবা কেরামের দিলে পয়দা হয়েছিল। তাঁদের সোহবতে তাবেয়ীনদের দিলে পয়দা হয়েছিল। তাঁদের সোহবতে তাবে তাবেয়ীনদের দিলে পয়দা হয়েছিল। এভাবে দিলের কাইফিয়্যাতের যে সিলসিলা চলে এসেছে, তা যেন আমরা লাভ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন। আমীন।

কর্মক্ষেত্রের অভাব পার্থিব শিক্ষায় শিক্ষিতদের

কয়েকদিন ধরে একটা কথা বলার জন্য মনে খুব তোলপাড় করছিল। আমাদের দ্বীনি তা'লীমের যে নেজাম এবং পার্থিব শিক্ষার যে ব্যবস্থা, এই দুই নেজামের মধ্যে একটা বাহ্যিক পার্থক্য এই যে, ওখানে যোগ্যতার খুব একটা অভাব নেই, তবে কর্মক্ষেত্রের প্রচণ্ড অভাব। ফলে যোগ্যতা অর্জন করার পরও সেখানের লোকেরা কর্মক্ষেত্রের অভাবে পেরেশানীতে আছে।

একটি ঘটনা

গতকাল আমার কাছে এক ভদ্রলোক এসেছিল। তাঁর কাছ থেকে জানতে পারলাম, 'মাত্র' সাত লক্ষ ছেলে কম্পিউটার সাইন্সে লেখাপড়া করে 'অবসর' নিয়েছে। ইউনিভার্সিটি থেকে কম্পিউটার সাইন্সের গুরুত্বপূর্ণ সনদ নিয়ে বের হয়ে কর্মক্ষেত্র খুঁজে পাচ্ছে না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক খবর। আমি তার সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে তার যোগ্যতা আন্দাজ করতে চেষ্টা করলাম। আমি ঐ অঙ্গনের লোক না হলেও অঙ্গনটা আমার জানার আগ্রহ আছে। কারণ, অঙ্গনটা বিরাট শক্তির। কম্পিউটারকে যদি কল্যাণকর কাজে লাগানো যায়, তাহলে তা অনেক সম্ভাবনাময় শক্তি। আর যদি তা ক্ষতিকর কাজে ব্যবহৃত হয়, তাহলে তা এক ধ্বংসাত্মক শক্তি।

কর্মক্ষেত্রের অভাব ওদের, আমাদের নয়

যাই হোক, অল্প কিছুক্ষণ আলোচনার পর আমি বুঝলাম যে, তার অঙ্গনে সে মোটামুটি যোগ্য। আমি তাকে বললাম, ভাই! আপনি আপনার ময়দানে যে পরিমাণ যোগ্যতা নিয়ে কর্মক্ষেত্রের অভাব দেখছেন, আমাদের এখানে কেউ যখন তার নিজের বিষয়ে এ পরিমাণ যোগ্যতা অর্জন করে, তখন তাকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়। আমাদের এখানে কর্মক্ষেত্রের কোনো অভাব নেই। এটা আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ। শোনো, আমাদের মূল সমস্যা হলো আমরা যে বিষয়ে লেখাপড়া করছি, সে বিষয়ে আমরা যোগ্যতা অর্জন করার তেমন চেষ্টা করি না। যোগ্যতার অভাব, বিপুল পরিমাণ কর্মক্ষেত্র আমাদের সামনে।[২]

মাদরাসাগুলোতে যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ অনেক

তো আমাদের নিজেদের বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করা দরকার। আর যোগ্যতা অর্জনের আমাদের এত সুযোগ আছে, যা অন্যরা সাহসও করতে পারে না। ২৪ ঘণ্টা প্রতিষ্ঠানে থাকার যে ব্যবস্থা আমাদের সব মাদরাসাতেই আছে, তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানে এই নিয়ম চালু করতে অক্ষম। কারণ, এর জন্য যে পরিমাণ ত্যাগ ও কোরবানী দরকার হয়, সেখানকার শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জীবনে তা কল্পনাও করা যায় না। তাই তারা এই নিয়ম চালু করতে পারে না। তারপরও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ওদের আছে, যেগুলোকে ওরা বিশেষ প্রতিষ্ঠান বলে। শিক্ষার্থীরা সেখানে ২৪ ঘণ্টা অবস্থান করে। তবে সংখ্যায় সেগুলো এতই কম যে, তা উল্লেখযোগ্য নয়।

যোগ্য মানুষের বড় অভাব

যাই হোক, আমাদের উচিত আমাদের এই নেজামকে মূল্যায়ন করা। নিজেদেরকে নিজেদের বিষয়ে যোগ্য করে গড়ে তোলা। আমি লোক পাই, মানুষ পাই না। মানুষ পাই, শিক্ষক পাই না। শিক্ষক পাই, শিক্ষাপ্রেমিক পাই না। শিক্ষকতা একটি শব্দ। একে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দ বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু যোগ্য শিক্ষক খুঁজেই পাওয়া যায় না। যোগ্য মানুষ

---

[২]. এখানের টীকাটি ৪৫৭ - ৪৫৮ নং পৃষ্ঠায় পড়ো।

খুঁজেই পাওয়া যায় না। তো আমাদের এখানে কর্মক্ষেত্রের অভাব নেই। আলহামদুলিল্লাহ যে-ই যোগ্যতা অর্জন করে, সে-ই কর্মক্ষেত্র পায়।[৩]

লেখার প্রসঙ্গে যদি কথা বলি, তো এখন যোগ্যতর অন্তত এক হাজার লেখকের দরকার। কেরানীরা অনেক লেখকের চেয়ে বেশী লেখে। তো লেখলেই যদি লেখক হতো, তাহলে কেরানীরা অনেক বড় লেখক গণ্য হতো। যোগ্য লেখকের বর্তমানে বড় অভাব।

সমাজসেবার মধ্যে যোগ্য মানুষের বিপুল অভাব। পৃথিবীতে যারা 'দ্বীনের জন্য' মানুষের খেদমত করবে, এই ময়দানেও যোগ্য মানুষের অনেক অভাব। সৎ মানুষের এতো অভাব যে, কারো মধ্যে সামান্য সততা পাওয়া গেলে, তার অন্য সব দুর্বলতাকে মানুষ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে। তো বাজান! মাদরাসা তো সততা তৈরির কেন্দ্র। তুমি যদি সততা অর্জন করতে পারো, তাহলে তোমাকেও মানুষ গ্রহণ করবে।

যাই হোক, আমরা যে সমস্ত ইলম চর্চা করি, অন্তত এসব ক্ষেত্রে যেন আমরা যোগ্য হয়ে গড়ে উঠি। যদিও এসবের বাইরে আরো অনেক কিছুরও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

৩. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. এক প্রসঙ্গে লিখেছেন– [আপনার হীনমন্যতার] কারণ কি এই যে, আমি নেসাবের পড়াশোনা সমাপ্ত করার পরও কোনো খেদমতের উপযুক্ত হতে পারিনি বা কোনো খেদমতের সুযোগ হবে কি-না এ ব্যাপারে অনিশ্চয়তা? এ ক্ষেত্রে আপনি নিজেকে আশ্বস্ত করতে পারেন যে, দ্বীনের যেকোনো প্রকারের খেদমতই অনেক বড় সৌভাগ্য এবং দুনিয়া ও দুনিয়াস্থ সবকিছু থেকে উত্তম! আলহামদুলিল্লাহ অনেক ধরনের খেদমতের যোগ্যতা আল্লাহ আমাকে দান করেছেন এবং অনেক খেদমত এমন আছে যার যোগ্যতা মেহনত ও অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ত করা সম্ভব। হ্যাঁ, দ্বীনী খেদমতের যে কত শাখা রয়েছে এবং এর ময়দান যে কত বিস্তৃত– এ ব্যাপারে [অনভিজ্ঞতার কারণে] বিস্তারিত জানা না থাকলে আপনি আপনার কোনো উস্তাদের শরণাপন্ন হয়ে অথবা কোনো অভিজ্ঞ খাদেমে দ্বীনের নিকট থেকে জেনে নিতে পারেন। তখন আপনি দেখবেন, দ্বীনী খেদমতের বহু পথ আপনার জন্য খোলা, প্রয়োজন শুধু একটু খেয়াল করা। [সূত্র. 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' পৃ. ৩৫৭]

যোগ্যতা অর্জনের তারতীব

এখন যোগ্যতা অর্জন হয় কিভাবে, সে কথা শোনো। সাধারণত ভালো লেখাপড়াকে যোগ্যতা অর্জনের ভিত্তি মনে করা হয়। তো বাজান! উন্নত পড়াশুনা যোগ্যতা অর্জনের অন্যতম একটা ভিত্তি ঠিকই। তবে এর স্থান অনেক পরে। যোগ্যতা অর্জনের তরতীব হলো– চিন্তা, চরিত্র, ইবাদত ও লেখাপড়া। প্রথমেই তোমাকে সুস্থ চিন্তার অধিকারী হতে হবে। এটা খুব সহজ। যে জিনিসের প্রয়োজন যত বেশী, আল্লাহ তা'আলা ঐ জিনিসকে তত সহজ ও কোমল করে দেন।

কী কী ফিকির আমাদের ধারণ করা দরকার; কী কী চিন্তা আমার গ্রহণ করা দরকার; কিভাবে আমার জীবনকে পরিচালনা করা দরকার; বাবা-মায়ের সাথে আমার কী আখলাক হওয়া দরকার; ভাই-বোনের সাথে আমার কেমন আচরণ হওয়া দরকার; বন্ধু-বান্ধবের সাথে কী আখলাক হওয়া দরকার; প্রতিবেশীদের সাথে কী আখলাক হওয়া দরকার; এমনকি শত্রুর সাথে আমার কী আচরণ হওয়া দরকার; যে আমার মন্দ চায় তার সাথে আমার কী ব্যবহার হওয়া দরকার; এগুলো আমাদের চিন্তা করা উচিত।

মায়ের সাথে আমরা অনেক সময় বান্ধবীর মত আচরণ করি। বাবার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করি। বন্ধুর সাথে অপরিচিতের মত আচরণ করি।

বন্ধুর সঙ্গে অপরিচিতসুলভ আচরণের একটি উদাহরণ

বন্ধুর সাথে অপরিচিতের আচরণের একটা উদাহরণ তোমাকে দেই। আমি ছাত্র জীবনে আমার এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম। বন্ধুর একটা প্রয়োজন পুরা করার জন্য। কাজটা শেষ হওয়ার পর আমাকে সে জিজ্ঞাসা করল– এখানে খাবি, না বাসায় গিয়ে খাবি। দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্বের দিকে তাকিয়ে আমি কষ্ট না পাওয়ার ভান করে বললাম– এটা কি বাসা না? ও আচ্ছা, এটা তো বাড়ি। তো আজকে আর বাসায় নয়, তোদের বাড়িতেই খাব। সে দিন আমি জীবনের সবচেয়ে অসুন্দর ও অরুচিকর খাবার খেয়েছি। বিরাট শিক্ষা পেয়েছিলাম সে দিন। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। কাছে ওর ছোট বোন ছিল। আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি দিয়ে খেয়েছ খুকী? সে বলল, মুরগীর গোশত দিয়ে। মুরগীর গোশত তো আমার দস্তরখান দেখেইনি। মুরগীর গোশত দিয়ে খেয়েছে। তো এটা বন্ধুর সাথে অপরিচিতের আচরণ।

উস্তাদের সাথে ছাত্ররা অপরিচিতের মত আচরণ করে। আবার ছাত্রদের সাথে উস্তাদগণও অপরিচিতের মত আচরণ করেন। আমাদের উচিত, নিজেদের এসব আচরণ ঠিক করা। তো ইনশাআলাহ আমাদের যোগ্যতা অর্জন হবেই।

যা হলে কর্মক্ষেত্রের অভাব হবে না

তো সঠিক চিন্তা, সঠিক চরিত্র, সঠিক আমল ও সঠিক লেখাপড়া এই শর্ত যদি আমরা যথাযথ পূরণ করতে পারি, তাহলে আমরা এমন যোগ্যতা অর্জন করতে পারব, যার পর আমাদের কর্মক্ষেত্রের কোনো অভাব হবে না।[৪]

বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার আবশ্যকতা

আরেকটি কথা শোনো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা। তোমরা অনেকে হয়তো ভাবছো, আমি এখন মাতৃভক্তির কথা বলব। মায়ের খেদমতের কথা বলব। বা নামাজের এহতেমামের কথা বলব ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এসব দিকও আপন আপন জায়গায় ঠিক আছে। এগুলোরও আমাদের অনেক অভাব। তবে এখন আমি বলতে চাচ্ছি মুখের ভাষাটার কথা। আমাদের চশমা সুন্দর। আমাদের টুপি সুন্দর। আমাদের জামা সুন্দর। এগুলোর সৌন্দর্য রক্ষা করার গুরুত্ব আমরা অনুভব করি। ঈদের সময় কত সুন্দর জামা পড়ি। তারপর খাবারের প্রসঙ্গে বলা যায়, সুস্বাদু থেকে সুস্বাদু খাবার ব্যবস্থা করার জন্য আমরা কত ফিকির করি। অনেক সময় মা-বাবাকে ফরমায়েশ দিয়ে সুন্দর খাবার রান্না করাই। মজার চেয়ে মজার খাবার খেতে চাই।

অনেক সময় দেখা যায়, বাবা চশমা কিনে দিলে পছন্দ হয় না। বেশী দামী ও বেশী সুন্দর চশমা তালাশ করে। আগে এক রকমের চশমা দেখতাম। এখন ছেলেদের চোখে দেখি অন্য রকমের চশমা। তারপর অনেক ছেলেকে

---

৪. যার মধ্যে মানবিক গুণ বিদ্যমান থাকে, সে মানুষের মধ্যে সমাদৃত হয়-ই। বিষয়ের দক্ষতার পাশাপাশি ব্যক্তির মধ্যে যদি মানবিক গুণ বিদ্যমান থাকে, তাহলে তাঁর কর্মক্ষেত্রের অভাব হওয়ার কথা নয়। মানুষ এমন লোককে নিয়ে বরং টানাটানি শুরু করে দেয়। এর বিপরীতে যিনি বিষয়ে দক্ষ, কিন্তু মানবীয় গুণাবলী থেকে বঞ্চিত, এমন ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক দক্ষতা যতই হোক, সে কখনো মানুষের মনে আসন গাড়তে পারে না। এমন 'মূর্খ জ্ঞানী'কে গুণী মানুষেরা মূল্যায়ন করবে দূরের কথা, তাদেরকে বরং সাধারণ মানুষেরাও ঘৃণা করে। যারা 'মানুষ' তারা মানুষের গুণাবলী থেকে বঞ্চিত তথাকথিত মানুষদেরকে যে মূল্যায়ন করবে না, এটাই তো স্বাভাবিক। ড. শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান আরিফী-এর اسْتَمْتِعْ بِحَيَاتِكَ / 'সুখময় জীবনের সন্ধানে' বইটির অধ্যয়ন এক্ষেত্রে অনেক উপকারে আসবে ইনশাআল্লাহ। বইটি 'আচরণ-দক্ষতা' বিষয়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা।

দেখি চশমা ভাঙ্গেওনি, নষ্টও হয়নি। পরিবর্তন করে ফেলে। কারণ অনেক দিন হয়ে গেছে। আমাদের এক ছাত্র বলেছে, 'রংটা ডিসকালার হইয়া গেছে'। আমি তাকে বললাম, 'ডিসকালার হইয়া গেছে' যে বললে, তোমার মুখের ভাষাটাতো শুদ্ধ হলো না। 'হইয়া গেছে' না বলে 'হয়ে গেছে' বলো। আর 'ডিসকালার' বলার অধিকার তুমি তখনই পাবে, যখন তুমি এর বানান বলতে পারবে। বানানটা বলতে পারবে তো? সুন্দর হতো যদি বলতে, 'বিবর্ণ হয়ে গেছে' বা 'রং উঠে গেছে' বা 'রং নষ্ট হয়ে গেছে'। চশমার সৌন্দর্যের জন্য তুমি এত ব্যস্ত, তো মুখের ভাষাকে সুন্দর করার জন্য তোমার ব্যস্ততা কতটুকু?

অনেকের মুখের ভাষা রীতিমতো নোংরা। সবকিছুতে নোংরামি। চিন্তায় নোংরামি, চরিত্রে নোংরামি, মুখের ভাষায় নোংরামি। নোংরামি অবস্থায় কেউ উঁচু হতে পারে না। সুন্দর পোষাক পরিধান করো, সমস্যা নেই। চিন্তা ও চরিত্রও সুন্দর করো। সুন্দর চশমা ব্যবহার করো, অসুবিধা নেই। মুখের ভাষাটাকেও সুন্দর করো। তোমার মুখের ভাষা শুনে লোকে যেন বলে– ছেলেটা ভদ্র, অভিজাত ও কোমল স্বভাবের।[৫] আল্লাহ আমাদেরকে সুউচ্চ চিন্তা, উত্তম চরিত্র, বিশুদ্ধভাষী ও ভালো লেখাপড়াকারী তথা যোগ্য হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

---

৫. শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দায়েমী সুন্নত। জন্মের পর তাঁকে বনু সা'আদ গোত্রে পাঠানোর অন্যতম একটি উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ ভাষার জ্ঞানার্জন করা। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বিশুদ্ধ ভাষায়েই কথা বলেছেন। হাদীসের কিতাবগুলোতে তাঁর যে সকল বাণী রয়েছে, সেগুলোকে সাহিত্যিক সংকলকগণ সম্পাদনার পর কিতাবে সংকলন করেননি। বরং বাণীগুলো তাঁদের নিকট যে ভাষায় পৌঁছেছে, তাঁরা সেগুলো হুবহু সেভাবেই লিপিবদ্ধ করেছেন। আজ চৌদ্দশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও রাসূলের বাণীগুলো আরবী সাহিত্যের অনুপম দৃষ্টান্তরূপে গণ্য করা হয়। রাসূল আরবদের মধ্যে সবচে' বিশুদ্ধভাষীরূপে পরিগণিত।
কিন্তু সুন্নতপ্রেমী দ্বীনদার শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও ক'জন আছেন, যারা সর্বদা শুদ্ধভাষায় কথা বলার এই দায়েমী সুন্নত জিন্দা করার জন্য চেষ্টা করেন? আল্লাহ তা'আলা এই সুন্নতও জিন্দা করার আমাদেরকে তাওফীক দান করুন। আমীন! 'বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার গুরুত্ব' শিরোনামে আমার 'আরবী ভাষা পাঠদান পদ্ধতি' বইয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা আছে। আলোচনাটি পড়ে নিও।

৪৫২ নং পৃষ্ঠার টীকা

কথাটি আমি সর্বপ্রথম উস্তাদে মুহতারাম শায়খুল হাদীস আলামা নূর হোসাইন কাসেমী দা. বা.-এর মুখে শুনেছি। সম্ভবত ১৪১১ - ১২ হি. শিক্ষাবর্ষে। তখন আমি শরহে বেকায়া জামাতের ছাত্র। তার পর থেকে এ পর্যন্ত এ বাস্তবতা সব সময় সূর্যের মতো স্পষ্ট লক্ষ করে আসছি। অতএব ভবিষ্যত নিয়ে তালিবে ইলম ভাইদের দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। হযরত আলী মিঁয়া নাদাবী রহ.-এর ভাষায় বলব– 'ইখলাস ও একনিষ্ঠতা হাসিল করো। সেই সাথে যেকোনো এক বিষয়ে ইখতিসাস ও বিশেষজ্ঞতা অর্জন করো। এরপর দেখো, দুনিয়া তোমার মূল্যায়ন করে কি না?'

কর্মক্ষেত্রের অভাব থাকলে ওদের আছে, আমাদের নয়। ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা করা সঙ্গত হলে তা ওদের জন্য, আমাদের জন্য নয়। আমাদের প্রচুর কর্মক্ষেত্র আছে। আমরা যদি নিজেদের বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করি, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল ইনশাআল্লাহ। দুনিয়ার ভবিষ্যৎ, কবরের ভবিষ্যৎ এবং আখেরাতের ভবিষ্যৎ। আলাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْئَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى.

অর্থাৎ নিজ পরিবারবর্গকে নামাজের আদেশ কর এবং নিজেও তাতে কায়েম থাক। আমি তোমার কাছে জীবিকা চাই না। জীবিকা তো তোমাকে আমিই দেই। আর তাকওয়ার পরিণাম শুভ।

কাল্পনিক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্যে যারা ঐ সব প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনা করে, দীর্ঘ সময় প্রচুর মেহনত ও অনেক টাকা-পয়সা ব্যয় করে, পরিণতি দেখে ওদের প্রতি ঈর্ষা নয়, বরং করুণা জাগে, দুঃখ হয়।

ঐ সব প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা সমাপনকারীদের মধ্য হতে যারা জীবনে মোটামুটি সুখ ও সমৃদ্ধি লাভ করে, একটু খেয়াল করলে দেখবে, পার্থিব ঐ সুখ ও সচ্ছলতার মূলে তাদের অনেকেরই সার্টিফিকেটের বিশেষ কোনো অবদান নেই। অবদান রয়েছে জীবিকা উপার্জনের জন্যে নিজেদের স্বতন্ত্র চেষ্টা ও মেহনতের। সারা জীবনই অনেকের সার্টিফিকেট ফাইলে আলমারীতে 'সংরক্ষিত' থাকে। যাদের কাছে তাদের তুলনায় নিম্নমানের সার্টিফিকেট আছে, অথবা যাদের াকছে মোটেও সার্টিফিকেট নেই, ওরাও অনেক সময় সেই পরিমাণ টাকা উপার্জন করে থাকে। বরং কখনো কখনো তাদের তুলনায় বেশী টাকাও উপার্জন করতে দেখা যায়। তাছাড়া সার্টিফিকেট যাদের কাজে লাগে, তাদের ক'জন বড় অঙ্কের ঘুষ প্রদান ছাড়া কোনো সরকারী চাকরি পান?

শুধু দুনিয়ার জন্য লেখাপড়া করার পর যদি দুনিয়াও ভাগ্যে না জুটে, তো সে ক্ষেত্রে خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةَ [দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টি হারাল] এ ছাড়া আর কি বলা যায়।

اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا ؕ فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۖ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِمَا يَصْنَعُوْنَ.

অর্থ. কাউকে যদি তার মন্দকর্ম শোভন করে দেখানো হয় এবং সে তাকে উত্তম মনে করে, সে কি তার সমান, যে সৎকর্ম করে? আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত করেন। অতএব তাদের জন্য আক্ষেপ করে তোমার যেন প্রাণনাশ না হয়। তারা যা করে আল্লাহ তা জানেন।

'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ৪৩ - ৪৫ পৃষ্ঠার টীকায় এ সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য অতিবাহিত হয়েছে। আশাকরি তোমার তা পড়া হয়েছে।

বাইতুল্লাহর ছায়া থেকে

-মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

মাদরাসাতুল মদীনার প্রিয় তালিবানে ইলম!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহর ঘরের সামনে বসে তোমাদের জন্য কয়েকটি কথা লিখছি। আল্লাহ যেন মেহেরবানী করে এই কথাগুলোকে আমার জন্য এবং তোমাদের সকলের জন্য নূর বানিয়ে দেন, আমীন! তোমাদেরকে আমি মুহাব্বত করি আল্লাহর ওয়াস্তে এবং তোমাদের জিন্দেগীর কামিয়াবি আমার আন্তরিক কামনা। পিছনের, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের মাদরাসাতুল মদীনার সকল তালিবে ইলমকে আল্লাহ কবুল করুন, আমীন! বাইতুল্লাহর যিয়ারত এবং রওয়া শরীফে হাযিরি নছীব করুন। কাবেলিয়্যত ও মাকবুলিয়্যাত দান করুন, আমীন!

জীবনের সর্বক্ষেত্রে এবং সর্ব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনো উপায় নেই। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোনো আশ্রয়স্থান নেই। আল্লাহর চেয়ে আপনও আমাদের কেউ নেই। আনন্দ কিংবা বেদনা, সুখ কিংবা দুঃখ, সচ্ছলতা কিংবা অনটন যা কিছু আল্লাহ দেন, আমাদের কল্যাণের জন্যই দেন, যদি আমরা তা শোকর ও ছবরের সাথে গ্রহণ করতে পারি। তিনিই শুধু দান করতে পারেন সুখ-শান্তি এবং তিনিই শুধু দূর করতে পারেন দুঃখ ও অশান্তি। আল্লাহ যেন আমাদের ভালোবাসেন এবং আমরা যেন আল্লাহকে ভালোবাসতে পারি। মানুষের প্রতি আমাদের ভালোবাসাও যেন শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে হয়।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আমাদের জিন্দেগীর জন্য উসওয়া ও আদর্শ। আমাদের আখলাক ও চরিত্র এবং আমাদের চিন্তা ও কর্ম সবকিছু যেন হয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আখলাক ও চরিত্র এবং চিন্তা ও কর্মের প্রতিবিম্ব। এজন্য মাদরাসাতুল মদীনার প্রতিটি ছাত্রের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হলো সীরাতুন্নবী সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মুতালা'আ, যাতে আমরা তাঁর নূরানী জিন্দেগী অনুসরণ করতে পারি।

আমলের গোমরাহীর মতো চিন্তার গোমরাহীও ভয়াবহ; বরং চিন্তার গোমরাহী আরো বেশী ভয়াবহ। কারণ, তা অনেক সময় ইরতিদাদ পর্যন্ত

নিয়ে যায়। চিন্তার গোমরাহী থেকে বাঁচার জন্য অতি জরুরী হরো, সালাফে ছালিহ-এর অনুসরণ করা। নিকট যুগের তিনজন মহান ব্যক্তিকে মাদরাসাতুল মদীনার তালিবে ইলমের জন্য আমি অনুসরণীয় মনে করি। কারণ, সম্মিলিতভাবে তাঁরা সালাফে ছালিহীনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিনিধিত্ব করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ., দাঈ ইলাল্লাহ হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ. এবং মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.। এই তিন মহান ব্যক্তির মাধ্যমে তোমরা যদি সালাফে ছালিহীনের এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে সুন্নতে নববীর অনুসরণ করতে পারো, তাহলে এই ফিতনা-ফাসাদের যুগেও ইনশাআলাহ সমস্ত গোমরাহী থেকে, আমলের গোমরাহী, আখলাকের গোমরাহী এবং চিন্তা ও ফিকিরের গোমরাহী থেকে নিরাপদ থাকবে।

জিন্দেগীতে যদি কামিয়াবি চাও, তাহলে মা-বাবার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করো। মায়ের সাথে [এবং বাবার সাথে] এমন আচরণ করো, যাতে তোমার কথা মনে হলে তাদের চোখে পানি এসে পড়ে। খুশির কারণে এবং সন্তুষ্টির কারণে। কখনও মা-বাবার মনে কষ্ট দিও না, যদি তাঁদের দিলে কষ্ট এসে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মাফ চেয়ে নাও এবং তাঁদের মনের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করো। সবসময় তাঁদের জন্য এই দু'আ করতে থাকো–

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

ক্রোধ, ঝগড়া-বিবাদ এবং হিংসা-হাসাদ এগুলো মানুষের ভিতরের ও বাহিরের সকল সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলে। সুতরাং ক্রোধকে দমন করার চেষ্টা করো। পরিচিত, অপরিচিত, ছোট, বড় সকলের সঙ্গেই ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া থেকে বেঁচে থাক। কারো ভালো কিছু দেখে তার প্রতি হিংসা করো না। কারণ, সেটা তাকে আল্লাহ দিয়েছেন। আর আল্লাহর দানের প্রতি হিংসা হবে বরবাদির কারণ। তুমি গিবতা করো অর্থাৎ আল্লাহর কাছে চাও, যেন তোমাকেও তিনি তা দান করেন।

কখনও অহঙ্কার করো না। অহঙ্কারী ব্যক্তি হল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। অহঙ্কার মানে নিজেকে বড় মনে করা, অন্যকে ছোট মনে করা, নিজের দোষ সম্পর্কে বেখবর থাকা এবং অন্যের দোষ চর্চা করা। আল্লাহ যেসকল গুণ দান করেছেন সেগুলোকে আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ মনে না করে, নিজের যোগ্যতা দ্বারা অর্জিত মনে করা। অহঙ্কারের বিপরীত গুণ

হলো বিনয়। অর্থাৎ নিজেকে ছোট মনে করা এবং অন্যকে বড় মনে করা। আর নিজের যাবতীয় গুণকে শুধু আল্লাহর দান ও অনুগ্রহ মনে করা। আল্লাহ যেন মাদরাসাতুল মদীনার প্রতিটি তালিবে ইলমকেই বিনয়ের গুণ দান করেন। বিনয় যেন হয় তাদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য। যা কিছু ক্ষুদ্র, তুচ্ছ ও হীন, সেগুলো থেকে নিজেকে দূরে রাখবে। আর যা কিছু বড়, মহৎ ও সুন্দর, সেগুলো অর্জন করার চেষ্টা করবে।

বাইতুল্লাহর মুসাফির বাইতল্লাহর সামনে বসে দিলের দরদের কালি দিয়ে এই কথাগুলো তোমাদের জন্য লিখে পাঠালো। আরো অনেক কথা লেখার ছিল। তবে আমলের জন্য এতটুকই যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

আমার আদরের ছোট ছোট তালিবানে ইলম! ফুল বাগানে ফুলকলি যেমন, তেমনি তোমরা হলে মানব বাগানের মানবকলি। মানব বাগানে একদিন তোমরা ফুল হয়ে ফোটবে এবং ইলমের, আমলের এবং চিন্তা-চেতনার সুবাস ছড়াবে– এ আশাই করছি আল্লাহর কাছে। আল্লাহর ঘর তাওয়াফ করার সময় তোমাদের জন্য এবং তোমাদের পরে তোমাদের মতো যারা আসবে তাদের জন্য আমি দু'আ করেছি। তোমরা শুধু আমার তিনটি নছীহতের উপর আমল করার চেষ্টা কর–

১. মা-বাবাকে খুশি কর, তাদের মনে কখনও কষ্ট দিও না।

২. কখনও মিথ্যা কথা বলো না এবং অভদ্র কোনো আচরণ করো না।

৩. সময় নষ্ট করো না এবং লেখাপড়ায় অবহেলা করো না।

এই তিনটি উপদেশ যদি মেনে চলো, তাহলে ইনশাআল্লাহ তোমাদের জীবন হবে ফুলের মতো সুন্দর। আমি তোমাদের সবার জন্য দু'আ করি এবং সবার কাছে দু'আ চাই, আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে কবুল করেন। আমীন!

তোমাদের খাদেম

আবু তাহের মিছবাহ

১৫ - ১২ - ২৯ হি.

পিতৃত্বের ছায়া

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

প্রত্যেক বাবা, প্রত্যেক মা, সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। এই পরিমাণ কল্যাণ কামনা করার নজির তো অন্য কোনো সম্পর্কের মধ্যে পাওয়া যেতেই পারে না। তবু শিক্ষকের মধ্যে এই গুণ বা এই তবিয়ত কিছু পরিমাণ হলেও আসা দরকার। কিছু ছায়াপাত হওয়া দরকার। মায়ের মমতা ও বাবার শফকতের কিছু পরিমাণ ছায়া শিক্ষকের মধ্যে পাওয়া দরকার। এটা যদি কোনো শিক্ষকের মধ্যে আসে, তাহলে ইনশআলাহ সে তার শিক্ষক জীবনে কিছু না কিছু যাহেরী কামিয়াবী হাসিল করবে। আর আখেরাতের কামিয়াবী তো আছেই।

দুনিয়াতে শিক্ষক জীবনটা, শিক্ষকতার যে পেশা, শিক্ষকতার যে অযীফা, এটাতো যাহেরী কামিয়াবী ইনশআল্লাহ হবে। আল্লাহ তা'আলা যেন উজব [আত্মমুগ্ধতা] থেকে হেফাজত করেন। আল্লাহ তা'আলা যেন শোকর কয়ার তাওফীক দান করেন। আমি আমার শিক্ষকতার শুরু থেকে যখন আমি তরুণ তখনই, আমি মাতৃত্ব ও পিতৃত্বের এই অনুভূতিটা আমার ছেলেদের মধ্যে অনুভব করেছি। যখন এই সমস্ত শব্দ উচ্চারণ করাও বয়সের সাথে খাপ খায় না। এই কারণে [আল্লাহর প্রশংসা] আমার তালেবে ইলমদের মুহাব্বত আমি পেয়েছি। আপনাদের ক্ষেত্রেও এরকম হবে। আপনার মধ্যে যদি এই ছায়াটা থেকে থাকে, তাহলে দেখবেন আপনার ছেলেরা আপনাকে মুহাব্বত করবে।

কোনো শিক্ষকের মধ্যে পিতৃত্বের ছায়া আছে, মাতৃত্বের ছায়া আছে, অথচ তাঁর ছেলেরা তাকে মুহাব্বত করে না, এটা হবে না ইনশাআলাহ। এই জিনিসটার এখন বড় অভাব।

যার মধ্যে পিতৃত্বের ছায়া থাকবে, মাতৃত্বের ছায়া থাকবে, সে কিন্তু ছাত্রদের থেকে খেদমত নেওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করে নিবে। এই জিজ্ঞাসা না করাটাই দলীল যে, তার মধ্যে শফকত নেই। খেদমত করা পর্যন্ত আছে। কিন্তু বাপ হিসাবে খেদমত নেওয়া, মা হিসাবে খেদমত নেওয়া, এই বৈশিষ্ট্যটা নেই। জিজ্ঞাসা করতে হবে। হুট করে বলে– এটা করো তো। এটা করার মতো অবস্থায় সে আছে কি না, দেখতে হবে।

পাহাড়পুরী হুজুর একটা কথা বলেছিলেন। তিনি কামরায় গেছেন। একটা ছেলে শুয়ে আছে। তল্লাশি করতে গেছেন। ছেলেটা যে শোয়া থেকে উঠছে না, উনি বুঝে ফেলেছেন যে, মনে হয় অসুস্থ। কিন্তু অন্য উস্তাদ গিয়ে তাকে কান ধরে উঠিয়েছে। 'আমরা এখানে কামরায় ঢুকছি, এখনো শুয়ে আছিস!'

হুজুর শান্ত করলেন। দেখলেন যে, আসলে সে অসুস্থ। উঠতে পারছে না। আমার শিক্ষকতার প্রথম যুগের ঘটনা। আমার মনে আছে। আমার মনে হয়েছে, এই লোকটা উস্তাদ হওয়ার উপযুক্ত না। আমাদের মধ্যে যেন এই গুণ আসে। এই গুণটা যার মধ্যে যেই পরিমাণ আসবে, সে সেই পরিমাণ কামিয়াবি লাভ করবে। তার কামিয়াবি ইনশাআল্লাহ কেউ রোধ করতে পারবে না।

যে যেই পেশায় আছে, সে যদি ঐ পেশায় সফল না হয়, তাহলে তার চেয়ে বড় দুর্ভাগা কেউ নেই। যে লেখক, তার লেখায় যদি সফলতা না আসে; যে ওয়ায়েজ, তার যদি ওয়াজের পেশায় সফলতা না আসে, তার যদি ডাইরির পাতা খালি থাকে, তাহলে এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর নেই। আমি ওয়াজ করতে পারি না। এটা কোনো দোষ না। কিন্তু যে ওয়ায়েজ, তার ওয়াজ করতে না পারাটা দোষের। আমি যে শিক্ষক, শিক্ষকতার পেশায় যদি সফল না হই ...! এটার সফলতার জন্য একেবারে অপরিহার্য একটা শর্ত, তার মধ্যে পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের ছায়া থাকতে হবে।

এখানে দু'একজন ছাত্রও আছে। এই জন্য আর একটা দিকও বলতে হয়। সেই ছাত্র কামিয়াবি হাসিল করতে পারবে না, যার মধ্যে সন্তান হওয়ার যে একটা কৃতার্থতা আছে, 'সাআদতমান্দী' [সৌভাগ্য] যাকে বলে, বাপ ধমক দিলেও সহীহ্ না দিলেও সহীহ্, ধমক দিলেও মা, ধমক না দিলেও মা, খেতে দিলেও মা, খেতে না দিলেও মা। যে তালেবে ইলমের মধ্যে এই জিনিসটা নেই, সে সারাজীবন পড়তে পারে, কিন্তু কামিয়াব তালেবে ইলম হতে পারবে না। আর যার মধ্যে এই গুণটা আছে, উস্তাদের অনেক আচরণ তার বরদাশত হয়ে যাবে। বরদাশতযোগ্য যে হয় না, তার কারণ হবো, ঐ সাআদতমান্দী তার মধ্যে নেই। মা বলতে পারেন- আজ তোরে ভাত দিব না। তারপরও মা মা-ই। এটা কেন, যেহেতু তার মধ্যে সন্তান হওয়ার যে গুণটা, সেটা আছে। এই সন্তান হওয়ার যে গুণ, এটার একটা ছায়া থাকতে হবে।

আমার উস্তাদ মীর ছাহেব রহ. পটিয়ার বানী [প্রতিষ্ঠাতা] মুফতী আজিজুল হক রহ.-এর খাবার রান্না করতেন। খাবার রান্না করা মানে মসলা পাটায় বেটে তারপর তরকারি রান্না করা। একদিন উনি পাটায় মসলা পিষছেন। হুযুরের মুখে শোনা, তিনি পিষছেন আর মুফতী ছাহেব রহ. চৌকিতে শোয়া ছিলেন। 'আহমদ! তোমার কষ্ট হইতেছে'। হুযুর উনার ভাষায় বলছিলেন– 'আমি ঘাড় বেকা করে তাকাইলাম। আমার মা-বাবার লগে এদ্দুর করলাম না অইলে। এটা আবার কষ্ট কী'। এই যে সন্তানত্ব, উনি যে সন্তান, আর এই যে চৌকিতে যিনি শোয়া আছেন উনি যে তাঁর বাপ, এই ছায়াটা পড়েছে। এই জন্য উনি কামিয়াব। তালেবে ইলমের সফল হওয়ার জন্য তার মধ্যে সন্তানত্বের ছায়া থাকতে হবে। আর উস্তাদের কামিয়াব হওয়ার জন্য পিতৃত্বের ও মাতৃত্বের ছায়া থাকতে হবে।

এখনও এই যমানায় মাদরাসাতুল মদীনায় আলহামদুলিল্লাহ কিছু ছাত্রের মধ্যে দেখি সন্তানত্বের ছায়া। এই যে কথাগুলো বলছি, কিছু কিছু ছেলের সূরত আমার জেহেনে এসে আছে, যাদের মধ্যে এই গুণগুলো আছে। আগের যামানার সাথে তুলনা করছি না। এই যামানার কথা বলছি। এই যামানায় যদ্দুর থাকার কথা, অদ্দুর আছে।

নফসের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার সফল পদ্ধতি[৬]

মাওলানা শাহ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন দা. বা.

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

নফস ও শয়তানের মোকাবেলা করতে হবে। আসলে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির পথে চলা এবং আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকার মধ্যেই জীবনের সফলতা। ব্যস, সব সময় এই চিন্তা নিয়ে থাকতে হবে।

কুরআন পাকে হযরত ইউসুফ আ.-এর ভাষায় রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন- إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيَ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي আমার নফসকে আমি পাক দাবি করি না। إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ নিশ্চয় নফস সর্বদা পাপাচারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي তবে যখন আমার প্রতিপালক দয়া করেন। إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ নিঃসন্দেহে আমার প্রভু অনেক ক্ষমাকারী ও অনেক দয়ালু।

---

৬. এটি আল্লাহ প্রেমের দহনে সদা দগ্ধ আমার শায়েখ ও মুর্শিদ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন দা. বা.-এর একটি বয়ান। ঢালকানগরের [গেণ্ডারিয়া, ঢাকা] 'খানকায়ে গুলশানে আখতারে' বিগত ১৫ - ৫ - ১৪৩০ হি. [১১ - ৫ - ২০০৯ ঈ.] সোমবার বাদ জোহর হয়রত বয়ানটি করেছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলাম। ক্যাসেট থেকে শুনে অনুলিপি তৈরি করার ভাগ্যও আমার কপালে জুটেছে। আল্লাহর ফজলে সালেকদের এক নূরানী পরিবেশে মঙ্গলবার [১৬ - ৫ - ১৪৩০ হি.] দিবাগত রাত দেড়টায় হযরতকে তা শুনানো সম্পন্ন হয়েছে। বয়ানটি প্রকাশের অনুমতি চাইলে হযরত সহাস্যে অনুমতি প্রদান করেন। উপস্থিত সালেকদের ঐক্যমতে বয়ানটির শিরোনাম 'নফসের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার সফল পদ্ধতি' নির্ধারণ করা হয়। আল্লাহ তা'আলা এর ওসিলায় আমাদের সকলকে নফসের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার তাওফীক দান করুন এবং আল্লাহ প্রেমের পানশালাগুলো থেকে পর্যাপ্ত মদিরা পান করার জন্য কবুল করুন। আমীন!

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে এই আয়াতে পাকের তাফসীরে বলা হয়েছে- لَأَمَّارَةٌ لَكَثِيْرَةُ الْأَمْرِ بِالسُّوْءِ أَيْ بِجِنْسِه অর্থাৎ নফসের স্বভাব এই যে, নফস মানুষকে মন্দের আদেশ করতেই থাকে। নফস দু'-একবার আদেশ করে ক্ষান্ত হয় না। বরং বার বার মন্দের প্ররোচনা দেয়। এজন্য হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ. বলেছেন- মনে কোনো ওয়াসওয়াসা এসে এক-দুবারেই যদি তা দূর হয়ে যায়, তাহলে তা শয়তানের পক্ষ থেকে। আর যদি অব্যাহত থাকে, তাহলে তা নফসের তরফ থেকে। لَأَمَّارَةٌ لَكَثِيْرَةُ الْأَمْرِ بِالسُّوْءِ

হযরত থানবী রহ. তো এতটুকুই বলেছেন যে, ওয়াসওয়াসা বার বার হলে তা নফসের পক্ষ থেকে। তিনি এর স্বপক্ষে কোনো দলিল উল্লেখ করেন নি। এই আয়াতে পাক তার দলিল। বারংবার মানুষকে মন্দের প্রতি প্ররোচিত করতে থাকা নফসের কাজ। وَالْمُرَادُ أَنَّهَا كَثِيْرَةُ الْمَيْلِ إِلَى الشَّهَوَاتِ। মনের চাহিদা অনুযায়ী চলার প্রতি নফসের আকর্ষণ বেশি থাকে। যেসব কাজ মনের কাছে ভালো লাগে, নফস সেগুলোরই আদেশ করে।

﴿إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ﴾، «مَا» مَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةٌ زَمَانِيَّةٌ، أَيْ هِيَ أَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ فِيْ كُلِّ وَقْتٍ إِلَّا فِيْ وَقْتِ رَحْمَةِ رَبِّيْ وَعِصْمَتِه.

নফস সব সময় মানুষকে মন্দের দিকে টানতে থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ তা'আলা দয়া করেন এবং হেফাজত করেন, তো ঐ সময়ই কেবল রক্ষা।

আয়াতে পাকের দ্বিতীয় অংশ দ্বারা প্রমাণিত হলো, বান্দার প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ পাকের রহমত কামনা করা উচিত। আল্লাহর রহমত ও হেফাজত না থাকলে কারো কোনো উপায় থাকবে না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যত দু'আ আছে, সব মু'জেযা। প্রত্যেক দু'আ আলাদা আলাদা মু'জেযা। আমরা তো মু'জেযার সংখ্যা গণনা করি- পাঁচশ, হাজার। কিন্তু বাস্তব হলো, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা স্বতন্ত্র একটি মু'জেযা। তাঁর প্রতিটি কাজ ভিন্ন একটি মু'জেযা। ঠিক সেভাবে কথা বলা এবং সেভাবে কাজ করা পৃথিবীর অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলে পাকের কথা ও কাজের মোটামুটি অনুকরণ তো সম্ভব। কিন্তু হুবহু নকল কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তো এই আয়াতে পাক হযরত ইউসুফ আলাইহি ওয়াসালামের মুখে

উচ্চারিত হয়েছিল। তা থেকে বুঝা যায়, তিনি কী পরিমাণ ফানাইয়্যাতওয়ালা ছিলেন। নবী হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে কি পরিমাণ বিলীন করেছিলেন। রাব্বুল আলামীনের দিকে কি পরিমাণ ধাবিত ছিলেন। নফসের প্রকৃতি ও স্বভাবের কারণে নফসের ব্যাপারে কতটা সতর্ক, সচেতন ও ভীত ছিলেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. লিখেছেন- إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ [তবে যখন আমার প্রভু দয়া করেন] এর অর্থ হলো, আল্লাহ তা'আলার দয়ার কারণেই আমরা রক্ষা পাচ্ছি। নবীগণ নিষ্পাপ। এ কারণেই রুহুল মা'আনীতে ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- أَيْ بِجِنْسِهِ অর্থাৎ নফসের স্বভাব এমন। কিন্তু এর শ্রেণী ও প্রকারের মধ্যে পার্থক্য হতে পারে। যেমন, নবীগণের নফস তাঁদেরকে মন্দের প্রতি প্ররোচিত করতে পারে না। কুরআনে কারীমেও তাঁদেরকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করা হয়েছে।

مَا رَحِمَ رَبِّيْ বাক্যে এক আশ্চর্য সৌন্দর্য ও বিস্ময়কর মু'জেযা নিহীত আছে। আল্লাহ তা'আলা إِلَّا النَّبِيِّيْنَ বলেননি। অর্থাৎ শুধু নবীগণকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেননি। বরং مَا رَحِمَ رَبِّيْ [যখন আমার প্রতিপালক দয়া করেন] বলেছেন, যাতে নিষ্পাপ নবীগণের পরেও আল্লাহ পাকের রহমতের প্রত্যাশা অব্যাহত থাকে। আমার রহমতের ছোঁয়া পেলে বেঁচে যাবে। উদাহরণস্বরূপ সিদ্দিকীন ও আউলিয়ায়ে কেরাম আছেন। আল্লাহ পাক তাঁদেরকে তাঁর বিশেষ রহমত দ্বারা হেফাজত করেন। তো এভাবে বলাতে আল্লাহ পাকের রহমতের প্রত্যাশা করার দাওয়াত থাকল। রহমত গ্রহণ করো, আর বেঁচে যাও। সুবহানাল্লাহ!

আমার শায়খ [আরেফবিলাহ শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব] দা. বা. বলেছেন- এই রহমত লাভ করার সহায়ক মাধ্যমগুলো আঁকড়ে ধরো। যেমন হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقَى جَلِيْسُهُمْ অর্থাৎ আমার বিশেষ নিকটবর্তী বান্দারা এমন যে, তাঁদের সঙ্গে যারা উঠাবসা করে, তারা কেউ জাহান্নামী হবে না, সবাই জান্নাতী হবে। এখানে شَقَاوَة [দুর্ভাগ্য] না থাকার কথা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে। তারা কেউ شَقِيّ [দুর্ভাগা] থাকবে না; বরং প্রত্যেকে سعيد [সৌভাগ্যবান] হয়ে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوْا فَفِى النَّارِ، وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُعِدُوْا فَفِى الْجَنَّةِ.

لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ অংশ থেকে প্রমাণিত হয় যে, شَقَاوَة-এর বিভিন্ন ধরণ আছে। মানুষ হতভাগা হয় কুফরের কারণে, শিরকের কারণে, বিদআতের কারণে, গুনাহের কারণে। এগুলো সবই شَقَاوَة

তো আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে উঠাবসাকারীরা কেউ জাহান্নামে যাবে না। এর দ্বারা বুঝা যায়, আল্লাহর নৈকট্যভাজন বান্দাদের সাহচর্যগ্রহণ কত গুরুত্বপূর্ণ!

হযরত থানবী রহ. তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে লিখেছেন– নবীগণের নফস إِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ থেকে ব্যতিক্রম। আল্লাহ পাক যাকে রক্ষা করেন, সে-ই নফসের ধোঁকা থেকে রক্ষা পায়।

আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে যারা সম্পর্ক রাখবে, উঠা-বসা করবে, তাদের জাহান্নামী না হওয়া نَصٌ قَطْعِيٌ তথা শরীয়তের অকাট্য বাণীর বর্ণনা। এ থেকেই হাকীমুল উম্মত রহ. বলেছেন, আহলুল্লাহর মহব্বতপ্রাপ্তরা মারদূদ [আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত] হয় না। কোনো জঘন্য গুনাহে লিপ্ত হলেও মৃত্যুর পূর্বে তাঁদের পরিপূর্ণ তাওবা করার তাওফীক অর্জিত হয়। হযরত থানবী রহ.-এর ভাষায়– اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤں گے অর্থাৎ কিয়ামতের ময়াদনে যদি কামেলদের অন্তর্ভুক্ত না-ও হও, তাওবাকারীদের দলভুক্ত অবশ্যই হবে। হাকীমুল উম্মতের এ ধরনের আশ্চর্য আশ্চর্য বাণী পড়ার সময় আমার প্রশ্ন জাগত, এগুলোর প্রমাণ কোথায়? আল্লাহর শোকর, হক তা'আলা এখন প্রমাণাদি বুঝতে থাকার তাওফীক দিচ্ছেন। هُمُ الْجُلَسَاءُ لَا يَشْقٰى جَلِيْسُهُمْ এই হাদীসাংশ হযরত থানবীর বাণীর কত মজবুত দলিল! لَا يَشْقٰى [হতভাগা হবে না]-এর ওয়াদা বহাল রাখতে হলে মৃত্যুর পূর্বে তাওবার তাওফীক দিতে হয়। তো لَا يَشْقٰى থেকেই বুঝা যায়, আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে যারা উঠা-বসা করে, তারা মারদূদ [আল্লাহর রহমত থেকে বিতাড়িত] হয় না। এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِيْنِه فَسَوْفَ يَأْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَه.

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কেউ যদি তার ধর্ম ত্যাগ করে, তবে আল্লাহ তা'আলা এমন এক জাতি সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি মহব্বত করবেন এবং তারাও তাঁকে মহব্বত করবে।

আমার শায়খ দা. বা. বলেন– এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, যারা আল্লাহকে মহব্বত করে, তারা মুরতাদ হয় না। তো মহব্বত অনেক বড় সম্পদ।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. বলেছেন– ابلیس عالم تھا، عارف تھا، عابد تھا অর্থাৎ ইবলিস আলেম, আরেফ, আবেদ সবই ছিল। তা সত্ত্বেও মারদূদ হওয়ার কারণ ছিল, عاشق نہ تھا ইশক-মহব্বত থেকে বঞ্চিত ছিল। মূলত মহব্বত মুরতাদ হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার গ্যারান্টি।

এভাবে অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ؕ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا.

অর্থাৎ আসমান-জমিন, পাহাড়-পর্বত কেউ আমানত বহন করার সাহস করেনি। কিন্তু মানুষ তা বহন করেছে। এই আমানত সম্পর্কে হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. বলেছেন– সকল আরেফ এ মর্মে ঐক্যবদ্ধ যে, এখানে আমানত দ্বারা আল্লাহর মহব্বত উদ্দেশ্য। তো মানুষ আল্লাহর মহব্বত বহন করেছে।

এই আমানত বহন করার পুরস্কারের ঘোষণাও আল্লাহ তা'আলা সঙ্গে সঙ্গে করেছেন। উঁচু স্তরের পুরস্কার। اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ঘনিষ্ঠজনদেরকেই মানুষ ঘনিষ্ঠভাবে বকাঝকা করে। কেমন জালেমের জালেম! কেমন জাহেলের জাহেল! কেউ যা বহন করার সাহস করেনি, সে তা বহন করার সাহস করেছে। আল্লাহ তা'আলা যে আমানত বহনকারীদেরকে পূর্ণ ভালবাসেন, এই আয়াতাংশ তার অনেক বড় প্রমাণ।

অতএব আমানত বহন করার অর্থ হলো, আল্লাহকে মহব্বত করা। আমানত বহনকারীরা দুনিয়াতেই আল্লাহর প্রশংসা লাভে ধন্য হয়েছেন। সুতরাং মহব্বতকারীরা উভয় জাহানে সফল।

إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ [তবে যখন আমার প্রতিপালক দয়া করেন] তো আমার শায়খ দা. বা. বলেছেন, উপরিউক্ত হাদীসে কুদসী দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ ওয়ালাদের সাহচর্য আল্লাহ তা'আলার রহমতের ছায়া। তাঁদের সাহচর্য গ্রহণ করলে شَقَاوَة [দুর্ভাগ্য] রহমতে রূপান্তরিত হয়, দুর্ভাগ্য সৌভাগ্যে পরিবর্তিত হয়। যার উপর আল্লাহ তা'আলার ক্রোধ ধাবিত হচ্ছিল, এখন তার প্রতি আল্লাহর মহব্বত ও রহমত ধাবিত হচ্ছে।

আমি বলতেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِتَرْكِ الْمَعَاصِيْ অর্থাৎ হে আল্লাহ! গুনাহ বর্জনের পদ্ধতি দ্বারা আপনি আমার উপর দয়া করুন। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যা বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আয় ঠিক একই বিষয় উচ্চারণ করেছেন। কি আশ্চর্য মু'জেযা! এ দু'আ দ্বারা বুঝা গেল, রহমত লাভের পথ হলো আনুগত্য প্রদর্শন করা। আর অবাধ্যতা ও নফসানিয়াত হলো রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। হে আল্লাহ! আমার প্রতি দয়া করুন গুনাহ বর্জন করার তাওফীক দান দ্বারা। بِتَرْكِ এর بَ কে تَصْوِيْرِيَّة গণ্য করা যায়। অর্থ হবে, আমার প্রতি দয়া করুন, যে দয়ার صُوْرَتْ তথা পদ্ধতি হবে আমি গুনাহ বর্জন করতে থাকব, গুনাহ থেকে মুক্ত থাকব। بَ কে سَبَبِيَّه ও বলা যায়। কিন্তু تَصْوِيْرِيَّة বললে তৃপ্তি লাগে। যে, হে আল্লাহ! আমার প্রতি আপনার রহমতের صُوْرَتْ [পদ্ধতি] এই থাকবে যে, আমি গুনাহ ছাড়তে থাকব, তখন আমি বুঝব যে, আমি রহমতের ছায়ায় আছি।

এই দু'আ থেকে প্রমাণিত হয়, যারা গুনাহ বর্জন করার তাওফীকপ্রাপ্ত, তারা পুরো সময় আল্লাহ তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত। আল্লাহ পাক তাদেরকে গুনাহ বর্জন করার তাওফীক দান করে সর্বদা রহমতের ছায়ায় রাখেন। নিজের নৈকট্য ও সন্তুষ্টির ছায়ায় রাখেন।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-কে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, কেউ কি বুঝতে পারে যে, সে জান্নাতে যাবে। তিনি বলেছেন, হ্যাঁ, অবশ্যই বুঝতে পারে। এক সড়ক আছে, যার শেষ সীমানা হলো জাহান্নাম। আরেক সড়কের শেষ সীমানা হলো জান্নাত। যে সড়কে চলা শুরু করবে, সেই সড়কের শেষ সীমানায় পৌঁছবে। সকল নেক আমল ও গুনাহ থেকে মুক্ত থাকা হলো তাকওয়া। আর তাকওয়া হলো জান্নাতের সড়ক। সুতরাং যে

তাকওয়ার উপর থাকবে, তার শেষ মঞ্জিল হবে জান্নাত। আর যে গুনাহের মধ্যে থাকবে, তার শেষ মঞ্জিল হবে জাহান্নাম। নাউযুবিলাহি মিন যালিক।

মোটকথা, مَعْصِيَة [গুনাহ, আল্লাহর অবাধ্যতা] شَقَاوَة [দুর্ভাগ্য]। আর যারা মা'সিয়াতওয়ালা [গুনাহগার], তারা أَشْقِيَاء [দুর্ভাগা]।

اشقیاء رادیدہ بینا نبود نیک وبد در دیدہ شاں یکساں نمود

মাওলানা জালালুদ্দীন রুমী রহ. বলেন- যারা أَشْقِيَاء অর্থাৎ কুফর, শিরক, বিদআদ ও অন্যান্য গুনাহের অভিশাপে আক্রান্ত, তাদের হক দেখার মতো দৃষ্টিশক্তি থাকে না। হক অনুধাবন করার মতো অনুধাবনশক্তি থাকে না।

ঐ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- وَلَا تُشْقِنِيْ بِمَعْصِيَتِكَ হে আল্লাহ! গুনাহের রাস্তায় আমাকে হতভাগা বানাবেন না। نَعُوْذُ بِاللهِ تَعَالٰى مِنْ ذٰلِكَ

তো বুঝা গেল, প্রত্যেক প্রকার গুনাহ হতভাগ্য হওয়ার কারণ।

এক সময় আমি ভাবতাম, شَقَاوَة [হতভাগ্য] বলতে কি বুঝায়? তারপর হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর কিতাবে এক স্থানে পেলাম, কুফর ও শিরক যেমন شَقَاوَة, অন্যান্য গুনাহও তদ্রূপ شَقَاوَة- আল্লাহ তা'আলা সকল গুনাহ থেকে আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

তো এখানে দু'টি কথা বুঝা গেল। এক. গুনাহ হতভাগ্যতা। দুই. হতভাগ্যতা থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ হলো গুনাহ বর্জন করা। গুনাহ ত্যাগ করলে হতভাগ্য হওয়া থেকে, কপালপোড়া হওয়া থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। আর গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক লাভ ও হতভাগ্য হওয়ার থেকে রক্ষা পাওয়ার সহজ পদ্ধতি হলো, আল্লাহওয়ালাদের সোহবত। আউলিয়া কেরামের সাথে উঠা-বসা।

তো দু'টি জিনিস জরুরী বুঝা গেল। এক. গুনাহ বর্জনের মুজাহাদা। দুই. আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত গ্রহণ করা। এজন্যই হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. বলেছেন, শুধু গুনাহ বর্জনের মুজাহাদা যথেষ্ট নয়। এমনিভাবে শুধু সোহবত গ্রহণের মেহনতও যথেষ্ট নয়। উভয়টিই জরুরী। হযরতের

বাণী পড়ার তাওফীক হয়েছে। দলিল উল্লেখ ছিল না। এখন তো দলিলও সামনে এসে গেল। আকাবিরের বাণীসমূহ মুদাল্লাল হতে থাকা অনেক বড় নেয়ামত।

এই গুনাহ বর্জন এবং আল্লাহ ওয়ালাদের সোহবত গ্রহণ উভয়টির জন্য সহায়ক হলো আল্লাহর জিকির। কারণ, বান্দা তখনই গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে, যখন তার প্রতি আল্লাহ পাকের তাওয়াজ্জুহ থাকে, স্নেহের দৃষ্টি থাকে, আল্লাহ পাকের দয়ার নজর অব্যাহত থাকে। আর হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত যে, জিকিরের দ্বারা বান্দার প্রতি আল্লাহ গাকের দৃষ্টি ভীষণ ধাবিত থাকে।

أَنَا مَعَ عَبْدِيْ إِذَا ذَكَرَنِيْ وَتَحَرَّكَتْ بِيْ شَفَتَاهُ.

বান্দা যখন আমার জিকিরে রত হয় এবং তার ঠোঁটদ্বয় জিকিরে নড়াচড়া করে, তখন আমি তার সঙ্গে থাকি।

এখানে আল্লাহ তা'আলা ইযাফাতের মাধ্যমে মানুষের উল্লেখ করেছেন– عَبْدِيْ এই ইযাফাত হলো– اضافت تشريفي অর্থাৎ বান্দা যখন আমার জিকির করে, তখন সে শারাফাতের [মর্যাদার] মাকামে থাকে। তো জিকির করলে শারাফাতের মাকাম অর্জিত হয়। হক তা'আলা যাকে শরীফ [মর্যাদাবান] বলেন, তিনি তাকে কতটা রহমতের নজরে দেখেন! এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, জিকির করলে বান্দার প্রতি রহমত ধাবিত হয়।

অন্য এক হাদীসে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন, বান্দা যখন একা একা আমাকে স্মরণ করে, তখন আমিও তাকে একা একা স্মরণ করে থাকি। আর সে যখন লোকজনের আসরে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তার জন্য আসরের ব্যবস্থা করি। জলসার আয়োজন করি। এভাবে তাকে স্মরণ করি।

এই হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জিকির করলে বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ধাবিত হয়। অন্য এক হাদীসে আছে–

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُوْنَ اللهَ تَعَالٰى إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ.

জিকিরের এত বড় ফজিলত! এত বেশী লাভ! ফেরেশতারা জিকিরকারীদের

ঘিরে রাখেন। রহমত তাদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাদের অন্তরে বিশেষ নূর অবতীর্ণ হয়। سَكِيْنَه ঐ নূরকে বলে, যে নূরের বরকতে বান্দার অন্তর আল্লাহর দিকে ধাবিত থাকে এবং গায়রুল্লাহর প্রতি যত আকর্ষণ থাকে, সব নিঃশেষ হয়ে যায়। نُوْرٌ يَسْتَقِرُّ فِي الْقَلْبِ، وَبِهِ يَثْبُتُ التَّوَجُّهُ إِلَى الْحَقِّ، وَيَتَخَلَّصُ مِنَ الطَّيْشِ. অর্থাৎ সাকীনা হলো এমন এক নূর যা অন্তরে স্থির হয়, তার ফলে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ গাঢ় হয় এবং মন অস্থিরতা থেকে মুক্তি লাভ করে।

তো জিকিরের কত উপকারিতা! এজন্য হযরত থানবী রহ. বলেন, আল্লাহ ওয়ালাদের সঙ্গে উঠা-বসা করো। গুনাহ থেকে আত্মরক্ষার মুজাহাদা করো। আর আল্লাহর জিকির করো। নিজের শায়খের পরামর্শ অনুযায়ী সামান্য জিকির করো। হযরত থানবী রহ. বলতেন, জিকির ছুটে যাওয়ার অর্থ হলো আত্মার ক্ষুধার্ত থাকা। জিকির না করলে আত্মা ক্ষুধার্ত থাকে। হযরতের ভাষা হলো, ذکر کا ناغہ تو روح کا فاقہ আত্মা দুর্বল হলে নফস সবল হয়। গুনাহের দিকে মানুষকে আকৃষ্ট করা নফসের পক্ষে সহজ হয়ে যায়। জিকিরের বরকতে আত্মায় বিপুল পরিমাণ নূর জমা হয়। নূরের পরিমাণ যত বৃদ্ধি পায়, আত্মা নফসের উপর তত প্রবল হয়। নেক আমলের তাওফীক তত লাভ হয়।

আলহামদুলিল্লাহ, আজ অনেক দিক আলোচনা হয়েছে এবং হক তা'আলার তাওফীকে সব কথা মুদাল্লাল [প্রমাণভিত্তিক] হয়েছে।

তো প্রত্যেকে গুনাহ বর্জন করার সিদ্ধান্ত করি। গুনাহ বর্জন করার জন্য হিম্মত জরুরী। হযরত হাকীমুল উম্মত রহ. বলেন, যাদের বড় বড় গুনাহের অভ্যাস হয়ে গেছে, তারা গুনাহের এই অভ্যাস থেকে মুক্ত হতে পারবে না মজবুত হিম্মত করা ছাড়া। অতএব হিম্মত করো, আল্লাহ পাকের দরবারে হিম্মতের জন্য দু'আ করো এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের নিকট হিম্মতের জন্য দু'আ চাও। তাঁদের দ্বারা হিম্মতের দু'আ করাও।

হযরত থানভী রহ. বলেছেন, কেউ যদি এই তিন কাজ করে– নিজে হিম্মত করে, আল্লাহর নিকট হিম্মতের দু'আ করে এবং আল্লাহ ওয়ালাদের নিকট হিম্মতের দু'আ চায়, অবশ্যই তার সব গুনাহ ছুটে যাবে ইনশাআলাহ।

আর গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য হিম্মত করা যে জরুরী, তার প্রমাণ হলো, হযরত ইউসুফ আলাইহিস্ সালামকে জুলায়খা যখন ফুসলাল, তখন ইউসুফ আ. সেখান থেকে ছুটলেন। হযরত থানবী রহ. বয়ানুল কুরআনে নয়; বরং অন্য এক কিতাবে লিখেছেন, দরজাগুলো বন্ধ ছিল। তখন সবগুলো তালা পড়ে গিয়েছিল। إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ আল্লাহ পাক নিজ রহমতে দরজাগুলো খুলে দিয়েছেন।

দরজা বন্ধ থাকার কারণে হযরত ইউসুফ আ. সেখানে বসে আল্লাহর দিকে ধাবিত হতে পারতেন। সেখানে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করতে পারতেন। সেখানেই সিজদায় লুটে পড়তে পারতেন। কিন্তু তিনি কী করলেন? তিনি বের হওয়ার জন্য দৌড় দিলেন। বুঝা গেল, যেখানে গুনাহের উপকরণ বিদ্যমান, সেখানে অবস্থান করাই নিষিদ্ধ।

অন্য আয়াতে বিষয়টি আরো স্পষ্ট আছে। فَفِرُّوْا إِلَى اللهِ، أَيْ : عَمَّا سِوَى اللهِ إِلَى اللهِ অর্থাৎ গায়রুল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আল্লাহর দিকে ছুটো।

আমার শায়খ দা. বা. বলেছেন– এই فِرَارْ [পলায়ন] তিন রকম– ১. فِرَارِ عَيْنِي ২. فِرَارِ قَلْبِي ৩. فِرَارِ قَالِبِي চোখের হেফাজত, চোখে দেখবে না, দেখলেই বিপদে পড়বে। قَلْبِ বা অন্তরের পলায়ন হলো কল্পনা না করা। গুনাহের উপকরণের কল্পনা করবে না। فِرَارِ قَالِبِي অর্থ হলো দেহের পলায়ন। অর্থাৎ গুনাহের স্থানে অবস্থান করবে না। দেহ নিয়ে সেখান থেকে পলায়ন করো। এই তিন রকম فِرَارْ [পলায়ন] গ্রহণ করে দেখ, আল্লাহর সঙ্গে কেমন قَرَارْ [অবস্থান] অর্জন হয়। আল্লাহর সঙ্গে অবস্থান হলো এই পলায়নের নগদ পুরস্কার। আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বার মধ্যেই নিহিত আছে অস্থির লোকদের স্থিরতা।

তো হযরত ইউসুফ আ. সেখান থেকে দৌড়েছেন, হিম্মত করেছেন। যতটুকু নিজের ক্ষমতায় আছে, ততটুকু করা জরুরী। لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে তার ক্ষমতা পরিমাণ দায়িত্বই অর্পণ করেন। إِتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ যতটুকু পার আল্লাহকে ভয় করো। তোমাদের যতটুকু সাধ্য আছে, ততটুকু করে দেখাও। বাকিটা আমি

দেখাব। হযরত ইউসুফ আ. দরজা পর্যন্ত দৌড়িয়ে তাঁর ক্ষমতায় যতটুকু ছিল ততটুকু দেখিয়েছেন, বাকিটা আল্লাহ তা'আলা দেখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশে তালাগুলো নিজে নিজে পড়ে গেল, দরজাগুলো নিজে নিজে খুলে গেল।

إِنَّ رَبِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ، عَظِيْمُ الْمَغْفِرَةِ وَمُبَالِغٌ فِي الرَّحْمَةِ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ أَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ إِلَّا نَفْسًا رَحِمَهَا اللهُ تَعَالٰى بِالْعِصْمَةِ كَنَفْسِ يُوْسُفَ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

নফসকে বিশ্বাস করতে নেই। নফসকে বিশ্বাস করা যায় না। গাউস, আবদাল, কুতব, দরবেশ, যত উর্ধ্বের মাকামই অর্জন হয়, নফসের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কারো কোনো সুযোগ নেই। কখন কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করে বসে বলা যায় না। খাজা [আযিযুল হাসান মাজযুব রহ.] ছাহেব বলেছেন–

بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد

فرشتہ بھی تہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا

আমলের দিক থেকে ও নূরের বিপুলতার দিক থেকে নফস যদি তোমার কাছে ফেরেশতার মতো মনে হয়, তবুও নফসের প্রতি সুধারণা পোষণ করা উচিত নয়। কুধারণা পোষণ করতে থাকো। এতদিন পর্যন্ত খানকায় থাকলাম, চিল্লা লাগালাম, নফসকে ফেরেশতার মতো মনে হচ্ছে। না নফসকে সামান্য সময়ের জন্যও বিশ্বাস করা যায় না।

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ

অবশ্যই নফস মন্দের আদেশ করতেই থাকে।

কিছু দোষ ছাড়ি, আদর্শ জীবন গড়ি[৭]

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

الحمدُ لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسَلين، وعلى آله وصَحْبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،

সহীহ মুসলিম শরীফে আছে[৮], হযরত সালমান ফারসী রা. কে একবার এক মুশরিক উপহাসের ছলে বলেছিল– তোমাদের নবী দেখি তোমাদেরকে সবকিছু শেখান, এমনকি পেশাব-পায়খানা কিভাবে করতে হয় তা-ও শেখান। মুশরিকটার ধারণা ছিল, পেশাব-পায়খানার আলোচনা হলো নীচ স্তরের আলোচনা। কোনো উঁচু স্তরের ব্যক্তি এমন নীচ স্তরের আলোচনা করতে পারেন না। হযরত সালমান রা. নিঃসঙ্কোচে তার কথা স্বীকার করে পেশাব-পায়খানার প্রয়োজন পূরণ সংশ্লিষ্ট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু শিক্ষা উল্লেখ করলেন। তিনি বুঝালেন, যে জিনিসগুলোকে মুশরিকটা ইসলামের ত্রুটি মনে করেছিল, সেগুলো বরং ইসলামের পূর্ণতার প্রমাণ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবই হয়েছে সকল চারিত্রিক গুণের সর্বোচ্চ আদর্শ স্থাপনের জন্য।

সুনানে আবু দাউদে আছে,[৯] সাহাবায়ে কেরাম একবার কোথাও যাচ্ছিলেন। তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বললেন– "তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে যাচ্ছ। সুতরাং সুন্দর পোশাক পরিধান

---

৭. এটি আমার একটি বয়ান। ০৪ - ১ - ১৪৩৪ হিজরী মোতাবেক ১৯ - ১১ - ২০১২ ঈ. সোমবার বাদ জোহর দারুল উলূম মাদানীনগর মাদরাসার মসজিদে ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বয়ানটি হয়েছিল। রেকর্ড থেকে অনুলিখন তৈরি করেছে মাদরাসার আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষার্থী মাওলানা মুফতী ওমর ফারুক [সোনারগাঁও]।

৮. হাদীস নং ৬২৯

৯. হাদীস নং ৪০৯১

করো এবং হাওদাকে পরিপাটি করো। মানুষের মধ্যে তোমাদের অবস্থানটা যেন তিলকের মতো হয়।" অনেকের শরীরে বিভিন্ন স্থানে তিল থাকে, যা দূর থেকে দেখলেই বুঝে আসে। এ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুঝালেন, মুসলমানদের এমনভাবে চলা উচিত, তাদের আচরণ-উচ্চারণ দেখলেই দর্শক যেন বুঝতে পারে, এরা উন্নত আদর্শের লোক।

এ হাদীসেরই পরবর্তী অংশ হলো, আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতা পছন্দ করেন না। এবং সেই কাজও পছন্দ করেন না, যা দ্বারা অশ্লীলতা প্রকাশ পায়, যদিও অশ্লীলতা করা ব্যক্তির উদ্দেশ্য না হয়।

এই হাদীসগুলোকে মূলভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে মাদরাসায় অবস্থানকালে যেসকল অশোভনীয় কাজ আমাদের অনেকের দ্বারা প্রকাশ পায়, সে ধরনের কিছু বিষয় আজ উদাহরণ হিসেবে আলোচনা করার ইচ্ছা করেছি। আল্লাহ তাওফীক দান করুন এবং উপকারী করুন। আমীন! এ উদাহরণগুলোর উপর চিন্তা করে আরো অনেক দোষ আমাদের খুঁজে বের করা উচিত। এবং সবগুলো থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। আমরা যদি আন্তরিকভাবে চাই, তাহলে অবশ্যই তা সম্ভব। এখানে এমন কোনো দোষ উল্লেখ করব না, যা দূর করা আমাদের কারও সাধ্যের বাইরে। অবশ্য অভ্যস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কিছু কষ্ট হবে। দুনিয়া তো পরীক্ষার ক্ষেত্র। কষ্ট না হলে পরীক্ষা হতো কিভাবে? যার পেটে কোনো সমস্যা নেই, আর সামনে বিরিয়ানি উপস্থিত আছে এবং বিরিয়ানির প্রতি তার আগ্রহও আছে, সে তো এমনিতেই খাবে। এর জন্য কি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে হুকুম আসতে হবে? বিধি-নিষেধ তো সেক্ষেত্রেই হয়, যেখানে কিছুটা কষ্ট থাকে। তবে তা সাধ্যাতীত থাকে না। মোটকথা, এ কথাগুলোর উপর আমল করা প্রত্যেকের পক্ষেই সম্ভব। তাহলে এখন বলা শুরু করি। এগুলো সুবিন্যস্ত কোনো রূপ নয়। বিশেষ কোনো বিন্যাস ও ধারাবাহিকতা ছাড়াই বলছি।

১. মিসওয়াক অথবা ব্রাশ, সেই ব্রাশে পেস্ট থাকুক অথবা না থাকুক, কোনো অবস্থাতেই ব্যবহার করার পূর্বে হাউজে চুবানো উচিত নয়। ভিজানোর প্রয়োজন হলে হাউজ থেকে পানি নিয়ে বাইরে ভিজাবে।

   মিসওয়াক করা সুন্নত। মিসওয়াক অবশ্যই করব। কিন্তু ব্রাশ করার ব্যাপারেও বিশেষকরে বর্তমানে দ্বিধা থাকা উচিত নয়। প্রত্যেক অজুর পূর্বে মিসওয়াক করার পাশাপাশি দিনে দু'বার ব্রাশ করতে চেষ্টা

করবে। এক. রাতে শোয়ার পূর্বে। দুই. সকালে নাস্তার পর। এর ফলে খাবারের যে সমস্ত কণিকা দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকে, সেগুলো বের হয়ে যাবে। আর দাঁত ও জিহ্বার পরিচ্ছন্নতা হলো মুখের সুস্থতার ভিত্তি, যা পুরো শরীরের সুস্থতার অন্যতম শর্ত। পেটের অসুস্থতার মূলে থাকে মুখের অসুস্থতা। ব্রাশ করার নিয়ম কী তা-ও এ প্রসঙ্গে শুনে রাখো–

ক. প্রথমে ভেতরের দিকে ব্রাশ সামান্য কোণাকোণিভাবে উপরে-নীচে উঠানামা করাও অথবা বৃত্তাকারে ঘোরাও।

খ. এরপর বাইরের দিকে উপরে-নীচে উঠানামা করিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতে থাকো। এলোমেলোভাবে ব্রাশ করবে না। ধীরসুস্থে সবগুলো দাঁত পরিষ্কার করো।

গ. তারপর উপরের দিক। দাঁতের উপর সোজা করে ধরে ব্রাশ করো যাতে সকল খাঁজ ও ফাঁক থেকে খাদ্যকণাগুলো বেরিয়ে আসে।

উল্লেখ্য, দাঁতের তিনটি স্থানে সাধারণত ময়লা জমে ওঠে। সেগুলোতে জীবাণু জন্মে ও বংশ বিস্তার করে–

ক. বেশির ভাগ ময়লা জমে মাড়ি ও দাঁতের সংযোগস্থলে।

খ. ময়লা লুকিয়ে থাকতে পারে দাঁতের ফাঁকসমূহে।

গ. দাঁতের পেছনের অংশের এবং চর্বণ অংশের খাঁজ ময়লা লুকিয়ে থাকার আরেকটি স্থান।[১০]

২. তাহাজ্জুদ পড়া অথবা কিতাব মুতালা'আ করার উদ্দেশ্যে আগে উঠার জন্য কেউ কেউ এলার্ম দিয়ে ঘুমায়। কিন্তু ঘুম ভারী হওয়ার কারণে এলার্ম বাজার পরও তাদের ঘুম ভাঙ্গে না। ওদিকে যারা তাহাজ্জুদ পড়ার জন্য কিংবা কিতাব মুতালা'আ করার জন্য আগে উঠার ইচ্ছা করেনি, তাদের ঘুম নষ্ট হয়, এমনকি তাদের উঠে এলার্মের আওয়াজ বন্ধ করতে হয়। তো যাদের ঘুম ভারী, তাদের এমন সময় এলার্ম দেওয়া উচিত নয়, যখন সকলের উঠার সময় নয়।

---

১০. সূত্র. মেডিপ্লাস টুথপেস্টের নির্দেশিকা।

৩. পা ধোয়ার জন্য হাউজের পাড়ে পা রেখে কেউ যেন পা না ধুই। পা ধোব বাইরে নিচে রেখে। হাত বা মগ দিয়ে হাউজ থেকে পানি তুলে পা ধৌত করব। হাউজের পাড়ে পা রেখে যদি পা ধোয়া হয়, তাহলে পায়ের পানি গড়িয়ে অনেক সময় হাউজের ভেতরে পরে।

৪. অনেকে অজুর স্থানে বসে দীর্ঘ সময় ধরে মিসওয়াক বা ব্রাশ করতে থাকে। অন্যদিকে যাদের তখন মিসওয়াক বা ব্রাশ করার প্রয়োজন নেই, তারা পেছনে অপেক্ষায় থাকে। তাই পেছনে কেউ অপেক্ষায় থাকলে ওজুর স্থানে বসে দীর্ঘ সময় ধরে ব্রাশ বা মিসওয়াক করতে থাকা উচিত নয়।

৫. যেকোনো কারণেই নাকে বেশি ময়লা থাকার ফলে যাদের নাক ঝাড়ার সময় আওয়াজ বেশি হয়, তাদের উচিত অন্যদের থেকে দূরে সরে নাক ঝাড়া। নাক ঝাড়ার আওয়াজ যেন কারো কানে না পৌঁছে, এর জন্য যতটুকু সম্ভব চেষ্টা করবে।

৬. যে সকল হাউজের পাড় বেশ নিচু, সে সকল হাউজে অজুকারীরা যদি লুঙ্গি বা পাজামা একটু ঢিলেঢালা করে না বসে, তাহলে তাদের দিকে মুখ করে অপর দিকে অজুকারী লোকেরা এক ধরনের বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। এভাবে লুঙ্গি বা পায়জামা টাইট করে অজু করতে বসা ইচ্ছাকৃত অশ্লীলতা না হলেও তা থেকে অশ্লীলতা প্রকাশ পায়। অতএব এ ব্যাপারেও আমাদের সতর্ক থাকা উচিত।

৭. অজুতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা উচিত নয়। মগ দিয়ে অজু করার সময় অনেককে দেখা যায়, পায়ে পানি ঢালতেই থাকে। যেখানে আধা মগ বা এক মগ দিয়ে দু' পা সুন্দরভাবে ধোয়া যায়, সেখানে দু' পায়ে চার পাঁচ মগ পানিও ঢালতে দেখা যায়। আর টেপ থেকে অজু করার সময় টেপ ছেড়ে দিয়ে অনেকে মেসওয়াক বা ব্রাশ করা শুরু করে। ওদিকে পানি পড়তে থাকে। ব্রাশ বা মিসওয়াক করার সময় বা টেপ থেকে অজু করার সময় এতো পানি নষ্ট হয় যে, সে পরিমাণ পানি যদি বালতিতে জমানো হয়, তাহলে তা দ্বারা একজন মানুষের সুন্দরভাবে গোসল হয়ে যাবে। এভাবে পানি অপচয় করার কারণে ইবাদত গুনাহে পরিণত হয়। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুন। সরাসরি টেপ থেকে অজু না করে মগ বা বদনায় পানি নিয়ে অজু করলে পানির অপচয় অনেকটা রোধ করা সহজ হবে।

৮. অজুর পর আমরা অনেকে হাত ঝাড়ি। অনেকে দাড়ি ঝাড়ি। এই হাত ও দাড়ি ঝাড়ার পানি কারো গায়ে পড়ছে কিনা, সে দিকে লক্ষ রাখি না। দেখা যায়, এই পানি অনেক সময় অন্যদের গায়েও পড়ে। মুসলমানের অন্যতম একটি গুণ হলো, তার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকবে। তার দ্বারা কেউ কষ্ট পাবে না। অতএব যে কাজের মধ্যে অন্যের কষ্ট হয়, সেটা বর্জনীয়। কারো কাজ-কর্ম দ্বারা অন্যের যে পরিমাণ কষ্ট হয়, তার মুসলমান হওয়ার মধ্যে সেই পরিমাণ ত্রুটি আছে। আমরা যেন এমন কোনো কাজ না করি, যা দ্বারা অন্য কেউ কষ্ট পায়।

৯. পাজামা পরে কেউ গোসল করবে না। অনুরূপভাবে এমন সাদা লুঙ্গি পরেও গোসল করবে না, যা দ্বারা শরীরের নিম্নাংশের আকৃতি প্রকাশ পায়। যদি সাদা বা পাতলা লুঙ্গি বা পায়জামা পরে কারো গোসল করতেই হয়, তাহলে সে অবশ্যই যেন একটা গামছা পেঁচিয়ে নেয়।

১০. গেঞ্জি খুলে দীর্ঘ সময় ধরে কাপড়-চোপড় ধুবে না। যদি দীর্ঘ সময় নিয়ে কাপড় ধোয়ার প্রয়োজন হয়, তাহলে গেঞ্জি গায়ে রেখে ধুবে। গেঞ্জি খুলবে শুধু গোসল করার সময়। গোসলের পূর্বে কারো সামনে গেঞ্জি খুলবে না। আর যদি গেঞ্জি গায়ে রেখেই গোসল করতে পার, তাহলে আরো ভালো। হ্যাঁ, তুমি যদি একা গোসলখানায় গোসল কর, তাহলে তুমি স্বাধীন। তোমার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে থাকার সুযোগ আছে। শরীয়তের পক্ষ থেকে এ অবস্থায় কোনো বিধি-নিষেধ নেই। মোটকথা, অন্যের প্রতি কুদৃষ্টি করবে না এবং নিজেও অন্যের কুদৃষ্টির উপকরণ হবে না।

১১. কেউ কেউ গোসল করার সময় দাঁড়িয়ে গায়ে এমনভাবে পানি ঢালতে থাকে যে, আশেপাশে যারা আছে তাদের গায়েও পানির ছিটা পড়ে। তো অন্যের গায়ে যেন পানির ছিটা না পড়ে, সে দিকে যথাসম্ভব লক্ষ রাখবে।

১২. অনেকে গোসল করার সময় লুঙ্গির নিচের দিক থেকে ঝটকা দিয়ে ভেতরে উপরের দিকে পানি মারে। ওই পানির ছিটা অন্যের গায়ে পর্যন্ত পড়তে দেখা যায়। এমন লোকের মধ্যে রুচিবোধের অনেক অভাব। এভাবে কেউ লুঙ্গির ভেতরে পানি মারবে না এবং অন্যের সামনে লুঙ্গির নিচ দিয়ে শরীরে সাবানও ব্যবহার করবে না। সাবান

ব্যবহার করবে লুঙ্গির উপর দিয়ে, তা-ও একটু আড়ালে গিয়ে। সপ্তাহে দু'দিনের বেশি সাবান ব্যবহার করবে না। অন্যান্য দিন সাবান ছাড়া এমনিতেই গোসল করবে। যে দু'দিন সাবান ব্যবহার করবে এবং শরীর ভালোভাবে কচলাবে, সে দু'দিন একটু নিরিবিলি গোসল করার চেষ্টা করো। যখন সকলের গোসল করার সময় নয়, তখন গোসল করো।

১৩. গোসল করার পর ও অন্যান্য সময় যখন লুঙ্গি পাল্টাবে বা পরবে, তখন আশেপাশে কেউ থাকলে পুরো ছড়িয়ে লুঙ্গি পরবে না। বরং লুঙ্গি চিকন করে সামনে নিয়ে পরবে। ছড়িয়ে পরলে অন্যের কুদৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

১৪. আমাদের হাউজগুলোর দক্ষিণ দিকে আলো বেশী। এ অবস্থায় দক্ষিণ পাড়ে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে গোসল করলে, ভেজা কাপড় শরীরের সাথে লেগে থাকার কারণে শরীরের কিছু অংশে এমন আকৃতি প্রকাশ পাবে, যার উপর দৃষ্টি পড়লে যারা কুরুচিসম্পন্ন অথবা রুচিহীন তাদের কিছুই মনে না হতে পারে, কিন্তু রুচিশীল লোকেরা তাতে অবশ্যই বিব্রত হবে। অতএব গোসল করার সময় পূর্ণ আলোর মধ্যে যদি দাঁড়াতেই হয়, তাহলে একটু জড়োসড়ো হয়ে কিংবা সামান্য বাঁকা হয়ে দাঁড়াবে। আর না হলে বসে গোসল করো। শুধু লুঙ্গি পরিবর্তন করার সময় দাঁড়াও।

১৫. হাউজের পাড়ে কাপড় ধোয়ার পর ঐ স্থানটাও ধুয়ে নিবে। অনেক সময় কাপড় নাপাক থাকে। এ অবস্থায় কাপড় ধোয়ার পর যদি স্থানটা ধুয়ে না রাখা হয়, তাহলে স্থানটা নাপাক থেকে যাবে। তখন সেখানে কারো পা লাগলে তার পা-ও নাপাক হবে। সেই পা নিয়ে নামায পড়লে নামাযও নষ্ট হবে। আর যার অবহেলার কারণে এ সবকিছু ঘটল, তার ঘাড়ে সব গুনাহ চাপবে।

১৬. কাপড় ধোয়ার পর বা সাবান দিয়ে গোসল করার পর যেখানে সাবান রেখেছিলে বা যেখানে সাবানের ফেনা লেগেছিল, সেই স্থানটা ভালভাবে ধুয়ে রাখবে। সাবান লাগা স্থানে পিছল খেয়ে ব্যথা পাওয়ার ঘটনা হাউজের পাড়ে অনেক ঘটে।

১৭. অনুমতি ছাড়া হাউজের পাড়ে অন্য কারো মগ নেয়া খুবই বিব্রতকর একটা কাজ। দেখা যায়, একজন নিজের পাশে মগ রেখে শরীরে সাবান মেখেছে। শরীর ভালভাবে ঘষেছে। এরপর যখন পানি ঢালবে, তখন মগ খুঁজে পায় না। একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে যেতে যেতে মগটি এখন দূরে একজনের হাতে। সারা শরীরে সাবান মাখা অবস্থায় এ বেচারা কিভাবে সেই দূর থেকে মগ আনবে? সৌজন্যের খাতিরে কেউ তার অসন্তোষ প্রকাশ করুক বা না করুক, কাজটা তার জন্য বড় কষ্টের বিষয়।

১৮. অনেকে খালি পায়ে মসজিদ বা কামরা থেকে বের হয়ে পা না ধুয়েই ভেতরে ফিরে আসে। এ অবস্থায় মাঠের যে ময়লা খালি পায়ে হাঁটার কারণে পায়ে লাগে, তাতে মসজিদ বা কামরা অপরিচ্ছন্ন হয়। অতএব খালি পায়ে বাইরে বের হবে না। কোনো কারণে যদি খালি পায়ে বের হতেই হয়, তাহলে পা পরিষ্কার না করে ভেতরে ফিরে আসবে না। আরেকটি কথা, খালি পায়ে টয়লেটে প্রবেশ করা অভদ্রতা ও রুচিহীনতার পাশাপাশি পরিবেশ-দূষণের অন্যতম কারণ। এভাবে পরিবেশে জীবাণু ছড়ায়। তাই কেউ খালি পায়ে টয়লেটে যাবে না। পেশাবখানায়ও না।

১৯. অনুমতি ছাড়া অল্প সময়ের জন্যও অন্যের জুতা ব্যবহার করবে না। এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেউ কেউ অনুমতি ছাড়া অন্যের জুতা ব্যবহার করাকে কিছুই মনে করে না। সবচেয়ে বিব্রতকর অবস্থার শিকার হন অভিভাবকগণ। তাঁরা বিভিন্ন জায়গায় জুতা রেখে ছাত্রদের সাথে বা উস্তাদদের সাথে দেখা করতে যান, নামাযের জন্য মসজিদে প্রবেশ করেন বা দফতরে কোনো প্রয়োজন থাকলে সেই প্রয়োজন পূরণ করেন। ওদিকে একজন তাঁর জুতো নিয়ে গেল। হয়ত চুরি করার ইচ্ছা নেই। আবার নিয়ে আসবে। কিন্তু ফিরিয়ে আনার আগ পর্যন্ত জুতার মালিক কতটুকু পেরেশান হবেন? বিভিন্ন স্থানে ফলকে লেখা থাকে– 'জুতা খুলে উঠুন'। এসমস্ত লেখা দেখে লোকেরা যখন জুতা খুলে কোথাও রাখে, তখন তাদের জুতা নিয়ে যাওয়া হয়। এটা কেমন আচরণ? শুধু জুতা নয়। অনুমতি ছাড়া অন্যের কোনো জিনিস ব্যবহার করবে না।

২০. অনেককে দেখা যায় দোকানে বসে খাবার খায়। অনেকে আবার হেঁটে হেঁটে খায়। প্রয়োজন ছাড়া দোকানে বসে যেমন কিছু খাবে না, তদ্রূপ হেঁটে হেঁটেও কিছু খাবে না। দোকান থেকে কিনে এনে কামরায় বসে খাবে। হেঁটে হেঁটে খাওয়া অভদ্রতা ও ব্যক্তিত্বের পরিপন্থি।

২১. মানুষের মলের কিছু না কিছু অংশ কমোডে লেগেই থাকে, তা চোখে দেখা যাক বা না যাক। তাই টয়লেট ব্যবহারের পূর্বেই কিছু পানি ঢেলে কমোড ভিজিয়ে নিবে। প্রয়োজন শেষ করার পর দরকার হলে কিছু পানি ঢালবে, যেন ময়লাটা চলে যায়। তারপর ব্রাশ দিয়ে ঘষে এক দু' বদনা পানি অতিরিক্ত ঢালবে। এভাবে অতিরিক্ত পানি ঢালাকে অপচয় মনে করবে না। টয়লেটকে যে অবস্থায় পাবে, আসার সময় তার তুলনায় ভাল অবস্থায় রেখে আসবে।

২২. জামা খোলা অবস্থায় শুধু পাজামা পরে অন্যের সামনে হাঁটাহাঁটি করবে না। এটাও এক প্রকার অশালীনতা।

২৩. বিভিন্ন রুমের সামনে কাপড় ছড়ানোর জন্য দু'তিন স্তরে তার লাগানো আছে। নিচের তারে শুকনো কাপড় থাকা অবস্থায় উপরের তারে ভেজা কাপড় ছড়াবে না। অন্যথায় নিচের শুকনো কাপড় ভিজে যাবে। তাছাড়া অন্যের ভেজা কাপড় সরিয়ে নিজের কাপড় ছড়াবে না।

২৪. ডাল, চা, ফিরনি, সেমাই মোটকথা কিছু খাওয়ার সময় মুখ থেকে যেন আওয়াজ না হয়। এ ধরনের আওয়াজ রুচিবান লোকদের ঘৃণা উদ্রেক করে। যার মুখ থেকে খাবার চিবানোর আওয়াজ হয়, রুচিবান লোকেরা তার সঙ্গে এক দস্তরখানে খেতে অস্বস্তি বোধ করে।

২৫. অজু করার পর বা খানা খাওয়ার পর সামনে পেলেই অন্যের গামছা বা তোয়ালে দিয়ে হাত-মুখ মুছবে না। অনুমতি ছাড়া অন্যের কিছু ব্যবহার করবে না। অনুমতির কথাটি আগেও একবার বলা হয়েছে।

২৬. পায়জামা পরে শোয়ার সময় কোমর থেকে নিচের অংশে রুমাল বা চাদর বা অন্য কোনো হালকা কাপড় রাখবে। লুঙ্গি পরা অবস্থায়ও যদি অতিরিক্ত কোনো কাপড় রাখ, তাহলে তা-ও ভাল।

২৭. যে সমস্ত কারণে মানুষ কষ্ট পায় সে ধরনের কিছু কারণের আলোচনা প্রসঙ্গে সালামের উত্তর না দেয়ার কথাও একজন বলেছে। এদ্বারা

বোঝা যায়, সালাম না করার মতো সালামের উত্তর না দেয়াও আমাদের মধ্যে কত ব্যাপক আকার ধারণ করেছে!

২৮. অনেক মাদরাসায় মাতবাখ থেকে খানা তোলার জন্য লাইন ধরতে হয়। একজনের সঙ্গে তুমি কথা বলে রাখলে, আমি পরে আসব। এরপর পরে এসে তোমার ১৫/২০/২৫ মিনিট আগে যারা লাইনে দাঁড়িয়েছে, তাদেরকে পেছনে রেখে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে খানা তুললে। এ কাজ দ্বারা অন্যরা কষ্ট পায়। অতএব এমন করা জায়েজ হবে না। শুধু তখনই জায়েজ হবে, যখন পূর্বে আসা প্রত্যেকে তাদের সামনে দাঁড়ানোর স্পষ্টভাবে অনুমতি দেয়। সুতরাং এ চালাকি কেউ করবে না। কোনো কিতাব নিয়ে লাইনে দাঁড়াও। এতে কাউকে কষ্টও দেয়া হবে না, তোমারও সময় নষ্ট হবে না। অথবা পরে এসে খানা উঠাও।

২৯. মিসওয়াক বা ব্রাশ করার সময় যত্রতত্র থুথু ফেলবে না। অনুরূপভাবে কুলির পানি যেকোনো স্থানে ফেলবে না।

৩০. অনেকে জায়নামাজে বসে তেপায়ায় কিতাব রেখে পড়ার পর জায়নামাজটি তেপায়ার উপর রেখে চলে যায়। যে জায়নামাজ এতক্ষণ তোমার নিচে ছিল, সেটাকে তুমি রাখলে কিতাব-খাতা-কলম ইত্যাদির উপর। এটা কেমন আদব হলো, তুমিই চিন্তা করো।

৩১. আদাবুল মু'আশারাত বা সামাজিক শিষ্টাচার বিষয়ে লিখিত বড়দের বিভিন্ন বই পড়বে। হযরত থানবী রহ.-এর "আদাবুল মু'আশারাত" নামেই একটি বই আছে। 'মিন আদাবিল ইসলাম' নামে শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ.-এর একটি কিতাব আছে। এ সমস্ত বই ও কিতাব পড়লে অনেক ফায়দা হবে। এগুলোর উপর আমল করলে দুনিয়াতেই জান্নাতের অনেক শান্তি অর্জন হবে।

৩২. সবশেষে কুদৃষ্টি ও কুকল্পনা বিষয়ে কিছু কথা বলব। খুবই জরুরী কথা। আর এ কথাই আমার আজকের এ বৈঠকের শেষ কথা। সব সময় দৃষ্টির ও কল্পনার হেফাজত করবে। বিশেষকরে দু'টি সময় কুদৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক থাকবে। এক. ঘুম থেকে উঠার সময়। দুই. গোসল করার সময়।

কুদৃষ্টি ও কুকল্পনার ব্যাপারে সতর্ক থাকা একটি দায়েমী ফরজ। সুন্দর-অসুন্দর যেমনই হোক, কারো দিকে কুদৃষ্টি করা সম্পূর্ণ হারাম।

কুদৃষ্টির সাথে না হলেও যাদের দাড়ি ওঠেনি প্রয়োজন ছাড়া তাদের দিকে তাকানো মোটেই নিরাপদ নয়। যেমন বিদ্যুতের তারে বিদ্যুৎ না থাকা অবস্থায়ও হাত দেয়া নিরাপদ নয়। কারণ, যেকোনো সময় বিদ্যুৎ এসে যেতে পারে।

কুদৃষ্টি ও কুসম্পর্কের ক্ষতি যে কত বেশী ও কত ভয়াবহ, তা বলে শেষ করা যাবে না। আমার ধারণায় শিক্ষার্থীদের জন্য কুদৃষ্টি ও কুসম্পর্কের সর্বনিম্ন ক্ষতি হলো, জীবনে বড় হওয়ার সম্ভাবনা অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। আর একমাত্র আল্লাহর অসন্তুষ্টির ভয়ে যে ব্যক্তি মনের উপর চাপ সৃষ্টি করে কুদৃষ্টি থেকে বিরত থাকবে এবং মনের চাহিদা তীব্র হলেও কুদৃষ্টি না করা নিজের অভ্যাসে পরিণত করবে, সে-ই শুধু বলতে পারবে, মনের শান্তি কুদৃষ্টি করার মধ্যে না কুদৃষ্টি না করার মধ্যে। আত্মিক এ স্তর অবশ্য এমনিতেই অর্জন হয় না। এর জন্য ভক্তি ও মহব্বতের সাথে কোনো রুহানী চিকিৎসকের সাহচর্যে থাকতে হয় এবং তাঁর নির্দেশিত ব্যবস্থাপত্র মেনে চলতে হয়।

দেহের যেমন রোগ-ব্যাধি থাকে এবং সেগুলোর জন্য দেহের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হয়, অনুরূপভাবে আত্মারও আছে অনেক রোগ ও অনেক ব্যাধি এবং সেগুলোর জন্যও আত্মার চিকিৎসকের চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়। প্রত্যেকের একজন শায়খ ও মুর্শিদ থাকা জরুরী। তাঁকে নিজের কল্যাণকামী বিশ্বাস করে তাঁর সামনে মনের দুর্বলতাগুলো প্রকাশ করবে। কোনো কিছু গোপন রাখবে না। এই মনে করবে না যে, এগুলো জানলে তিনি তো আমাকে পাক্কা শয়তান মনে করবেন। না, এই ধারণা ভুল। তিনি যদি বাস্তবেই মুসলিহ ও মুর্শিদ হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি বরং মনে করবেন, এ ছেলে অনেক উঁচু স্তরের। সংশোধনের উদ্দেশ্যে সে আমার কাছে তার মনের খেয়ানতগুলো প্রকাশ করছে।

আমি তোমাদেরকে একান্ত অনুরোধের সঙ্গে বলব– নিজের ক্ষতি করবে না। আল্লাহর গযবের পাত্র হবে না। জীবন নষ্ট করবে না। যাঁর প্রতি মনের আগ্রহ ও আস্থা হয় এমন একজন কামেল শায়খকে[১১]

---

[১১]. ৪৯৭ নং পৃষ্ঠায় 'কামেল শায়েখে'র পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।

নিজের আত্মার চিকিৎসক হিসেবে নির্বাচন করো এবং তাঁর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করো। কুদৃষ্টি ও কুকল্পনাসহ মনের অন্যান্য রোগ থেকে আরোগ্য লাভ না করলে বাহ্যিক অনেক যোগ্যতা থাকলেও সেগুলো দ্বারা নিজের এবং দেশ ও দশের উপকারী কোনো কাজ হবে না। যারা নিজেদের আত্মাকে সংশোধন করে, তাদের বাহ্যিক যোগ্যতা অল্প হলেও আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের দ্বারা বড় বড় কাজ নেন। এটিই বাস্তবতা।

কেউ নিজেকে বুযুর্গ মনে করে বসে থাকবে না। বুযুর্গ ও মুত্তাকী মূলত সে-ই, যে সবসময় নিজের নফসের অবস্থা তদারকি করতে থাকে; নফসের ব্যাপারে মনে করে- নফস আমাকে যেকোনো মুহূর্তে ধোঁকা দিতে পারে; নফসকে কোনো অবস্থায়ই বিশ্বাস করো না। অতএব যাঁর দিকে তাকালে মনে কোনো খারাপ বাসনা আসে না, প্রয়োজন না হলে তার দিকেও আমরা তাকাব না। যে ব্যক্তি নফসের ব্যাপারে যত নিশ্চিন্ত থাকবে, সে ব্যক্তি গুনাহ্ সংঘটিত হওয়ার তত ঝুঁকির মধ্যে থাকবে।

আমি আপাতত মাত্র দু'টি বইয়ের নাম বলছি- ১. 'আল্লাহর মহব্বত লাভের পরীক্ষিত তিনটি কিতাব'। ২. 'কুদৃষ্টি ও অসৎ সম্পর্কের ধ্বংসলীলা ও প্রতিকার'। বইদু'টির লেখক হলেন আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.। বইদু'টির কিছু অংশ হযরতের বয়ান, আর কিছু অংশ লেখা। বাংলায় অনুবাদ করেছেন আমার শায়খ ও মুর্শিদ ঢালকানগরের হযরত আকদাস মাওলানা শাহ্ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন দা. বা.। বইদু'টি প্রত্যেকের পড়া উচিত।

আল্লাহ্ তা'আলা এতক্ষণের আলোচনাগুলো দ্বারা আমাদের সকলকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخِرُ دَعْوَانا أَنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصَحْبه أجمعين.

৩২ নং বিষয় সংশ্লিষ্ট পরবর্তী সংযোজন

কুদৃষ্টি বিষয়ক হযরত থানবী রহ.-এর একটি বিশেষ বক্তব্য

'আপবীতি' কিতাব থেকে উপরিউক্ত ৩২ নং বিষয় সংশ্লিষ্ট একটি আলোচনা এখানে সংযোজন করা উপকারী মনে করছি। আল্লাহ তা'আলা সংযোজনটি উপকারী করুন। আমীন! 'আপবীতি' ষষ্ঠ খণ্ডে শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. লিখিয়েছেন–

غَضُّ الْبَصَرِ নামে হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর একটি উপদেশমূলক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি চোখের হেফাযত সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। কুরআন শরীফের يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ[12] আয়াত দ্বারা আলোচনা শুরু করেন।

তিনি লিখেন, কুদৃষ্টি এমন গুনাহ যাকে মানুষ গুনাহ মনে করে না; মনে করে কোনো একটি সুন্দর স্থান দেখার মতো একটি স্থান দেখল। এ জন্য গুনাহের পর অন্তরে কষ্ট বা ব্যথা অনুভব হয় না। এটা এমন মারাত্মক গুনাহ যা থেকে বৃদ্ধরাও বাঁচতে পারে না। খারাপ কাজের জন্য অনেক চেষ্টা ও তদবীর করতে হয়। টাকাও প্রয়োজন হয়। অন্যের সন্তুষ্টিও প্রয়োজন হয়। কিন্তু এ গুনাহ করতে কিছুর প্রয়োজন হয় না। এতে কোনো বদনামীও নেই। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই এ গুনাহ সম্পর্কে জানেন যে, সে কোন্ নিয়তে দেখে, তাই এ গুনাহ করার পরও মৌলভী সাহেব মৌলভীই থাকেন। কারী সাহেব কারী সাহেবই থাকেন। এ গুনাহ সম্পর্কে অন্য কেউ জানে না। যদিও বা আকাবিরদের কেউ জানে, কিন্তু তাঁরা এত বড় মনের অধিকারী যে, তাঁরা তা কিছুতেই ব্যক্ত করেন না।

একবার হযরত উসমান রা.-এর খেদমতে এক ব্যক্তি আসল। লোকটি কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত ছিল। হযরত উসমান রা. তার নাম উল্লেখ না করে শুধু এতটুকু বলেন, মানুষের একি অবস্থা যে, তার দৃষ্টি থেকে যিনা ঝরছে।

কাশফ ও অন্তর্দৃষ্টির কল্যাণে যে আকাবিরগণের সামনে গুপ্ত জিনিস প্রকাশ

---

[১২]. সূরা মু'মিন, আয়াত নং ১৯

হয়ে পড়ত। তাঁরা লিখেছেন, অসংযত দৃষ্টির কারণে চোখে এক ধরনের মলিনতা সৃষ্টি হয়, যার মাঝে সামান্য বুঝ আছে সে দেখেই বুঝতে পারে যে, এ ব্যক্তির দৃষ্টি অপবিত্র। বিশেষকরে নাবালেগ ছেলেদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া অত্যন্ত মারাত্মক। এ ব্যাপারে শরীয়তের নিষেধাজ্ঞা একেবারে সুস্পষ্ট। আমাদের বুযুর্গরাও এর যেসব অনিষ্টতার কথা লিখেছেন তা থেকে জানা যায়, এটা অত্যন্ত কঠিন বিপদ। এক বুযুর্গ বলেন, খারাপ দৃষ্টি শয়তানের একটা তীর। অর্থাৎ খারাপ দৃষ্টির মাধ্যমেই শয়তানের শিকারে পরিণত হয়।

হযরত আবু কাসেম কুশাইরী রহ. একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি দ্বীনদার হতে চায়, তার জন্য মহিলা ও নাবালেগ ছেলেদের সাথে বেশী মেলামেশা করা অত্যন্ত ক্ষতিকর। তার জন্য এগুলো ডাকাততুল্য। এগুলো কখনো তাকে তার উদ্দেশ্য পর্যন্ত পৌছতে দিবে না।

অন্য আরেকজন বুযুর্গ বলেন, আল্লাহ্ যাকে তাঁর দরবার থেকে বের করে দিতে চান, তার অন্তরে নাবালেগ ছেলেদের প্রতি আগ্রহ ও মুহাব্বত সৃষ্টি করে দেন। কুদৃষ্টির আরেকটি মারাত্মক খারাপ দিক আছে যা অন্য কোনো গুনাহে নেই। তাহলো অন্যান্য গুনাহ যখন খুব মন ভরে করা হয়, এক সময় সেটা থেকে মন ফিরে আসে। কিন্তু বদ নজর বা কুদৃষ্টি এত খারাপ যে, যত বেশী কুদৃষ্টি দেয় খাহেশ তত বেশী বাড়তে থাকে।

একজন বুযুর্গ ছিলেন তিনি পর্দার ব্যাপারে তেমন সতর্কতা অবলম্বন করতেন না; মহিলাদেরকে তার সামনে আসার অনুমতি দিতেন। তিনি মনে করতেন, আমি তো অনেক বৃদ্ধ হয়ে গেছি, এখন আমার সামনে মহিলাদের আসাতে কোনো অসুবিধা নেই। অন্য একজন বুযুর্গ তাকে উপদেশ দেন যে, মিয়াঁ! মহিলাদের তোমার সামনে আসতে নিষেধ করবে। তিনি তাঁর উপদেশের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেননি। পরিশেষে একবার এ বুযুর্গ রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমি তো বৃদ্ধ হয়ে গেছি, এখন মহিলাদের আমার সামনে আসাতে কোনো শংকাবোধ করি না। তবুও কি পর্দা করা জরুরি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, পুরুষ যদি জুনায়েদ বাগদাদীর মতো বুযুর্গ হয় আর মহিলা যদি রাবেয়া বসরীর মতো বুযুর্গ হয়, এর পরও যদি কোনো নির্জন স্থানে একত্রিত হয়, শয়তান তাঁদের নিকট উপস্থিত হবে এবং তাঁদের

দু'জনের দ্বারা কোনো কুকর্ম অবশ্যই ঘটাবে। এরপরও মহিলাদেরকে তোমার সামনে আসতে দেয়া কিভাবে তোমার জন্য জায়েজ হবে?

এক বুযুর্গ কাবা ঘর তাওয়াফ করছিলেন। তিনি কানা[১৩] ছিলেন। তিনি তাওয়াফ করতেন আর বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার ক্রোধ থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। কেউ জিজ্ঞাসা করল, এত ভয় পাচ্ছেন কেন? ব্যাপার কী? তিনি বললেন, আমি একবার একটি ছেলের দিকে কুদৃষ্টি নিয়ে তাকাই। অমনি অদৃশ্য থেকে একটি চপেটাঘাত লাগল আর আমার চোখ ফুটে গেল। এ জন্য ভয় হচ্ছে, যেন দ্বিতীয়বার এমন না হয়।[১৪]

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ. اَلسُّنَّةُ الْخَلَبِيَّةُ কিতাবে লিখেন, হযরত শায়খ ওয়াসেতী বলেন, আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বান্দাকে অপমানিত করতে চান, তার অন্তরে কিশোর ও বালক ছেলেদের মুহাব্বত সৃষ্টি করে দেন এবং তার সংশ্রবে লিপ্ত করেন।

কুদৃষ্টির কারণে চোখে যে এক ধরনের মলিনতা সৃষ্টি হয়, অল্প জ্ঞানী ব্যক্তিও তা বুঝতে পারে। এ সম্পর্কে মুফতী মাহমুদ হাসান ছাহেব গঙ্গুহী হযরত মাওলানা আব্দুল কাদির রায়পুরী রহ. থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। ঘটনাটি হযরত আব্দুল কাদির রায়পুরী রহ. কে বড় হযরত রায়পুরী রহ.[১৫] শুনিয়েছেন। বড় হযরত রায়পুরী রহ. একবার অজু করছিলেন। এক পা ধুয়েছেন আরেক পা' ধুবেন, এ সময় দু' ব্যক্তি আসবেন। একজন আগে থেকেই হযরতের মুরিদ ছিলেন, অন্যজন নবাগত। হযরত মুরিদকে বললেন, তোমার তো কোনো সমস্যা হয়নি? মানুষের অলসতা ও গাফলতী সহজে যায় না। [এ ব্যক্তি যিকির ও অযীফার পাবন্দী করত না, তাই তাকে এ কথা বললেন।] নবাগত ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন, চোখ থেকেই তার একটি ব্যাধি ঠিকরে বেরুচ্ছে। অন্তরও খারাপ। এ ব্যক্তির বদ নজরের অভ্যাস ছিল, আক্বীদাও ভাল ছিল না।[১৬]

---

১৩. একচক্ষুহীন।

১৪. غَضُّ الْبَصَرِ কিতাবের বক্তব্য শেষ হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ হযরত আব্দুর রহীম রায়পুরী রহ.।

১৬. 'আপরীতি' ২ ঃ ৩৭৮ - ৩৮১

একটি সাক্ষাৎকার[১৭]

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : 'ইসলাহী জোড়' আয়োজনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : 'ইসলাহী জোড়' শব্দ থেকেই এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বের করা যায়। 'ইসলাহী জোড়' শব্দের অর্থ হলো 'সংশোধনমূলক মিলন'। তো এই মাহফিলের লক্ষ্য হলো একটি উপযোগী পরিবেশে অবস্থান করে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা লাভ করা এবং পাশাপাশি সোহবত, বয়ান, তা'লীম ও যিকির-আযকার ইত্যাদির মাধ্যমে আত্মিক পরিশুদ্ধির কিছু অনুশীলন করা। যেন ধীরে ধীরে এই স্তর অর্জন হয় যে, ইবাদতের সময় যেন সরাসরি আল্লাহকে দেখছি। আর এর উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : সন্দ্বীপের হযরত [মাওলানা মুহাম্মদ ইদ্রীস] রহ.-এর ইসলাহে নফসের পদ্ধতি কেমন ছিল?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : হযরতের নিকট আমার উপস্থিতি অনেক বিলম্বে হয়েছে। অবশ্য হযরতের হাতেই দারুল উলূম মাদানীনগর মাদরাসায় আমার নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। আর তা হয়েছে হযরতের ইন্তিকালের মাত্র এক সপ্তাহ পূর্বে। যাই হোক, আমি যতটুকু বুঝেছি, হযরত 'তাখলিয়ার পর তাহলিয়া' এই নীতির পরিবর্তে সুপ্রসচেতন বুযুর্গদের মতো 'তাখলিয়া' ও 'তাহলিয়া' উভয় মেহনত একসঙ্গে করাতেন। অর্থাৎ তিনি

---

১৭. দারুল উলূম মাদানীনগর মাদরাসার [ঢাকা] বার্ষিক 'ইসলাহী জোড়' উপলক্ষে প্রকাশিত 'ইসলাহী জোড় প্রতিদিন' পত্রিকার ২৫ ডিসেম্বরের সংখ্যায় নিম্নের সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছে। ২০১১ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক 'ইসলাহী জোড়' অনুষ্ঠিত হয়েছে ডিসেম্বর মাসের ২৩ - ২৪ - ২৫ তারিখে। 'ইসলাহী জোড় প্রতিদিন'-এর পক্ষ থেকে মাদরাসার ছানাভী দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী মিজানুর রহমান [চট্টগ্রাম] ও হাবীবুল্লাহ [নরসিংদী] সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছে। ব্যাপক উপকারিতার লক্ষ্যে সাক্ষাৎকারটি এ বইয়ে পুনঃপ্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা ইখলাসের সাথে কবুল করুন। আমীন!

গুনাহ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার পর উন্নত গুণাবলী অর্জনের সবক দেওয়ার পরিবর্তে, গুনাহ ছাড়ার মোজাহাদা এবং উন্নত গুণাবলী অর্জন করার সাধনা একসঙ্গে করাতেন।[১৮]

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : ইসলাহী জোড়ের জন্য হযরত রহ. নিজকে এবং অন্যদেরকে কীরূপ ফিকিরমন্দ রাখতেন?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : হযরতের বিভিন্ন ঘটনা শুনে এবং তাঁর উত্তরসূরীদের তৎপরতা দেখে বোঝা যায়, হযরত ইসলাহী জোড় সফল করার জন্য, অর্থাৎ ইসলাহী জোড়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন হওয়ার জন্য অত্যন্ত ফিকির করতেন ও অন্যদেরকেও যথেষ্ট ফিকিরমন্দ রাখতেন।

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : বর্তমান পরিস্থিতিতে মুসলিম উম্মাহর আত্মিক সংস্কারের স্বরূপ কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : আমিই আর কী যে, আমার মনে করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। তবে কুরআন পাকের একটি আয়াতের আলোকে বলতে চাই– ঈমানকে প্রিয় করে তোলার জন্য এবং কুফর, পাপাচার ও নাফরমানীকে ঘৃণিত বানাবার জন্য যতবেশী সম্ভব উম্মাহকে বলা প্রয়োজন। এর জন্য প্রচার মাধ্যমগুলো বড় ধরনের ভূমিকা পালন করতে পারে। আল্লাহ সকলকে হেদায়াত দান করুন। আমীন! আর ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে সাধারণ মানুষদের জন্য বুযুর্গগণের সোহবত গ্রহণ করার সুযোগ ব্যাপক করা দরকার।

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : ইসলাহী মজলিসগুলোর ফায়দা আরও ব্যাপক ও পরিপূর্ণ কীভাবে হতে পারে?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : কোনো স্তরের উপর তুষ্ট না হয়ে মজলিসগুলোর উপকারিতা আরও ব্যাপক হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে। সর্বদা ফিকিরমন্দ থাকতে হবে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা অনেক পদক্ষেপ ইলহাম করবেন ইনশাআলাহ।

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : এ মাহফিলকে 'ইসলাহী জোড়' নামকরণের কারণ কী?

---

[১৮]. টীকাটি ৪৯৮ - ৪৯৯ নং পৃষ্ঠায় পড়ুন।

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : গতানুগতিক মাহফিলের পরিবর্তে এ মাহফিলকে কতগুলো ইসলাহী মজলিসের রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। এ মাহফিলকে উপলক্ষ্য করে মাদরাসার জন্য কোন চাঁদাও কালেকশন করা হয় না। এটি একটি সম্পূর্ণ আত্মশুদ্ধিমূলক মাহফিল। তাই একে 'ইসলাহী জোড়' নামকরণ করা হয়।

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : এ যুগে কি খানকার প্রয়োজন আছে?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : অবশ্যই প্রয়োজন আছে। দেহ ও আত্মা উভয়ের সমন্বয়ে মানুষ। দেহের মতো আত্মারও রোগ-ব্যাধি আছে। দেহের রোগ নিরাময়ের জন্য ক্লিনিক ও হাসপাতালের প্রয়োজন যতদিন থাকবে, আত্মার চিকিৎসার জন্য কামেল শায়খের সোহবত ও খানকার প্রয়োজন ততদিন থাকবে।

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : জেনারেল শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে নারীসমাজ ইসলাহী মেহনতের মাধ্যমে কীভাবে উপকৃত হতে পারে?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : স্কুল-কলেজ পড়ুয়া বল আর মাদরাসা পড়ুয়া বল আল্লাহওয়ালাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে যারা নিজেদের আত্মার সংশোধন করেনি, তারা সকলেই সাধারণ মানুষ। আর যাঁরা তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আত্মার সংশোধন করেছেন, আল্লাহর নিকট শুধু তাঁরাই অসাধারণ, তাঁদের বাহ্যিক চলাফেরা যতই সাধারণ হোক। সকলকে নির্দিষ্ট কোনো কামেল শায়খের সঙ্গে ইসলাহী সম্পর্ক গড়তে হবে। মহিলাগণ মাহরাম পুরুষের সহায়তায় চিঠি-পত্রের মাধ্যমে সম্পর্ক রাখবে। সেই শায়খের ফয়েজ পরিপূর্ণ হাসিল করার জন্য চারটি কাজ করতে হবে। কাজগুলোর কথা হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেছেন–

১. অবহিত করা অর্থাৎ নিজের ভালো-মন্দ অবস্থা বিশেষ করে দোষণীয় বিষয়গুলো শায়খকে অবগত করতে হবে। মহিলাগণ এ কাজটি চিঠি-পত্রের মাধ্যমে করবেন।

২. মেনে চলা। অর্থাৎ শারীরিক রোগী যেমন ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র মেনে চলে, তদ্রূপ আত্মিক রোগীরও শায়খের ব্যবস্থাপত্র মেনে চলতে হবে।

৩. ভক্তি-বিশ্বাস রাখা অর্থাৎ ডাক্তার নির্বাচন করার পূর্বে যেমন দেখে-শুনে যাচাই-বাছাই করে চিকিৎসা গ্রহণ করা হয়, তেমনি শায়খ নির্বাচনের

পূর্বেও যাচাই-বাছাই করতে হয়। শায়খের ব্যাপারে এ আস্থা রাখতে হবে যে, তিনি আমাকে যে দিকনির্দেশনা দেন তা মেনে চলার মধ্যেই আমার মুক্তি ও সফলতা নিহিত।

১. অনুগত থাকা অর্থাৎ আল্লাহর মুহব্বত ও মা'রেফাত এবং রূহানী তারাক্কী লাভের জন্য শায়খের একান্ত অনুগত থাকা, জীবিত লোকের হাতে মরদেহের যে অবস্থা, কামেল শায়খের প্রতি অনুরূপ অনুগত ও নিবেদিত থাকা।

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : ছাত্রজীবনে তাসাউওফের মেহনত করা সম্পর্কে আমাদের সালাফের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ ক্ষেত্রে করণীয় পন্থা কী হতে পারে?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী রহ. বলেছেন– হযরত গঙ্গুহী রহ. ও অন্যান্য আকাবিরগণ ছাত্রদেরকে বাইআত করতেন না। 'শিক্ষাজীবন' সমাপ্ত করার পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা ছাত্রদেরকে তাসাওউফের যিকির-শোগল থেকে বিরত রাখতেন। হযরত থানবী রহ. স্বয়ং নিজের ঘটনা লিখেছেন– ছাত্রজীবনে আমি হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর নিকট বাইআতের দরখাস্ত করেছি। তিনি দরখাস্ত কবুল না করে বললেন, এটা শয়তানের ওয়াসওয়াসা। অর্থাৎ কুরআন-হাদীসের ইলমের ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা থেকে সরিয়ে শয়তান অন্য একটি কাজে লাগিয়ে দিতে চায়, যেন কুরআন-হাদীসের ইলম অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

আসল কথা হলো, তখন আমাদের ইলমী অঙ্গনে যে বাইআতের প্রচলন ছিল তা এখনকার মতো ছিল না। এখন লোকজন বুযুর্গদের হাতে বাইআত হয়ে যায়। তারপর কাজের কাজ কিছুই করে না। কিন্তু তখন বাইআত হওয়ার পর মুরিদ সুলূক ও আধ্যাত্মিকতার দীর্ঘ সাধনা শুরু করে দিত। এ অবস্থায় হযরত থানবী রহ.-এর মতো হযরতগণ যদি ছাত্রজীবনে বাইআত হয়ে যেতেন, তাহলে যিকির-শোগলের ধারবাহিকতাও শুরু হয়ে যেত। তখন যিকিরের প্রতিক্রিয়া ও নূর এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির বিভিন্ন অবস্থার ধারাবাহিকতাও শুরু হয়ে যেত। এর অনিবার্য ফল হিসেবে ইলমের প্রতি মনোযোগ হ্রাস পেয়ে যেত। কারণ, যে ব্যক্তি যিকিরের স্বাদ পেয়ে যায়, তার কাছে যিকিরের তুলনায় তৃপ্তিকর ও অধিক স্বাদের কোনো জিনিস থাকে না। সে তখন শুধু যিকিরের লোক হয়ে যায়। তখন হেদায়া,

তাওযীহ, তালবীহ, মায়যাবী, উমূরে আম্মাহ ও খায়ালী-এর মতো জটিল ও রসহীন কিতাবে মন দিতে পারে না। সে তখন অন্য জগতের হয়ে যায়।

তো হযরত থানবী রহ. যদি ছাত্রজীবনেই বাই'আত হয়ে তাসাওউফের যিকির-শোগলে লেগে যেতেন, তাহলে শুধু একজন বুযুর্গই হতেন। ইলমের সেই স্তর কিছুতেই অর্জন করতে পারতেন না, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দান করেছেন। তিনি হাকীমুল উম্মত ও মুজাদ্দিদে মিল্লাত হতেন না। তাঁর কলমে অসংখ্য সংশোধনমূলক কিতাব উম্মত লাভ করত না, যেগুলো ইনশাআল্লাহ বহু যুগ পর্যন্ত সরল পথের দিশা দান করতে থাকবে।

তো আমার ভাইয়েরা! হযরত গঙ্গুহী রহ. প্রমুখ আমাদের আকাবিরগণ ছাত্রদেরকে এ জন্য বাই'আত করতেন না, যাতে তারা যিকির-শোগলে নিমগ্ন হয়ে ইলম থেকে বঞ্চিত না হয়ে যায়। এর অর্থ কিছুতেই এই ছিল না যে, ছাত্রদের জন্য তা'আল্লুক মা'আল্লাহ এবং তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন নেই।

তাছাড়া তখনকার যুগে বর্তমানের মতো এতো অধিক পরিমাণে মাদরাসা ছিল না। তখন তো দারুল উলূম দেওবন্দ ও মাযাহিরুল উলূম সাহারানপুরেরও শুরু যুগ ছিল। আর আমরা আমাদের বড়দের কাছে শুনেছি, তখন অবস্থা এই ছিল যে, দারুল উলূম দেওবন্দের পাহারাদারও ছাহেবে নিসবত বুযুর্গ হতেন। সেখানের পুরো পরিবেশ ছিল তা'আল্লুক মা'আল্লাহ ও তাকওয়ার পরিবেশ। ছাত্রজীবনে যে পরিমাণ তা'আল্লুক মা'আল্লাহ, তাকওয়া ও আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন, মাদরাসার পরিবেশে থাকা দ্বারা ততটুকু এমনিতেই অর্জন হয়ে যেত।

কিন্তু এখন আমাদের মাদরাসাগুলোতে সেই পরিবেশ আর নেই। তাকওয়া ও সংশোধন এবং তা'আল্লুক মা'আল্লাহর জন্য মাদরাসায় থাকা ও লেখাপড়া করা এখন যথেষ্ট নয়। বর্তমানে মাদরাসাগুলোর পরিবেশ তো আমার-তোমার সামনেই রয়েছে। এ কারণে স্বয়ং হযরত গঙ্গুহী রহ.-এর খলীফাগণ ও তাঁদের খলীফাগণ নিজেদের কর্মপন্থা পরিবর্তন করেছেন এবং ছাত্রদেরও বাইআত গ্রহণ করা শুরু করেছেন।

তাই তোমাদেরকে আন্তরিকতার সাথে গুরুত্ব দিয়ে আমি এ পরামর্শ দিচ্ছি যে, তোমরা এই ছাত্রজীবনেই কোনো ছাহেবে নিসবত বুযুর্গের সঙ্গে সম্পর্ক

করে কমপক্ষে নামায, তেলাওয়াত ও অল্প পরিমাণ যিকিরের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাও। যদি তোমরা এ ব্যাপারে উদাসীন হও, তাহলে বুখারী, মুসলিম, জালালাইন, বাইযাবী পড়লেও শয়তান তোমাদেরকে তার নিজের বানিয়ে ফেলবে।

নবম প্রশ্নের উত্তরে যা বললাম সবগুলো হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নোমানী রহ.-এর কথা।

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : ইসলাহী মজলিস হতে অর্জিত আত্মিক উন্নতির উপর অটল থাকার জন্য সালেকীনদের করণীয় কী হতে পারে?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে যে চারটি কাজের কথা বলা হয়েছে সেগুলো করে যেতে হবে। এর জন্য নিজের হিম্মত করতে হবে। আল্লাহর দরবারে হিম্মতের জন্য দু'আ করতে হবে। শায়খের নিকটও হিম্মতের জন্য দু'আ চাইতে হবে। এগুলো সবই বড়দের কথা।

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : তাবলীগী ভাইদের নিজেদের ও পরিবারের মেহনতের জন্য দিন, সপ্তাহ ও বছরভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচী থাকে। এ মেহনতের জন্য আকাবিরের এ ধরনের কর্মসূচী কী ছিল এবং কীভাবে তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব? আর কীভাবে ইস্তেকামাতের সাথে মানুষকে তাতে জুড়িয়ে রাখা সম্ভব?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : হ্যাঁ, ইহসানের স্তর অর্জন করার জন্যও চিল্লা-সালের নিয়ম আছে। প্রাত্যহিক যিকির-মোরাকাবা, সাপ্তাহিক মজলিস ও মাসিক ইসলাহী জোড় প্রভৃতি কর্মসূচী আছে। কোনো কামেল শায়খের সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক যত গভীর হবে, এসকল স্তর অর্জন করা তত সহজ হবে। হিম্মত করা চাই। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই দান করবেন।

প্রসঙ্গত বলার মত একট কথা হল, তাবলীগের মধ্যে অন্যকে দাওয়াত দেয়ার গুরুত্ব থাকে বেশি। আর তাসাউওফের মধ্যে নিজকে সংশোধন করার প্রতি মন দেয়া হয় বেশি। তাই লক্ষ্য অর্জনের জন্য উভয়ের কর্মপদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তা'লীম, তাসাউওফ, জিহাদ ও তাবলীগ ইত্যাদি কোনোটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বরং একটি অপরটির পরিপূরক। অবশ্য প্রতিটি মেহনতের সঙ্গে প্রত্যেকের সমান সম্পর্ক থাকবে না। মনের ঝোঁক ও টানের ভিত্তিতে এক একজনের এক এক বিষয়ের সঙ্গে

সম্পর্ক কম-বেশি থাকাই স্বাভাবিক। তবে সবক'টি মেহনতের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব থাকা জরুরী।

আত্মশুদ্ধির সাধনায় সকলকে জুড়িয়ে রাখার জন্য ইসলাহী জোড়গুলোকে আরো গতিশীল করতে হবে। সাপ্তাহিক ও মাসিক মজলিসগুলোকে আরো জীবন্ত ও বেগবান করতে হবে।

ইসলাহী জোড় প্রতিদিন : ইসলাহের জন্য আকাবির-রচিত বিভিন্ন বই কতটুকু উপকারী? এক্ষেত্রে অগ্রাধিকারযোগ্য কিছু বইয়ের নাম পাঠকদের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করুন?

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ : আকাবিরের বই পড়া উপকারী হওয়ার কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে বই পড়া হলো দ্বিতীয় স্তরের কাজ। অষ্টম প্রশ্নের উত্তরে যে চারটি জিনিস উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো হলো প্রথম স্তরের কাজ। আকাবিরের বই পড়তে হবে। শুধু তাঁদের লিখিত বই নয়। তাঁদের জীবনচরিত, বাণীসমগ্র ও পত্রসমগ্রও পড়তে হবে। আর পড়ার জন্য বই নির্বাচন নিজে না করে নিজের ইসলাহী মুরব্বীর মাধ্যমে করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় ক্ষতির আশঙ্কা আছে। অগ্রাধিকারযোগ্য হিসেবেও অনেক বইয়ের নাম বলা যায়। তবে আমি এখন আরেফবিল্লাহ কুত্বে আলম হযরত মাওলানা শাহ হাকিম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.-এর শুধু দু'টি বইয়ের কথা বলব, প্রথম বইটির নাম 'আল্লাহর মুহাব্বত লাভের পরীক্ষিত তিনটি কিতাব'। এ বইয়ে এক সঙ্গে হযরতের তিনটি আলোচনা আছে– ১. তা'আল্লুক মা'আল্লাহ। ২. তাওবার ফযীলত। ৩. এস্তেগফারের সুফল। দ্বিতীয় বইটির নাম 'কুদৃষ্টি ও অসৎ সম্পর্কের ধ্বংসলীলা ও প্রতিকার'।

এত সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন তৈরি করার জন্য আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। উত্তরগুলো দ্বারা সর্বপ্রথম আমাকে তারপর পাঠকদেরকে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন![১৯]

---

[১৯]. উত্তরগুলো ২৪ - ১ - ১৪৩৩ হি./২০ - ১২ - ২০১১ ঈ. মঙ্গলবার ঢাকা থেকে কুমিল্লা এবং কুমিল্লা থেকে ঢাকা যাওয়া-আসার পথে বাসে লেখা হয়েছে।

পরবর্তী সংযোজন

কামেল শায়খের পরিচয়

উপরগুলোতে কয়েকবার 'কামেল শায়খ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'কামেল শায়েখ'-এর ভাবার্থ হলো, আত্মার রোগ-ব্যাধির সুদক্ষ চিকিৎসক। আত্মার রোগ-ব্যাধি জানার জন্য এবং সেগুলো থেকে মুক্তি লাভ করার পদ্ধতি অবগত হওয়ার জন্য, আমার শায়খ ও মুর্শিদ হযরত আকদাছ মাওলানা শাহ আব্দুল মতিন বিন হুসাইন দা. বা.-এর অনূদিত এবং করাচির হযরত আরেফবিল্লাহ মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.-এর রচিত, 'আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার' বইটি আন্তরিকভাবে পাঠ করা অনেক উপকারী প্রমাণিত হয়েছে।

যাই হোক, আত্মার রোগ-ব্যাধি থেকে শুধু মুক্ত হলেই অথবা যিকির-শোগলের প্রতি অনুপ্রাণিত থাকলেই কেউ কামেল শায়েখ হয়ে যান না। যিনি কোনো কামেল শায়খের চিকিৎসা গ্রহণ করে নিজ আত্মার রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, তারপর এ বিষয়ের অন্যান্য রোগীদরকে উপযুক্ত চিকিৎসাসেবা দেয়ার দীক্ষাও গ্রহণ করেছেন, এরপর কাশফ ও ইলহামের ভিত্তিতে নয় বরং অবস্থা যাচাই করে শায়খ তাঁকে অন্যান্যদের এ সমস্ত রোগের চিকিৎসা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং তিনি সবসময় নিজের নফসের অবস্থা তদারকি করেন, নিজের নফসের ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করেন না, নিজ শায়খের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন, শায়খের অবর্তমানে শায়খের আস্থাভাজন ও অন্যান্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে চলেন, সর্বোপরি সকল ক্ষেত্রে সুন্নতের অনুসরণ করেন, 'কামেল শায়খ' দ্বারা এখানে আমার এমন ব্যক্তি উদ্দেশ্য। যদিও শায়খের অনুমতি লাভ তথা খেলাফত পাওয়া কামেল হওয়ার গ্যারান্টি হয়, তদ্রূপ খেলাফত না পাওয়া কামেল না হওয়ার দলিল নয়।

আর যাকে কেউ নিজের আত্মার চিকিৎসক হিসেবে গ্রহণ করবে, তিনি কামেল কি-না, তা ঐ ব্যক্তির নিজের যাচাই করে নিতে হয়। হযরত থানভী রহ. 'তা'লীমুদ্দীন' কিতাবে বিস্তারিতভাবে হক্কানী শায়খের আলামত উল্লেখ করেছেন।[২০]

---

[২০]. ১৩ - ০২ - ১৪৩৩ হি./০৮ - ০১ - ২০১২ ঈ. রবিবার দিবপূর্ব রাত ২টা ১১ মিনিটে 'কামেল শায়খ' সংশিষ্ট এ লেখাটি লেখা হয়েছে।

৪৯১ নং পৃষ্ঠার টীকা

হযরত শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রহ. 'আপবীতি'তে লিখিয়েছেন, হযরত থানবী রহ. লিখেছেন, নকশবন্দিয়া সিলসিলার মাশায়েখগণের রীতি হলো তাঁরা প্রথমে وَصْل [আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা]-এর তদবীর করেন। এর এই প্রভাব পড়ে যে, আল্লাহ তা'আলার সত্তা ব্যতীত সকল কিছু থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা فَصْل [গায়রুল্লাহর থেকে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা] কে প্রাধান্য দেন। এর এই ফল হয় যে, গায়রুল্লাহর সাথে যতই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়, আল্লাহ তা'আলার সাথে ততই সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। কারণ এটাই স্বাভাবিক যে, যখন একটি বৃদ্ধি পাবে, তখন অপরটি হ্রাস পাবে। এমনিভাবে দ্বিতীয়টি বৃদ্ধি পেলে প্রথমটি হ্রাস পাবে। ... আর এর ভিত্তিতেই وَصْل কে প্রাধান্য দেয়ার রীতিকে মূলত নকশবন্দিয়া সিলসিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়, আর فَصْل কে প্রাধান্য দেয়ার রীতিকে মূলত চিশতিয়া সিলসিলার সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়।

বাস্তবে যদিও এই দুই সিলসিলার মাশায়েখগণ সব সময় وَصْل ও فَصْل কে প্রাধান্য দেয়ার পূর্বোক্ত রীতির অনুসরণ করেন না, বরং তালিবের জন্য যখন যা উপযোগী হয় তা-ই গ্রহণ করেন, তথাপি নকশবন্দিয়াদের মাঝে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে وَصْل কে প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় এবং চিশতিয়াদের মাঝে বেশিরভাব ক্ষেত্রে فَصْل কে প্রাধান্য দেয়ার রং দৃষ্টিগোচর হয়। হযরত হাজী ছাহেব রহ. একবার এ রীতি প্রয়োগ করে এক তালিবের সম্পর্কের পরীক্ষা নেন। ...

কিন্তু এখন তো চিশতিয়াও নকশবন্দিয়ায় পরিণত হয়েছে। তাছাড়া কিইবা করা? তালিবদের সেই হিম্মত আর নেই। যেহেতু তালিবদের সেই হিম্মত নেই, আর শায়েখগণও মুজতাহিদ হয়ে থাকেন, তাই তরীকতের মুজতাহিদগণ এই পন্থা অবলম্বন করেছেন যে, তাঁরা وَصْل ও فَصْل উভয়টিকে একসাথে চালান। চিশতিয়ারা তাই فَصْل কে আগে করার রীতি পরিহার করেন। কারণ এ পন্থাটি বর্তমান কালের জন্য উপযোগী নয়। তাছাড়া বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণের জন্য এক নিয়মের অধীনে থাকা বাধ্যতামূলক নয়। বরং তাঁরা সময় ও চাহিদার প্রেক্ষিতে নতুন নতুন চিকিৎসা উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করেন। সুতরাং বর্তমান যুগচাহিদার প্রেক্ষিতে فَصْل ও وَصْل উভয়টি পাশাপাশি চালানোই অধিক শ্রেয় ও উপযোগী। যে শায়খ তরীকতের মুজতাহিদ নন, তিনি অন্য কাউকে শায়খ বানানোর যোগ্য নন। ...

তবে বর্তমান যুগে এক নতুন বিদ'আত চালু হয়েছে যে, কেউ কেউ কেবল وَصْل কে গ্রহণ করেছে আর فَصْل থেকে একেবারেই হাত গুটিয়ে নিয়েছে। فَصْل কে তারা আগেও রাখেনি, পরেও রাখেনি। উভয়টিকে একসাথেও চালায় না।

কিছু চরমপন্থী আছে যারা যোগীদের চিন্তা-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তারা وَصْل অর্থাৎ আমলকে একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে এবং লোকালয় ছেড়ে জঙ্গলে থাকছে এবং আরাম-আয়েশ বর্জন করছে। [অর্থাৎ فَصْل কে গ্রহণ করছে।] এটা তো বাতিলপন্থীদের তরীকা।

অন্যদিকে হকপন্থী অধিকাংশ মাশায়েখগণ কেবল যিকিরের তা'লীমে তুষ্ট থাকছেন। তালিবের দোষ-ত্রুটি ও বদআখলাক নির্মূলে নামমাত্রও মেহনত করান না। তারা মুরীদের আমল-আখলাকের তদারকীও করেন না, তা'আল্লুক ও সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য কোনো শাসনও করেন না। এ শ্রেণীর মাশায়েখগণ তরীকতের পূতপবিত্র ও নির্মল ধারার বদনামের কারণ।

তবে আমি কুরআন-হাদীসের আলোকে বলছি এবং সুফিয়ায়ে কেরামও এ ব্যাপারে একমত যে, وَصْل ও فَصْل এ উভয় তদবীর ব্যতীত তরীকত হতে পারে না। শায়খের এতটুকু স্বাধীনতা তো আছে যে, তিনি প্রয়োজনমত একটাকে আগে পরে করতে পারেন, কিন্তু কোনো একটা থেকে একবারেই হাত গুটিয়ে নেয়া ভুল এবং তরীকতের পুরোপুরি খেলাফ। ...

সারকথা হল, وَصْل ও فَصْل উভয়টির প্রতি গুরুত্ব দাও। আল্লাহ তা'আলার সাথে সম্পর্ক বাড়াও। গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক কমাও। কোনো শায়খ থেকে এর তরীকা ও পদ্ধতি জেনে নাও। যদি শায়খ না পাও, তবে মুহাক্কিক ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের কিতাব অধ্যয়ন করে কাজ শুরু করো। ইনশাআল্লাহ বিফল হবে না। যদি মুহাক্কিক শায়খ পাওয়া যায়, তবে তাঁর সাথে সাথে সাক্ষাৎ করে পন্থা জেনে নিও। যদি তাঁর থেকে সাক্ষাতে জানা সম্ভব না হয়, তবে পত্র যোগাযোগের মাধ্যমে জেনে নিও এবং আমলের পাবন্দি করো। কারণ আমল না করে কেবল কিছু কথা শিখে নেয়া বা তাসাওউফ-এর মাসআলা জেনে নেয়ায় কোনো ফায়দা নেই। [আপবীতি ২ ঃ ৪৩১ - ৪৩৭]

আমরা এক কাফেলা[২১]

মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ

পৃথিবীর সকল যুগে সকল দেশে আমরা তালিবুল ইলম এক অভিন্ন পরিবার। আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অভিন্ন। আমাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও মাকছাদে হায়াত অভিন্ন। আমরা তালিবুল ইলম। আমরা এক কাফেলা যার শুভ যাত্রা শুরু হয়েছিলো মসজিদে নববীর ছুফফা প্রাঙ্গন থেকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে। ছাহাবা, তাবেঈন, তাব্‌য়ে তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন ও আকাবিরে দ্বীন যুগ পরম্পরায় সবাই ছিলেন এই মহাকাফেলার যাত্রী। এভাবে বহু শতাব্দীর পথপরিক্রমা শেষে আজ আমরা সেই নূরানী কাফেলার সৌভাগ্যবান যাত্রী। প্রজন্মপরম্পরায় এগিয়ে যাবে এ কাফেলা এবং শামিল হবে হযরত ইমাম মাহদীর মোবারক জামাতে। কিন্তু আমরা আজ আত্মবিস্মৃত, নিজেদের আত্মপরিচয় হারিয়ে লাঞ্ছিত, অপদস্থ। 'আমরা এক কাফেলা' এই তারানায় রয়েছে একজন তালিবে ইলমের পরিচয়, আত্মমর্যাদা ও মাকছাদে হায়াতের কথা।

চৌদ্দশ বছরের আমরা এক কাফেলা
ইলমের ঈমানের আমরা এক কাফেলা
আমাদের পরিচয় শোনো।
আমরা আলোর ইশারা, নূরের ফোয়ারা
মহাকালের অন্ধকারে রৌশন সিতারা
আমাদের পরিচয় শোনো।
আমরা সত্যের অভিসারী, উম্মাহর অতন্দ্র প্রহরী
যুগে যুগে শত দুর্যোগে আমরা পথের দিশারী।
আমাদের পরিচয় শোনো।
শোকর আল্লাহর, গর্ব নয় কোনো।
ইলমের তালিব মোরা, নবীর ওয়ারিছ মোরা
জীবন মোদের ধন্য
আমরা অন্য, আমরা ভিন্ন, আমরা অনন্য
আমরা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ আমাদের জন্য
জীবন মোদের ধন্য।

---

২১. 'তারানা'টি একান্ত কোনো সময়ে মাঝে মধ্যে আবৃত্তি করবে। মুখস্থ করার জন্য ধীরে ধীরে চেষ্টা করবে। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দান করুন। আমীন!

হেরার অভিযাত্রী, আমরা ছুফফার অনুসারী
পাথেয় কলম-কালি, নির্জন রাতের আহাজারী
ইলমে নবী, আমলে নবী, আমাদের সাধনা
বুকে ইশকে নবী, মুখে ওয়াবিহী হাদ্দাছানা
ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ, বু হোরায়রা
নবী-পরশে ধন্য যারা, আমাদের পরিচয় তারা
নেই কোনো পরিচয় অন্য।
মাদানী গুলশানের আমরা পুষ্প, আমরা সৌরভ
সত্যের ডংকা, বাতিলের শংকা, ঈমানের গৌরব
জীর্ণ, শীর্ণ, রিক্ত, নিঃস্ব, তবু আমরা ধনী
ফকিরির মাঝে আমিরি শান শুধু আমরা জানি
আতা, সালিম, রাবী'আ, ছাওরী, যুহরী, যোরারা
ছাহাবা-পরশে ধন্য যারা, আমাদের পরিচয় তারা
নেই কোনো পরিচয় অন্য।
ক্ষুধা, অনাহার, যন্ত্রণা, নবী জীবনে পাবো সান্ত্বনা
কতদিন বেধেছেন পাথর, সয়েছেন কত লাঞ্ছনা
সেই পথে চলা বন্ধু! আমাদের জীবন-অঙ্গীকার
সে পথের যত যিল্লতি, তা আমাদের অহঙ্কার
মালিক শাফেয়ী আহমদ বু হানীফা, এই যে ধারা
উম্মাহর ইমাম যারা, আমাদের পরিচয় তারা
নেই কোনো পরিচয় অন্য।
শিখবো শেখাবো খায়রুকুম মান তা'আল্লামা
মীরাছ ইলমী খাযানা, লা-দীনার, লা-দিরহামা
নাই বা চিনুক যামানা, কিছু তাতে যায় আসে না
মাখলুকাতের দু'আ, ফিরেশতা বিছায় নূরের ডানা
আসকালানী, বাকিল্লানী, মিরগিনানী, এই যে ধারা
ইলমের শহীদ যারা, আমাদের পরিচয় তারা
নেই কোনো পরিচয় অন্য।
আমরা ডুবুরী, জ্ঞান-সাগরের মুক্তা-মণি তুলে আনি
দেখো ইতিহাস, তুচ্ছ কত রাজমুকুটের হাতছানি
ইবনে বতুতা, ইবনে খালদুন, ইবনে সিনা, ফারাবী
আমরা হবো যুগের রাজী-গাযালী, কুরতুবী, তাহাবী
ইলমের নীরব সাধনা চির বহমান এই যে ধারা
আমাদের গর্ব তারা, আমাদের পরিচয় তারা
নেই কোন পরিচয় অন্য।

আমরা জানি তাইমিয়ার কলম, তরবারি, জুব্বাখানি
বালাকোট-শামেলী, শাহ শহীদ-গাঙ্গুহীর কোরবানি
আমরা জানি রেশমি রুমাল কাহিনী, মাল্টার জিন্দেগানী
কালো কালি আর লাল খুনে মাখামাখি শুধু আমরা জানি
ইলমের রোহবান জিহাদের ফোরসান এই যে ধারা
আমাদের গর্ব তারা, আমাদের পরিচয় তারা
নেই কোন পরিচয় অন্য।
সিলসিলা যুক্ত সাথে আল্লাহর ও রাসূলুল্লাহর
কোনো সরকার করিবে স্বীকার বলো কি দরকার?
জোনায়েদ-জিলানী, আলফেছানী, শাহ দেহলবী
মোহাজিরে মাক্কী, নানুতবী, কান্দলবী, থানবী
সময়ের সান্ত্বনা যারা, যুগজিজ্ঞাসার জবাব যারা
আমাদের গর্ব তারা, আমাদের পরিচয় তারা
নেই কোন পরিচয় অন্য।
নবী-হাতে ছুফফার সত্তরজনে পিয়েছে দুধের পেয়ালা
আমরা তার ভাগিদার, আমাদের কাফেলা সেই কাফেলা
যুগের দুর্যোগে আজ যারা রাহবার আলী নাদাবীর মত
ইলমের গৌরব যত এখানে এই বাংলায় চিরশায়িত
আল্লাহর রহমতে মেহদীর ঝাণ্ডায় লড়বে যারা
আমাদের গর্ব তারা, আমাদের পরিচয় তারা
নেই কোন পরিচয় অন্য।
কিন্তু আজ কোথায় রাখি লাজ, ডুবিলো কি ভাগ্য-তারা
একদিন আমরা গড়েছি কুরতুবা, খোরাসান, বোখারা
আমরা জ্বেলেছি জ্ঞান-আলো, কত জাতি উজ্জ্বল হলো
শিক্ষক কেন শিষ্য হলো, এ ঘর কেন আঁধার বলো?
ভুলেছি অতীত, কেটেছি শিকড়, আছে কি ভবিষ্যৎ?
কাফেলা হেজাজের তুর্কিস্তানের ধরেছি ভ্রান্ত পথ
সালাফের পথে মুক্তি খালাফের, ইমাম মালিকের বাণী
রাসমে আজানে কোথা আজ, রূহে বেলালীর সঞ্জীবনী?
তাই এসো ভাই! শপথ করি, আবার নিশি জাগি
আবার ধরি ছুফফার জিন্দেগী, ইলমের তরে সর্বত্যাগী
সে যুগের মুসলিম-বুখারী, এ যুগের মাদানী-কাশ্মীরী
এসো ভাই! তাদের পথে চলি, তাদের মত জীবন গড়ি
অতীতের নমুনা একবার যদি ভাই! জাগাতে পারি
দেখিবে দুনিয়া করিবে চুম্বন আমাদের পায়ে পড়ি।

সমাপ্ত

حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا (عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضـ)

মুহাসাবা করি জীবন গড়ি

সম্পাদনায়

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ

রচনায়

মাওলানা ইলয়াস খান

ফাযেল, দারুল উলুম মাদানীনগর ঢাকা

সম্পাদকের কথা

আল্লাহর অসংখ্য শোকর যে, তিনি আমাদেরকে দ্বীনের কিছু কাজ করার তাওফীক দিয়েছেন। দান করেছেন একটি সুন্দর জীবন। জীবনটাকে তো আর যেভাবে ইচ্ছা নষ্ট করে ফেলা উচিত নয়। জীবনটাকে গড়ার জন্য আমাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। আর জীবনের উন্নতির মূল মাধ্যমই হলো সব সময়ের আচরণ ও উচ্চারণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা। কোরআন ও হাদীসে মুহাসাবার ব্যাপারে যত তাকীদ এসেছে সেসবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তো এই সচেতনতা সৃষ্টি হওয়াই। তাই যার এ গুণটি যত বেশি মাত্রায় অর্জন হবে, মুহাসাবা করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সে ততটা সফল হবে। শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. (১৪১৭হি.) ইমাম আবূ আবদুল্লাহ হারেস মুহাসেবী রহ. (১৬৫হি.-২৪৩হি.) -এর রচিত رسالة المسترشدين। কিতাবের মুহাসাবা বিষয়ক আলোচনার টিকাতে[১] আকাবির ও আসলাফের জীবন থেকে নমুনাস্বরূপ ছয়টি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। মুহাসাবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী তা বোঝার জন্য ঘটনাগুলো আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে ইনশাআল্লাহ।

আসলে জীবনে তারাই উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয় যারা জীবনের হিসাব রাখে। কীভাবে তাদের এক একটি মিনিট ব্যয় হয়, এ ব্যাপারে তারা সজাগ থাকে। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সময়গুলোর ব্যাপারেও তারা সচেতন থাকে। ফলে একসময় তাদের জীবন সুন্দর হয় এবং অনেক সুন্দর হয়। মানববাগানে তারা হয় প্রস্ফুটিত পুষ্প। সবাই ব্যাকুল হয় তাঁদের নিকট আসতে, তাঁদের একটু ঘ্রাণ নিতে। মরেও তারা অমর থাকে। কর্ম ও কীর্তির গুণে তারা মানুষের হৃদয়ে বেঁচে থাকে যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী। আমাদের মহান পূর্বসূরীগণ এভাবেই মহান হয়েছেন। কর্ম ও কীর্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। তাদের উত্তরসূরী হওয়ার দাবী

---

[১]. ১৮৫ পৃষ্ঠা থেকে ১৮৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত।

করতে হলে আমাদেরকেও তো কিছু চেষ্টা করতে হবে। তাদের অনুসৃত পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। কারো জীবনে মুহাসাবা ও আত্মপর্যালোচনা থাকলে তার কয়েকটি বড় বড় অর্জন হয়। যথা-

১. জীবনের উন্নতি সদা অব্যাহত থাকে।
২. জীবনকে অবনতি থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়।
৩. যে কোনো সময় অবনতির সূচনার ব্যাপারে দ্রুত সজাগ হয়।
৪. সর্বদা আমল করার প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ অনুভব করে।
৫. যথাযথ আমল করতে না পারার অনুশোচনাবোধ সবসময় জাগ্রত থাকে।
৬. ইলম, আমল, আখলাক ও ফিকরের ক্ষেত্রে একজন আদর্শ তালিবুল ইলম হতে পারে।

হাদীসে নববীর আলোকে মুহাসাবার গুরুত্ব

এখন আমরা হাদীসের আলোকে মুহাসাবার গুরুত্ব আলোচনা করবো।

عن شَدَّادِ بن أَوْس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الكَيِّسُ مَنْ دَانَ نفسَه وعَمِلَ لِمَا بعدَ الموتِ، والعاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نفسَه هَوَاهَا، وتَمَنَّى عَلَى الله». أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث حسن»، ثم قال: ومعنى قوله: «مَنْ دَانَ نفسَه» يقول: حَاسَبَ نفسَه في الدنيا قبل أن يُحَاسَبَ يومَ القيامة.

হযরত শাদ্দাদ বিন আওস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য আমল করে, সে-ই বুদ্ধিমান। আর অক্ষম সে-ই, যে নিজেকে নফসের অনুগত বানায়, আর আল্লাহর কাছে বড় বড় আশা করতে থাকে।[২]

---

[২]. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৫৯

حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ، فَقَالَ لِي : «مَنِ اسْتَوَى يَوْمَاهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ، وَمَنْ كَانَ غَدُهُ شَرَّ يَوْمَيْهِ، فَهُوَ مَلْعُونٌ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ النُّقْصَانَ مِنْ نَفْسِهِ فَهُوَ إِلَى نُقْصَانٍ، وَمَنْ كَانَ إِلَى نُقْصَانٍ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ».

ওয়ালিদ বিন সালেহ এক ব্যক্তি থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, যার দুই দিন এক রকম কাটল, সে ধোকায় পড়ে আছে। যার আজকের দিনের তুলনায় আগামী দিন মন্দ হল, সে লা'নতযোগ্য। নিজের ক্ষতিকে যে অনুধাবনও করতে পারে না, সে তো ক্ষতির দিকে ধাবমান। আর এমন ব্যক্তির জন্য বেঁচে থেকে নিজের ক্ষতি করার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।[৩]

সাহাবায়ে কেরামের বাণীর আলোকে মুহাসাবা

يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي الله عنه قال : حَاسِبُوْا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوْا، وتَزَيَّنُوْا للعَرْضِ الأَكْبَرِ. وإنما يَخِفُّ الحسابُ يومَ القيامةِ عَلى مَنْ حَاسَبَ نفسَه في الدنيا.

হযরত ওমর রাযি. বলেছেন, কেয়ামতের দিন তোমাদের হিসাব নেয়ার পূর্বেই নিজেদের হিসাব নাও। সেদিন [সকলের সামনে আমলসমূহের] সবচেয়ে বড় উপস্থাপনের জন্য নিজেদেরকে [সুন্দর আমল দ্বারা] সজ্জিত করো। দুনিয়ায় যে নিজের হিসাব নিয়েছে সেদিন তার হিসাব সহজ হবে।[৪]

عن الحسن بن علي رضي الله عنه، أنه قال : «من اعتدل يومه فيها فهو مغرور، ومن كان يومه خيرا مِّنْ غَدِه فَهُوَ مَغْبُوْنٌ، ومَنْ لَمْ يَتَفَقَّدِ النُّقْصَانَ عَنْ نَفْسِه فإنه في نُقْصَانٍ، ومَنْ كان في نقصانٍ فالموتُ خيرٌ له.

---

৩. اقتضاءُ العِلْمِ العَمَلَ, খতীব বাগদাদী, পৃ. ১১২

৪. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৫৯

হযরত হাসান বিন আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যার দুই দিন এক রকম কাটল, সে ধোকায় পড়ে আছে। যার আজকের দিনের তুলনায় আগামী দিন মন্দ হল, সে ধোকায় পড়ে আছে। আর নিজের ক্ষতির যে খোঁজ-খবর নেয় না, সে ক্ষতিতে পড়ে আছে। আর যে ক্ষতিতে পড়ে আছে তার জন্য বেঁচে থেকে নিজের ক্ষতি করার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো।[৫]

সালাফের আমলের আলোকে মুহাসাবা

ويُرْوَى عَنْ مَيْمُونِ بن مِهْرَان رحمه الله قال: «لا يَكُونُ العَبْدُ تَقِيًّا حَتَّى يُحَاسِبُ نفسَه كما يُحَاسِبُ شَرِيْكَه مِنْ أين مَطْعَمُه ومَلْبَسُه».

মায়মুন বিন মিহরান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, বান্দা কিছুতেই মুত্তাকী হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের হিসাব নেয় যেভাবে এক অংশীদার অপর অংশীদার থেকে হিসাব নেয় যে, তার খাবার এবং পোশাক কোথা থেকে এলো।[৬]

عن الحسن قال: «المؤمن قَوَّامٌ عَلى نفسه، يُحَاسِبُ نفسَه لله عَزَّ وجَلَّ، وإنما خَفَّ الحسابُ يوم القيامة على قومٍ حَاسَبُوا أَنْفُسَهُم في الدنيا، وإنما شَقَّ الحسابُ يوم القيامة على أقوامٍ أَخَذُوا هذا الأمرَ من غيرِ محاسبةٍ».

হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, মুমিন নিজের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য নিজের হিসাব নিতে থাকে। দুনিয়ায় যারা নিজেদের হিসাব নিয়েছে, সেদিন তাদের হিসাব সহজ হবে। আর কেয়ামতের দিন হিসাব কঠিন হবে তাদের, যারা নিজেদের হিসাব নেয়া ব্যতীত দুনিয়ায় জীবন কাটিয়েছে।[৭]

قال ابنُ عَرَبِيّ: كان أَشْيَاخُنَا يُحَاسِبُونَ أَنْفُسَهُمْ على ما يتكلمون به وما يفعلونه ويُقَيِّدُوْنَه في دَفْتَرٍ، فإذا كان بعد العشاء حَاسَبُوا نُفُوْسَهُم، وأَحْضَرُوْا

---

৫. جامع الأحاديث হাদীস নং ৩৭৪৯৭, كنز العمال হাদীস নং ৪৪২৩৬।

৬. সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৪৫৯।

৭. حِلْيَةُ الأَوْلِيَاءِ ২ : ১৫৭, البِدَايَةُ والنِّهَايَةُ ৯ : ২৭২

دَفْتَرَهُم، ونَظَرُوا فيما صَدَرَ منهم مِنْ قَوْل وعَمَل، وقَابَلُوْا كُلًّا بِمَا يَسْتَحِقُّه: إِنِ اسْتَحَقَّ استغفارًا اسْتَغْفَرُوْا، أو التوبةَ تَابُوا، أو شُكْرًا شَكَرُوْا، ثم يناموں. فزِدْنا عليهم في هذا الباب الخواطرَ، فكنا نقيِّد ما نُحَدِّثُ به نُفُوْسَنا ونَهُمُّ به، ونُحَاسِبُها.

শায়খ ইবনুল আরাবী বলেন, আমাদের শায়খগণ প্রতিদিন নিজেদের প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণের হিসাব নিতেন এবং সেগুলোকে একটি খাতায় লিখে রাখতেন। ইশার পর নিজেদের হিসাব নেয়ার জন্য বসতেন। নিজেদের আচরণ ও উচ্চারণ লিখে রাখা খাতা এনে হিসাব নিতেন। সবগুলোকে নিয়ে ভাবতেন। ইসতেগফারযোগ্য ত্রুটিগুলোর জন্য ইসতেগফার করতেন এবং তাওবাযোগ্য ত্রুটিগুলোর জন্য তাওবা করতেন। আর ভালো কাজগুলোর জন্য আল্লাহর শোকর করতেন। তারপর ঘুমুতে যেতেন।
শায়খ ইবনুল আরাবী বলেন, আমরা এগুলোর সাথে সাথে মনে উদয় হওয়া বিষয়গুলোও লিখে রাখি। আমরা সেগুলোরও হিসাব নিই।[৮]
শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ রহ. ইমাম হারেস মুহাসেবী রহ.-এর রচিত رسالة المسترشدين কিতাবের টিকাতে কয়েক জায়গায় মুহাসাবা বিষয়ে আরো অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

* * *

এবার আলোচ্য 'মুহাসাবা করি জীবন গড়ি' বইটি সম্পর্কে আলোচনা করছি। অনেক আগে একদিন ইলিয়াস খান তার ও তার সাথীদের দৈনন্দিনের মুহাসাবার কয়েকটি ছক দেখালো। ছকগুলো দেখে আমি খুব মুগ্ধ হলাম। এ বছরের শুরুতে ছকগুলোকে সে আরো সুন্দর করে গুছিয়ে দেখালো। তখন এটাকে আরো সুবিন্যস্ত ও উপকারী মনে হলো। তবে ছকের অনেকগুলো বিষয় অস্পষ্ট ছিল। যেমন: 'ফিক্‌র ও স্বাস্থ্য' পর্বে এক স্থানে আছে- 'প্রত্যেক বিষয়কে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখা'। তো এর ব্যাখ্যা কী? 'মু'আশারা ও আখলাক' পর্বে এক স্থানে আছে- 'আদাবে যিন্দেগীর পাবন্দি করা।' তো যিন্দেগীর আদবের পাবন্দি করা'র ব্যাখা কী? অদ্রূপ ছকে এমনও কিছু বিষয় ছিল যেগুলোর ব্যাখ্যা বুঝে আসে, তবে ছকে

---

[৮]. فَيْضُ القَدِيْرِ ٥ : ٦٧

সেগুলোর জন্য কী লিখবে তা অনেকের জন্য স্পষ্ট নয়। তাই আমি তাকে প্রতিটি বিষয়ের উদ্দেশ্য এবং সেগুলো পুরণ করার নিয়ম লিখিতভাবে ব্যাখ্যা করতে বললাম। তখন সে 'মুহাসাবার বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা' শিরোনামে একটি বিস্তারিত লেখা তৈরি করল।

এরপর মনে হলো, 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' ও 'লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি' বইদু'টির বর্তমান সংস্করণের সাথে এটাও যুক্ত করে দিই। এতে ব্যাপকভাবে তালিবুল ইলম ভাইয়েরা বইটির সাথে পরিচিত হতে পারবে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ইলিয়াস খানকে কম্পোজকৃত ফাইলগুলো দিতে বললাম। সে লেখাগুলোকে আরও পরিমার্জন করে আমাকে দিল। তারপর আমি পুরো লেখাটি দেখলাম এবং বিভিন্ন স্থানে কিছু রদবদল করলাম।

উল্লেখ্য, মুহাসাবা হলো তৃতীয় কাজ। এর পূর্বে আরো দু'টি কাজ আছে। ১. মুশারাতা, ২. মুরাকাবা। নিজের করণীয় হিসেবে পূর্ব থেকে কিছু কাজ নির্ধারণ করাকে মুশারাতা বলে। কাজগুলো যথাযথ সম্পাদন হচ্ছে কি না, তার প্রতি লক্ষ রাখাকে মুরাকাবা বলে। সম্পাদন করা হলো কি না, তার হিসাব নেয়াকে মুহাসাবা বলে। এ বইয়ে তালিবানে ইলমের প্রাত্যহিক জীবনের উপযোগী বিভিন্ন আমলকে মুহাসাবার বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছে। বইটি সম্পর্কে আমার অনুভূতি হলো, তালিবে ইলমদের যে কেউ বইটির ছকগুলো পুরণ করার হিম্মত করবে, সে 'মানুষ' হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমার সাথে ইলয়াস খানের সম্পর্ক তার মীযান জামাত থেকে। এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময় তার কিছুটা তত্ত্বাবধান করার সৌভাগ্য আমার অর্জিত হয়েছে। তারপর এখন সে মাশাআল্লাহ পারিভাষিক অর্থেই 'মাওলানা'। তার প্রাত্যহিক জীবন দেখে আমার যে অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তার বিবরণ এখানে আমি দেব না। আমি শুধু দু'আ করি, তার 'তালেবে সাদেক' হওয়া আল্লাহ তা'আলা অব্যাহত রাখুন এবং কেয়ামতের দিন তাকে এবং 'তাদেরকে' যেন আমি পাই আমার নেক আমলনামায়। আমীন!

সবশেষে বইটির জন্য দু'আ করি, আল্লাহ তা'আলা বইটি কবুল করুন। সবাইকে বইটি দ্বারা উপকৃত হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন!

বিনীত

সফিউল্লাহ ফুআদ

[পূর্ব] ভুঁইয়াপাড়া, গল্লাই
চান্দিনা, কুমিল্লা

১৯. ৮. ১৪৩৫ হি.
১৮. ৬. ২০১৪ ঈ.
দুপুর ২ টা ১০ মিনিট

কিছু কথা, কিছু আশা

জীবনটা তো চলেই যাচ্ছে। মোমবাতির মত গলে গলে নিঃশেষ হয়েই যাচ্ছে। এরই মাঝে আমাকে গড়ে নিতে হবে নিজের জীবন। আমার এবং আমাদের কাছে গোটা সমাজের আছে অনেক চাওয়া ও অনেক প্রত্যাশা। আমার জীবন যেন অনেক সুন্দর হয়, কর্ম ও কীর্তির গুণে গুণান্বিত হয়, আমি যেন হতে পারি আকাবির ও আসলাফের জীবন্ত নমুনা, যেন উম্মাহর দ্বীনী সকল প্রয়োজন পূরণ করার যোগ্য হই, আমার ও আমাদের কাছে এই তো চাওয়া আমাদের মা-বাবার, আসাতিযায়ে কেরামের এবং পুরো উম্মাহর।

আমাদের সকল প্রয়োজনের ব্যবস্থা করে তারা আমাদের কাছে চান শুধু এতটুকুই। আমি 'মানুষ' হবো, উম্মতকে 'মানুষ' বানাবো। মা-বাবা, আসাতিযায়ে কেরাম ও উম্মাহর সকল ইহসান ও অনুগ্রহ ভোগ করে একজন ওয়াফাদার হিসেবে কী করণীয় আমার? কী দায়িত্ব আমার?

আমাকে মানুষ হতে হবে। আল্লাহর প্রিয় বান্দা হতে হবে। পুরো উম্মাহকে 'মানুষ' বানানোর এবং আল্লাহর প্রিয় বান্দা বানানোর সাধনা করতে হবে। আকাবির ও আসলাফের জীবন্ত নমুনা হতে এবং উম্মাহর দ্বীনী সকল প্রয়োজন পূরণ করার যোগ্য হতে আমাকে আমার জীবন উৎসর্গ করতে হবে।

এজন্য আমাকে দৃঢ় প্রত্যয়ী হতে হবে। চেষ্টা ও পরিশ্রম এবং মুজাহাদা ও কোরবানির নাযরানা পেশ করতে হবে। সুদূর পথ পাড়ি দিতে একটু একটু করে নিয়মিত পথ চলতে হবে। পৌঁছুতে হবে অনেক দূরের সেই মনযিলে।

এ পথচলায় আসবে অনেক বাধা, অনেক প্রতিকূলতা। কিন্তু আমাকে অটল ও অবিচল থাকতে হবে। কখনো মন ভেঙ্গে যাবে, হতাশারা আমাকে গ্রাস করে ফেলবে; কখনো শয়তান ধোকাগ্রস্ত করার অপপ্রয়াস চালাবে, উদাসীন করে রাখবে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সব দায়িত্ব থেকে। আবার নফস মনের গভীরে জাগিয়ে তুলবে প্রবৃত্তি-পূজার নিত্য নতুন পথ ও পন্থা, চোখের সামনে মেলে ধরবে রঙিন পৃথিবীর রঙিন সব কামনা ও বাসনা।

কিন্তু না। আমি এসব কিছুর সামনে অটল থাকব। নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নিবেদিত থাকব। আমি সাধনা করে চলব অবিরাম। কারণ আমি যে উম্মাহর সবচেয়ে দায়িত্বশীল ব্যক্তি। আমার সামান্য অলসতা বা অবহেলা

কিংবা একটুখানি ঝিমিয়ে পড়া তো ডেকে আনতে পারে গোটা একটা জাতির পতন এবং খুব সহজেই। তাই নিজের পরিচয় সব সময় আমাকে মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে দায়িত্বের কথাও।

অবশ্য মানুষ হিসেবে অনেক সময় আমরা নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারি না। অলসতা ও গাফলতের শিকার হয়ে পড়ি। ভুলে যাই জীবনের বড় বড় সব লক্ষ্য ও গন্তব্যের কথা। কিন্তু আমি জানি, আমাকে এগুলো মোকাবেলা করেই পথ চলতে হবে। কিন্তু কীভাবে?

আমাদের আকাবির ও আসলাফ সব যুগেই এসব সমস্যার সমাধান দিয়ে গেছেন। আমাকে সাধ্যমত তাঁদের দেখানো পথ ও পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করতে হবে। ফুআদ ছাহেব হুজুর দা. বা. তাঁর 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইটিতে ১৮৫-১৮৬ নং পৃষ্ঠায় 'ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করার উপায়' শিরোনামে এ বিষয়ে বিভিন্ন আলোচনা করেছেন।

নিজের মাঝে আগ্রহ ও উদ্যম ধরে রাখার অনেকগুলো উপায়ের মাঝে একটি কার্যকর পদ্ধতি আমরা অবলম্বন করতে পারি। সেটি হলো, আমরা মাঝে মাঝে আদীব হুজুর মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা. বা.-এর রচিত *'আমরা এক কাফেলা'* তারানাটি পড়তে পারি।

যে কোনো কষ্টের সময় আমি সান্ত্বনা পেতে বলতে পারি–

ক্ষুধা, অনাহার, যন্ত্রণা, নবী জীবনে পাবো সান্ত্বনা

কতদিন বেধেছেন পাথর, সয়েছেন কত লাঞ্ছনা ...

নিজের অলসতাগুলো ঝেড়ে ফেলতে আমি আবৃত্তি করতে পারি,

আমরা ডুবুরী, জ্ঞান সাগরের মুক্তা-মণি তুলে আনি

দেখো ইতিহাস তুচ্ছ কত রাজমুকুটের হাতছানি ...

এভাবে এ তারানার প্রতিটি চরণ আমাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পথে। তাই যখনই সুযোগ পাই তারানাটি আমি মনে মনে অবৃত্তি করবো।

শেষ কথা

তালিবুল ইলম ভাইদের সামনে মুহাসাবার কোনো নমুনা পেশ করার মত ইলমী ও আমলী কোনো ধরণের যোগ্যতা যে আমার নেই, তা তো সবারই অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমার অত্যন্ত মুহসিন ও মুশফিক উস্তাদ মুফতী হাবেল হুজুরের নির্দেশেই এই 'দুঃসাহস' করা।

কয়েক বছর আগের কথা। প্রতিদিন মুমালোর আগে আমরা কয়েকজন বসে মুহাসাবা করতাম। আরিফুল ইসলাম ভাই, আব্দুল মাজেদ ভাই, ইউনুস ভাই ও মুহসিন ভাই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাহর শোকর, আমরা সকলেই চলতি বছর [১৪৩৫ হি./২০১৪ ঈ.] দারুল উলুম মাদানীনগর মাদরাসা থেকে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করলাম।

প্রথমে আমরা মুখে মুখেই মুহাসাবা করতাম। তারপর প্রথমে একটি, তারপর দুটো, তারপর কয়েকটি কাগজ তৈরি করলাম। এরই মাঝে চলে গেলো কয়েক বছর। সহপাঠীদের সাথে মুহাসাবার সময়ই ধীরে ধীরে তৈরি হয়েছে মুহাসাবার এই ছকগুলো।

তারপর একদিন হুজুরকে আমাদের খসড়া কপিগুলো দেখালাম। হুজুর সম্মতি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন।

সবশেষে চলতি বছরের শুরুর দিকে সবগুলো ছককে নতুনভাবে পরিমার্জন করে পুনরায় হুজুরকে দেখালাম। তখন হুজুর নমুনাস্বরূপ কিছু বিষয় দেখিয়ে বুঝালেন, মুহাসাবার বিষয়গুলোতে বিভিন্ন অস্পষ্টতা আছে। তাছাড়া ছকগুলো কীভাবে পুরণ করতে হবে তা-ও অনেক স্থানে স্পষ্ট নয়। তাই এ বিষয়ে একটি বিস্তারিত লেখা তৈরি করা দরকার। তাহলে ছকগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া এবং সেগুলোর আলোকে মুহাসাবা করা সহজ হবে।

হুজুরের আদেশের পর বিষয়টি নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ভাবলাম। তারপর 'মুহাসাবার বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা' শিরোনামে কিছুটা ব্যাখ্যা করার তাওফীক হলো। এভাবে আল্লাহ তা'আলা ধীরে ধীরে কাজটি পূর্ণ করার তাওফীক দান করলেন। আলহামদুলিল্লাহ।

কিছু দিন আগের কথা। একদিন হুজুরের কাছে গেলাম কোনো এক প্রয়োজনে। হুজুরের *'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ'* ও *'লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি'* বইদু'টির নতুন সংস্করণের কাজ চলছিলো। কাজের অবস্থা জানতে চাইলাম। তখন এক পর্যায়ে হুজুর বললেন, 'ভেবেছি, *"শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ"*'ও *"লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি"*-এর এ সংস্করণের শেষে তোমার মুহাসাবার বইটি যুক্ত করে দেব।'

আমি অবাক হলাম। সাধারণ এ কাজটাকে হুজুর এমন গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন তা কখনো ভাবতেও পারিনি। অবশ্য বান্দার সাথে হুজুরের 'জাররা নাওয়াযি'র দৃষ্টান্ত এই প্রথম নয়। কিতাব বিভাগের জীবনের শুরুর দিকেই যখন হুজুরের সাথে সম্পর্ক হয়, তখন থেকে এ পর্যন্ত হুজুরের কত যে ইহসান ও অবদান বান্দার প্রতি আছে, তা বলে শেষ করার নয়।

হুজুর তো এ কথা বললেন। তবে নিজের অবস্থার প্রতি তাকিয়ে খুব দ্বিধা হচ্ছিলো। কারণ যদি আমার গোনাহের কারণে অন্যদের উপরও এর বিরূপ প্রভাব পড়ে, তাহলে তো বড়ই খতরা ও আশঙ্কার বিষয় হবে। উস্তাদে মুহতারাম মুফতী নূর মুহাম্মদ ছাহেব দা. বা. কে বিষয়টি অবগত করলাম। হুজুর বললেন, ফুআদ ছাহেবের বলার পর আর দ্বিধা থাকা উচিত নয়। আসাতিযায়ে কেরামের হুকুম হয়ে যাওয়ার পর তো আর শাগরিদের কোনো কথা থাকে না। নতুবা যার নিজেরই কোনো পুঁজি নেই, গোনাহের কালিমায় যে নিজেই জর্জরিত রাত-দিন, সে কীভাবে দেখাতে পারে এত বড় দুঃসাহস!

তাছাড়া এ পুরো কাজে বান্দার নিজের তো কিছুই নেই। বড়দের কিছু নসীহতকে শুধুই একটি ছকবদ্ধ করে দেয়া- এই যা কাজ। এখানে যত বিষয় আছে কিছু তো সবারই জানা। আর বাকিগুলো আমাদের বড়দের ফিকির থেকেই নেয়া।

আর আসলাফের চিন্তা ও ফিকির যাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছেছে তাদের অন্যতম হলেন, হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ., দাঈ ইলাল্লাহ হযরত মাওলানা ইলয়াস রহ., মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা আলী মিয়া নাদাবীসহ আমাদের এ যুগের মহান ব্যক্তিত্ব শাইখুল ইসলাম মুফতী

মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা., মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা. বা. এবং মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা. বা.। এরপর আছেন আমার মুহতারাম আসাতিযায়ে কেরাম। তাদের মাঝে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেন মুফতী নূর মুহাম্মদ দা. বা. ও মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ দা. বা.। তাঁদেরই বিভিন্ন কথাকে একটি ছকবদ্ধ করে দেয়া ছাড়া এখানে আর কোনো কাজ নেই।

* * *

এ লেখার শেষে যে ছকগুলো উল্লেখ করা আছে সেগুলো পূরণ করার জন্য আমরা প্রয়োজনমত ফটোকপি করে নিতে পারি। এছাড়া প্রতিদিন পূরণ করার জন্য এভাবে প্রস্তুতকৃত ছক লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করা যাবে। পুরো এক বছরের ছক বিরতির মুহাসাবা ও তেলাওয়াতের মুহাসাবাসহ বোর্ড বাঁধাই করা পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

সবশেষে দোয়া করি, 'হে আল্লাহ! এই ক্ষুদ্র কাজটিকে আপনি কবুল করুন। দয়া করে সকল ত্রুটিগুলো দূর করে দিন। একে আমার এবং সকলের জন্য উপকারী করুন। আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না যাদের আলোচনা এসেছে কোরআনে এ ভাষায়–

الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا.

প্রিয় ভাই, মন থেকে কি একটু বলবেন, 'আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন'?

বিনীত
ইলয়াছ খান
পাথরাইল, দত্তকান্দি
চৌহালি, সিরাজগঞ্জ

১৭ - ৮ - ১৪৩৫ হি.
১৬ - ৬ - ২০১৪ ঈ.
সকাল ১০টা ১৫ মিনিট

মুহাসাবার ব্যাপারে লক্ষণীয় কিছু কথা

১. আমি অবশ্যই আমার মুরব্বীকে নিজের অবস্থা জানাব। এটিই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উন্নতির মূল মাধ্যম। মুহাসাবাও তাঁকে দেখিয়েই শুরু করব এবং নিয়মিত তাকে দেখাব।

২. মুহাসাবায় উল্লেখিত সবগুলো আমল একসাথে শুরু করতে হবে এমন নয়। যতটুকু সহজে সম্ভব হয় ততটুকু দিয়েই শুরু করব। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে বাকিগুলোর উপর আমলের চেষ্টা করব। স্বাভাবিকভাবে আমার মন যতটুকু আমল করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, এখন ততটুকুই করব। মাঝে মাঝে একটু করে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করব। নিজের প্রতি খুব বেশি চাপ প্রয়োগ করব না। কারণ সীমা ছাড়িয়ে গেলে কখনো মনে এমন বিরক্তি সৃষ্টি হয় যে, পরে আর মুহাসাবাই করা সম্ভব হবে না। যে কাজগুলো এখন করব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেগুলোর ঘর ফাঁকা রাখব। এভাবে ধীরে ধীরে কয়েক বছরেও যদি সবগুলো আমল করার অভ্যাস গড়ে নিতে পারি, তা-ও অনেক বড় প্রাপ্তি।

৩. প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে অবশ্যই মুহাসাবা করব। ইশার নামাযের পর সাথে সাথে করতে পারলে বেশি ভালো হয়। দিনের সব কাজ শেষ করে মুহাসাবা করতে বসলে অনেক সময় মুহাসাবার পূর্ণ লক্ষ্য অর্জিত হয় না। কারণ তখন শরীর ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাই সবগুলো বিষয় নিয়ে ভালোভাবে ভাবা সম্ভব হয় না। আর নিজের কাজগুলো নিয়ে ভাবা এবং সবসময় নিজের কাজগুলোকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়াই মুহাসাবার মূল উদ্দেশ্য।

৪. কোনো দিন সময় কম থাকলেও রুটিন ঠিক রাখার জন্য অন্তত প্রতিটি বিষয়ের কয়েকটি করে ঘর পূর্ণ করে নেব। প্রচণ্ড ঘুম পেয়েছে। তখনও প্রতি বিষয়ের ১/২ টি করে হলেও ঘর পূর্ণ করে নেব। প্রচণ্ড কাজের চাপ, কোথাও বেড়াতে গিয়েছি কিংবা হঠাৎ জরুরি কোনো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি- এ ধরণের পরিস্থিতিতেও অল্প করে হলেও মুহাসাবা করব। পরে যখন সময় পাই তখন বাকিটুকু পূর্ণ করে নেব। এতেও অন্তত রুটিনমাফিক চলার বরকত অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

৫. কোনো কারণে ঘুমের আগে মুহাসাবা করতে না পারলে পরদিন সুযোগ করে অবশ্যই করে নেব। আর সারা দিন শেষ হয়ে পরদিনের রাত এসে গেলে আগে আজকের মুহাসাবা পূর্ণ করব। তারপর গতদিনের কাযা আদায় করব।

৬. আমলের হিসাব লেখার ক্ষেত্রে অবশ্যই ভালো করে ভাবব। কোনো রকম একটা হিসাব করে লিখব না। যত ভালোভাবে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে পারব তত দ্রুত আমার উন্নতি হতে থাকবে, সারা দিন কাজের সময় আমলগুলোর কথা তত বেশি স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে আসতে থাকবে। তাই একটু কষ্ট হলেও কিংবা বিরক্তি এলেও এভাবেই করার চেষ্টা করব। কিছু দিন এভাবে করে যেতে পারলে কল্পনাতীত উন্নতি অনুভব করব ইনশাআল্লাহ।

৭. যেসব কাজের ক্ষেত্রে সংখ্যা বা পরিমাণ লিখার কথা, কখনো সময় বা থাকায় সেগুলো যদি পুরোপুরি হিসাব করতে নাও পারি, তাহলে অন্তত এতটুকু তো অবশ্যই করব যে, আমলটি যদি কিছু পরিমাণও করা হয় তাহলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা (.) দেব।

৮. কোনো বিষয় যদি আমার আপাতত আমল ও মুহাসাবা করার ইচ্ছা না থাকে তাহলে সে বিষয়টার ঘর ফাঁকা রাখব। আর যদি কোনো কাজ মাঝে মাঝে করার নিয়ত থাকে তাহলে যেদিন করার ইচ্ছা থাকবে সেদিনই কেবল ঘর পূরণ করব। অন্যান্য দিন ঘরটা ফাঁকা রাখব। যেমন: আমার যদি নিয়ত থাকে সপ্তাহে একদিন আরবীতে, অন্যদিন বাংলায় রোযনামচা লিখব, তাহলে একদিন বাংলা রোযনামচার ঘর পূরণ করব, আর আরবী রোযনামচার ঘর ফাঁকা রাখব। পরদিন আরবী রোযনামচার ঘর পূরণ করব, আর বাংলা রোযনামচার ঘর ফাঁকা রাখব। অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করব।

৯. 'এ মাসের লক্ষ্য'– প্রতি পৃষ্ঠায় এ ঘরে আমরা আমাদের বর্তমানের লক্ষ্যটা লিখে রাখব। যেমন: আমি এ মাসে 'ধ্যানের সাথে ইসতেগফার' প্রতিদিন ১০০ বার করে করতে চাই। তাহলে 'ধ্যানের সাথে ইসতেগফার করা'র উপরের ঘরে ১০০ লিখে রাখব। তেমনি আমি এ মাসে যদি দুরূদ শরীফ প্রতিদিন ১০০ বার করে পড়তে চাই, তাহলে 'দুরূদ শরীফ পড়া'র উপরের ঘরে ১০০ লিখে রাখব। 'হাদীস মুখস্থ করা', 'কোরআন তেলাওয়াত করা' এগুলোর ক্ষেত্রেও আমরা প্রতিমাসের লক্ষ্য লিখে রাখব। তবে কিছু বিষয়ে এটা লেখার প্রয়োজন হবে না।

এটা লিখে রাখার উপকার হল, আমি যে লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি প্রতিদিন সে লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারছি কি না সে হিসাব করা সহজ হবে। আমি হয়ত লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি 'ধ্যানের সাথে ইসতেগফার' ১০০ বার করে করব। কিন্তু আজ ৫০ বার করতে পেরেছি। তাহলে বুঝাতে পারব, আজ আমার আমল কিছুটা কমে গেছে। আগামীকাল থেকে আরো ভালোভাবে চেষ্টা করতে হবে।

১০. মুহাসাবার জন্য ব্যয় হওয়া সময়টাকে সময় নষ্ট হচ্ছে বলে ভাবব না। কারণ আমি বিশ্বাস করি, জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছার অভিসারের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের মুহাসাবা হবে আমার সর্বোত্তম সঙ্গী।

১১. মুহাসাবা মানুষের জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে সহায়ক মাত্র। এটিই উন্নতির মূল ভূমিকা পালনকারী নয়। কারণ প্রদীপ যেমন প্রদীপ থেকেই আলো গ্রহণ করে, তেমনি জীবনও তো আলো গ্রহণ করে 'জীবন্ত' জীবন থেকেই। তাই 'জীবন্ত' জীবনের সাথে সংযোগ সাধনের চেষ্টা করবো সবসময়।

১২. মুহাসাবার বই প্রয়োজন ছাড়া কাউকে দেখাব না। নিজের বিশেষ অবস্থাও কেবল নিজ মুরব্বীকেই জানাব।

১৩. মুহাসাবার প্রতি পৃষ্ঠার নিচে নিজ মুরব্বীর স্বাক্ষর নেয়ার ঘর রয়েছে। প্রতি সপ্তাহে অন্তত একবার মুরব্বীকে দেখিয়ে প্রতি পৃষ্ঠায় স্বাক্ষর নেব। তাঁর কষ্ট হলে অন্তত প্রথম এক পৃষ্ঠায় নিয়ে নেব। এতে আমি যেমন মানসিকভাবে হিম্মত ও সাহস পাব, তেমনি পাব মুরব্বীর নেক নজর, আর সকল কাজে বিশেষ বরকত।

১৪. মুহাসাবাকে আমি নিজের প্রতিদিনের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর মতই একটি কাজ মনে করব। তাই এর জন্য আমার রুটিন ও নেযামুল আওকাতে যথেষ্ট পরিমাণ সময় রাখব।

১৫. আমি তো বিশ্বাস করি– 'মুহাসাবা করা আমার জন্য অত্যন্ত উপকারী।' তাই আমি যাদের কল্যাণ কামনা করি তাদেরও নিয়মিত মুহাসাবার প্রতি উদ্বুদ্ধ করব। আর মুসলমান হিসেবেও তো আমি প্রত্যেক মুসলমান ভাইয়ের কল্যাণকামী। তাই সবাইকে বিশেষভাবে তালিবুল ইলম ভাইদেরকে মুহাসাবার প্রতি ভালোভাবে উৎসাহিত করব। আর মন থেকে দু'আ করব, 'হে আল্লাহ! আপনি এটিকে কবুল করুন। সবাইকে ইসতেকামাত ও অটলতার সাথে নিয়মিত মুহাসাবা করার তাওফীক দান করুন।'

মুহাসাবার বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা

ইবাদত - ১

কাজের শুরুতে ও মাঝে নিয়াত বিশুদ্ধ করা : প্রতিদিন প্রত্যেক কাজের শুরুতে ও মাঝে কয়েক সেকেন্ড সময় নিয়ে চিন্তা করব, আমার এ কাজটি কেবল আল্লাহরই জন্য। পড়তে বসেছি। চিন্তা করব, আমার এই পড়াশোনা তো কেবলই আল্লাহর জন্য। খেতে বসেছি। চিন্তা করব, আমি যা খাব তা আল্লাহর জন্য, আল্লাহর ইবাদতের জন্য। প্রত্যেক কাজের শুরুতে এমনটা করার চেষ্টা করব। সারা দিন কতটি কাজের শুরুতে এভাবে নিয়াত বিশুদ্ধ করলাম, সেই পরিমাণটা লিখবো। যেমন: ১/২/৩/১০ ইত্যাদি। আর সারা দিন একবারও না হলে (.) লিখব।

কাজের নিয়াতকে ব্যাপক করা : প্রত্যেক কাজের শুরুতে নিয়াতটাকে অনেক ব্যাপক করব। নিয়াতকে অনেক প্রসারিত রাখব। আমার ভাবনা যেন হয় অনেক দূর-দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। আমি একটি ফিকহের কিতাব পড়ছি, ভাববো, আমি নিজে এই কিতাবের মাসআলাগুলো জানব এবং মানব। আর আল্লাহ যদি কবুল করেন তাহলে একদিন আমি উম্মতকে মাসআলা বলব। আল্লাহ যদি তাওফীক দেন, আমি আমার পরিবারে, এলাকার মসজিদে এবং অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন বিষয়ের মাসআলা নিয়ে আলোচনা করব। এবং ...। কাউকে সালাম দিলাম। ভাবব, এর মাধ্যমে তার সাথে আমার দ্বীনী সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এই সম্পর্কের ভিত্তিতে আমি তার থেকে দ্বীনদারির ক্ষেত্রে উপকৃত হবো। এবং ...। খানা খাব। ভাবব, এর মাধ্যমে আল্লাহ যে শক্তি দান করবেন, তা দ্বারা আমি কুরআন পড়ব, হাদীস পড়ব, নামায পড়ব, ইবাদত করব, মানুষের সেবা করব এবং ...।

ধ্যানের সাথে ইসতেগফার করা : ইসতেগফার করার সময় ভাবব, 'হে আল্লাহ! আমি সব গুনাহ থেকে তওবা করছি। আপনি আমার গুনাহগুলো মাফ করে দিন।' যেসব মাকরূহ ও অনুত্তম কাজ হয়ে গেছে সেজন্যও ইসতেগফার করব। আজকের নামাযে তাকবীরে উলা ছুটে গেছে। মনে মনে এজন্য অনুতপ্ত হই। স্মরণ করে বলি, আসতাগফিরুল্লাহ। নামাযে ঘুম

ধরেছে। স্মরণ করে বলি, আসতাগফিরুল্লাহ। আজ পড়ালেখায় কোন সময় অলসতা হয়েছে। স্মরণ করে বলি, আসতাগফিরুল্লাহ। এভাবে নিজের সকল ত্রুটির জন্য আল্লাহর মাগফিরাত প্রার্থনা করব। প্রতি নামাযের পরে ১০/২০ বার ইসতেগফার করার চেষ্টা করি। সকাল-বিকাল একটু বেশি করার চেষ্টা করি। ইনশাআল্লাহ জীবন অনেক সুন্দর হবে। ধ্যানের সাথে এভাবে কত বার ইসতেগফার করা হলো তা লিখবো। ৫০/৬০/১০০ ইত্যাদি।

রাসূলের ইহসান স্মরণ করে দরুদ শরীফ পড়া : উম্মতের জন্য রাসূলের ইহসান ও কষ্টের ঘটনাগুলো একে একে স্মরণ করব এবং দুরুদ পড়ব। সারা দিন এভাবে কত বার দুরুদ শরীফ পড়া হল তা লিখব।

নামাযের .../... মিনিট পূর্বে মসজিদে যাওয়া : নামাযের ১০/১৫ মিনিট পূর্বেই মসজিদে যাওয়া উচিত। সুন্নতওয়ালা নামাযের অন্তত ১৫ মিনিট আগে, আর অন্যান্য নামাযের অন্তত ১০ মিনিট আগে। আমি যদি ১০/১৫ আগে যেতে না পারি, তাহলে আমার সাধ্য অনুযায়ী সংখ্যাটা লিখে নেব। যেমন ৫/১০, ৮/১২ ইত্যাদি। পাঁচ ওয়াক্তই সময়মত যাওয়ার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কত ওয়াক্ত নামাযে সময়মতো যেতে পারলাম তা লিখব।

১ম কাতারে নামায আদায় : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই ১ম কাতারে আদায় করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেবো বা ৫ লিখব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কত ওয়াক্ত ১ম কাতারে হল তা লিখব। যেমন ২/৪ ইত্যাদি।

তাকবীরে উলার সাথে নামায : পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই তাকবীরে উলার সাথে আদায় করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব বা ৫ লিখব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কত ওয়াক্ত তাকবীরে উলার সাথে হলো তা লিখব। যেমন ২/৪ ইত্যাদি।

আযানের জবাব দেয়া : আযানের সময় আযানের জবাব দেব এবং পরে দুরূদ শরীফ ও দোয়া পড়ব। এতে রাসূলের শাফাআত লাভ হবে ইনশাআল্লাহ। পাঁচ বার আযানের সময়ই জবাব দেওয়ার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব বা ৫ লিখব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কত ওয়াক্ত আজানের জবাব দেয়া হলো তা লিখব। যেমন ২/৪ ইত্যাদি।

ইকামতের জবাব দেয়া : ইকামতের সময় ইকামতের জবাব দেব। আজানের জবাবের মতো এটি মুস্তাহাব। অর্থের প্রতি লক্ষ রেখে ধ্যানের সাথে শব্দগুলো উচ্চারণ করবো। এতে নামাযের কিছুটা মানসিক প্রস্তুতিও হয়ে যাবে এবং নামাযে মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে ইনশাআল্লাহ। এভাবে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইকামতের জবাব দেওয়ার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব বা ৫ লিখব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কত ওয়াক্ত ইকামতের জবাব দেয়া হল তা লিখব। যেমন ২/৪ ইত্যাদি।

তাহাজ্জুদ আদায় করা : শেষ রাতে ওঠা সম্ভব না হলে প্রথম পর্যায়ে অন্তত ঘুমানোর আগে তাহাজ্জুদ পড়ে নেব। দোয়া করব, যেন শেষ রাতে ওঠার তাওফীক হয়। আসলে এটা মানুষের ইচ্ছা ও সংকল্পের ওপরও অনেকটা নির্ভর করে। মানুষ যখন একান্তভাবে কামনা করে, তখন তার সামনে পথ খুলেই যায়। নিজে নিজেই কিংবা অন্যের মাধ্যমে কোনো একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

ইশরাক আদায় করা : একটু কষ্ট হলেও সকালে ইশরাকের চার রাকাত অন্যথায় অন্তত দুই রাকাত নামায আদায় করব। আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

আওয়াবীন আদায় করা : মাগরিবের ফরজের পর ছয় রাকাত পড়ার চেষ্টা করব। অন্তত চার রাকাত, নতুবা দুই রাকাত অবশ্যই পড়ব। আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

অন্তত অজুর সময় মেসওয়াক করা : মেসওয়াক তো অনেক সময়ই সুন্নত। তবে অভ্যাস করার জন্য অন্তত অজুর শুরুতে মেসওয়াক করব। আর সাধ্যমত অন্যান্য সময়ও চেষ্টা করব। সারা দিন প্রত্যেক বার অজুর শুরুতে মেসওয়াক করা হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা কত বার হলো না তা লিখব।

সাধ্যমত অজু অবস্থায় থাকা : সারা দিন অজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করব। এতে সব কিছুতে বরকত অনুভব করব ইনশাআল্লাহ। আমাদের

আকাবিরের অভ্যাস তো এমনটাই ছিল। তো এভাবে সারা দিন খেয়াল করে তাওফীক হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা কতক্ষণ হল না তা লিখব। যেমন : ১ ঘ./৩০ মি. ইত্যাদি।

নেয়ামতের কথা স্মরণ করে শোকর করা : গভীরভাবে খেয়াল করে নেয়ামতের কথা স্মরণ করে শোকর করব। 'আল্লাহ আমাকে সুস্থ জীবন দান করেছেন। আল্লাহ আমাকে ইলম অর্জনের পথে রেখেছেন। আল্লাহ আমাকে এমন এমন উসতাদের শাগরিদ হওয়ার তাওফীক দিয়েছেন। আল্লাহ আমার মা-বাবাকে সুস্থ রেখেছেন। এবং ...'। এভাবে আমার ওপর আল্লাহর যে অগণিত নেয়ামত আছে, এক এক করে সেসবের কথা স্মরণ করে মনের গভীর থেকে বলব, 'আলহামদুলিল্লাহ।' সারা দিনে এভাবে ৫০ থেকে ১০০ কিংবা আরো বেশি নেয়ামতের কথা ভেবে ভেবে শোকর আদায় করব। এতে আমার সারাদিন অনেক সুন্দরভাবে কাটবে ইনশাআল্লাহ। ফাঁকা ঘরে সারা দিনে কত বার হল তা লিখব।

কত বার খানার সুন্নতের পাবন্দি হল : খানার সময় স্মরণ করব, আমি সুন্নতমতো খানা খাব। খানার কোনো সুন্নতের ওপর আমল ছুটে যাচ্ছে কি না, সাধ্যমত এ কথা স্মরণ করে করে খাব। এভাবে খানার আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কত বার এভাবে হলো তা লিখব।

কত ওয়াক্ত নামাযে সুন্নতের পাবন্দি হল : নামাযের সময় স্মরণ করব, আমি সুন্নত মতো নামায আদায় করব। নামাযের কোনো সুন্নতের ওপর আমল ছুটে যাচ্ছে কি না- সাধ্যমত এ কথা স্মরণ করে করে নামায আদায় করব। এভাবে নামাযের আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কত ওয়াক্ত নামায এভাবে হল তা লিখব।

কত বার ঘুমের সুন্নতের পাবন্দি হল : ঘুমের সময় স্মরণ করব, আমি সুন্নত মতো ঘুমাব। ঘুমের কোনো সুন্নতের ওপর আমল ছুটে যাচ্ছে কি না- ঘুমানোর সময় এবং ঘুম থেকে ওঠার সময় সাধ্যমত এ কথা স্মরণ করব। এভাবে ঘুমের আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কতবার পাবন্দি হল তা লিখব।

ইসতেনজার সুন্নতের পাবন্দি হয়েছে কি : ইসতেনজার সময় স্মরণ করব, আমি সুন্নত মতো ইসতেনজা করব। ইসতেনজার সময় কোনো সুন্নতের ওপর আমল ছুটে যাচ্ছে কি না- সাধ্যমত এ কথা স্মরণ রাখব। এভাবে সুন্নতের কথা স্মরণ রেখে আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কত বার এভাবে হল তা লিখব।

..... সুন্নতের পাবন্দি কতটুকু হলো : ওজু করা, অন্যের সাথে কথা বলা, মসজিদে প্রবেশ করা, মসজিদ থেকে বের হওয়াসহ সকল ক্ষেত্রে সুন্নতমতো আমল করা দরকার। তো আমি মনে মনে এ মাসে কয়েকটি কাজের সুন্নতগুলো জেনে নেব। সে কাজগুলো ফাঁকা ঘরে লিখে নেব। সেগুলোর যে কয়েকটির ওপর আমল হল সেটা লিখব। আর সবগুলোর ওপর আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কতগুলোর উপর আমল করা হল তা লিখব। এ সুন্নতগুলো অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেলে পরবর্তীতে আরো কিছু সুন্নত জেনে নেব। তখন সে আমলগুলো ফাঁকা স্থানে লিখে নেব। তারপর থেকে সেগুলোর মুহাসাবা করবো। যেমন প্রথম মাসে লিখতে পারি 'ওজু ও মেসওয়াকের'। পরে লিখতে পারি 'কথা বলার'। তারপর লিখতে পারি 'আত্মীয়-স্বজনের সাথের'। এভাবে ধীরে ধীরে জীবনের ছোট-বড় সব সুন্নতগুলো আমলে আনার চেষ্টা করব। এতে আমার জীবনে রহমত ও বরকতের ফল্গুধারা প্রবাহিত হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ইবাদত - ২

নামাযের খুশূ'-খুজূ' [দেহ ও মন স্থির রাখা] : নামাযে খুশূ-খুযূ থাকার অর্থ হল নামাযে শরীর ও মন স্থির থাকা। সুতরাং নামাযে দেহ স্থির রাখাটা হল খুশূ-খুজূর ৫০%, আর মন স্থির রাখাটা ৫০%। তাই দেহ নামাযে যেভাবে স্থির রাখা দরকার সারা দিন সেভাবে যদি পূর্ণ সময় দেহ স্থির রাখতে পারি, তাহলে নামাযের খুশূ'-খুজূ'র ৫০% পূর্ণ হল। তেমনি নামাযে যেভাবে মন স্থির রাখা দরকার সারা দিন সেভাবে যদি পূর্ণ সময় মন স্থির রাখতে পারি, তাহলে খুশূ'-খুজূ'র বাকি ৫০%ও পূর্ণ হল। তো হিসাব করব, দেহ-মন কোন্‌টার কত ভাগ খুশূ'-খুজূ' হল। তারপর উভয়টি যোগ করে পরিমাণটি লিখব। যেমনঃ ৪০%, ৫০%, ৭৫%, ৯০% ইত্যাদি। এক্ষেত্রে একেবারে পাই পাই হিসাব করা সম্ভবও নয়, প্রয়োজনও নেই।

আসলে এই চিন্তার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো, নামাযে ক্রমান্বয়ে নিজের মধ্যে চিন্তা-ফিকির সৃষ্টি করা। তাই এভাবে ফিকির করা হলে ধীরে ধীরে নামাযে আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এবং সব সময় অন্তত নিজের অবস্থার ব্যাপারে সচেতন থাকা স্বাভাবিক হবে। উপরন্তু খুশূ'-খুজূ'র ত্রুটির কারণে আল্লাহর কাছে দোয়া করার প্রয়োজন অনুভূত হবে।

নামাযে মন নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা : নামাযে মন স্থির রাখার জন্য অবশ্যই আমাকে বারবার চেষ্টা করতে হবে। আর চেষ্টা করে যাওয়াটাই মূলত বান্দার কাজ। তাই যে যত বেশি চেষ্টা করতে পারলো সে-ই তত সফল। সুতরাং দিন দিন নামাযে মন স্থির রাখার চেষ্টা বাড়াতে হবে। সারা দিন মোটামুটি কত বার চেষ্টা করলাম, অনুমান করে তা লিখব। সারা দিনের ফরজ আর সুন্নত মিলিয়ে বত্রিশ রাকাতে গড়ে কত বার করে মন নিয়ন্ত্রণ হল। আর নফল নামাযগুলো পড়া হলে সেগুলোকেও এর সাথে যুক্ত করে নেব। গড়ে প্রতি রাকাতে তিন বার করে হলে ১০০ বারের বেশি হবে। গড়ে ৫/১০ বার করে হলে পরিমাণ আরো অনেক বেশি হবে। ২০০/৩৫০/৫০০ ইত্যাদি যে কোনো সংখ্যা এখানে হতে পারে।

এখানেও সেই একই কথা। এই চিন্তার দ্বারা মূল উদ্দেশ্য হলো, নামাযে ধীরে ধীরে নিজের মাঝে চিন্তা-ফিকির সৃষ্টি করা। এভাবে ফিকির করা হলে ক্রমান্বয়ে নামাযে আমাদের মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। এবং সব সময় অন্তত নিজের অবস্থার ব্যাপারে সচেতন থাকা যাবে। আর ত্রুটির কারণে আল্লাহর কাছে দোয়া করার প্রয়োজন অনুভূত হবে।

সূরা ইয়াসিন, ওয়াকিয়া ও মুলক পাঠ : বাদ ফজর সূরা ইয়াসিন, বাদ মাগরিব সূরা ওয়াকিয়া ও বাদ ইশা সূরা মুলক তেলাওয়াতের আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করব এবং কয়টি সূরা পড়া হলো তা লিখব। যেমনঃ ১/২/৩।

কোরআন তেলাওয়াতের পরিমাণ : সারা দিনের তেলাওয়াতের পরিমাণ লিখব। যেমনঃ আধা (১/২) পারা, ১ পারা, ২ পারা ইত্যাদি।

ফিকর ও তাদাব্বুরের সাথে তেলাওয়াত : প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় অর্থ ও মর্মের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগী হয়ে তেলাওয়াত করব। আয়াতের মর্মের প্রতি একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করব। উসতাদে মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা.-এর একটি আলোচনা আছে এ বিষয়ে। 'তাফসীরে তাওযীহুল কোরআনের' বাংলা অনুবাদের শুরুতে ভূমিকা হিসেবে আলোচনাটি যুক্ত আছে। আমাদের সকলের আলোচনাটি পড়া উচিত। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' তে ৫৬ - ৫৯ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে হুজুর যা লিখেছেন তা-ও পড়ে নেব এবং স্মরণ করব। এর আলোকে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করব। এভাবে যত পৃষ্ঠা বা পারা তেলাওয়াত করা হল, তা লিখে রাখব। যেমনঃ ৩/৫/৭ পৃ., ১ পা. ইত্যাদি।

ফিকর ও তাদাব্বুরের সাথে হাদীস পড়া : প্রতিদিন অন্তত কিছু সময় অর্থ ও মর্মের প্রতি গভীরভাবে মনোযোগী হয়ে কিছু হাদীস পড়ব। হাদীসের মর্মের প্রতি একাত্ম হওয়ার চেষ্টা করব। মনে তখন যেন কেবলই হাদীসের ফিকির থাকে। ভাবব, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে লক্ষ করে নিজেই হাদীসটি বলছেন, আর আমি শুনছি। কেবলই জীবনে বাস্তবায়নের জন্য পড়ব। অন্য কোনো উদ্দেশ্য থাকবে না। এভাবে হাদীস পড়ার চেষ্টা করব। তো যতক্ষণ বা যতগুলো হাদীস এভাবে ফিকিরের সাথে পড়া হবে, তা লিখব। যেমনঃ ৫/১০ মি., ১০/১৫ টি ইত্যাদি।

গুরুত্বের সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করা : সারা দিন কিছুক্ষণ একান্ত মনে গুরুত্ব সহকারে কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করব। যেমন: ফরজ নামাযগুলোর আগে ও পরে, তাহাজ্জুদের সময়, ইশরাক ও আওয়াবীনের পরে। তো এভাবে কতক্ষণ গুরুত্ব সহকারে দোয়া করলাম, সেই পরিমাণ লিখব। যেমন: ১০মি./২০মি. ইত্যাদি। আর দোয়া করা না হলে (.) লিখব।

মাগরিবের আগে দোয়া করা : এটা দোয়া কবূলের সময়। এছাড়াও একটু আগে সমজিদে এলে ধীরস্থিরতার সাথে নামায আদায় করা সম্ভব হয়। তাই এ সময় দোয়া করার ইহতেমাম করব। এর তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

যে কোনো কাজের শুরুতে দোয়া করা : যে কোনো কাজের শুরুতে দোয়া করার অভ্যাস করা দরকার। এতে সারা দিন আল্লাহর সাথে বিশেষ সম্পর্ক অব্যাহত থাকে। যেমন নামায পড়ার আগে আমি বলব, 'হে আল্লাহ! আমাকে আপনার পছন্দের নামায পড়ার তাওফীক দিন। পরিপূর্ণ খুশূ' ও খুজূ'র সাথে নামায আদায় করার তাওফীক দান করুন।'

দরসে বসার আগে, এমনকি প্রতি ঘণ্টার শুরুতে ও মাঝে দোয়া করব– 'হে আল্লাহ! আমাকে মনোযোগের সাথে উসতাদে মুহতারামের সব কথা শোনার তাওফীক দিন। যা শুনছি তা সঠিকভাবে বোঝার ও মনে রাখার তাওফীক দান করুন।'

মুহাসাবা করতে বসার শুরুতে দোয়া করব, 'হে আল্লাহ! এই মুহাসাবা আমার জন্য উপকারী করুন। প্রতিদিন সব আমল পূর্ণ করার তাওফীক দিন।'

ঘুম থেকে উঠেই দোয়া করতে পারি, 'হে আল্লাহ! অলসতা ও অবসাদ থেকে আমি আপনার আশ্রয় চাই। আমাকে কাজের আগ্রহ ও উদ্যম দান করুন। আজকের দিনটিকে আমার জীবনের সর্বোত্তম দিন হিসেবে কবুল করুন।'

খানার সময় দোয়া করতে পারি, 'হে আল্লাহ! এই খানা আমার জন্য তৃপ্তিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত করুন। এই খানার মাধ্যমে আমার শরীরে ইলম অর্জনের জন্য প্রয়োজন পরিমান মুজাহাদা করার তাওফীক দিন।'

এভাবে প্রত্যেক কাজের শুরুতে দোয়া করব। প্রত্যেক কাজে দোয়ার পাবন্দি করতে পারলে ইনশাআল্লাহ আমার জীবন অনেক সুন্দর হবে। আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি অনুভব করব ইনশাআল্লাহ। আর 'খালওয়াত দর আনজুমান' অর্থাৎ মানুষের মাঝে থেকেও 'আল্লাহর সাথে থাকা'র স্বাদ অনুভব করতে পারব ইনশাআল্লাহ।

অন্যের জন্য দোয়া করা : পুরো উম্মতের জন্য, নিজের মা-বাবা, আসাতিযায়ে কেরাম, উপরন্তু যাদের আমাদের উপর হক আছে তাদের সকলের জন্য দোয়া করবো। নিজের মাদরাসা ও জামাতের ছাত্রদের জন্য দোয়া করব। পরিচিত ও বিশেষ কিছু মানুষের জন্য নাম ধরে ধরেও দোয়া করব। আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব বা কতজনের জন্য দোয়া করা হল সেই সংখ্যা লিখব। আর দোয়া করা না হলে ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

ইহতেসাবের সাথে আমল করা : যে কোনো কাজ করার সময় ভাবব, কাজটি করলে আল্লাহ আমাকে কী পরিমাণ সাওয়াব ও প্রতিদান দেবেন। এভাবে সাওয়াব ও প্রতিদানের আশায় আমল করাকেই বলা হয় ইহতেসাবের সাথে আমল করা। হাদীসে ইহতেসাবের সাথে আমল করার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদাবী রহ.-এর এ বিষয়ে একটি লেখা আছে। এর বাংলা অনুবাদের নাম হলো, 'ঈমান ও ইহতিসাব'। তো প্রতিদিন কতগুলো আমল ইহতেসাবের সাথে করা হল, সে সংখ্যাটা লিখব।

সবাইকে সালাম দেয়া : সবাইকে সালাম দেয়ার চেষ্টা করব। কতজনকে সালাম দিলাম বা যাদের সাথে দেখা হয়েছে তাদের কত পার্সেন্ট ব্যক্তিকে আমি সালাম দিয়েছি সেই পরিমাণটা লিখব। যেমন: ২০%/৩৫%/৬০%/১০০%। অথবা কতজনকে সালাম দিয়েছি তা লিখবো। যেমন: ১০/২০/৩০/১০০/২০০ ইত্যাদি।

ঈসালে সাওয়াব করা : পড়ালেখাসহ প্রত্যেক আমলের পরই আমরা ঈসালে সওয়াব করতে পারি। অন্তত মুহাসাবার সময় সারা দিনের সব আমলের নিয়ত করে ঈসালে সাওয়াব করব। এভাবে ঈসালে সাওয়াব করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

ছয় তাসবীহ আদায় করা : সকাল-বিকাল ছয় তাসবীহর আমল পূর্ণ করার চেষ্টা করব। নিজ নিজ ইসলাহী মুরব্বীর পরামর্শে আমল করলে অনেক উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইয়ে[৯] উসতাদে মুহতারাম মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক দা. বা. এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি শুরু থেকেই আমরা পড়ে নেব। এভাবে তাসবীহ আদায় করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

ঈমানী মুযাকারা করা : নিজের মাঝে আল্লাহর প্রতি ঈমান ও ইয়াক্বীন বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন ঈমানী মুজাকারা করা দরকার। আল্লাহর কুদরতের কথা, তাঁর বিশাল শক্তি ও প্রতাপের কথা, নবী ও ছাহাবীদের প্রতি আল্লাহর গায়বী নুসরতের ঘটনা, জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা, কোরআন-হাদীসে বর্ণিত ঈমানদারদের বিভিন্ন আলামত– এ ধরণের ঈমানজাগানিয়া আলোচনা করব। প্রতিদিন কিছু সময় অন্তত কারো সাথে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব। এসবই ঈমানী মুযাকারার অন্তর্ভুক্ত। এভাবে প্রতিদিন কিছু সময় কেবল তাত্ত্বিক আলোচনার জন্য নয়, বরং আমল করার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আলোচনা করব। আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেবো। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেবো।

মৃত্যুর কথা ভাবা : চোখে দেখা মৃত্যু ও মৃতের অবস্থাগুলো স্মরণ করব। এ ব্যাপারে কোরআন-হাদীসে উল্লেখিত কথাগুলো স্মরণ করব। আমার অবস্থা তো তাদেরই মতো হবে। তাই সেগুলোর আলোকে নিজের মৃত্যু, কবর এসবের কথা স্মরণ করব। নিবিষ্ট মনে ভেবে নিজের মাঝে ভয় সৃষ্টির চেষ্টা করব; নিজের সামনে সেসব দৃশ্যকে বাস্তব করে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এভাবে ২/৪/৫ মিনিট যতটুকু সময় পারি, মৃত্যুর কথা ভাবার চেষ্টা করব। দিনে একাধিক বার হলে ভালো। নতুবা অন্তত একবার অবশ্যই করার চেষ্টা করব। এভাবে আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

---

[৯]. ২৭৬ নং পৃষ্ঠায়।

জাহান্নামের শাস্তির কল্পনা : জাহান্নামের শাস্তির কথা ভাবব। এ ব্যাপারে কোরআন ও হাদীসে উল্লেখিত কথাগুলো স্মরণ করব। কোরআন-হাদীসে যাদের ব্যাপারে জাহান্নামী হওয়ার ঘোষণা এসেছে, তাদের অবস্থা নিয়ে ভাবব। আমার অবস্থাও তাদের মতো হয়ে যায় কি না এ ব্যাপারে নিজের মাঝে ভয় সৃষ্টি করব। নিবিষ্ট মনে ভেবে নিজের মাঝে ভয় সৃষ্টির চেষ্টা করব; নিজের সামনে সেসব দৃশ্যকে বাস্তব করে তুলে ধরার চেষ্টা করব। এভাবে ২/৪/৫ মিনিট বা যতটুকু সময় পারি, জাহান্নামের শাস্তির কথা ভাবার চেষ্টা করব। দিনে একাধিক বার হলে ভালো। নতুবা অন্তত একবার অবশ্যই করার চেষ্টা করব। 'ফাজায়েলে সাদাকাতে'র ২য় খণ্ডের শেষ অধ্যায়ে মৃত্যুর মোরাকাবার ব্যাপারে সুন্দর আলোচনা আছে। সেখানে একটু দেখে নিলে আশা করি কাজটা খুব সুন্দর ও সহজভাবে করা যাবে। এভাবে যতটুকু সময় পারি, আযাবের কল্পনা করার চেষ্টা করব। আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

জান্নাতের নেয়ামতের কল্পনা : জান্নাতের নেয়ামতের কথা কল্পনা করব। এ ব্যাপারে আয়াত ও হাদীসে বর্ণিত কথাগুলো স্মরণ করব। কোরআন-হাদীসে যাদের ব্যাপারে জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা এসেছে, তাঁদের অবস্থা নিয়ে ভাবব। আমি তাঁদের মতো হতে পারছি কি না, তাঁদের পথে চলতে পারছি কি না, এ ব্যাপারে খুব চিন্তা করব। নিবিষ্ট মনে ভেবে নিজের মাঝে জান্নাতের আশা সৃষ্টি করব। আমার মনে দুনিয়ার যে সমস্ত ভোগ-বিলাসের প্রতি আগ্রহ আছে সেসবের ব্যাপারে ভাবব, এ সমস্ত জিনিস এবং এগুলো ছাড়াও আরো অনেক জিনিস দুনিয়ার তুলনায় অনেক উন্নতরূপে জান্নাতে আমার জন্য রাখা আছে। এতে আমার মাঝে দুনিয়ার এ সকল জিনিসের প্রতি আগ্রহ কমে যাবে। এভাবে ২/৪/৫ মিনিট বা যতটুকু সময় পারি জান্নাতের নেয়ামতের কথা ভাবার চেষ্টা করব। দিনে একাধিক বার হলে ভালো। নতুবা অন্তত একবার অবশ্যই করার চেষ্টা করব। এভাবে আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা : আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা করব। আল্লাহর অপূর্ব সৃষ্টি নিজের দেহ ও প্রকৃতির সব কিছু নিয়ে ভাবব। প্রভাতের রাঙা সূর্য আর সন্ধ্যার লাল সূর্য কি আমাদেরকে ভাবতে শেখায় না মহান আল্লাহকে নিয়ে। রাতের আকাশে মিটিমিটি জ্বলতে থাকা তারাগুলো, আর রাতের চাঁদের জোসনার আনাগোনা কি আমাদেরকে স্মরণ করায় না কিছু। আমার শরীরের প্রতিটি অঙ্গের বিস্ময়কর কাজ কি আমাকে স্মরণ করায় না মহান আল্লাহর সুনিপুণ সৃষ্টিকুশলতার কথা। এভাবেই আমার চারপাশের সবকিছু কি আমাকে ভাবায় না। যদি আমি ভাবতে চাই তাহলে ভাবতে চাই তাহলে ভাবার জিনিসের অভাব নেই। আর যার হৃদয়ে নেই সেই স্পন্দন সে এসব কিছুকে ভাবে কেবল চিরাচরিত 'ঘটনা'। প্রতিদিন কিছু সময় অন্তত এভাবে চিন্তা করব। এভাবে চিন্তা করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

গতকালের চেয়ে কতগুলো আমলে উন্নতি হল : পুরো ইবাদত-১ ও ইবাদত-২ এর আমলগুলো নিয়ে ভাবব। কতগুলো আমলে গতকালের চেয়ে উন্নতি হল তা হিসাব করব। তারপর সে সংখ্যাটা লিখব। যেমন: ২/৫/৮/১০/২০/৩০ ইত্যাদি। আর উন্নতি না হলে ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

গতকালের চেয়ে কতগুলো আমলে অবনতি হল : পুরো ইবাদত-১ ও ইবাদত-২ এর আমলগুলো নিয়ে ভাবব। কতগুলো আমলে গতকালের চেয়ে অবনতি হল তা হিসাব করব। তারপর সে সংখ্যাটা লিখব। যেমন: ২/৫/৮/১০/২০/৩০ ইত্যাদি। আর অবনতি না হলে শোকর আদায় করে (.) চিহ্ন দেব।

মুআশারা ও আখলাক -১

মাখলুকের সাথে সুন্দর ব্যবহার করা : আমি মানুষের কাছে যেমন ব্যবহার আশা করি, অন্তত তেমন ব্যবহার অন্যের সাথেও করার চেষ্টা করব। সুন্দর ব্যবহার কী তা আমরা মোটামুটি সবাই জানি। তো সারা দিন প্রত্যেকের সাথে প্রতিটি আচরণ সুন্দর করে করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার সুন্দর ব্যবহার হল না, তা লিখব।

হাসিমুখে কথা বলা : সারা দিন সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলব। এভাবে চলতে পারলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার হাসিমুখ ছাড়া গোমড়া মুখে কথা বললাম তা লিখব।

সাধ্যমত অন্যকে আদেশ ছাড়া কথা বলা : সারা দিন সাধ্যমত অন্যকে আদেশ ছাড়া কথা বলব। এটা বিনয়ের লক্ষণ। আমি বলতে পারি, 'ভাই! কাজটা কি করা সম্ভব?' 'ভাই! কাজটা কি করতে পারবেন?' 'কাজটা যদি একটু করতেন খুব ভালো হত।' অবস্থা হিসেবে এ ধরণের কোনো বাক্য ব্যবহার করব। বড় ও সাথী ভাইদের সাথে এভাবেই কথা বলব। ছোটদের সাথেও স্বাভাবিক আচরণ করার চেষ্টা করব। এভাবে দিন কাটানোর তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার ব্যতিক্রম হল তা লিখব।

সাধ্যমত অন্যের কথা মেনে নেয়া : কেউ আমাকে কোনো কিছু করতে বললে সাধ্যমত তা করে নেব। বিভিন্ন সময় সাথীরা আমাদেরকে বিভিন্ন কাজ করার অনুরোধ করে। যেমন: একটি কিতাব এগিয়ে দিতে বা কোনো কিছু এনে দিতে বলে। এ ধরণের আরো অনেক কাজ আসে। তো সুযোগ মতো এগুলো আমরা মেনে নেয়ার অভ্যাস করলে আমাদের মাঝে বিনয়ের গুণ সৃষ্টি হবে। যে বলল তার জন্য এভাবে বলা উচিত ছিল কি না, তা চিন্তা

করব না। মনে একটু খারাপ লাগলেও মেনে নিয়ে কাজ করে ফেলব। এতে আমার অনেক লাভ হবে। সারা দিন এভাবে অন্যের কিছু সহযোগিতা করা সম্ভব হলে শোকর করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার হল না, তা লিখব।

মধ্যম আওয়াযে কথা বলা : সারা দিন স্বাভাবিক আওয়াযে কথা বলব। স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে কথা বলব না। এভাবে দিন কাটানোর তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার ব্যতিক্রম হল তা লিখব।

আওয়ায করে হাসা থেকে বাঁচা : সারা দিন কোনো অবস্থায় আওয়ায করে হাসব না। তো এভাবে সবার সাথে আওয়ায করে হাসা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার আওয়ায করে হাসা হয়ে গেল, তা লিখব।

চলার সময় দৃষ্টি অবনত রাখা : সারা দিন স্বাভাবিক চলাফেরার সময় দৃষ্টি অবনত রাখব। এটা চলার আদব। এর মাধ্যমে কুদৃষ্টি থেকে বাঁচার শক্তি সৃষ্টি হবে। নিজের গাম্ভীর্য বজায় থাকবে। এভাবে সারা দিন চলাফেরার সময় দৃষ্টি অবনত রাখার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার হল না, বা কত পার্সেন্ট সময় হল না, তা লিখব।

অন্যের খেদমত করা : খানার জন্য পানি আনতে যাওয়ার সময় পাশের একজনের জগও নিয়ে গেলাম। ঘুমের সময় অন্যের বিছানাটাও তার জায়গায় নিয়ে এলাম। [তবে অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে, খুঁজতে গিয়ে সে যেন আবার পেরেশান না হয়।] খানার সময় খেদমতের নিয়তে সাথীর পানির গ্লাসটা ভরে দিলাম। একজনের দিকে গ্লাসটা এগিয়ে দিলাম। ইত্যাদি। তো সারা দিন এভাবে কত বার অন্যের খেদমত করা হল, তা লিখব।

নিজের সকল দায়িত্ব পালন করা : নিজের সকল দায়িত্ব অবশ্যই পালন করব। নতুবা এতে অন্যকে কষ্ট দেয়া হবে। এছাড়া আরো বড় ক্ষতি হল, এ ধরণের মানুষকে সবাই বোঝা মনে করতে থাকে। তাদের উপর কোনো

দায়িত্ব অর্পণ করে না। তাদের ওয়াফার ও গাম্ভীর্য এবং ওযন ও মানুষের কাছে মুল্য ধীরে ধীরে এক সময় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। সারা দিন সব ধরণের দায়িত্ব পালন করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার হল না, তা লিখব।

কিছু ইজতেমায়ী কাজ করা : কতগুলো ইজতেমায়ী কাজ করা হল, তা লিখব। যেমন: হাউজে ময়লা পড়ে আছে; আমি পরিষ্কার করে দিলাম। ইসতেনজাখানা অপরিষ্কার; আমি পরিষ্কার করে দিলাম। জামাতে ইজতেমায়ীভাবে পানি আনা হয়। তালিবুল ইলম ভাইদের খেদমতের নিয়তে আমি পানি নিয়ে আসলাম। ইত্যাদি।

কথা বলার পূর্বেই, অন্তত পরে হলেও ভাবা : কথা বলার পূর্বে ভাবব, 'কথাটা কেন বলছি। কথাটা বলা কতটুকু প্রয়োজন। কথাটা না বললে কোনো সমস্যা হবে কি না।' যদি কথা বলার আগে এই ভাবনাটা ভাবতে না পারি, তাহলে অন্তত যখন একটু অবসর হই তখন ভাবার চেষ্টা করব। রাস্তা দিয়ে হাঁটছি, গোসল করছি ইত্যাদি কাজের সময় আমি ভাবতে পারি সারা দিনের বলা কথাগুলো নিয়ে। মুহাসাবা করার জন্য একটু সময় নিয়ে বসা হলে তখনও কাজটা করা সম্ভব। এভাবে সারা দিনের বলা কথাগুলোর কত ভাগ কথা নিয়ে কথা বলার পূর্বেই, অন্তত পরে হলেও ভেবেছি, তা লিখব। যেমন: ১০%/২০%/৪০%/৮০%/১০০% ইত্যাদি।

নজরের হেফাযত করা : সারা দিন কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকব। কুদৃষ্টি এমন মারাত্মক এক ব্যাধি যা একজন তালিবুল ইলমের জীবনের সম্ভাবনাকে নষ্ট করে দিতে পারে। সারা দিন নজরের হেফাযত করার তাওফীক হলে আল্লাহর শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নফসের কোনো ধরনের খেয়ানত হলে ইসতেগফার করব এবং নিজের ইসলাহী মুরব্বীকে অবস্থা অবগত করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণ করব। করাচীর হযরত আরেফবিল্লাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.-এর 'কুদৃষ্টি ও অসৎ সম্পর্কের ধ্বংসলীলা ও প্রতিকার' নামে একটি পুস্তিকা আছে। তদ্রূপ 'আল্লাহর মহব্বত লাভের পরীক্ষিত তিনটি কিতাব' নামেও তাঁর একটি

পুস্তিকা আছে। পুস্তিকাদু'টির বাংলা অনুবাদ করেছেন ঢালকানগরের হযরতওয়ালা শাহ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন দা. বা.। পুস্তিকাদু'টির আন্তরিক অধ্যয়নে আমরা অনেক উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ না করুন, যদি নজরের কোনো খেয়ানত হয়েই যায়, তাহলে কত বার হল, তা লিখব।

রাগ দমন করা : সারা দিন সবার সাথে রাগ করা থেকে বেঁচে থাকব। এভাবে দিন কাটানোর তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার অন্যের সাথে অপ্রয়োজনে রাগ করলাম, তা লিখব। যেমন: ২/৪/৫/৭ ইত্যাদি।

অনুমতি ছাড়া অন্যের কোনো কিছু ব্যবহার থেকে বাঁচা : সারা দিন কারো ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কোনো জিনিস অনুমতি ছাড়া ধরব না। এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার হল না, তা লিখব।

গীবত থেকে বাঁচা : সারা দিন কারো গীবত করব না। খুব চিন্তা করব, আমার অজান্তেই আমার দ্বারা গীবত হয়ে গেল না তো! আমি যদি আমার ভুল ধরতেই না পারি, তাহলে সংশোধন হওয়ার কোনো সুযোগই হবে না। কারণ রোগ চিহ্নিত করা না গেলে চিকিৎসা সম্ভব নয়। এভাবে দিন কাটানোর তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার কাজটা হল তা লিখব। আর অবশ্যই যার গীবত করা হয়েছে তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেব। মাফ চাওয়ার একটা সহজ পদ্ধতি হলো, এভাবে বলা যে, আপনার ব্যাপারে আমার বলা- শোনা মাফ করে দিন। কথাটা শায়খুল ইসলাম মুফতী তাকী ওসমানী দা. বা. ইসলাহী মাজালিসে লিখেছেন।

অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচা : সারা দিন কোনো কথা বা কাজ দ্বারা কাউকে কোনো রকম কষ্ট দেব না। খুব ভাবব, আমার দ্বারা কেউ সামান্য কোনো কষ্ট পেল কি না। আমি আমার দায়িত্ব [ঝাড়ু দেয়া, পানি আনা, খানা আনা ইত্যাদি] পালন করলাম না, এতে অন্যদের কষ্ট হল। সময়মত উপস্থিত হলাম না, এতে অন্যের কষ্ট হল। চলতে গিয়ে অসতর্কতায় একজনের সাথে পা লেগে গেল, এতে তার কষ্ট হল। এরূপে কত ভাবে যে

আমরা অন্যদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকি, তা অনেক সময় আমরা অনুভবই করতে পারি না।

অনেক সময় আমরা ছোটদেরকে কষ্ট দেই। কষ্ট পেয়েও ছোট হওয়ার কারণে তারা তা প্রকাশ করতে পারে না। কষ্ট পাওয়ার পরও হয়ত তাদের মুখে হাসি থাকবে। কিন্তু কাজটা আমার ব্যক্তিত্বের জন্য অনেক বড় দুর্বলতা। আমি যদি 'মানুষ' হতে চাই, আমাকে এসব থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এ বিষয়ে সতর্কতা সৃষ্টি হওয়ার জন্য আমরা হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী রহ.-এর জীবনী এবং আদাবুল মুআশারা সংশ্লিষ্ট বইগুলো পড়ব। সারাদিন অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার কষ্ট দেয়া হল, তা লিখব। আর অবশ্যই যাকে কষ্ট দিয়েছি তার কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেব।

মিথ্যা থেকে বাঁচা : কখনও মিথ্যা কথা বলব না। ছোটখাট বিষয়েও আমরা অনেক সময় মিথ্যা বলে থাকি। অথচ ভাবিই না যে, এটা মিথ্যা। নিজেকে উল্টো প্রবোধ দিতে থাকি, 'না, এটা তো মিথ্যা নয়। একটু এদিক সেদিক হয়েছে আর কি। আর এটা হতেই পারে। এটা তেমন কিছু নয়।' সারা দিন মিথ্যা বলা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার মিথ্যা বলা হল, তা লিখব।

কুচিন্তা ও কুধারণা থেকে বাঁচা : সারা দিন ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কুচিন্তা করব না। যদি মনে তেমন কিছু এসে যায়, তাহলে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে যাব। কুচিন্তায় লিপ্ত হওয়া এমন এক ব্যাধি যা ঘুণের মত মানুষের পাকদামানি ও চারিত্রিক পবিত্রতাকে নষ্ট করে দেয়। তা নিজের অজান্তে বহু সময় নষ্ট হওয়ারও কারণ হয়। তা পড়ালেখা, আমল-আখলাক সবকিছুর উপর সীমাহীন মন্দ প্রভাব ফেলে। আমি যদি -আল্লাহর পানাহ- এমন ব্যাধিতে আক্রান্ত হই, তাহলে অবশ্যই দ্রুত আমার ইসলাহী মুরব্বীকে জানিয়ে এর চিকিৎসা করে নেব।

কারো প্রতি কুধারণা করব না। কাউকে কোনো অন্যায় কাজ করতে দেখলেও কিংবা কারো থেকে কোনো অন্যায় আচরণ পেলেও তার প্রতি

কুধারণা করব না। ভাবব; তার এই কাজটাই হয়তো খারাপ, আমার জানার বাইরে তার অনেক ভালো কাজও তো থাকতে পারে। তাছাড়া কাজটা করার একটু পরেই হয়ত সে এমন তওবা করেছে যার কারণে তার গোনাহ মাফ হয়ে গেছে। বরং গোনাহ নেকীতে পরিণত হয়েছে। বিপরীতে আমি যদি কুধারণায় লিপ্ত থাকি, তাহলে আমার আমলনামায় যুক্ত করছি কবীরা গুনাহ। গোনাহ করে সে হয়ে গেলো নেকীর মালিক, আর কুধারণা করে আমি হলাম কবীরা গুনাহর মালিক। আল্লাহ আমাদের সবাইকে হেফাজত করুন। আমীন! সারা দিন কুচিন্তা ও কুধারণা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে মোট কত বার কুচিন্তা বা কুধারণা হল, তা লিখব।

ওয়াদা ঠিক রাখা : সবার সাথে ওয়াদা ঠিক রাখব। বলেছি, 'দশটার সময় আসব।' তাহলে সময়মতই আসব। বলেছি, 'অমুক দিন এই জিনিসটা বা টাকাটা দিয়ে দেব।' তাহলে সেদিনই দিয়ে দেব। নতুবা আমার কাজটা অন্যকে কষ্ট দেবে। আমি হব ওয়াদা ভঙ্গ করার মুনাফেকী স্বভাবের শিকার। এছাড়া আরো বড় ক্ষতি হলো, যারা কথা ঠিক রাখে না, তাদের ওয়াকার ও গাম্ভীর্য এবং ওযন ও মানুষের কাছে মূল্য ধীরে ধীরে কমতে কমতে এক সময় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। তো সারা দিন ওয়াদা ভঙ্গ করা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার হল না, তা লিখব।

আমানত রক্ষা করা : সারা দিন কারো কোনো আমানতের খেয়ানত হল কি না ভাবব। কারো গোপন কথা প্রকাশ করে দিলাম, এটা আমানতের খেয়ানত হল। মাদরাসার টেবিল-চেয়ারসহ যত উপকরণ আছে, সবই আমার নিকট আমানত। কারো থেকে কোনো কিতাব পড়তে আনলাম, এটাও আমানত। এভাবে যত আমানত আমাদের হাতে আছে, সব আমানতের যথাযোগ্য ব্যবহার ও সংরক্ষণ করা আমাদের দায়িত্ব। যদি এক্ষেত্রে কোনো খেয়ানত না হয়ে থাকে, তাহলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার খেয়ানত হল, তা লিখব।

মুআশারা ও আখলাক - ২

আমল ও আখলাকের উন্নতির জন্য দোয়া : প্রতিদিন অন্তত একবার মনের গভীর থেকে আমল ও আখলাকের উন্নতির জন্য দোয়া করব। দোয়া করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। সারা দিন দোয়া করা না হলে মুহাসাবার সময় অন্তত করে নেব। তা-ও না করা হলে ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

সারা দিনের ভুলগুলো বের করা : সব সময় নিজের কাজকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করব এবং নিজের ভুল বের করার চেষ্টা করব। কারো সাথে কথা বলার সময় অপ্রয়োজনে হাত পা নাড়ছিলাম, প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রুত হাঁটছিলাম, কিংবা একজন তালিবুল ইলমের মর্যাদা পরিপন্থি কোনো কাজ আমার দ্বারা প্রকাশ পেয়েছিল, তা নিয়ে ভাবব। এছাড়া আরো কত ভুল যে আমরা করি, নিজেরাও তা অনুভব করতে পারি না। সচেতনতার সাথে এসব বিষয় লক্ষ করার চেষ্টা করব। এমন কতগুলো ভুল ধরতে পারলাম তা লিখব। নতুবা (.)চিহ্ন দেব।

নিজের ভুলগুলো ভিন্ন খাতায় নোট করে রাখব। যত বেশি ভুল ধরতে পারব, ততই এ বিষয়ে আমার উন্নতি হচ্ছে বলে বোঝা যাবে। আর যখনই সময় পাই এগুলো দেখব। যেসব ভুল সংশোধন করার তাওফীক হয়েছে সেগুলোর জন্য শোকর করব। নতুন করে ভুলমুক্ত জীবন গড়ার সংকল্প করব।

অন্যের গুণ বের করা : অন্য ভাইদের গুণের প্রতি লক্ষ করব। সারা দিন লক্ষ করা না হলে অন্তত মুহাসাবার সময় আমার উসতাদ বা সাথীদের কোন গুণ খুঁজে বের করব। এভাবে সারা দিনে অন্যের মোট কতগুলো গুণ বের করা হল, সেই সংখ্যাটা লিখব। যেমনঃ ৫/১০ ইত্যাদি। আর অন্যের গুণগুলো লিখে রাখার চেষ্টা করব। মাঝে মাঝে তালিকাটি দেখব। এতে আমার মাঝে সেই গুণগুলো আসতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

অহঙ্কার প্রকাশক আচরণ ও উচ্চারণ থেকে বাঁচা : সারা দিন মাঝে মাঝে ভাবব, আমার কোনো আচরণ বা উচ্চারণে তাকাব্বুর ও অহঙ্কার প্রকাশ পেল কি না। কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, চোখ রাঙিয়ে বা ঘাড় বাঁকিয়ে কথা বলা ইত্যাদি অহঙ্কার প্রকাশমূলক আচরণ ও উচ্চারণ থেকে বেঁচে থাকা চাই। তাকাব্বুর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর রচিত 'উম্মুল আমরায' কিতাবটি আমরা অধ্যয়ন করতে

পারি। 'সর্বরোগের মূল' নামে কিতাবটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবু ছাবের আব্দুল্লাহ ছাহেব দা. বা.। এছাড়াও শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দা. বা.-এর 'ইসলাহী মাজালিসে'ও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। তো চিন্তা-ভাবনার পর যদি এমন কোনো আচরণ বা উচ্চারণ প্রকাশ পাওয়ার কথা মনে না হয়, তাহলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার অহঙ্কার প্রকাশক আচরণ বা উচ্চারণ প্রকাশ পেয়েছে, তা লিখব।

শরীর ও ব্যবহার্য জিনিস পরিষ্কার রাখা : শরীর, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি ব্যবহার্য সব কিছু পরিষ্কার রাখব। অর্থাৎ এগুলোর কোনো কিছু অপরিষ্কার হয়ে গেলে তা দ্রুত পরিষ্কার করে নেব। আর সব পরিষ্কার থাকলে তো ভালো। এ ব্যাপারে শায়খুল ইসলাম মুফতী মুহম্মদ তাকী ওসমানী দা. বা.-এর আলোচনার সূত্র ধরে উসতাদে মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা.-এর একটি আলোচনা আছে 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইটিতে।[১০] আলোচনাটি আমাদের সকলের পড়া উচিত। সেখানে হুজুর যা লিখেছেন সে আলোকে নিজের সব কিছুর ব্যাপারে সচেতন হব। সুতরাং পরিষ্কারযোগ্য কতগুলো জিনিস আমি পরিষ্কার রাখিনি তা লিখব। আর সব পরিষ্কার রাখার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব।

ব্যবহার্য সব কিছু পরিপাটি রাখা : কাপড়-চোপড়, কিতাব-খাতা ইত্যাদি ব্যবহার্য সব কিছু পরিপাটি রাখব। অর্থাৎ এগুলোর কোন কিছু অগোছালো থাকলে তা পরিপাটি করে নেব। আর সব পরিপাটি থাকলে তো ভালো। সুতরাং পরিপাটিযোগ্য কতগুলো জিনিস আমি পরিপাটি রাখিনি তা লিখব। আর সব পরিপাটি রাখার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব।

অপচয় থেকে বাঁচা : সারা দিন পানি, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ব্যবহার্য জিনিসে অপচয় থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করব। এভাবে দিন কাটানোর তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কতটি জিনিসের ক্ষেত্রে অপচয় হল তা লিখব।

আদাবে যিন্দেগীর পাবন্দি করা : প্রত্যেকটি কাজেরই কিছু আদব আছে। কারো সাথে সাক্ষাৎ করা বা কথা বলা, কারো কাছে যাওয়া- এভাবে সব কাজেরই আদব আছে। এগুলোর পাবন্দি করা চাই। আর এগুলো জানতে

---

[১০]. পৃষ্ঠা ১৩৭ - ১৪৩

আদাবুল মুয়াশারাত ও আদাবে যিন্দেগি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কিতাব পড়ব। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' কিতাবে বিভিন্ন জায়গায় হুজুর এ জাতীয় বিভিন্ন কিতাবের নাম লিখেছেন। সেগুলো সংগ্রহ করে পড়ে নেব। সুযোগমত বা মুহাসাবার সময় ভাবব, কতগুলো কাজে আদাবের পাবন্দি করেছি, আর কতগুলো কাজে পাবন্দি করা হয়নি। কতগুলো কাজে পাবন্দি করা হয় নি তা লিখব। যেমন: ৫/১০/২০ ইত্যাদি।

মানুষের সাথে সম্পর্কের নিয়ত সহীহ করা : আমার সাথে যাদের সম্পর্ক আছে, যেমন : আমার মা-বাবা, ভাই-বোন, আসাতিযায়ে কেরাম, আত্মীয়-স্বজন এবং যেসব সাথীদের সাথে ওঠা-বসা বেশি হয়ে থাকে, তাদের কয়েকজনের কথা স্মরণ করব। তারপর ভাবব, তার সাথে আমার সম্পর্ক তো কেবল আল্লাহর জন্য। তার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনো কম-বেশি হচ্ছে না তো! এভাবে কিছু সময় ভাবব। এতে আমার কারো সাথে কুসম্পর্ক বা আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে সম্পর্ক থেকে বেঁচে থাকা সহজ হবে। অন্তত এ ব্যাপারে সচেতন হয়ে মুরব্বীকে জানিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করা সহজ হবে।

অন্যের অনুগ্রহ স্মরণ করা : মা-বাবা, ভাই-বোন, আসাতিযায়ে কেরাম, আত্মীয়-স্বজন ও সহপাঠীবৃন্দসহ অন্যান্য যাদের আমার ওপর অনুগ্রহ আছে, তাদের কথা স্মরণ করব। তাদের যেসব অনুগ্রহ আছে তা স্মরণ করব। তাদের জন্য দোয়া করব। এতে আমার মাঝে তাদের প্রতি ওয়াফাদারী ও কৃতজ্ঞ থাকার গুণ সৃষ্টি হবে। প্রতিদিন সকলের অনুগ্রহ স্মরণ করতে না পারলে অন্তত কয়েকজনের অনুগ্রহ স্মরণ করার চেষ্টা করব। এভাবে স্মরণ করা হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

অন্যের গুণের কথা আলোচনা : আমরা সাধারণত সাথীদের সাথে প্রতিদিন কিছু না কিছু কথা বলিই। সেসব কথার মধ্যে আমি আমার চারপাশের মানুষের মাঝে দেখা গুণগুলো নিয়ে আলোচনা করব। যেমন: আমার কোন উসতাদের মধ্যে কোনো গুণ দেখলাম। সাথীদের মধ্যে কোনো গুণ দেখলাম। তার অনুপস্থিতিতে সুযোগমত সেগুলো আলোচনা করব। এর বড় একটি লাভ হল, এতে তাদের প্রতি মনে শ্রদ্ধা জন্মাবে এবং গুণগুলো নিজে অর্জন করার আগ্রহ সৃষ্টি হবে। আর এক্ষেত্রে প্রতিদিন নতুন নতুন গুণ আলোচনা করতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। একই গুণ আমরা বারবার আলোচনা করতে পারি। আর অনেক বড় কিছু নয়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক গুণই কিন্তু আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। যেমন: কারো কিতাবগুলো খুব পরিপাটি, উসতাদের প্রশ্নের উত্তর কেউ সকলের আগে

দিয়ে দেয়, সময় হেফাজতে সে যথেষ্ট যত্নবান, নিয়মিত মুহাসাবা করে, ইত্যাদি সাধারণ গুণগুলোই আমরা আলোচনা করতে পারি।

উসতাদের সাথে সাক্ষাৎ : কোনো একজন উসতাদের কাছে যে কোনো কারণেই হোক যাব। পড়া জিজ্ঞাসা করার জন্য বা খেদমত করার জন্য কিংবা দেখা করার জন্য যেতে পারি। এতেও আমার অনেক কিছু অর্জন হবে। এভাবে যত জন উসতাদের সাথে সাক্ষাৎ করা হলো, সেই সংখ্যা লিখব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

পাগড়ি পরা : সাধ্যমত পাগড়ি পরে থাকার ইহতেমাম করব। আমলটা আমরা এভাবে শুরু করতে পারি যে, প্রথমে অন্তত নামাযের সময় পাগড়ি পরার ইহতেমাম করব। নামাযের সাথে সাথেই পাগড়ি খুলে ফেলব না। বরং স্বাভাবিকভাবে যতক্ষণ পরে থাকতে পারি ততক্ষণ পরেই থাকব। এভাবে অন্তত নামাযের সময় পাগড়ি পরার ইহতেমাম করা হলে টিক চিহ্ন দেব। পাঁচ ওয়াক্ত পূর্ণ না হলে হিসাবমত ৩/৫ ইত্যাদি লিখব। পাঁচ ওয়াক্ত পরতে যদি কষ্ট হয় তাহলে দিনে অন্তত ১/২ বার করে পরার নিয়ত করেই শুরু করতে পারি। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

ভুল হলে মাফ চাওয়া : কারো সাথে কোনো ভুল আচরণ বা উচ্চারণ হয়ে গেলে মাফ চেয়ে নেব। যেমন: কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেললাম, কারো কোনো ধরণের হক নষ্ট করে ফেললাম কিংবা কারো গীবত করলাম ইত্যাদি। এমন পরিস্থিতি না এলে কিংবা যাদের হক নষ্ট করা হয়েছে তাদের কাছে মাফ চাওয়া হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা কত জনের কাছে ভুল হওয়া সত্ত্বেও মাফ চাওয়া হয়নি তা লিখব। তাদের কাছে পরদিনই মাফ চেয়ে নেব।

ঘুমানোর আগেই সবাইকে মাফ করে দেয়া : একটু ভাবব, সারা দিনে কারো প্রতি আমার মনে কোনো ধরণের কষ্ট জন্মে আছে কি না। কারো প্রতি মনে কষ্ট থাকলে আল্লাহর কাছে নিজে মাফ পাবার আশায় তাকে মাফ করে দেব। আগে না করা হলে অন্তত মুহাসাবা করার সময় কাজটা করে নেব। আমল পূর্ণ করার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

চুপ থাকার অনুশীলন করা : প্রতিদিন একটা সময় চাই তা ১৫ মিনিটই হোক, কোনো ধরণের কথা বলব না। যত প্রয়োজনই থাকুক আমি এ

সময়ের ভেতর কথা বলব না। খুব প্রয়োজন হলে ইশারায় বা লিখে জানাব। এতে আমার মাঝে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি সৃষ্টি হবে। এর আরো একটি উপকার আছে। সেটি হল, অনর্থক কথাবার্তা থেকে নিজেকে বাঁচানো সহজ হবে। কথার শুরুতে ও শেষে মনে ভাবনা আসতে থাকবে যে, কথাটা বলা উচিত হল কি না। কথাটা না বললেও চলত কি না।

অনুচিত ঘুম থেকে বাঁচা : যখন ঘুমানো উচিত নয় তখন ঘুমানোটাই অনুচিত ঘুমের শামিল। দরসে বা কাজের সময় ঘুম আসলে কত বার এল তা হিসাব করব। সারা দিন অনুচিত ঘুম থেকে বাঁচার তাওফীক হলে শোকর আদায় করে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতেগফার করে কত বার বা কতক্ষণ অসময়ে অনুচিত ঘুম এল তা লিখব। আমরা অনেক সময় চেষ্টা করেও ঘুম থেকে বাঁচতে পারি না। অথবা বলতে পারি, কীভাবে চেষ্টা করতে হবে তা জানি না। 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের ১৮৫ নং পৃষ্ঠায় অনুচিত ঘুম থেকে বাঁচার কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি উল্লেখ করা হয়েছে। পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করলে সকলেই উপকৃত হব ইনশাআল্লাহ।

মনোযোগের সাথে মুহাসাবার বিষয়গুলো দেখা : মুহাসাবার গুণগুলো উল্লেখিত ছোট বইটি থেকে সারা দিন সবগুলো বিষয় অবশ্যই দেখব। একটু ভাবব, কাজটি হয়েছে কি না। কাজটি হচ্ছে কি না। এভাবে ফিকিরের সাথে একবার অবশ্যই দেখার চেষ্টা করব। বেশি দেখার সুযোগ হলে আরো ভালো। সারা দিন কত বার দেখা হল তা লিখব।

গতকালের চেয়ে কতগুলো আমলে উন্নতি হল : পুরো মুআশারা ও আখলাক - ১ ও মুআশারা ও আখলাক - ২ এর আমলগুলো নিয়ে ভাবব। কতগুলো আমলে গতকালের চেয়ে উন্নতি হল তা হিসাব করব। তারপর সংখ্যাটা লিখব। যেমনঃ ২/৫/৮/১০/২০/৩০ ইত্যাদি। আর উন্নতি না হয়ে থাকলে ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

গতকালের চেয়ে কতগুলো আমলে অবনতি হল : পুরো মুআশারা ও আখলাক - ১ ও মুআশারা ও আখলাক - ২ এর আমলগুলো নিয়ে ভাবব। কতগুলো আমলে গতকালের চেয়ে অবনতি হল তা হিসাব করব। তারপর সংখ্যাটা লিখব। যেমনঃ ২/৫/৮/১০/২০/৩০ ইত্যাদি। আর অবনতি না হয়ে থাকলে শোকর আদায় করে (.) চিহ্ন দেব।

লেখাপড়া - ১

তাফাক্কুহ ফিদ্দীনের জন্য দোয়া : তাফাক্কুহ ফিদ্দীন বা দ্বীনের সঠিক বুঝই তো আমাদের ইলম শেখার সবচেয়ে বড় মাকসাদ। আর এটি অর্জন করার অন্যতম একটি মাধ্যম হল প্রতিদিন কাকুতি মিনতি করে তাফাক্কুহের জন্য দোয়া করা। দোয়া করা হলে টিক চিহ্ন দেব। কিছু সময় নিয়ে মুহাসাবা করতে বসলে তখনও দোয়া করে নিতে পারি। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

মুতালাআ করে দরসে বসা : দরসি সব কিতাব মুতালাআ করে দরসে বসব। অন্তত এতটুকু কাজ করব যে, সামনের দরসের কোন্ অংশ বুঝেছি আর কোন্ অংশ বুঝিনি তা পৃথক করার চেষ্টা করব। তালিবুল ইলমদের জন্য ফুআদ ছাহেব হুজুর দা.বা. এর অত্যন্ত উপকারী বই 'লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি'তে 'দরস পূর্ববর্তী স্তর' শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। সবগুলো কিতাব এভাবে মুতালাআ করা হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা কতগুলো কিতাবের মুতালাআ করা হল তা লিখব। আর একটি কিতাবেরও মুতালাআ না হলে (.) চিহ্ন দেব।

১টি কিতাব সাধ্যমত হল্ করে দরসে বসা : সবগুলো কিতাবের মধ্য থেকে অন্তত একটি কিতাব হল্ করার নিয়তে ভালোভাবে মুতালাআ করব। পরে আমার বুঝকে উসতাদের বুঝের সাথে মিলিয়ে নেব। এতে ধীরে ধীরে আমার মাঝে নিজে নিজে কিতাব বোঝার হিম্মত ও যোগ্যতা সৃষ্টি হবে। এভাবে চেষ্টা করা হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

উসতাদের দরস মনোযোগের সাথে শোনা : উসতাদের দরস পূর্ণ মনোযোগের সাথে শোনা হলে সবক প্রায় দরসেই ইয়াদ হয়ে যায়। অন্তত সবকের বেশির ভাগ অংশের হল তো দরসে হয়েই যায়। তো সারা দিনের দরসগুলোর কত পার্সেন্ট সময় মনোযোগের সাথে শোনা হলো লিখব। যেমন: ৫০%/৮০%/১০০%।

মুজাকারা / তাকরার করা : মুজাকারাযোগ্য কিতাবগুলো মুজাকারা করব, তাকরারযোগ্য কিতাবগুলো তাকরার করব। এভাবে কতগুলো কিতাবের মুজাকারা ও তাকরার করা হল তা লিখব। নতুবা ইসতেগফার করে (.)

চিহ্ন দেব। তালিবুল ইলমদের জন্য অত্যন্ত উপকারী বই ফুতাদ ছাহেব হুজুরের রচিত 'লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি'তে 'দরস পরবর্তী স্তর' শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে।

অন্তত ১ বার সব পড়া নিয়ে ভাবা : সারা দিন যা কিছু পড়েছি তা নিয়ে ভাবব, আমি সারা দিন কী কী পড়লাম। দরসের কোনো অংশ আমার অস্পষ্ট রয়ে গেল কি না। আমি দরস ভালোভাবে বুঝেছি কি না। কিতাব সামনে রেখে হলেও কাজটি করব। এভাবে কতগুলো কিতাবের পড়া নিয়ে অন্তত একবার করে ভাবা হল তা লিখব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

পড়া অন্তত ২ বার স্মরণ করা : সারা দিন যা কিছু পড়েছি তা নিয়ে ভাবব, আমি সারা দিন কী কী পড়লাম। গুরুত্বপূর্ণ কথাগুলো মনে আছে কি না। না থাকলে কিতাব দেখে হলেও আবার স্মরণ করে নেব। এভাবে কতগুলো কিতাবের পড়া পরে স্মরণ করা হল তা লিখব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

..... কিতাবের পড়া হল্ হয়েছে কি? এখানে একটি কিতাবের নাম লিখব। কিতাবটি যদি হল্ করা হয়ে থাকে, তাহলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা কত পার্সেন্ট হল্ হয়েছে তা লিখব। আর হল্ না হলে ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

..... কিতাবের পড়া হল্ হয়েছে কি? এখানে অন্য একটি কিতাবের নাম লিখব। কিতাবটি যদি হল্ করা হয়ে থাকে, তাহলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা কত পার্সেন্ট হল হয়েছে তা লিখব। আর হল্ না হলে ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

..... কিতাবের পড়া হল হয়েছে কি? এখানে অন্য একটি কিতাবের নাম লিখবো । তো কিতাবটি যদি হল করা হয়ে থাকে তাহলে টিক চিহ্ন দেবো। নতুবা কত পার্সেন্ট হল হয়েছে তা লিখবো। আর হল না হলে ইসতেগফার করে (.) দেবো।

..... কিতাবের পড়া হল্ হয়েছে কি? এখানে অন্য আরেকটি কিতাবের নাম লিখব। কিতাবটি যদি হল্ করা হয়ে থাকে, তাহলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা কত পার্সেন্ট হল হয়েছে তা লিখবো। আর হল্ না হলে ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

আসবাবে ইলমের আদব রক্ষা করা : উসতাদ, কিতাব, কাগজ, কলম, কালি ইত্যাদি জিনিসের আদব রক্ষা করা ইলমী বরকতের জন্য খুবই জরুরী। কখনো এগুলোর আদব পরিপন্থি কোন কাজ হয়ে গেল কিনা তা নিয়ে খুব ভাবব। সারা দিনে আসবাবে ইলমের আদাবের বিপরীত কিছু না হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

সময় হেফাযতের চেষ্টা করা : সময় হেফাযতের চেষ্টা কত পার্সেন্ট করলাম তা লিখব। কতটুকু সময় নষ্ট করেছি তাও লিখতে পারি। তবে সময় হেফাযতের চেষ্টা কীভাবে করা যেতে পারে এ বিষয়টা খুব ভালোভাবে বোঝা দরকার। আরব বিশ্বের অন্যতম বিদগ্ধ আলেম শায়খ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. [১৪১৭ হি.]-এর কালজয়ী قِيْمَةُ الزَّمَنِ عِنْدَ العلماءِ নামক কিতাবটি অবশ্যই ভালো করে পড়ব। ফুআদ ছাহেব হুজুর দা.বা.-এর 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ে 'সময়ের সদ্ব্যবহার' শিরোনামে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। আলোচনাটি পড়লেও সময় হেফাযত করার পদ্ধতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন হবে ইনশাআল্লাহ। তারপর সে আলোকে সময় হেফাযতের চেষ্টা করব। এভাবে কত পার্সেন্ট চেষ্টা করলাম লিখব। যেমন: ৫০%/৮৫%/৯৫% ইত্যাদি।

সময়ের ভগ্নাংশগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা : আমাদের জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক অংশ নষ্ট হয়ে যায়। আমরা সেসব সময়কে কাজে লাগালেও অনেক কাজ করতে পারি। এ ব্যাপারে আদীব হুজুর মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ দা. বা. এর একটি আলোচনা আছে। আলোচনাটি 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইতেও ১১২ - ১১৪ পৃষ্ঠায় আছে। আমরা আলোচনাটি পড়ে নেব। এভাবে সময়ের কত পার্সেন্ট ভগ্নাংশকে কাজে লাগালাম তা লিখব। যেমন: ৪০%/৭০%/১০০%।

অমীমাংসিত সমস্যা লিখে রাখা : সারা দিন পড়ালেখাসহ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন ধরণের সমস্যার মুখোমুখি হই। এসব সমস্যা লিখে রাখা না হলে প্রয়োজনের সময় স্মরণ থাকে না। ফলে সমস্যার সমাধান করাও সম্ভব হয় না। তাই আজ সারা দিনে মুখোমুখি হওয়া কতগুলো সমস্যা আমি লিখে রাখলাম তা লিখব। যেমন: ১/৪/৮/১০ ইত্যাদি।

অমীমাংসিত বা অজানা বিষয়ে প্রশ্ন করা : সারা দিনের যে সমস্ত সমস্যা আমি লিখে রাখছি সেগুলো যারা জানেন তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নেব। আজ এমন কতগুলো বিষয় জানলাম তা লিখব। যেমন: ১/৪/৮/১০ ইত্যাদি। এ কাজটি করতে পারলে দিন দিন আমার মাঝে ইলমী ও তাহকীকি মেজায তৈরি হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ইসলাহী কিতাব মুতালাআ : যে সমস্ত কিতাব পড়লে নিজের মাঝে ইসলাহের ফিকির পয়দা হয় এবং নিজের মাঝে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, ৮/১০ মিনিট হলেও এ ধরনের কোনো কিতাব প্রতিদিন পড়ব। মুরব্বীর পরামর্শক্রমে কিতাব নির্ধারণ করব। যেমন করাচীর হযরতের দু'টি বই– 'আল্লাহর মহব্বত লাভের পরীক্ষিত তিনটি কিতাব' ও 'কুদৃষ্টি ও অসৎ সম্পর্কের ধ্বংসলীলা ও প্রতিকার'।

আকাবির ও আসলাফের জীবনী মুতালাআ : প্রতিদিন কোনো আকাবিরের জীবনী সামান্য হলেও পড়ব। মুরব্বীর পরামর্শক্রমে গ্রন্থ নির্ধারণ করব। ৮/১০ মিনিট করে হলেও কোনো জীবনীগ্রন্থ পড়ব। মুতালাআ হলে টিক চিহ্ন দেব। অন্যথায় ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

ফিকরী কিতাব মুতালাআ : যে সমস্ত কিতাব পড়লে নিজের মাঝে আকাবির-আসলাফের ফিকর আসে এবং নিজের চিন্তা-ভাবনায় গভীরতা সৃষ্টি হয়, নিজের মাঝে বুলন্দ ফিকর ও দৃঢ় হিম্মত পয়দা হয়, ৮/১০ মিনিট করে হলেও সে ধরণের কোনো কিতাব প্রতিদিন পড়ব। যেমন 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের বর্তমান সংস্করণ। মুরুব্বীর পরামর্শক্রমে কিতাব নির্ধারণ করব। মুতালাআ হলে টিক চিহ্ন দেব। অন্যথায় ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

বাংলা রোযনামচা লেখা : রোযনামচা লেখালেখি শেখার সহজতম মাধ্যম হওয়ার পাশাপাশি এর অনেক বড় একটি উপকারিতা হল, এর মাধ্যমে নিজের চিন্তা ও চেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে এবং সেগুলোর সংরক্ষণ হয়। তাই প্রতিদিন রোযনামচা লিখব। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইয়ের ২৪৯ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. যা লিখেছেন তাও পড়ে নেব এবং স্মরণ রাখব। রোযনামচা লেখা হলে টিক চিহ্ন দেব। অন্যথায় ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

লেখাপড়া - ২

আরবী রোযনামচা লেখা : বাংলার মতো আরবী ভাষায়ও নিয়মিত রোযনামচা লিখব। আজ আরবীতে রোযনামচা লেখা হয়ে থাকলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতিগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

অন্তত তিনটি বাংলা বানান শুদ্ধ করা : অন্তত তিনটি বাংলা বানান প্রতিদিন শিখব। কারণ একজন আলেমের ন্যূনতম যে যোগ্যতাগুলো থাকা উচিত শুদ্ধ বানানে লিখতে পারাটা সেগুলোর অন্যতম। যে কোনো বানানে সন্দেহ হলে অভিধান দেখার মাধ্যমেই কাজটি করতে পারি। এছাড়াও পড়ার সময় সচেতন থাকার মাধ্যমেও করতে পারি। এ বানানগুলো একটা খাতায় লিখে রাখব। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইয়ের ২৫১ নং পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. যা লিখেছেন তাও পড়ে নেব এবং স্মরণ রাখব। এভাবে বানান শেখা হলে টিক চিহ্ন দেব। নয়তো (.) চিহ্ন দেব।

শুদ্ধ বাংলায় কথা বলা : অবশ্যই শুদ্ধ বাংলায় কথা বলব। শুদ্ধ ভাষায় কথা বলা রাসূলের সুন্নত। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইয়ের ২৫১ নং পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে হুজুর যা লিখেছেন তাও পড়ে নেব এবং স্মরণ রাখব। এ বিষয়ে 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের শেষে যুক্ত আদীব হুজুরের 'অভাব কর্মক্ষেত্রের নয়, যোগ্যতার' শিরোনামের বয়ানে 'বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলার আবশ্যকতা' বিষয়ে যে আলোচনা আছে তাও পড়ে নেব। সারা দিনের কত পার্সেন্ট কথা শুদ্ধ বাংলায় বললাম তা লিখব। যেমন: ৪০%/৭০%/১০০%।

অন্তত .../... (ঘ./মি.) আরবীতে কথা বলা : প্রতিদিন আরবীতে কথা বলার জন্য কিছু সময় নির্ধারণ করব। কোনো ভাষায় কথা বলার দক্ষতা সে ভাষায় কথা বলার মাধ্যমেই অর্জন হয়। আজ আরবীতে কতক্ষণ কথা বললাম তা লিখব। যেমন: ৩০/৩৫/৪০ মিনিট।

জীবনের লক্ষ্যগুলো উচ্চারণ করা : নীরবে হালকা আওয়াযে গভীর মনোযোগের সাথে জীবনের লক্ষ্যগুলো উচ্চারণ করব। এতে এসব লক্ষ্যের আবেদনগুলো গভীরভাবে অন্তরে বসে যাবে। আমি আমার লক্ষ্যের প্রতি আরো বেশি সচেতন ও নিবেদিত হতে পারবো ইনশাআল্লাহ। লক্ষ্যগুলো এভাবে উচ্চারণ করা হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা (.) চিহ্ন লিখব।

সালাফের মূল্যবান মুখস্থ করা। অর্থাৎ আকাবির ও আসলাফের কিছু বাণী মুখস্থ করা। এ ব্যাপারে মাসিক আলকাউসারে উস্তাদে মুহতারাম মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা.-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তিতে 'ছোটদের সহীহ হাদীস সংকলন' কিতাবের শুরুতে আলোচনাটি পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। আলোচনাটি সবাই পড়ে নেব এবং সে আলোকে মূল্যবান হিফজের কাজ চালিয়ে যাব। আজ কতগুলো নম্বর বা আক্ষর মুখস্থ করলাম তা লিখব। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

বিষয়ভিত্তিক আয়াত/হাদিস হিফয করা : গায়রে হাফেজ ভাইয়েরা প্রতিদিন অন্তত ২/৩/৫ আয়াত বা ৪/৫ লাইন করে মুখস্থ করতে পারি। এভাবে প্রতিদিন কিছু কিছু আয়াত মুখস্থ করব। যে কয়টি আয়াত বা লাইন মুখস্থ করলাম মুহাসাবার খরে তা লিখে রাখব। হাদীস মুখস্থ করাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আজ কতগুলো হাদীস মুখস্থ করলাম সংখ্যাটা লিখব। তাই আজ ৪টি আয়াত ও ৮টি হাদীস হিফয করা হলে ৪ । ৮ লিখবো। নতুবা ৫ । ১০, ২ । ৫ ইত্যাদি সংখ্যা লিখব।

সাথে সাথে আরো একটি কাজ করা দরকার। তা হলো, বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদীস মুখস্থ করা। আর যা মুখস্থ আছে সেগুলোকে মস্তিষ্কে বিষয়ভিত্তিক বিন্যস্ত করা। এখানে শিরোনামে যদিও বিষয়ভিত্তিক আয়াত ও হাদীস হিফয করার কথা আছে, কিন্তু তা সম্ভব না হলে অন্তত আয়াত ও হাদীস হিফয করব। আর সেভাবেই লিখব যেভাবে উপরে লেখা হয়েছে।

অজানা কিতাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা : প্রতিদিন নতুন কোন বই বা কিতাবের ব্যাপারে ধারণা লাভ করার চেষ্টা করব। কিতাবের নাম এবং লেখকের নাম ও পরিচয় জেনে মনে রাখার চেষ্টা করব। কিতাবটিতে কী কী বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং আমার কোন্ কোন্ প্রয়োজনে কিতাবটি আমার সহায়ক হতে পারে তা নিয়ে চিন্তা করব। এটি করা হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা ইসতিগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা : প্রতিদিন দরসে এবং বাইরে যা কিছু পড়ছি, শুনছি বা জানছি সেসবের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো লিখে রাখার চেষ্টা করব। কত পার্সেন্ট করা হল তা লিখব। যেমন: ৪০%/৭০%/১০০%। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

অন্তত ..... মিনিট পেছনের হিফয স্মরণ করা : প্রতিদিন একটা সময় নির্ধারণ করে নেব। যেমন ১০/২০/৩০/৪০ মিনিট। ফাঁকা জায়গায় পরিমাণটি লিখে রাখব। পেছনের যেসব পড়া পড়েছি তখন সেগুলো কিছু কিছু করে স্মরণ করার চেষ্টা করব। এভাবে মেহনত করা হলে লক্ষ করব সব পড়া খুব ভালোভাবে স্মরণ আছে। এভাবে করা হলে টিক চিহ্ন দেব অথবা মিনিটের পরিমাণটি লিখব। নতুবা ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

অন্তত ..... মিনিট পেছনের পড়া পুনরায় পড়া : পেছনের যেসব পড়া ভালো করে মনে আছে সেসব তো প্রতিদিনের পেছনের পড়া স্মরণ করার সময় স্মরণ করব। আর যেসব পড়া পুনরায় দেখতে হবে সেগুলো পড়ার জন্য একটা সময় নির্ধারণ করে নেব। সে সময়টা ফাঁকা জায়গায় লিখব। এভাবে পড়া হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা কত মিনিট পেছনের পড়া পুনরায় পড়া হল তা লিখব। অন্যথায় ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

মনোযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করা : প্রত্যেক ছাত্রেরই পড়ালেখায় মনোযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা প্রতিদিন করা উচিত। আর একজন তালিবুল ইলম যত বেশি মনোযোগের সাথে পড়াশোনা করবে, তার তত বেশি দিন পড়া মনে থাকবে। এজন্য সারা দিনের পড়ালেখার সময় কত বার মনোযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করলাম তা লিখব। অন্যথায় (.) চিহ্ন দেব।

গতদিনের চেয়ে মেহনত বৃদ্ধির চেষ্টা করা : প্রত্যেকের উচিত বিগত দিনের তুলনায় পড়ালেখায় মেহনত বৃদ্ধির চেষ্টা করা। আর একজন তালিবুল ইলম যত বেশি মেহনত করবে, তার তত বেশি উন্নতি হবে। পৃথিবীতে মানুষ মেহনতের মাধ্যমেই সফল হয়। মেহনত ছাড়া মেধা ও যোগ্যতা নিষ্ক্রিয় হতে থাকে। সারা দিনের পড়ালেখার সময় মেহনত বৃদ্ধির চেষ্টা করা হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

নেযামুল আওকাতের পাবন্দি : নেযামুল আওকাত বা রুটিনের পাবন্দি করা জীবনে উন্নতির জন্য খুবই জরুরী। এর মাধ্যমে সীমিত সময়ে অনেক বেশি কাজ করা যায়। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইয়ে ২৪৭ - ২৪৮ নং পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে হুজুর যা লিখেছেন, তাও পড়ে নেব এবং স্মরণ রাখব। ফুআদ ছাহেব হুজুর দা.বা-এর 'লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি' বইয়ে 'লেখাপড়ার পরিকল্পনা' শিরোনামের অধীনে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা

আছে। আজ নেযামুল আওকাতের পাবন্দি কত পার্সেন্ট হল তা লিখব। যেমন: ৫০%/৮৫%/৯৫% ইত্যাদি।

সাধারণ জ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন : ইলমী বিষয়াদি ছাড়াও অন্যান্য অনেক বিষয়ে একজন তালিবুল ইলমের মুতালাআ থাকা দরকার। এজন্য মুরব্বীর পরামর্শক্রমে কিছু কিতাব নির্ধারণ করব। ৮/১০ মিনিট হলেও প্রতিদিন এ ধরনের কিতাব অধ্যয়ন করব। অধ্যয়ন করা হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

ওয়াসী' ও মু'তাদিল ফিকরের জন্য দোয়া করা : অর্থাৎ ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাপক চিন্তা-ভাবনার জন্য দোয়া করব। এর বাস্তবতা বোঝা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাপক চিন্তা-ভাবনার অধিকারী ব্যক্তির 'সমঝদার' সাহচর্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ ব্যাপক চিন্তা-ভাবনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থাদির গভীর অধ্যয়নের উপর নির্ভরশীল। একজন তালিবুল ইলমের জন্য এটা অপরিহার্য। এর জন্য সবসময় দোয়া করা দরকার। আজ এভাবে দোয়া করে থাকলে টিক চিহ্ন দেব। অন্তত মুহাসাবার সময় দোয়া করে নেব। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

গতকালের চেয়ে কতগুলো বিষয়ে উন্নতি হল : পুরো পড়ালেখা-১ ও পড়ালেখা-২ এর আমলগুলো নিয়ে ভাবব। কতগুলো আমলে গতকালের চেয়ে উন্নতি হল তা হিসাব করব। তারপর সে সংখ্যাটা লিখব। যেমন: ২/৫/৮/১০/২০/৩০ ইত্যাদি। আর উন্নতি না হয়ে থাকলে ইসতেগফার করে (.) চিহ্ন দেব।

গতকালের চেয়ে কতগুলো বিষয়ে অবনতি হল : পুরো পড়ালেখা-১ ও পড়ালেখা-২ এর আমলগুলো নিয়ে ভাবব। কতগুলো আমলে গতকালের চেয়ে অবনতি হল তা হিসাব করব। তারপর সে সংখ্যাটা লিখব। যেমন: ২/৫/৮/১০/২০/৩০ ইত্যাদি। আর অবনতি না হয়ে থাকলে শোকর আদায় করে (.) চিহ্ন দেব।

ফিকর ও স্বাস্থ্য

অন্তত .... বার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবা : প্রতিদিন আমি ভাবব, আমি আমার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি নিবেদিত আছি তো! জীবনের লক্ষ্য ভুলে আমি অলসতায় ডুবে পড়ি নি তো! সারা দিন যতবার ভাবা সম্ভব হবে বলে মনে হয়, তত সংখ্যাটা ফাঁকা ঘরে লিখে রাখব। যখনই সময় পাই নিজ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবব। এতে আমার মাঝে উদ্যম ও উদ্দীপনা অব্যাহত থাকবে ইনশাআল্লাহ।

নিজের কাজকে সালাফের কাজের সাথে মেলানো : যে কোনো কাজের সময় ভাবব, আমার জানা আকাবির ও আসলাফের কে এই কাজটি কীভাবে করেছেন। মুতালাআর সময় আকাবিরের কয়েকজনের মুতালাআর কথা ভাবব। কারো সাথে কথা বলছি, কোথাও ইলমী সফরে যাচ্ছি ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে আকাবির ও আসলাফের নমুনাগুলো স্মরণ করার চেষ্টা করব।

ঘুম থেকে উঠেই নিয়তের নবায়ন করা : ঘুম থেকে উঠেই আমরা নিয়তের নবায়ন করব। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইয়ের ১৫৯ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দা.বা. লিখেছেন– 'তিনি [হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ নো'মানী রহ.] এ বিষয়ে এ জন্য তাকীদ করতেন যে, এর মাধ্যমে ইখলাসের মুহাসাবা হয় এবং নতুন উদ্যম সৃষ্টি হয়, যা ইলমের জন্য নিজেকে বিলীন করার প্রেরণা সৃষ্টি করে। এর তৃতীয় সুফল এই যে, প্রতিদিন নতুন করে নিয়ত করা দ্বারা এ কথা হৃদয়ে বদ্ধমূল হতে থাকে যে, এ সকল মেহনত-মুজাহাদা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য। এই মানসিকতা গড়ে ওঠার পর তালিবে ইলমের মনে সুন্দর চরিত্র, উন্নত চিন্তা এবং বিশুদ্ধ রুচি অর্জন করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়।'

পড়াশোনা ও জানা থেকে কল্যাণকর কিছু করার ফিকির : আজ সারা দিনের পড়াশোনা ও জানা থেকে আমার মনে কোনো সুন্দর ও পবিত্র চিন্তা এল, আমি এটিকে সংরক্ষণ করব। কারণ এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হাদিয়া। আমি যদি এটিকে ভালোভাবে কদর করি, তাহলে আল্লাহ আরো পাঠাতে থাকবেন। যেমনঃ আমার মনে হলো, খৃস্টান মিশনারিদের অপতৎপরতায় যারা খৃস্টান হয়ে যাচ্ছে আমি তাদেরকে দাওয়াত দেব।

কিংবা আমার পাশের বাড়ির হিন্দু ভাইটিকে দাওয়াত দেব। অথবা বড়দের ইজাযত হলে আমি দাওয়া বিষয়ে একটি কিতাব লিখব। বা আমার এলাকায় আমি একটি নূরানী মকতব বা দ্বীনী স্কুল প্রতিষ্ঠা করব ইত্যাদি। মোটকথা মনে আসা যে কোনো সুন্দর কল্পনা ও পরিকল্পনা আমি সংরক্ষণ করব। তবে সিদ্ধান্ত তো অবশ্যই নিজ মুরব্বী এবং এ বিষয়ের বড়দের সাথে পরামর্শ করার পর নেব। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়ে' বইয়ে ২৪৯ পৃষ্ঠায় রোযনামচায় কী লিখব তা আলোচনা করতে গিয়ে এ ব্যাপারে মাওলানা আব্দুল মালেক ছাহেব দা. বা. লিখেছেন, 'কোনো নেক আমলের নিয়ত করেছেন বা ভবিষ্যতের জন্য কোনো করণীয় বিষয় চিন্তায় এসেছে, সবই লিপিবদ্ধ করতে পারেন।' কথাটি খুব ভালোভাবে স্মরণ রাখার চেষ্টা করব। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু কথা হুজুর বলেছেন, মাসিক আলকাউসারের মে '১৪ সংখ্যার শিক্ষার্থীদের পাতায়– 'আসাতিযায়ে কেরামের ফিকির থেকে ভিন্ন ফিকির পোষণ করলে সেই তালিবুল ইলমের দ্বারা কোনো কাজ আশা করা যায় না। আসাতিযায়ে কেরামের সাথে "ফিকরী হাম আহেঙ্গী" বা চিন্তার ঐক্য তালিবুল ইলমের জন্য খুবই জরুরি। তোমার ভালো কোনো নিজস্ব ফিকির থাকলে সেটা হেফাযত করে রাখো। এখন উসতাদের ফিকিরটাই গ্রহণ করো। এরপর তোমার কাছে অনেক ফিকির জমা হলে একসময় সবচে' ভালো এবং সবচে' উপকারী ফিকিরকে তারজীহ দিও। কিন্তু এখন ইসতিফাদার জন্য তোমাকে আসাতিযায়ে কেরামের ফিকির অনুযায়ীই চলতে হবে।'

ই'তেদাল ও ইনসাফ পরিপন্থি কাজ না করা : আমি সারা দিন কারো সাথে ইনসাফ ও ভারসাম্যহীন কাজ করলাম কি না তা ভাবব।

ছোট-বড় প্রত্যেক ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণ : অন্যের আচরণ ও উচ্চারণ, চলাফেরা, মুআমালা, মুআশারা থেকে আমি শিক্ষা গ্রহণ করার চেষ্টা করব। সেগুলোকে লিখে রাখব। ছোট-বড় প্রতিটি ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। শিক্ষাগুলো লিখে রাখব। মাঝে মাঝে সেগুলো পড়ে দেখব। এভাবে সারা দিন কতগুলো শিক্ষা গ্রহণ করলাম তা লিখব। নতুবা (.) চিহ্ন দেব।

সকলের সুন্দর কাজগুলো নিয়ে ভাবা : অন্যদের সুন্দর কাজগুলো নিয়ে ভাবব। কীভাবে অমুক এই কাজটি করতে পারল। কী কী কারণে কাজটি সুন্দর হয়েছে। আমি কিতাবটি পড়েছি, অন্য একজনও পড়েছে। কিন্তু তার পড়াটা আমার তুলনায় সুন্দর হয়েছে। ভাবব, কী কী গুণের কারণে সেটি সুন্দর হয়েছে।

সারা দিনের কথা বলা ও চিন্তা-ভাবনার অনুপাত : আজ সারা দিন কতক্ষণ কথা বললাম, আর কতক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করলাম, তা ভাববো। এ ভাবাটা যেমন নিজের বিভিন্ন কাজ-কর্ম নিয়ে, তেমনি নিজের জীবনকে নিয়ে, তেমনি নিজের পড়া-শোনা নিয়ে।

প্রত্যেক বিষয়কে গভীরভাবে ভাবা : প্রত্যেক বিষয়কে গভীরভাবে ভাববো। কোনো কাজ করতে হবে। কোনো ঘটনা ঘটে গেছে। গভীরভাবে ভাববো। কোনো বিষয়ে দ্রুত মন্তব্য করবো না। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেবো না। যথেষ্ট সময় নিয়ে সব দিক গভীরভাবে ভেবে তারপর যা করার করবো। লক্ষ্য রাখবো, আমার আচরণ, উচ্চারণ বা ফিকিরে যেন সাত্‌হিয়াত ও তামৃশিয়ার ছাপ (অর্থাৎ দুর্বল ও ভাসাভাসা চিন্তার ছাপ) না থাকে। এ সম্পর্কে 'তালিবানে ইল্‌ম ঃ পথ ও পাথেয়' বইয়ের ২৬৬ - ২৬৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা আছে। আমরা আলোচনাটি পড়ে নেবো।

প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর চিন্তা-ভাবনা করে দেয়া : সাধারণ থেকে সাধারণ কোনো বিষয়ে কেউ আমাকে প্রশ্ন করলে আমি চিন্তা-ভাবনা করে তবেই উত্তর দেবো। এতে আমার উত্তর বাস্তবোচিত হবে বলে আশা করা যায়।

প্রত্যেক বিষয়কে ইতিবাচক দৃষ্টিতে ভাবা : আমি প্রত্যেক বিষয়ে ইতিবাচক মানসিকতার হওয়ার চেষ্টা করবো। যে কোনো বিষয়ের নেতিবাচক দিকগুলো দেখার পাশাপাশি ইতিবাচক দিকগুলোও দেখবো। কেউ কোনো কাজ করেছে। আমি প্রথমেই সেটার ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা করবো না এবং ভাববো না যে, সে হয়ত অসৎ নিয়তে কাজটি করেছে। বরং ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করবো। তবে এর দ্বারা আমি অন্যের প্রতারণার শিকার হবো এমনটাও কাম্য নয়। তাই যারা আমার আস্থার পাত্র তাদের প্রতি থাকবে সুধারণা, সাথে সতর্কতা। আর যাদের প্রতি এখনো আস্থা সৃষ্টি হয়নি -পরিচয়হীনতা বা অন্য কোনো কারণে- তাদের প্রতি থাকবে প্রথমে সতর্কতা, সাথে সুধারণা।

প্রয়োজন পরিমাণ হাঁটা : 'সফলতার রাজপথ' বইটির বর্তমান সমগ্রের 'সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা' শিরোনামের প্রবন্ধে 'প্রয়োজন পরিমাণ হাঁটা' সম্পর্কে আলোচনা আছে। সেখান থেকে পড়লে আমরা আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারবো।

ব্যায়াম করা : 'সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা' শিরোনামের প্রবন্ধে 'ব্যায়াম করা' সম্পর্কেও আলোচনা আছে। সেখান থেকে পড়লে আশা করি আমরা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারবো।

পানি পান করা। ফুআদ ছাহেব হুজুর দা.বা. 'সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা' শিরোনামের প্রবন্ধে এ বিষয়েও আলোচনা করেছেন। সেখান থেকে পড়লে আমরা বিষয়টি বুঝতে পারব ইনশাআল্লাহ।

বুক ভরে বাতাস ভেতরে নেয়া : উপরোল্লিখিত 'সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা' শিরোনামের প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। সেখান থেকে পড়লে আমরা বিষয়টি ভালোভাবে বুঝতে পারব।

সময়মত খাবার খাওয়া : নির্দিষ্ট সময়ে খাবার খাব। সাহরী সকাল ৮ টার মধ্যে। দুপুরের খাবার বেলা ২ টার মধ্যে। রাতের খাবার সাড়ে ৮ টার মধ্যে। এটা স্বাস্থ্যসম্মত খাবার রুটিন।

অখাদ্য ও কুখাদ্য না খাওয়া : 'সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা' শিরোনামের প্রবন্ধে এ বিষয়েও আলোচনা আছে। বিষয়টি সেখান থেকে পড়ে নেব ইনশাআল্লাহ।

অন্তত ঘুমানোর আগে ও নাস্তার পরে ব্রাশ করা : সারা দিন অন্যান্য সময় মেসওয়াক করব। আর এ দুই সময় ব্রাশ করতে পারলে ভালো হয়। ডাক্তারগণ এমনই বলেন। ফুআদ ছাহেব হুজুর দা.বা. 'কিছু দোষ ছাড়ি, আদর্শ জীবন গড়ি' শিরোনামে প্রকাশিত তাঁর বয়ানে ব্রাশ করার পদ্ধতি বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

শরীরের উপর অস্বাভাবিক চাপ প্রয়োগ না করা : উপরোল্লিখিত 'সুস্বাস্থ্যের ভিত্তি ও ব্যাখ্যা' শিরোনামের প্রবন্ধে এ বিষয়েও আলোচনা আছে। সেখান থেকে পড়লে আমরা আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারব।

সীমাহীন কঠিন মুহূর্তেও আশাবাদী থাকা : কোনো কাজের ব্যাপারে মনোবল ভাঙব না। সব পরিস্থিতিতে আমি আশাবাদী থাকব। এতে আমি উম্মাতের মাঝে কাজ করে যেতে পারব অনেক বেশি। যাদের মাধ্যমে যুগে যুগে বিপ্লব ঘটেছে তাদের মাঝে যেসব গুণ ছিল সেগুলোর অন্যতম হল, কঠিন থেকে কঠিন মুহূর্তেও তারা অটল ও অবিচল থাকতে পেরেছেন নিজ লক্ষ্যের প্রতি। ৯৯ টি নিরাশার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও তাঁরা ভর করেন ১টি আশার প্রতি আর আল্লাহর নুসরতের প্রতি। তাই সবসময় আমি আশাবাদী থাকব। ফুআদ ছাহেব হুজুর দা.বা. 'শিক্ষার্থীদের সফলতার রাজপথ' বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

বিষয় : .....

* যে পৃষ্ঠাটি ফাঁকা রাখা আছে সেটি নিজের ইচ্ছামতো কোনো বিষয় যুক্ত করে নেবার জন্য। আমি কোনো কিতাব পড়ছি। তো প্রতিদিন কতটুকু পড়ছি সে হিসাব রাখার জন্য ফাঁকা ঘরে কিতাবটির নাম লিখে রাখতে পারি। যেমনঃ 'মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হলো', 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' ইত্যাদি। আজ কত পৃষ্ঠা পড়লাম তা নিচের ঘরে লিখে রাখব। এভাবে অন্য যে কোনো আমল যার ওপর আমি আমল করতে চাচ্ছি, কিন্তু তা মুহাসাবায় নেই, তা লিখে রাখতে পারি। যেমনঃ মসজিদ সাফাই করা।

বিষয় : নেযামুল আওকাত

* নেযামুল আওকাতের পৃষ্ঠাটি হল রুটিনমত কাজ করায় অভ্যস্থ হওয়ার জন্য। প্রতিদিন আমি হিসাব নেব, সময়মত কাজগুলো করতে পারলাম কি না। এক্ষেত্রেও সারা দিনের সবগুলো কাজের হিসাব একত্রে শুরু করা জরুরী নয়। প্রথমে দু-চারটি আমল দিয়েই শুরু করতে পারি। আমাদের সাধারণত যেসমস্ত কাজ প্রয়োজন হয়, সেগুলো 'সারা দিনের আমলসমূহ' ঘরে লিখা আছে। আর 'আমলসমূহের নির্ধারিত সময়' ঘরটি ফাঁকা আছে। এখানে আমি আমার সুবিধামত সময় লিখে নেব। 'তালিবানে ইলম ঃ পথ ও পাথেয়' বইয়ে ২৪৭ - ২৪৮ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে হুজুর যা লিখেছেন তাও পড়ে নেব এবং স্মরণ রাখব। কাজটি সময়মত হলে টিক চিহ্ন দেব। নতুবা (.) চিহ্ন দেব। আর কাজটি যদি হয়ে থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ আগে পরে হয়ে গেছে, তাহলে (-) চিহ্ন বা সুবিধামত অন্য কোনো চিহ্ন দেব। দু'টি ঘর ফাঁকা রাখা আছে। আরো কোনো কাজ নেযামুল আওকাতের ভেতর আনার যোগ্য মনে হলে এগুলোতে তা লিখে নেব। [১১]

---

[১১]. আলহামদুলিল্লাহ, আজ ২৩. ৮. ১৪৩৫ হি. রবিবার দুপুর ১১ টা ৩০ মিনিটে কাজ সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ আপনি এ কাজকে কবুল করুন এবং আমার ও সবার জন্য উপকারী করুন। কেয়ামত পর্যন্ত এ কাজকে স্থায়ী করুন। একে আমার ও আব্বু-আম্মুর এবং আমার আসাতিযায়ে কেরামের নাজাতের ওসীলা বানান। আমীন। -ইলয়াছ খান।

আমি স্বপ্ন দেখি ...

আমি নিয়মিত মুহাসাবা করি। কারণ আমি স্বপ্ন দেখি ইলমে নবী, আমলে নবী, খুলুকে নবী ও ফিকরে নবীর যোগ্য ওয়ারিছ হওয়ার। তাই আমি প্রতিদিন দোয়া করি, "হে আল্লাহ, আমাকে দান করুন ইলমের অনির্বাণ তৃষ্ণা। আমার হৃদয়ে দান করুন আপনার ভালোবাসা, উম্মাহর প্রতি দরদ এবং উম্মাহর কল্যাণে সদানিবেদিত থাকার চেতনা ও প্রেরণা। আমাকে দান করুন ইলমের গভীরতা ও প্রাজ্ঞতা, দ্বীন ও শরীয়তের তাফাক্কুহ ও সঠিক বুঝ; আর ভারসাম্যপূর্ণ বিশাল ব্যাপ্ত ফিকর ও ভাবনা; সাথে সাথে দান করুন আপনার বিশেষ নেয়ামত 'সুস্থতা' ও 'কর্মব্যস্ততা'র জীবন।" দোয়ায় উচ্চারণ করা এই সবই আমার স্বপ্ন। আর আমার বেঁচে থাকাও এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যই। আমি বিশ্বাস করি, জীবনের সেই স্বপ্নের পথে অভিসারের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের মুহাসাবা হবে আমার সর্বোত্তম সহায়ক। ঘুমানোর আগে আমি প্রতিদিন অবশ্যই মুহাসাবা করবো, ইনশাআল্লাহ।

নাম		
ঠিকানা		
জামাত		
মাস	হি.	ঈ.
সাল	হি.	ঈ.
যোগাযোগ		

নিয়মিত মুহাসাবা করি, উন্নতি অব্যাহত রাখি

দৈনন্দিনের মুহাসাবা

বিষয়: ইবাদত - ১

৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	হিজরী তারিখ	৫ মাসের গড়	মাস
									ঈসায়ী তারিখ		
									বার		
									কাজের শুরুতে, মাঝে ও শেষে নিয়ত বিশুদ্ধ করা		
									কাজের নিয়তকে ব্যাপক করা		
									ধ্যানের সাথে ইসতেগফার করা		
									দুরুদ শরীফ পড়া		
									নামাযের .../... মিনিট পূর্বে মসজিদে যাওয়া		
									১ম কাতার		
									তাকবীরে উলা		
									আযানের জবাব		
									ইকামতের জবাব		
									তাহাজ্জুদ		সপ্তাহ
									ইশরাক		
									আওয়াবীন		
									অন্তত অজুর সময় মেসওয়াক করা		
									সাধ্যমত অজু অবস্থায় থাকা		
									নেয়ামত স্মরণ করে শোকর করা		
									বানার সুন্নতের পাবন্দি		
									নামাযের সুন্নতের পাবন্দি		
									ঘুমের সুন্নতের পাবন্দি		
									ইসতেনজার সুন্নতের পাবন্দি		
									..... সুন্নতের পাবন্দি		

ক্রমিক নং	মৃত্যুর কারণ	সাধারণ আমাশয়	উপসর্গের প্রকোপ হয়	ব্লাড পরীক্ষা
১				
২				
৩				
৪				
৫				
৬				
৭				
৮				
৯				
১০				
১১				
১২				
১৩				
১৪				
১৫				
১৬				
১৭				
১৮				
১৯				
২০				
২১				
২২				
২৩				
২৪				
২৫				

নিয়মিত মুহাসাবা করি, উন্নতি অব্যাহত রাখি

দৈনন্দিনের মুহাসাবা

বিষয়: ইবাদত - ২

৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	হিজরী তারিখ	এ মাসের লক্ষ্য	মাস
									ঈসায়ী তারিখ		
									বার		
									নামাযে খুশূ-খুজূ থাকা (শরীর ও মন স্থির রাখা)		
									নামাযে মন নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা		
									সূরা ইয়াসিন, ওয়াকিয়া ও মুলক পাঠ		
									কোরআন তেলাওয়াতের পরিমাণ		
									ফিকির ও তাদাব্বুরের সাথে তেলাওয়াত		
									ফিকির ও তাদাব্বুরের সাথে হাদীস পড়া		
									গুরুত্বের সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করা		
									মাগরিবের আগে দোয়া করা		
									যে কোন কাজের শুরুতে দোয়া করা		
									অন্যের জন্য দোয়া করা		
									ইহতেসাবের সাথে আমল করা		
									সবাইকে সালাম দেয়া		
									ঈসালে ছাওয়াব করা		
									তিন/ছয় তাসবীহ আদায় করা		
									ঈমানী মুযাকারা করা		
									মৃত্যুর কথা ভাবা		
									জান্নাতের নেয়ামত ও জাহান্নামের শাস্তির মোরাকাবা		
									আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা		
									গতকালের চেয়ে কতগুলো আমলে উন্নতি হলো		
									গতকালের চেয়ে কতগুলো আমলে অবনতি হলো		

১০																				
১১																				
১২																				
১৩																				
১৪																				
১৫																				
১৬																				
১৭																				
১৮																				
১৯																				
২০																				
২১																				
২২																				
২৩																				
২৪																				
২৫																				
২৬																				
২৭																				
২৮																				
২৯																				
৩০																				

সাপ্তাহিক আমল	রোযা রাখা			সালাতুত তাসবীহ পড়া	
মুরব্বীর স্বাক্ষর					

নিয়মিত মূল্যায়ন করি, উন্নতি অব্যাহত রাখি

দৈনন্দিনের মূল্যায়ন

বিষয়: মূল্যায়ন ও আখলাক - ১

মাস	৩ মাসের লক্ষ্য		১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		ইজতেমা তারিখ									
		ইসলামী তারিখ									
		বার									
		কথা কলম আচরণ, অন্তত পনের দিন									
		নজরের হেফাজত করা									
		রাগ দমন করা									
		অপ্রয়োজনীয় কথার শিরোনাম ব্যবহার থেকে বাঁচা									
		গীবত থেকে বাঁচা									
		অন্যকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচা									
		মিথ্যা থেকে বাঁচা									
		কৃত্রিমতা ও কৃপমণ্ডুকতা থেকে বাঁচা									
		গুনাহ চিহ্নিত রাখা									
সন		আমানত রক্ষা করা									
		মাশায়েখের সাথে সুন্নত ব্যবহার করা									
		হালিয়ায়ে কথা বলা									
		অন্যকে আদেশ ছোট্ট কথা বলা									
		সাধ্যমত অন্যের কষ্ট মেনে নেয়া									
		মধ্যম আওয়াজে কথা বলা									
		আওয়ায করে হাসা থেকে বাঁচা									
		চলার সময় নজর নিচু রাখা									
		অন্যের দোষত্রুটি খোঁজা									
		নিজের সাধ্যমত দান করা									
		নিয়ম ইত্তেবায়ী খাতা করা									

নিয়মিত মুহাসাবা করি, উন্নতি অব্যাহত রাখি

দৈনন্দিনের মুহাসাবা

বিষয়: মুজাশারা ও আখলাক - ২

মাস	এ মাসের লক্ষ্য	হিজরী তারিখ									
		ঈসায়ী তারিখ									
		বার									
		আমল ও আখলাকের উন্নতির জন্য দোয়া									
		নিজের ভুল বের করা									
		অন্যের গুণ বের করা									
		অহঙ্কারপ্রকাশক আচরণ ও উচ্চারণ থেকে বাঁচা									
		শরীর ও ব্যবহার্য সব কিছু পরিষ্কার রাখা									
		ব্যবহার্য সব কিছু পরিপাটি রাখা									
		অপচয় থেকে বাঁচা									
		আদাবে যিন্দেগীর পাবন্দি করা									
		মানুষের সাথে সম্পর্কের নিয়ত সহীহ করা									
সন		অন্যের ইহসান স্মরণ করা									
		অন্যের গুণের কথা আলোচনা									
		উসতাদের সাথে সাক্ষাৎ									
		পাগড়ী পরা									
		ভুল হলে মাফ চাওয়া									
		সবাইকে মাফ করে দেয়া									
		চুপ থাকার অনুশীলন করা									
		অনুচিত ঘুম থেকে বাঁচা									
		ফিকিরের সাথে মুহাসাবার বিষয়গুলো দেখা									
		গতকালের চেয়ে কতগুলো আমলে উন্নতি হলো									
		গতকালের চেয়ে কতগুলো আমলে অবনতি হলো									

১০																						
১১																						
১২																						
১৩																						
১৪																						
১৫																						
১৬																						
১৭																						
১৮																						
১৯																						
২০																						
২১																						
২২																						
২৩																						
২৪																						
২৫																						
২৬																						
২৭																						
২৮																						
২৯																						
৩০																						
সাপ্তাহিক আমল			ওয়াজা-কাতা সম্পন্ন করা										সূরা কাহফ তেলাওয়াত করা									
মুরব্বীর স্বাক্ষর																						

নিয়মিত মুহাসাবা করি, উন্নতি অব্যাহত রাখি

দৈনন্দিনের মুহাসাবা

বিষয়ঃ পড়ালেখা - ১

মাস	৩ মাসের লক্ষ্য										
		ফজরের তারিখ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	ইশার তারিখ										
	বার										
	তাহাজ্জুদ নিয়তের জন্য দোয়া										
	মুতালাআ করে দরসে বসা										
	১টি কিতাব সাধ্যমত হল করে দরসে বসার চেষ্টা করা										
	দরসগুলো মনোযোগের সাথে										
	মুতাকাররা / তাকরার করা										
	অন্তত ১ বার সারা দিনের পড়া লিখে রাখা										
	অন্তত ২ বার সারা দিনের পড়াগুলো স্মরণ করা										
	---------- কিতাবের পড়া হল হয়েছে কি										
	---------- কিতাবের পড়া হল হয়েছে কি										
	---------- কিতাবের পড়া হল হয়েছে কি										
সন	---------- কিতাবের পড়া হল হয়েছে কি										
	আসরাবে ইলমের আদব রক্ষা করা										
	সময় হেফাযতের চেষ্টা করা										
	সময়ের ক্ষুদ্র অংশগুলো কাজে লাগানোর চেষ্টা										
	অধিমাংশিত সময়গুলো লিখে রাখা										
	অধিমাংশিত বা অজানা বিষয়ে আতাকে প্রশ্ন করা										
	ইসলাহী কিতাব মুতালাআ										
	আকাবির ও আসলাফের বাণী মুতালাআ										
	ফিকহী কিতাব মুতালাআ										
	বাংলা রোমনাসাত লেখা										

নিয়মিত মুহাসাবা করি, উন্নতি অব্যাহত রাখি

দৈনন্দিনের মুহাসাবা

বিষয়: পড়ালেখা - ২

মাস	৩ মাসের লক্ষ্য	হিজরী তারিখ	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		ঈসায়ী তারিখ									
		বার									
		আরবী রোযনামচা লেখা									
		অন্তত তিনটি বানান শুদ্ধ করা									
		শুদ্ধ বাংলায় কথা বলা									
		অন্তত ....(মি./ঘ.) আরবীতে কথা বলা									
		জীবনের লক্ষ্যগুলো উচ্চারণ করা									
		সালাফের নুসুস মুখস্থ করা									
		বিষয়ভিত্তিক আয়াত মুখস্থ করা									
		বিষয়ভিত্তিক হাদীস মুখস্থ করা									
		অজানা কিতাব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা									
সন		প্রয়োজনীয় তথ্য লেখা									
		অন্তত ... মিনিট পেছনের হিফয স্মরণ করা									
		অন্তত ... মিনিট পেছনের পড়া পুনরায় পড়া									
		অন্তত আধা ঘণ্টা এক মনোযোগে পড়া									
		মনোযোগ বৃদ্ধির চেষ্টা করা									
		গতদিনের চেয়ে মেহনত বৃদ্ধির চেষ্টা করা									
		নেযামুল আওকাতের পাবন্দি									
		সাধারণ জ্ঞানের জন্য অধ্যয়ন									
		ওয়াসী ও মুতাদিল ফিকহের জন্য সোয়া করা									
		গতকালের চেয়ে কতগুলো বিষয়ে উন্নতি হলো									
		গতকালের চেয়ে কতগুলো বিষয়ে অবনতি হলো									

১০																					
১১																					
১২																					
১৩																					
১৪																					
১৫																					
১৬																					
১৭																					
১৮																					
১৯																					
২০																					
২১																					
২২																					
২৩																					
২৪																					
২৫																					
২৬																					
২৭																					
২৮																					
২৯																					
৩০																					
সাপ্তাহিক আমল			ইতিহাস পাঠ করা									কেরাকে বাতিলা সম্পর্কে মুতালাআ									
মুরব্বীর স্বাক্ষর																					

নিয়মিত মহাসাধনা করি, উন্নতি অবাধে বাধি

দৈনন্দিনের মহাসাধনা

বিষয়: ফিকর ও স্বাস্থ্য

৯	৮	৭	৬	৫	৪	৩	২	১	৯ মাসের লক্ষ্য	মাস
									ইন্তেকালী তাফাক্কুর	
									ইসলামী তাফাক্কুর	
									বাক্য	
									যতক্ষণ .... বার জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভাবা	
									নিজের কাজকে সালাফের কাজের সাথে মেলানো	
									ঘুম থেকে উঠেই নিজেকে যাচাই করা	
									পড়াশোনা ও জ্ঞান বিষয় থেকে উপকারী কিছু করার সিদ্ধান্ত	
									ইন্টারনেট ও ইলমাহ পরিপন্থি কাজ না করা	
									ছোট-বড় যে কোন ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ	
									সবার সুন্দর কাজগুলো নিয়ে ভাবা	
									সারা দিনের কথা বলা ও চিন্তা-ভাবনার অনলাইন	
									যে কোন বিষয়কে গভীরভাবে ভাবা	
সন									যে কোন প্রশ্নের উত্তর চিন্তা-ভাবনা করে দেয়া	
									সব বিষয়কে ইতিবাচক দৃষ্টিতে ভাবা	
									প্রয়োজন পরিমাণ হাঁটা	
									ব্যায়াম করা	
									পানি পান করা	
									বুক ফুলিয়ে দম নেয়া	
									সময়মত খাবার খাওয়া	
									অপচয় ও কৃপণতা না থাকা	
									অন্তত ঘুমানোর আগে ও নাস্তার পরে আল্লা স্মরা	
									শরীরের উপর অপচাপিত চাপ প্রদোম না করা	
									যাযাবরীন কঠিন মুহূর্তেও আশাবাদী থাকা	

| | | |

দৈনন্দিনের মুহাসাবা

বিষয়: .....

মাস				সন		
এ মাসের লক্ষ্য						
হিজরী তারিখ	ঈসায়ী তারিখ	বার				
১						
২						
৩						
৪						
৫						
৬						
৭						
৮						
৯						

| | | |

নিম্নলিখিত মহাজনদের কর্তৃক, উদ্ভূত অবস্থাতে রক্ষিত

দৈনন্দিনের মুহাসাবা

বিষয়ঃ নিম্নাঙ্কিত আকারে

মাস													
		বিক্রয়ী জাতির			১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
		ক্রয়কারী জাতির											
		ক্রয়কৃত দ্রব্য	আরো বিক্রয়ের জন্য ক্রয়কৃত দ্রব্য										
			বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত খরচ										
			বাকির দর										
			নগদের দর										
			ক্রয়কৃত দ্রব্য ও খরচের সমষ্টি										
			মোট লাভ / ক্ষতির পরিমাণ										
			বিক্রয়ের পক্ষ										
			ক্রয়ের পক্ষ

ক্রমিক নং	সাপ্তাহিক অবসর	সরকারি ছুটির দিন																												
১	০১	০৮	১৫	২২	২৯																									
২	০২	০৯	১৬	২৩	৩০																									
৩	০৩	১০	১৭	২৪	৩১																									
৪	০৪	১১	১৮	২৫																										
৫	০৫	১২	১৯	২৬																										
৬	০৬	১৩	২০	২৭																										
৭	০৭	১৪	২১	২৮																										

যে আমলগুলোর প্রতি আগামীকাল থেকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবো

সন:	মাস:

১	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

২	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

৩	
১	
২	
৩	

৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

৪	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

৫	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

৬	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

৭	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

৮	
১	
২	
৩	

যে আমলগুলোর প্রতি আগামীকাল থেকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবো

সন:	মাস:

৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

১১	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

৯	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

১২	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

১৪	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

১০	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

১৩	
১	
২	
৩	

১৫	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

আমলগুলোর প্রতি আগামীকাল থেকে আরো বেশি গুরুত্ব দেবো

১৬	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।	

১৯	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।	

২২	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।	

১৭	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।	

২০	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।	

২৩	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।	

১৮	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।	

২১	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।	

২৪	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।	

আমলগুলোর প্রতি আগামীকাল থেকে আরো বেশি গুরুত্ব দেবো

২৫	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

২৮	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

৩১	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

২৬	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

২৯	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

যে বিষয়গুলোর প্রতি আগামী মাসে অনেক বেশি গুরুত্ব দেবো	
১	
২	
৩	
৪	
৫	
৬	
৭	
৮	
৯	
১০	

ইনশাআল্লাহ আগামী মাস থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো। আমাকে তাওফীক দান করুন, হে আল্লাহ!

২৭	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

৩০	
১	
২	
৩	
৪	
৫	

ইনশাআল্লাহ আগামীকাল থেকে কাজগুলো আমি অনেক গুরুত্বের সাথে করবো।

মাস শেষে আমার সংকল্প

নতুন মাসের শুরুতে আমি আবার সংকল্প করছি, গত মাসের ভালোগুলো আমি ধরে রাখতে চেষ্টা করবো এবং ত্রুটিগুলো শুধরে নেবো। ইনশাআল্লাহ এ মাসে সবগুলো আমল আরো সুন্দর করে করবো।

"হে আল্লাহ, আমাকে তাওফীক দান করুন। হে আল্লাহ, আমাকে দান করুন ইলমের অনির্বাণ তৃষ্ণা। আমার হৃদয়ে দান করুন আপনার ভালোবাসা, উম্মাহর প্রতি দরদ এবং উম্মাহর কল্যাণে সদানিবেদিত থাকার চেতনা ও প্রেরণা। আমাকে দান করুন ইলমের গভীরতা ও প্রাজ্ঞতা, দ্বীন ও শরীয়তের তাফাক্কুহ ও সঠিক বুঝ; আর ভারসাম্যপূর্ণ বিশাল ব্যাপ্ত ফিকর ও ভাবনা। সাথে সাথে দান করুন আপনার বিশেষ নেয়ামত 'সুস্থতা' ও 'কর্মব্যস্ততা'র জীবন।"

মাসিক মুহাসাবা	পরিমাণ
এ মাসে মুহাসাবা কত দিন করেছি	
কতগুলো আমলের ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতি হয়েছে	
কতগুলো আমলের ক্ষেত্রে কিছুটা অবনতি হয়েছে	
কতগুলো আমল গত মাসের মতই আছে	
কতগুলো আমল কখনো কখনো কম হয়েছে	
কতগুলো আমল কখনো কখনো বেশি হয়েছে	
সাপ্তাহিক আমলগুলো কতটুকু হয়েছে	

সারা বছরের তেলাওয়াতের মুহাসাবা,
বিরতির সময়ের বিশেষ আমল ও পড়াশোনার মুহাসাবা,
এবং হিজরী ক্যালেন্ডার

কিছু কথা

আল্লাহর শোকর, তিনি আমাদেরকে মুহাসাবা করার তাওফীক দিচ্ছেন। দৈনন্দিনের মুহাসাবার পাশাপাশি যখন আমরা বাড়িতে যাই তখনও আমাদের মুহাসাবা করা উচিত। সেজন্যই শেষে যুক্ত করা হয়েছে *'বিরতির সময়ের মুহাসাবা'* অংশ। সবগুলো বিষয় আমরা দেখলেই বুঝতে পারবো ইনশাআল্লাহ। যতটুকু সম্ভব হয় পূর্ণ করার চেষ্টা করবো। আর পরের পৃষ্ঠার ফাঁকা ঘরগুলোতে বিরতির সময় কী কী কিতাব পড়ছি সেগুলোর নাম লিখবো। প্রতিদিন কী পরিমাণ পড়া হলো তা লিখবো। এছাড়া আমার উসতাদ বিরতির সময় কোন কাজ দিয়ে দিলে তাও এখানে লিখে মুহাসাবা করতে পারি।

আর প্রথমেই যুক্ত করা হয়েছে তেলাওয়াতের মুহাসাবা। ১ম খতম, ২য় খতম- এভাবে ২৫ খতম পর্যন্ত দেয়া আছে। প্রতি খতমের বরাবর নিচে ১ম ও ২য় পৃষ্ঠা মিলিয়ে বাম দিকে ১-৩০ পর্যন্ত লেখা আছে। এ ছকের উদ্দেশ্য হলো, আমরা যেন সারা বছরে কত খতম তেলাওয়াত করছি তা স্মরণ রাখতে পারি। আর কোনো খতম আমাদের অসম্পূর্ণ রয়ে গেলো কি না সে ব্যাপারেও যেন সজাগ থাকতে পারি।

তাই প্রতিদিন যে পারাগুলো তেলাওয়াত করলাম ১-৩০ পর্যন্ত লেখা ঘরের ডানের ঘরে টিক চিহ্ন দেবো। এটা যদি প্রথম খতমের হয় তাহলে প্রথম খতমের বরাবর ঘরে দেবো, যদি ২য় বা ৩য় খতম হয় তাহলে সে বরাবর নিচের ঘরে টিক চিহ্ন দেবো। সুতরাং আজ যদি আমার এ বছরের ৩য় খতমের ৭, ৮ ও ৯ নং পারা তেলাওয়াত করি তাহলে ৩য় খতমের বরাবর নিচের ঘরের ৭, ৮ ও ৯ লেখা ঘরে টিক চিহ্ন দেবো। এভাবে সারা বছরে কতগুলো খতম হলো তা সহজেই হিসাব করতে পারবো। আর কোন খতম অপূর্ণ রয়ে গেলো কি না তাও বুঝতে পারবো।

সবশেষে আছে হিজরী ক্যালেন্ডার। আমরা যেন সহজে হিজরী মাসের হিসাব রাখতে পারি এজন্য এটি সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ। হিজরী মাসের প্রথম দিনেই আমি চাঁদ দেখে কিংবা জেনে ১ম তারিখের ব্যাপারে নিশ্চিত হবো। তারপর এ মাসের তারিখগুলো লিখে ফেলবো। ২৯ পর্যন্ত লিখবো। মাস শেষে উনত্রিশ তারিখে যদি জানি যে, চাঁদ না দেখা যাওয়ায় আগামীকাল ৩০ তারিখ তাহলে আগের মাসের ঘরে ৩০ লিখবো। আর পরদিন থেকে নতুন মাস হিসাব করবো। আর চাঁদ দেখা গেলে পরবর্তী মাসের ১ তারিখ থেকে লিখে নেবো। আর নিচে ছোট করে ঈসায়ী ও বাংলা সনও লিখে নেবো। ঈসায়ী সন এক রঙের কালি দিয়ে, আর বাংলা সন অন্য রঙের কালি দিয়ে লিখলে আমরা সহজেই পৃথক করতে পারবো। উপরে আরবী মাসের দুই দিকে যে ফাঁকা জায়গা আছে তাতেও ঈসায়ী ও বাংলা সনের নাম লিখে নেবো।

আমরা সবাই হিজরী সন ব্যবহারের প্রতি যত্নবান হবো এটাই আমাদের একান্ত কামনা। আল্লাহ আমাদের সকল মেহনতকে কেবলই তার জন্য কবুল করুন। অল্প হলেও ইখলাসের সাথে উপকারী কাজ করার তাওফীক দিন। আমীন।

নিয়মিত মুহাসাবা করি, উন্নতি অব্যাহত রাখি

তেলাওয়াতের মুহাসাবা

সাল			হিজরী														ঈসায়ী										
পারা নং	১ম খতম	২য় খতম	৩য় খতম	৪র্থ খতম	৫ম খতম	৬ষ্ঠ খতম	৭ম খতম	৮ম খতম	৯ম খতম	১০ম খতম	১১তম খতম	১২তম খতম	১৩তম খতম	১৪তম খতম	১৫তম খতম	১৬তম খতম	১৭তম খতম	১৮তম খতম	১৯তম খতম	২০তম খতম	২১তম খতম	২২তম খতম	২৩তম খতম	২৪তম খতম	২৫তম খতম	২৬তম খতম	২৭তম খতম
১																											
২																											
৩																											
৪																											
৫																											
৬																											
৭																											
৮																											
৯																											
১০																											
১১																											
১২																											

| ১৩ | | |

মাদরাসা বিরতির সময়ের মুহাসাবা

বিষয়: বিবিধ (বিরতির সময়: .....)

মাস																														
ঈসায়ী তারিখ													সন																	
হিজরী তারিখ		বার																												
		মা-বাবার খেদমত করা																												
		পরিবারের সবার সাথে হাসি-খুশি থাকা																												
		ঘরের কাজ করা (ঝাড়ু, রান্না ইত্যাদি)																												
		ঘরে তালিম করা																												
		ঘরে জরুরী মাসায়েলের আলোচনা করা																												
		আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ/ফোনে কথা																												
		ওলামায়ে কেরাম/ইমাম/মুয়াজ্জিন সাহেবদের যিয়ারত																												
		তালিবে ইলম ভাইদের সাথে সালাম ও মুসাফাহা																												
		ছাত্র/যুবক ও অন্য ভাইদের সাথে সালাম-মুসাফাহা																												
		এলাকায় দাওয়াত দেয়া (পরিমাণ)																												
		মসজিদে জরুরী মাসায়েলের আলোচনা																												
		এতীম/অসহায়/বিধবাদের খোঁজ নেয়া																												
		অসুস্থদের ও বৃদ্ধ মুরব্বীদের খোঁজ নেয়া																												
		ফোনে আসাতিযায়ে কেরামের সাথে কথা																												
		পূর্বের স্কুল/মাদরাসার উসতাদদের যিয়ারত																												
		জ্বি মতের ও বিধর্মী ভাইদের যিয়ারত ও দ্বীনী কথা																												
		ছোটদের কোরআন/জরুরী মাসায়েল শিক্ষা																												
		এলাকার দ্বীনী উন্নতি ফিকির ও স্বপ্নগুলো লিখে রাখা																												
		নামাযে যাবার সময় দাওয়াত দেয়া																												
		(স্কুল/কলেজ) ছুটির দেয়া/ সালাম করা (গ্রিনিংস)																												

মাদরাসা বিরতির সময়ের মুহাসাবা

বিষয়: পড়ালেখা (বিরতির সময়: .....)

মাস												সন										
ঈসায়ী তারিখ	হিজরী তারিখ	বার																				
১																						
২																						
৩																						
৪																						
৫																						
৬																						
৭																						
৮																						
৯																						
১০																						
১১																						
১২																						
১৩																						
১৪																						
১৫																						
মুরব্বীর স্বাক্ষর																						

লেখাপড়ার আদর্শ পদ্ধতি

লেখাপড়ার প্রথম ভিত্তি হলো রুটিন। তো একজন শিক্ষার্থী কিভাবে রুটিন তৈরি করবে? স্বাভাবিক চেষ্টা ও অস্বাভাবিক চেষ্টার মধ্যকার পার্থক্য-রেখা কী?

দরসের লেখাপড়ার স্তর তিনটি–

১. দরস-পূর্ববর্তী স্তর: এটি হলো প্রস্তুতি-পর্ব।
২. দরস চলাকালীন স্তর: এটি হলো মনোযোগসহকারে শোনার পর্ব।
৩. দরস-পরবর্তী স্তর: এটি হলো আয়ত্ত করার পর্ব।

উন্মুক্ত লেখাপড়ার পর্ব পাঁচটি–

১. পৃষ্ঠা উলটানো। ২. প্রশ্ন করা। ৩. পাঠ করা।
৪. মনে রাখার চেষ্টা করা।
৫. পুনরাবৃত্তি করা।

এ বইয়ে উপরিক্ত স্তর ও পর্বগুলো সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর পরীক্ষা সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন শিরোনামে। যেমন- পরীক্ষার্থীদের জন্য আটটি উপদেশ, পরীক্ষা মজার খেলা, কীভাবে পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ করবে? পরীক্ষার হলের আচরণ-বিধি, প্রশ্নের পরিভাষা, পরীক্ষার খাতায় কীভাবে লিখবে? কীভাত্র মানসম্মত করবে? মৌখিক পরীক্ষা, পরীক্ষা সম্পর্কে শেষ কথা।

তারপর পড়াতে মন না বসার ১৪ টা কারণ ও সেগুলোর সমাধান পেশ করা হয়েছে বিস্তারিতভাবে।

বইটির শুরুতে উল্লেখিত বাণীর শেষ অনুচ্ছেদে বেফাক-মহাসচিব মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল জাব্বার রহ. লিখেছেন-

> ‘তাই আমার প্রস্তাব হলো, বইটি মুতাওয়াসসিতা [নিম্ন মাধ্যমিক], ছানাভী [উচ্চ মাধ্যমিক] ও ফযীলত [স্নাতক] সকল মারহালার প্রথম সাময়িক পরীক্ষার সিলেবাসভুক্ত করা হোক। শিক্ষার্থীরা বইটি নিজেরা অধ্যয়ন করবে এবং পরীক্ষা দিবে। আল্লাহ সকলকে সুবিবেচনার তাওফীক দান করুন! আমীন!!’

সাফল্যের প্রাকৃতিক ভিত্তিগুলো আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেকের নাগালে রেখেছেন। যারা ভিত্তিগুলো অনুসরণ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সাফল্য দান করেন।

সাফল্য অর্জনের প্রধানতম ভিত্তি হলো-

১. আত্মপরিচয় লাভ
২. ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি;
৩. সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য;
৪. পরিশ্রম-সাধনা, সময়ের সদ্ব্যবহার, লক্ষ্য অর্জনের জন্য মনে প্রবল তাড়না সৃষ্টি;
৫. শাস্ত্রজ্ঞ ও 'তাফাক্কুহ্ ফিদ্দীন' ওয়ালা মনীষীদের সাহচর্য গ্রহণ করা এবং তাঁদের জীবনচরিত-বাণীসমগ্র-পত্রসমগ্র ইত্যাদি অধ্যয়ন করা;
৬. তাকওয়া-তা'আল্লুক মা'আল্লাহ, তাওবা-ইস্তেগফার ও দ্ব দু'আ-মুনজাত

ইতিবাচক মানসিকতা ও ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হতে পারলে তোমারও এই অভিজ্ঞতা অর্জন হবে যে, মেধার স্বল্পতা, শারীরিক অসুস্থতা, আর্থিক অসচ্ছলতা, আর্থিক অধিক সচ্ছলতা, পারিবরিক প্রতিকূলতা, পরিবেশের প্রতিকূলতা, বংশীয় আভিজাত্যহীনতা, ইয়াতিম হওয়া, বয়স বেশী হওয়া, জীবনের দীর্ঘ সময় বিপথে কেটে যাওয়া, এমনকি শারীরিক ত্রুটি যেমন বধিরতা বোবাত্ব অন্ধত্ব ইত্যাদি কিছুই সাফল্য অর্জনের পথে বাধা নয়। সাফল্য অর্জনের সাফল্য অর্জনের পথে প্রধান বাধা হলো নেতিবাচক মানসিকতা ও প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি।

এ বইয়ে উপরিক্ত বিষয়গুলো সবিস্তারে আলোচনা করা হয়েছে।



মাকতাবাতুত তাকওয়া

১১/১ ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা

মোবাইল : ০১৯৬২-৪১৫০৭০

মুদ্রণে : মদীনা-আলোকায়ন প্রেস